রাষ্ট্রনীতি-রাজনীতি আইন ও মানবাধিকার

ডঃ মোঃ মাইমুল আহসান খান

সেল্‌ফ প্রকাশনী
ঢাকা

বি.এ/বি.এস.এস, এম.এ /এম.এস.এস. ও আইন বিভাগের
ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সর্বশেষ নতুন সিলেবাস অনুযায়ী রচিত।

রাষ্ট্রনীতি-রাজনীতি
আইন ও মানবাধিকার

ডঃ মোঃ মাইমুল আহসান খান

সহযোগী অধ্যাপক আইন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশনায়

সেল্ফ প্রকাশনী

২৪, নবাবগঞ্জ রোড,

ঢাকা-১২১১

পরিবেশনায়

তাহের বুক হাউজ

৬৮/৮৪ নীলক্ষেত,

ঢাকা-১২০৫

www.pathagar.com

প্রকাশক
মোঃ আবু তাহের ভূঁইয়া
সেল্‌ফ প্রকাশনী
২৪ নবাবগঞ্জ রোড, ঢাকা-১২১১

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

সহযোগিতায়
মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট (১৫শ বি.সি.এস.)

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭

কম্পোজ
মাইক্রো র‍্যাম কম্পিউটার্স
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড (৪র্থ তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ১৫০.০০ টাকা মাত্র।

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একখানি বই বাংলায় লিখিবার ইচ্ছা আমার বহুদিন হইতেই ছিল। সেই ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ায় আজ আনন্দবোধ করিতেছি। এই ব্যাপারে যাহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাহাদের নিকট আমার ঋণ শোধ হইবার নহে। প্রকাশক বইটি প্রকাশনার ব্যাপারে যেভাবে আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন তাহাতে সত্যই তিনি ধন্যবাদের পাত্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের নিকটও আমি ঋণী। কারণ, তাঁহাদের মূল্যবান গ্রন্থ হইতে আমি প্রচুর উদ্ধৃতির দ্বারা ইহাকে যথাসম্ভব সুন্দর করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি।

মাতৃভাষায় পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ জাগাইয়া তোলা এবং এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমি অধিতব্য বিষয়গুলিকে সহজ, সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

প্রচেষ্টা আমার সফল হইলে শ্রম সার্থক হইবে। অনুরাগী পাঠক ইহার উন্নয়নের জন্য কোন বিষয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে অত্যন্ত প্রীত হইব।

ডঃ মোঃ মাইমুল আহসান খান

সহযোগী অধ্যাপক আইন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

রাষ্ট্রনীতি– রাজনীতি ঃ আইন ও মানবাধিকার

সূচীপত্র

অধ্যায় ১ । রাষ্ট্রঃ রাষ্ট্রের উপাদান সমূহ ও আইন

সরকার–সার্বভৌমত্বের আভ্যন্তরীণ দিক–সার্বভৌমত্বের বাহ্যিক দিক, সমা ও রাষ্ট্র, রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ, রাষ্ট্রের সংজ্ঞার বিতর্ক, রাষ্ট্রের প্রকৃতি, জৈ শরীরিতত্ত্ব, জৈব শরীরি মতবাদের ইতিহাস, এ্যারিস্টটলের অভিমত মধ্যযুগীয় অভিমত, হার্বাট পেনসারের অভিমত, ম্যাকইভারের অভিমত, জৈ শরীরি মতবাদের সমালোচনা, আইনগত তত্ত্ব, আইনগত তত্ত্বের সমালোচনা, যান্ত্রিক মতবাদ, যান্ত্রিক মতবাদের সমালোচনা, মার্কসীয় তত্ত্ব, মার্কসী তত্ত্বের সমালোচনা,

অধ্যায় ২ । রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কীয় মতবাদ

রাষ্ট্রের উৎপত্তির ঐশ্বরীক মতবাদ,–ঐশ্বরীক ক্ষমতা বনাম রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব, রা সৃষ্টির ঐশ্বরীক মতবাদের সমালোচনা, বিধাতার ক্ষমতার ভুল ব্যাখ্যা, শক্তি প্রয়োগ মতবাদ, শক্তি প্রয়োগ মতবাদের সমালোচনা, সামাজিক চুক্তি মতবাদ, রাষ্ট্রের আদর্শবাদী তত্ত্ব, ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান, সামাজিক চুক্তি, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সীমা,

অধ্যায় ৩ । রাষ্ট্রের আদর্শবাদী তত্ত্ব

সম্পদ, শাস্তি, অধিকার ও কর্তব্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, কান্টের রাষ্ট্র দর্শণে সমালোচনা, উইল হেম ফ্রেডরীক হেগেল (১৭৭০–১৮৩১) হেগে চুক্তিসিদ্ধ।

তর্ক শাস্ত্রীয় প্রেক্ষিত, ইতিহাস সম্পর্কে হেগেল, মানুষের ইচ্ছাশক্তি সম্প হেগেল, রাষ্ট্র সম্পর্কে হেগেল, সংবিধান সম্পর্কে হেগেল, স্বাধীনতা সম্প হেগেল, যুদ্ধ সম্পর্কে হেগেল, হেগেল দর্শনের সমালোচনা,

অধ্যায় ৪ । ঐতিহাসিক বা বিবর্তন মতবাদ

রক্তসম্পর্ক, ধর্ম, যুদ্ধবিগ্রহ, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, রাজনৈতিক চেতনা,

অধ্যায় ৫ । সার্বভৌমত্ব

জন বোদিন (১৫৩০–১৫৯৬) হুগো গ্রটিয়াস, সার্বভৌমত্বের মৌলিক বৈশিষ্ট সার্বভৌমত্বের প্রকারভেদ, নাম ও সর্বস্ব প্রকৃত সার্বভৌমত্ব, বাস্তব ও আই

www.pathagar.com

সম্পর্কীয় সার্বভৌমত্ব, জনগণের সার্বভৌমত্ব, সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জন অষ্টিনের মতবাদ, অষ্টিনের সার্বভৌমত্বের সমালোচনা, সার্বভৌমত্বের বহুত্ববাদী ধারনা, বহুত্ববাদী ধারণা বিকাশের কারণ, সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে লাষ্কি,

অধ্যায় (৬) সার্বভৌমত্বের মৌলিক বৈশিষ্ট্য

অধ্যায় (৭) আইন

আইনের বিভিন্ন মতবাদ, দার্শনিক মতবাদ, তুলনামূলক মতবাদ, সমাজতান্ত্রিক মতবাদ, ঐতিহাসিক মতবাদ, বিশ্লেষনাত্বক মতবাদ, মার্কসীয় মতবাদ, আইনের সংজ্ঞা, আইনের উৎস, ধর্ম, প্রথা, বিচারকের রায়, গবেষণা গ্রন্থ, সাম্য ও সুবিচার ও ন্যায়পরায়নতা কমন ল,

অধ্যায় ৮। আইন ও নৈতিক অবক্ষয়

অধ্যায় ৯। আইন ঃ অধিকার ও কর্তব্য

অধিকারের শ্রেণীবিভাগ, প্রাকৃতিক অধিকার, নৈতিক অধিকার, আইনগত অধিকার, স্ত্রীর অধিকার, পারিবারিক অধিকার,

অধ্যায় ১০। আইনের সারকথার স্ববিরোধিতা

অধ্যায় ১১। ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা ঃ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে সাংবিধানিক আইন

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে সাংবিধানিক আইন শরীয়া ও সাংবিধানিকতাবাদ, একটি অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টি, রাজতন্ত্র ও ইসলাম মৌলবাদ সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পরীক্ষা ঃ শরীয়া আইন,

অধ্যায় ১২। পৈত্রিক সম্পত্তিতে সমানাধিকার ও উত্তরাধিকার ঃ

অধ্যায় ১৩। মানবাধিকার ঃ সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোন

সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিপাত, সমাজতান্ত্রিক মানবাধিকার: পুঁজিবাদী উদারবাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ কর্মপ্রনালী ও মানবাধিকার, সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদের সংকট,

অধ্যায় ১৪। মানবাধিকার ও ইসলামিক দৃষ্টিকোন

ইসলামী মানবতাবাদ ও স্বাধীনতার ধারণাই ইসলামী মানবাধিকারের আধ্যাত্মিক মাত্রায় মুসলিম রাজনৈতিক কতৃপক্ষ ও অমুসলিম সম্প্রদায়, আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ ও মানবাধিকার, ইসলামী সাংবিধানিকতাবাদ ও মানবাধিকার,

অধ্যায় (১৫) রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব ও অর্থনৈতিক মুক্তি ঃ উপমহাদেশ প্রসঙ্গ ও বাংলাদেশ

www.pathagar.com

অধ্যায় (১৬) **এরিষ্টটল**

এরিষ্টটলের পলিটিক্স, দাস তত্ত্ব, এরিষ্টটলের দৃষ্টিতে, এরিষ্টটলের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র ও মধ্যবিত্তের শাসন ,গণতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, মধ্যবিত্তের শাসন, বিপ্লব, বিপ্লব ঃ ব্যক্তি ও পারিবারিক বিরোধ, ষষ্ঠ পুস্তক, সপ্তম পুস্তক, অষ্টম পুস্তক, বিভিন্ন তন্ত্রে বিপ্লব, এরিষ্টটলের ন্যায়তন্ত্র

অধ্যায় (১৭) **প্লেটো**

গবেষণা কর্ম, রিপাবলিক, রিপাবলিক আইনের অনুচ্ছেদ, রিপাবলিক শিক্ষা ব্যবস্থা, রিপাবলিক (জন্ম শাসন ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ), প্লেটোর স্টেটম্যান, দি-লজ (The laues)

অধ্যায় (১৮) **চুক্তিমতবাদ সম্পর্কে টমাস হব্‌স**

জনলক, লকের সামাজিক চুক্তির সমালোচনা, জ্যা জ্যাক রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদ, রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচনা, বিপ্লব ও সমাজ বিবর্তন সম্পর্কে, পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ, মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ, মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ, পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের সমালোচনা

অধ্যায় (১৯) **সার্বভৌমিত্ব সম্পর্কে অস্টিনীয় মতবাদ**

অষ্টিনের সার্বভৌমত্বের সমালোচনা, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অস্টিনীয় সার্বভৌমত্বের সন্ধান একেবারেই মেলে না, বহুত্ববাদী ধারণা বিকাশ করণ বিগত বৎসরের প্রশ্ন

অধ্যায় (২০) **আলীজা আলী ইজেতবেগোভিচের ভাবনা থেকে সভ্যতা ও সংস্কৃতি**

গণসংস্কৃতি, নাস্তিবাদ, মঞ্চে বিষাদবাদ, নীতি এবং ইতিহাস, ধর্ম এবং জীবন, ধর্মবিপ্লব, সর্বহারা শ্রেণী ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

অধ্যায় (২১) **রাজনীতিতে মানবধিকার + উত্তরাধিকার ও কেয়ার টেকার সরকারঃ আদর্শিক দ্বন্দ্ব ও নির্বাচন**

দুই দশকের রাজনীতিতে বাংলাদেশ, '৯১-এর সংসদ নির্বাচন, '৯১-এর নির্বাচনে ভারত ফ্যাক্টর, '৯১-এর নির্বাচনে ইসলাম ফ্যাক্টর, '৯১-এর নির্বাচন ও মহিলা নেতৃত্ব, '৯১- এর নির্বাচন ও জাতীয় পার্টি , '৯১- এর নির্বাচনের ফলাফল ও রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ গোলাম আযম ইস্যু গণফোরাম – আর এক উত্তরাধিকার, '৯১- এর নির্বাচন উত্তর ছাত্র রাজনীতি, ছাত্রদলের দুই গ্রুপঃ ছাত্র রাজনীতির নতুন মাত্রা, ছাত্র রাজনীতি: নিরস্ত্রীকরণে বিরোধী দল, ১৯৯৪- এর মেয়র নির্বাচন, '৯৬- এর জাতীয় নির্বাচন।

www.pathagar.com

রাষ্ট্র

'রাষ্ট্র' শব্দটি অর্থের দিক থেকে কোন্ কোন্ শব্দের কাছাকাছি? এ প্রশ্নের তত্ত্বগত উত্তরের চাইতে ব্যবহারিক উত্তর সহজ। 'রাজ্য' 'দেশ' 'সমাজ' সরকার' ও 'জাতির' মতো শব্দকে প্রায়ই রাষ্ট্রের সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ছাত্রদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, তাদের মাঝে কে ক'টি রাষ্ট্র দেখেছে বা ভ্রমণ করেছে, তখন তাদের বিবেচনায় রাষ্ট্র ও দেশের মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকে না। দেশ ভ্রমণ মানেই তো রাষ্ট্র ভ্রমণ। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি সমগ্র ভারত বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি রাষ্ট্র (State) বলা হয়, আবার এদের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যকে State নামে আখ্যায়িত করা হয়। সমগ্র সোভিয়েত রাশিয়া একটি প্রজাতন্ত্র, আবার এর অঙ্গরাজ্যগুলো প্রজাতন্ত্র (Republic) নামেই পরিচিতি ছিল। অর্থাৎ একটি State বা Republic যেমন একটি রাষ্ট্র হতে পারে, আবার অনেক গুলো অঙ্গরাজ্য বা প্রজাতন্ত্র মিলেও একটি রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে। সমগ্র ভারতকে যদি একটি রাজ্য বলি, আবার পশ্চিমবঙ্গকেও যদি একটি রাজ্য বলি এবং দু'ক্ষেত্রেই যদি State শব্দটি ব্যবহার করি, তাহলে বাহ্যিক দিক থেকে যেন একই ধারণা প্রকাশ পেল। ক্যালিফোর্নিয়াও State, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও State, অথচ অন্য বহু ধারণার ক্ষেত্রে এমনটি করার উপায় নেই। অনেকগুলো হাত মিলিয়ে একটি হাত সৃষ্টি করা যায় না, আবার অনেকগুলো মানুষের সমষ্টিও একটি মানুষ হয় না। এমন কি অনেকগুলো জাতি মিলেও অরাজনৈতিক অর্থে একটি জাতি গঠন করা যায় না। অথচ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। অনেকগুলো রাষ্ট্র মিলে যেমন একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি করা যায়, তেমনি একটি রাষ্ট্রকে ভেঙ্গেও অনেকগুলো রাষ্ট্রের আবির্ভাব সম্ভব। উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রকে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর দাবীদার হতে কোন বাধা নেই। একারণেই রাষ্ট্রকে একটি বিশেষ অবস্থা বলা যায়।

আমরা যখন বলি স্বাস্থ্য বা মনের অবস্থা (State), তখন আমরা কিন্তু অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের একটি সমন্বিত অবস্থাকে বুঝি। যখন বলা হয় সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থা, তখনই 'State' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আবার যখন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বা মালিকানার কথা বলা হয়, তখন আমরা সরকারী নিয়ন্ত্রণ বা মালিকানাকেই বুঝি। অন্যদিকে রাষ্ট্রকে প্রায়ই একটি রাজনৈতিক সমাজ (Political Society) বা প্রতিষ্ঠান (Institution) বলা হয়ে থাকে। 'রাষ্ট্র' শব্দটির বহুবিধ ব্যবহার কোন নতুন ঘটনা নয়। আর রাষ্ট্রের ধারণাও মোটেই নতুন কিছু নয়। আমরা অ্যারিস্টটলকেও রাষ্ট্রের পরিচয় ব্যাখ্যা করতে দেখি। আবার ম্যাকিয়াভেলীর কাছ থেকেও রাষ্ট্রের বর্ণনা পাই। কিন্তু এসব মনীষীদের বর্ণনাতেও কি রাষ্ট্র সদা এক থেকেছে? নিশ্চয়ই নয়। রাষ্ট্রের অ্যারিস্টটলীয় ধারণা গ্রীক নগর-রাষ্ট্র কেন্দ্রিক হওয়াই স্বাভাবিক, আবার ম্যাকিয়াভ্যালী ইউরোপীয় জাতি-রাষ্ট্রের ধারণাকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র সম্পর্কে কিছু বলতেই প্রায় অক্ষম। কিন্তু এরা যেহেতু

www.pathagar.com

দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন, তাই তাঁদের সময়ে প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার চাইতে আরো বড় ধরণের রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা তাঁরা কল্পনা করতে পারতেন। তাই বলে গ্রীকরাও আধুনিক জাতি-রাষ্ট্র সৃষ্টির কথা ভাবতে পারেনি, আবার ইউরোপীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রসমূহ আধুনিক যুগের ধর্মীয় বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনকে যৌক্তিক কিছু মনে করতে পারেনি। এসব কারণেই রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করে এর মর্ম উদ্ধার করা রীতিমত অসম্ভব ব্যপার। তাই রাষ্ট্রের ধারণা ব্যাখ্যা করার সময় সকলে রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান ও গুণাবলীর উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং এ ব্যাপারে সবাই ঐক্যমতে পৌছেছেন যে, চারটি অপরিহার্য উপাদান একত্রে পাওয়া গেলেই বুঝতে হবে রাষ্ট্র নামক জিনিসটির উদ্ভব ঘটেছে।

রাষ্ট্রের উপাদানসমূহ ও আইনঃ নিদিষ্ট জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব মিলেই রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। রাষ্ট্রের এ অপরিহার্য উপাদানসমূহ নিজেদের মধ্যে যে সম্পর্ক বা যোগসূত্র স্থাপনের ফলে একটি বিশেষ অবস্থার উদ্ভব ঘটায়, তাই রাষ্ট্র নামে পরিচিত। এই বিশেষ অবস্থাটি সৃষ্টি ও বজায় রাখার ব্যাপারে আইনের ভূমিকা মূলমন্ত্রের মতো কাজ করে। আইনের অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্র সৃষ্টিকারী উপাদানসমূহ নিজেদের মাঝে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে না, এমনকি একে অপরকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। তাই প্রতিটি উপাদানের সাথে আইনের সম্বন্ধ আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

জনসংখ্যা ঃ মানুষকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের সৃষ্টি। মানুষের জন্যই রাষ্ট্র, রাষ্ট্রে জন্য মানুষ নয়। কিন্তু প্রতিটি রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যা প্রয়োজন। অর্থাৎ রাষ্ট্রের অবশ্যই জানা থাকা প্রয়োজন কোন জনগোষ্ঠী তার অধীন, আর কোন জনগোষ্ঠী তার অধীন নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোন রাষ্ট্রের অধীনস্থ জনগোষ্ঠী কত বড় বা ছোট হবে? অর্থাৎ গণনায় জনসংখ্যার পরিমান কত হবে। প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের নাগরিক সংখ্যা নির্ধারণ করেছিলেন ৫০৪০। কিন্তু তাঁর ছাত্র অ্যারিস্টটল এরূপ কোন সংখা নির্ধারণ করতে সম্মত হননি। তাঁর মতে গ্রীক নগর রাষ্ট্রগুলোর জনসংখ্যা কোন ভাল রাষ্ট্র সৃষ্টির পথে অন্তরায় নয়। তাঁর মতে জনসংখ্যর কারণে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র চর্চা করতে অসুবিধে হয়- এমন অবস্থা সৃষ্টি হলে বুঝতে হবে রাষ্ট্রে জনসংখ্যার আধিক্য ঘটেছে। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের যুগে, অর্থাৎ যেখানে প্রতিটি নাগরিকই আইন তৈরিতে সরাররি ভোট দিত, সেখানে জনগণের সংখাধিক্য রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অসুবিধে সৃষ্টি করতো। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র অসম্ভব হয়ে পাড়লেও আদর্শ রাষ্ট্রের জন্য নির্দিষ্ট জনসংখ্যার পরিমাণ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলেছে বহুকাল। ফরাসী দার্শনিক রুশো অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঁর সামাজিক চুক্তি বইতে দশ হাজার নাগরিকের দেশকেই আদর্শ রাষ্ট্র সৃষ্টির পথে সহায়ক মনে করেছিলেন।

আধুনিক কালে রাষ্ট্রের অধীনস্থ জনগোষ্ঠী কত বড় বা ছোট, তা আর কোন মৌলিক ব্যাপার নয়। মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে রাষ্টের আওতাধীন জনগোষ্ঠীর সাথে রাষ্ট্রের বাঁধন কত মজবুত। অর্থাৎ আইন রাষ্ট্র-যন্ত্রের সাথে তার নাগরিকদের কত নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে। মূলতঃ একটি

www.pathagar.com

আধুনিক রাষ্ট্রে কোন ধরণের আইন অনুসৃত হয়েছে, আর তার নাগরিকগণ সে আইনকে কত বেশি আপন করে নিতে পেরেছে, তার উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রটি কত বেশি সফল। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ নিয়ে চীনের ভাল রাষ্ট্র হতে কোন বাধা নেই। আবার স্যানম্যারিনো, ব্রুনাই, মালদ্বীপ বা কাতারের মতো ছোট দেশগুলোতে কম জনসংখ্যার কারণে রাষ্ট্র-যন্ত্র সবল বা দুর্বল হবে এমন যুক্তি অন্তসারশূন্যতায় ভরপুর । তবে প্রতিটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যার সাথে তার সম্পাদের একটি সংগতি থাকা বাঞ্ছ নীয়। তা না হলে রাষ্ট্রটি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়বে। অন্য রাষ্ট্র বা শক্তি সাহায্যের নাম করে তার স্বাধীন অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলবে সহজেই।

কোন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে কি পরিমান সহায়-সম্পদ রয়েছে, তার চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ঐ সম্পত্তিতে জনগণের অধিকার আইন কত নিপুণভাবে নিশ্চিত করতে পেরেছে। রাষ্ট্রের নাগরিক বা জনগনের মাঝে আজ আর আইন বাহ্যিক কোন বৈষম্য স্বীকার করে না, তথাপি প্রতিটি রাষ্ট্রের সুবিধা ভোগী সম্পদায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর উপর শোষণ ও নির্যাতন চালায় অত্যন্ত সুকৌশলে। আইনের ফাঁক এখানে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে। তাই দেশের অধিকাংশ জনগণ যাতে রাষ্ট্রের জন্য অনুসৃত আইন সৃষ্টি, প্রয়োগ ও রদকরণ প্রক্রিয়ায় নানা ভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে, সে ব্যবস্থাই আধুনিক একটি রাষ্ট্রকে অধিকতর সফল করে তোলে। ভিন্নভাবে বলতে গেলে নাগরিকদের মোট জনসংখ্যা নয়, বরং সুনাগরিকদের আনুপাতিক হারের উপরই নির্ভর করে আধুনিক কোন রাষ্ট্রের সর্বাধিক সফলতা ও ব্যর্থতা।

ভূখন্ডঃ রাষ্ট্রের জনসংখ্যার জন্য অবশ্যই নিদিষ্ট ভূ-খন্ডের প্রয়োজন, যেখানে তারা বসবাস করবে । কিন্তু কোন জনগোষ্ঠী যদি অস্থায়ীভাবে কোন ভূ-খণ্ডে অবস্থান করে, তবে কি তারা রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে পারবে? যাযাবররা সংখ্যার যত বেশিই হোক না কেন, তাদের পক্ষে রাষ্ট্র সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কোন জনসংখ্যার স্থায়ীভাবে কোন ভূ-খণ্ডে বসবাসের অর্থ শুধু ঐ ভূ-খণ্ডকে করায়ত্ত করা নয়; বরং রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডের উপর কর্তৃত্ব বলতে বুঝায় ঐ ভূ-খণ্ডের উপরিভাগ এবং তার জল, স্থল, আকাশ ও অন্তরীক্ষের সকল সহায়-সম্পত্তির উপর জনগণের সর্বময় আধিপত্য। রাষ্ট্রের নাগরিকগণ আইনানুগভাবেই রাষ্ট্রের ভূ-খন্ডর স্বত্বাধিকারী। আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের সকল শাসনতন্ত্রই একথা স্বীকার করে নিয়েছে। রাষ্ট্র তার ভূ-খণ্ডের সাথে তার নাগরিকদের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করতে সদা তৎপর।

কোন দেশের জনগণ যদি নিজদের ভূ-খণ্ডের সঙ্গে তাদের ভাগ্যকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত করে ভাবতে না শিখে, তবে তাদের কর্মকান্ডে দেশ-প্রেমিক হওয়ার অবকাশ যুক্তিসঙ্গত কারণেই অনেক কম। জনগণকে রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নতি-অবনতির বিনির্মাতা করার স্বার্থেই তাদেরকে রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডের সাথে একত্ম হতে হয়। রাষ্ট্রের সীমানায় সকল সফলতা ও ব্যর্থতার অংশীদারিত্ব দিতে হয় জনগণ ও তাদের আবাসভূমিকে।

www.pathagar.com

নিজস্ব স্থায়ী আবাসভূমি ছাড়া কোন জাতি বা জনগোষ্ঠী কিছুতেই তাদের উন্নতি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে না। আবার নিজ আবাসভূমির প্রতি অবহেলা একদিন তাদেরকে নিজ ভূমিতে পরবাসী করে তোলে। অতীতে ঘন ঘন যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ভূ-খন্ডের হাত-বদল সহজেই এ সত্যের প্রমান দেয়। আধুনিক কালে আক্ষরিক অর্থে ভূ-খণ্ডের মালিকত্ব খুব কমই হাত-বদল হয়। প্যালেস্টাইনী ভূমিতে ইসরাইলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে বিংশ শতাব্দীর ইতহাসে একটি ব্যতিক্রম ধরা যায়। কিন্তু নিজ আবাসভূমির প্রতি দায়িত্বহীনতাই সম্ভবতঃ প্যালেস্টাইনীদের দুরবস্থার সূত্রপাত ঘটিয়েছে। কারণ গোড়াতেই যদি প্যালেস্টাইনী জনগণকে তাদের আবাসভূমির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করা যেত, তবে বহিরাগতরা এভাবে তাদের ভূমিতে আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হতো না। অন্যদিকে ইহুদীরা পৃথিবীর কোথাও না কোথাও নিজেদের একটি স্থায়ী আবাসস্থল রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলো দারুণভাবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজ ইহুদীদের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি তা ইসরাইলী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ছাড়া সম্ভব হতো না । কোন জাতির লোকদের জন্য কোন নির্দিষ্ট আবাসভূমি থাকা জরুরী। এ প্রয়োজন শুধু ঐ ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগণের জন্যই নয়, বরং ঐ জাতির লোক যারা পৃথিবীর অন্যত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাদের স্বার্থেও একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রয়োজন। আরবদের একুশটি রাষ্ট্র রয়েছে, কিন্তু আন্তর্জাতিক জীবনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব খাটানোর মতো কোন আরব রাষ্ট্র না থাকার কারণে তারা আন্তর্জাতিক আইন বা কোন সংগঠনকে নিজ জাতির স্বার্থের পক্ষে কাজে লাগানোর ব্যাপারে এক ইসরাইলের মোকাবিলায় বড়ই অসহায়।

কোন রাষ্ট্রের ভূ-খন্ড কত বড়, এটি অনেক সময়ই তেমন বড় ব্যাপার নয়। মূল ব্যাপারটি হচ্ছে রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডটি কত বেশি সুন্দর ও সুনির্দিষ্টভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। রাষ্ট্রের জনগণ বা সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার শিকার হয়ে প্রাকৃতিকভাবে সমৃদ্ধ ও সুষমামন্ডিত কোন ভূ-খন্ড সহজেই প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারাতে পারে। আবার অপেক্ষাকৃত কম জলৌসের অধিকারী কোন ভূ-খণ্ড সঠিকভাবে কল্যাণকর পদ্ধতি ব্যবহার করার ফলে জনগণের জন্য অধিকতর উপযোগী আবাসস্থল হয়ে উঠতে পারে। রাষ্ট্রের জনগণের সাথে ভূ-খন্ডের সার্বিক স্বার্থ জড়িত করার ব্যাপারে আইনের ভূমিকা নীতি নির্ধারণীর ও নিয়ন্ত্রনকারীর। আইন যদি তার এ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয় তবে কোন রাষ্ট্রের জনগণ ও তাদের আবাসভূমি ইতিহাসের যে কোন নির্মম পরিহাসের শিকার হতে বাধ্য। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের খণ্ড-বিখন্ডকরণ পক্রিয়াই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সরকার ঃ কোন জনগোষ্ঠী কোন ভূ-খন্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে গেলে সেখানে একটি সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ থাকতে হবে। সরকার কথাটির সাধারণত বহুবিধ ব্যবহার লক্ষণীয়। জমিদারী ব্যবস্থা থাকাকালীন সময়ে জমিদারদের একজন 'সরকার' থাকত। বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও অনুরূপ 'সরকার' পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দেখা যেত। কোন প্রতিষ্ঠানের সরকার তাকেই বলা হত যে সব কাজের নির্বাহী কর্তা। সরকার-বাবু মানে কিন্তু মালিক বাবু নয়, বরং মালিক কর্তৃক

www.pathagar.com

নিযুক্ত ব্যক্তি, যিনি সকল কাজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পদন করেন। ঠিক তেমনি সরকার রাষ্ট্রের জনগণ বা ভূ-খণ্ডের মালিক নয়; বরং জনগণ তাদের মৌলিক ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রের সকল কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার স্বার্থে একটি কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করে। এ সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষই সরকার নামে অভিহিত।

সরকার সৃষ্টিতে, এর কার্যাবলী সম্পাদনে এবং এর রদ-বদলে আইনের ভূমিকা চূড়ান্ত। সরকার কিভাবে আসবে ও যাবে, কিভাবে এর বিভিন্ন বিভাগ কাজ করবে-সবই নির্ধারণ করে দেয় আইন। আইন সরকার ও জনগণের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। সরকার ইচ্ছা করলেই যা খুশী তা করতে পারে না। সরকারকে আইন মেনে চলতে হয়। সরকারকে জনগণের কাছে তার বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিতে হয়। সরকারকে জনগণের আশা-আকাঙ্খা ও চাওয়া-পাওয়ার প্রতি যত্নবার হতে হয়। জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধার প্রতি উদাসীন সরকার বেশিদিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না।

সরকারের সকল কর্মকাণ্ডকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়; শাসন, আইন ও বিচার। এ তিনটি বিভাগের ক্ষমতাই আইন দ্বারা সৃষ্ট। আইনই এদেরকে একই সূত্রে বেঁধে দেয়, আবার একটিকে অপরটি থেকে আলাদা করে দেয়। এই তিনটি বিভাগের মাধ্যমেই সরকার ও জনগণের মাঝে বিভিন্ন ধরণের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। প্রতিটি বিভাগকেই আইন মেনে চলতে হয়। সরকার বেআইনী ভাবে শাসন করতে পারেন না। আইন তৈরি করার সময় সরকার বেআইনী পন্থা অবলম্বন করতে পারেন না বা জনগণের ইচ্ছা-অভিরুচির বিরুদ্ধে আইন তৈরি করার ক্ষমতাও তার নেই। বিচারের কাজে হস্তক্ষেপ করে বিচারের রায়কে প্রভাবিত বা বদলে দেয়ার ক্ষমতাও সাধারণতঃ সরকারের থাকে না। যে সরকারের সাথে আইনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, সে সরকারের পক্ষে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও জনগণের কার্যাবলীকে আইনের নিয়ন্ত্রণে আনা সহজ হয়। আবার যে জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ নাগরিক আইন মাফিক চলতে চায়, তাদের সরকারের পেক্ষে অবৈধ কাজ-কর্ম বেশিদিন চালোনো সম্ভব নয়। জনমত যদিও রাষ্ট্র সৃষ্টির কোন উপাদান নয়, কিন্তু আধুনিক কালে সরকারের অধিকাংশ ক্রিয়া-কলাপের খবর পাওয়া জনগণের পক্ষে সহজ বিধায় জনমতের বিরুদ্ধাচরণ করে কোন সরকারই ক্ষমতায় বেশিদিন টিকে থাকতে পারেন না।

সার্বভৌমত্ব ঃ কোন নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে কোন সরকারের অধীনে কোন জনগোষ্ঠী স্থায়ীভাবে বসবাস করলেই কোন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে না। রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন এমন কর্তৃত্বের, যা অপ্রতিরোধ্য। অর্থাৎ যে ক্ষমতার বলে জনগণ তাদের নির্বাচিত বা পছন্দমত সরকারের মাধ্যমে পূর্ণ স্বাধীন ভাবে তাদের সকল আশা আকাঙ্খা পূরণ করতে পারে। সার্বভৌমত্বের সরচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে রাষ্ট্রের জন্য অনুসৃত আইন কি হবে, এ ব্যপারে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোন বিদেশী রাষ্ট্রের বা আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে তার সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রেও যে পূর্ণ স্বাধীন।

সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের জীবন ও আত্মাস্বরূপ। বাকী তিনটি উপাদান সার্বভৌমত্বের ছোঁয়া ছাড়া রাষ্ট্র

www.pathagar.com

গঠনে অক্ষম। কোন মানুষের আত্মা যেমন শরীরের কোন নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে না, বরং শরীরে প্রাণ-বায়ু থাকলেই আমরা যেমন বুঝি তার আত্মা শরীরের সাথে মিশে আছে, তেমনি রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব থাকলেই বাকি তিনটি উপাদান সজীব ও সক্রিয় হয়ে উঠে। কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রমাণ দুই ভাবে মিলতে পারে। রাষ্ট্র অবশ্যই আভ্যন্তরীন এবং বহির্দেশীয় সকল ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বধীনতা ভোগ করবে এবং সে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপকারী শক্তি, প্রতিষ্ঠান, জাতি বা দেশকে প্রতিহত করার মতো সামর্থ্যের অধিকারী হবে। তাই সার্বভৌমত্বের দু'টি দিক রয়েছে: আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয়।

সার্বভৌমত্ব একটি অবিভাজ্য ও অখণ্ড ধারণা। তাই আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব (Internal sovereignty) ও বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব (External sovereignty) কথা দু'টি কিছুটা হলেও বিভ্রান্তিজনক। কোন মানুষ তার চিন্তাজগতে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করতে পারে, আবার তার কর্মপন্থা নির্ধারণেও সে স্বাধীনতা ভোগ করে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই তার একই মন ও আত্মা কাজ করে। রাষ্ট্র যে শক্তি বলে তার আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় কার্যাবলীতে সর্বোচ্চ ও চরম ক্ষমতা ব্যবহার করে, এটি মূলতই আত্মার মতো একটি অবিভাজ্য ধারণা।

সার্বভৌমত্বের আভ্যন্তরীণ দিক (Internal aspect of sovereignty) :

রাষ্ট্র তার সীমানার ভেতর সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর প্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধিকারী। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় চূড়ান্ত ক্ষমতাকে যদি রাষ্ট্রের ভেতরে কোন ব্যক্তি, সংস্থা, সংঘ বা প্রতিষ্ঠান চ্যালেঞ্জ করে, তবে রাষ্ট্র তার ক্ষমতা বলে তাকে পদানত করে বা আনুগত্যের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করে। আইনের ক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত কোন নিয়ম-কানুন যদি রাষ্ট্রীয় আইনের সাথে সংঘর্ষশীল হয়, তবে দ্বিতীয়টির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্র আইন তৈরি ও রদ করার ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নকারী সংস্থার মাধ্যমে তার সার্বভৌমত্বের প্রমাণ দেয়। শাসনের ক্ষেত্রে আইনানুগভাবে নির্বাহী প্রধান সকলের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব কার্যকর করে। বিচারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদালত যে-কোন ব্যাপারে স্বাধীনভাবে তার শাস্তিমূলক বা অন্য কোন ফয়সালা সম্বলিত রায় প্রদান করে। এক কথায় রাষ্ট্র তার নিজ সীমানায় আইন, শাসন ও বিচার সংক্রান্ত সকল ব্যাপারেই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। এরূপ চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতারই অপর নাম সার্বভৌমত্বের আভ্যন্তরীণ দিক।

সার্বভৌমত্বের বাহ্যিক দিক (External aspect of sovereignty) :

বহির্বিশ্বে কি কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব কার্যকর? কোন রাষ্ট্র তার আভ্যন্তরীণ বিষয়াদিতে যেমন সার্বভৌম, অনুরূপ সার্বভৌম শক্তি তার সীমানার বাইরে ব্যবহারের চেষ্টা মানেই হচ্ছে অন্য আর সব রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের উপর হামলা বা হস্তক্ষেপ। কোন রাষ্ট্র নিজ সীমানায় সর্বোচ্চ ক্ষমতা বিনা বাঁধায় প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু অন্যের সীমানায় তা করতে পারে না। অথচ বহির্বিশ্বে তার স্বার্থ রক্ষার্থে কোন রাষ্ট্র তার পন্থা বা পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বধীনতা ভোগ করে। অর্থাৎ

www.pathagar.com

কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে কি ধরণের বন্ধুত্ব বা শত্রুতামূলক আচরণ করবে, সে ব্যপারে সে নিজেই সকল দায়-দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে পারে। কোন দেশের সাথে তার কিরূপ সন্ধি হবে বা কূটনৈতিক সম্পর্কের ধরণ কেমন হবে, তা রাষ্ট্র নিজেই ঠিক করে। অন্য দেশ বা প্রতিষ্ঠান জোর করে তাকে দিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে নিতে পারে না বা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না। তাত্ত্বিকভাবে বহির্দেশীয় কার্যাবলীতে রাষ্ট্র পরিপূর্ণ স্বাধীন, কিন্তু বাস্তবে বৃহৎ ও শক্তিশালী কয়েকটি দেশ ছাড়া বাকি দেশগুলোর এ ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা ব্যবহার করার অবকাশ খুবই সীমিত। অবশ্য কোন দেশের বৈদেশিক নীতিমালাকে যদি আভ্যন্তরীন নীতিমালার সম্প্রসারিত রূপ হিসেবে ব্যখ্যা করা যায়, তবে বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে প্রতিটি রাষ্ট্রকে স্বাধীন ভাবা যায়। কিন্তু দুর্বল ও গরীব দেশসমূহের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় ক্ষেত্রেই সার্বভৌম শক্তির ব্যবহারকে সীমিত আকারে বুঝাই অধিকতর বাস্তবসম্মত।

সমাজ ও রাষ্ট্র ঃ মনুষ্য বসতি থাকলেই রাষ্ট্র গড়ে উঠবে, এমন কোন কথা নেই। অথচ বর্তমান বিশ্ব প্রমাণ দেয় রাষ্ট্রহীন মানব সমাজ অসম্ভব। কিন্তু এক কালে এমনটি ছিল না। মানুষ পরিবার বা গোত্রভুক্ত হয়ে কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ছাড়াই জীবনাতিপাত করতো। রাষ্ট্রের কথা চিন্তাও করতো না বা করতেও হতো না। রাষ্ট্রের যে সব সাধারণ প্রকৃতির কথা আজ আমরা বলি, এর বিরাট অংশ জুড়েই আছে আজকের দিনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা। কিন্তু আজকের দিনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার ইতিহাস খুব একটা পুরাতন নয়।

মেকিয়াভ্যালীকেই (১৪৬৯-১৫২৭) আমরা আজকের আধুনিক অর্থে 'রাষ্ট্র' শব্দটি ব্যপকভাবে ব্যবহার করতে দেখি। পারিবারিক, ধর্মীয় বা অন্য যে-কোন সামাজিক সংগঠনের পেছনে রাষ্ট্র সম্পর্কিত চিন্তার তেমন কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। রাষ্ট্র ছাড়াই পরিবার, দেশ, নগর, গ্রাম, জাতি, উপজাতি, ধর্ম, রাজনৈতিক দল, শ্রেণী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিলো এবং তাদের কার্যক্রম যথারীতি চলে আসছিলো। রাষ্ট্র কি এ সবের স্থলাভিষিক্ত হতে চেয়েছে? রাষ্ট্র এসব কোন একটি বা কয়েকটিকে একত্রিত করে এর স্থলাভিষিক্ত হতে চায়নি; বরং এর প্রত্যেকটিকে কোন না কোনভাবে প্রভাবিত করতে চেয়েছে: আবার প্রত্যেকের কাছ থেকেই নিজের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ্ করেছে। পরিবার থেকে শুরু করে জাতি পর্যন্ত সবাইকে রাষ্ট্র অধিকতর সুন্দরভাবে সংরক্ষণ ও পরিবর্ধন করতে চেয়েছে। কিন্তু সমাজে রাষ্ট্রের অভ্যুদয়কে বিভিন্ন ভাবে দেখা হয়েছে। কেউ এর জাতিগত বা ধর্মীয় চরিত্রকে প্রকটভাবে দেখেছে, আবার কেউ রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্রকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে।

কোন এক সময়ের নির্দিষ্ট কোন রাষ্ট্রের চরিত্র ব্যখ্যা করলে অবশ্যই এর মধ্যে কোন একটি বিশেষ রূপ অধিকতর প্রকট মনে হওয়াই স্বাভাবিক। আর তাই ম্যাকআইভারের মতে: "রাষ্ট্রের সাধারণ প্রকৃতির চেয়ে নির্দিষ্ট একটি রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে একমত হওয়া সহজ।" কিন্তু কোন নির্দিষ্ট রাষ্ট্রে কি ঐ সমাজের পরিপূর্ণ রূপ প্রতিফলিত হয়? রাষ্ট্রকে যদি আমরা একটি রাজনৈতিক

www.pathagar.com

সমাজ বলি এবং সরকার–যন্ত্র ও রাজনৈতিক দল সহ সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক সমাজের অংশ ধরি, তাহলেও কি ঐ রাজনৈতিক সমাজের কর্মকান্ডের সাহায্যে মানবীয় সকল সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব? আধুনিক রাষ্ট্র অতীতের সকল রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী এবং এর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তারপরও কোন রাষ্ট্রর পক্ষেই কোন সমাজের সমগ্র জীবন–ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন সম্ভব নয়। জীবন কোন যন্ত্র নয় যে, মানুষের উদ্ভাবিত অন্য আর একটি যন্ত্রে দ্বারা এর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রন সম্ভব হবে। রাষ্ট্রের অবস্থান এবং এ যন্ত্রটির ক্রমবর্ধমান শক্তিশালী রূপ অবশ্যই সমাজের মাঝে পরিস্ফুটিত হচ্ছে। তাই বলে রাষ্ট্রই সমাজের একমাত্র চূড়ান্ত স্বরূপ নয়। রাষ্ট্র এমন একটি যন্ত্র, যা সমাজ জীবনের চাইতে অনেক বেশি দ্রুত স্বরূপ পাল্টাতে পারে। এর আদর্শগত ভিত্তিও পরিবর্তিত রূপ পরিগ্রহ করতে পারে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত কার্যক্রমের মধ্যে আমূল পরিবর্তনই শুধু নয় পরস্পর বিরোধী গতিধারও লক্ষ্য করা যেতে পারে।

'সামাজিক জীবনের উপর কর্তৃত্ব লাভ করে রাষ্ট্র সমাজ জীবনকে পোষণ অথবা শোষণ করে, সংযত অথবা মুক্ত করে, পূর্ণতা দান করে, অথবা ধ্বংস করে।' (Ibid, পৃষ্ঠা–৩)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মান সমাজের দ্বিধাবিভক্তি ও পূর্ব জার্মান সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং আবার ১৯৯০ সালে পশ্চিম জার্মানীর সাথে একত্রীকরণের মাধ্যমে একক জার্মানীর আর্বিভাব প্রমাণ করে কোন জাতির সমাজ ব্যবস্থার রাজনৈতিক রূপ ব্যহ্যিকভাবে যত ভাবেই বদলানো যাক না কেন, ইতিহাসের অনুকূল পরিস্থিতিতে সে পুনরায় স্বীয় রূপ ধারণ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ১৯৮৯ সালে উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেনের একত্রীকরণও একই সত্যের প্রমাণ বহন করে। দক্ষিণ ইয়েমেনে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও উত্তর ইয়েমেনে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা মূলত সার্বিক ইয়েমেনী সমাজ কাঠামোর তেমন একটা বড় ধরণের পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ হয়নি। রাষ্ট্রযন্ত্র যতই শক্তিশালী ও বৃহৎ হোক না কেন, এটি সামাজিক মানুষের বাহ্যিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র। সমাজে প্রচলিত বন্ধুত্ব বা শত্রুতা, পরশ্রীকাতরতা বা সহমর্মিতা, নিষ্ঠুরতা বা মমত্ববোধের ন্যায় সামাজিক প্রবণতার উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বড়ই সামান্য। সর্বোপরি সমাজের নৈতিক অবস্থার উপর রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব খুব কম ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য।

আদর্শগত ভাবে রাষ্ট্রের স্বরূপ কেমন হওয়া উচিত? রাষ্ট্রের কি কি কাজ করা উচিত? এসব প্রশ্নের তাত্ত্বিক উত্তর এবং কোন রাষ্ট্রের বাস্তব অবস্থার মাঝেও বড় ধরনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাই রাষ্ট্রকে এক ধরণের সংঘ বলাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। এ সংঘটির সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে এর ভিতরে অবস্থিত বাকি সব সংঘ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে এর সম্পর্কের গতি–প্রকৃতির উপর। যখন কোন রাষ্টের ভিতরের সকল শক্তিশালী সংঘের সাথে এর সুসামঞ্জস্য বজায় থাকে তখনই রাষ্ট্র অধিকতর সফলতার সাথে কাজ করতে পারে। কিন্তু একটি রাষ্ট্র যতই সফল হোক না কেন, তার পক্ষে সমগ্র সমাজের জীবন ধারা পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। সে কারণেই রাষ্ট্র ব্যবস্থা সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার আংশিক প্রতিফলন মাত্র। বহু ব্যক্তি, সংঘ ও প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের উপর

www.pathagar.com

নির্ভর না করে সমাজ জীবনের বিভিন্ন গতিধারার উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের সাথে এদের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। রাষ্ট্রেরও এতে কোন আপত্তি থাকে না, আবার রাষ্ট্র ব্যবস্থার বাইরে থাকার কারণে তাদেরও তেমন বড় ধরণের কোন লোকসান হয় না।

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ ঃ

একটি রাষ্ট্রের ভিতরে বহু ধরণের সংঘ থাকে। যখন কোন এক দল লোক কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঐকমত্যে পৌঁছে, সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করে, তখনই তারা কোন সংঘ সৃষ্টি করে থাকে। প্রতিটি সংঘেরই নিজস্ব নিয়ম-কানুন থাকতে বাধ্য। এই সব নিয়ম-কানুনই সংঘের সদস্যদের জন্য আইন স্বরূপ। এই দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের ন্যায় তারা অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি সংঘই তার সদস্যদের জন্য আইন তৈরি করে থাকে। কোন সংঘের আইন শুধুমাত্র তার সদস্যদের জন্যই প্রযোজ্য। প্রতিটি সংঘের সদস্যরা সংঘের আইন মেনে চলে। কিছু ব্যক্তিগত,সামাজিক এমনকি রাজনৈতিক সুবিধাও ভোগ করে থাকে। এর বিনিময়ে তাদেরকে সংঘেব প্রতি কিছু কর্তব্য পালন করতে হয়। কোন সদস্য যদি তার সংঘের প্রতি দায়িত্ব পালন না করে বা পালন করতে ব্যর্থ হয়, তবে সংঘের তরফ থেকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে। তবে সংঘের নিয়ম ভঙ্গের পরিণতি সাধারণত জরিমানা ও সদস্যপদ হারানো পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। কিন্তু রাষ্ট্রের সাথে একজন নাগরিকের সম্পর্ক আরো কঠিন বন্ধন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই যে কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে না। নাগরিকত্ব অর্জন না করলে অনেক সময় ঐ রাষ্ট্রে বসবাস পর্যন্ত করতে পারে না।

"রাষ্ট্রের আইন মানা না মানা নাগরিকদের ইচ্ছাধীন কোন ব্যাপার নয়। রাষ্ট্রের আইন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না, এতে শাসক ও শাসিত এ দুইই নিয়ন্ত্রিত হয়। আইন এ অর্থে সার্বজনীন যে, কোথাও এর কার্যকারিতা বন্ধ থাকে না। সমাজের প্রত্যেক এলাকায় রাজনৈতিক আইন হলো একটা সুদৃঢ় ও স্থায়ী কাঠামো" (Ibid, পৃষ্ঠা ১৪-১৫)

রাষ্ট্র যেহেতু একটি স্থায়ী আইনানুগ কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই অন্যান্য সংঘের মতো এর জন্ম, মৃত্যু ও পুর্ণগঠন পদ্ধতি তত সহজ নয়। রাষ্ট্র বিধ্বস্ত ও খণ্ডিত হলে এর পরিণতিও হয় ভয়াবহ ও সুদূরপ্রসারী। সে কারণেই রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের মিলন বা বিচ্ছেদ মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। অথচ অন্যান্য সংঘের বেলায় এ প্রক্রিয়া তেমন কোন জটিলতার সৃষ্টি করে না। নতুন করে কোন সংঘ সৃষ্টি বা তার বিলুপ্তির জন্য কিছু লোক ব সদস্যের ইচ্ছাই যথেষ্ট। অথচ বাল্টিক রাষ্ট্র তিনটির পুনরায় সার্বভৌম রূপ পরিগ্রহ করতে অপেক্ষা করতে হয়েছে ১৯৪০ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত। রাষ্ট্রীয় আইনের বিশেষত্বই মূলতঃ রাষ্ট্রকে অন্যান্য সকল সংঘ থেকে আলাদা করে ফেলে। অন্যান্য সংঘের মতো রাষ্ট্রীয় আইন সহজে পরিবর্তন করা যায় না। রাষ্ট্রীয় আইনের বল প্রয়োগ করার ক্ষমতা প্রায়ই অসীম। অথচ অন্যান্য সংঘের আইন সুপরিবর্তনীয় এবং এর বল প্রয়োগ করার ক্ষমতাও খুবই সীমিত।

www.pathagar.com

রাষ্ট্র যে আইন ব্যবহার করে তাকে আমরা সার্বজনীন রাজনৈতিক আইন বলতে পারি। রাষ্ট্রীয় আইনের সার্বজনীনতা ও সীমাহীন বলপ্রয়োগ করার ক্ষমতার কারণে তার পরিধির বিস্তৃতি ঘটে খুব ধীরে। সমাজ জীবনের জটিলতায় ও বৈচিত্রে প্রায়ই তাকে সাবধানী ভূমিকা পালন করতে হয়। সে নিজেকে সহজে অকেজো বা দুর্বল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চায় না। "আইন রচিত হয় অতি বিস্তারিত এক পদ্ধতিতে। বিচার, বিবেচনা ও আপোষ-মীমাংসার মাধ্যমে যে সূত্র রচিত হয়, তারই স্পষ্ট প্রকাশ হলো আইন। প্রচলিত বিধি বিধানের জটিল কাঠামোতে সযত্নে আইন-সূত্রকে খাপ খাইয়ে এর প্রণয়ন হয়। " (পৃঃ ১৫Ibid) রাষ্ট্রীয় আইনের সৃষ্টি ও প্রায়োগিক জটিলতা ব্যহ্যিকভাগে সীমাহীন ক্ষমতাধর এ নিয়ন্ত্রকের কার্যকারিতাকে অনেকাংশে সীমিত করে ফেলে। আবার অন্যান্য সংঘের দর্বল আইন সমূহ সহজেই প্রয়োগ করা যায় বলে ঐসব আইন সৃষ্টি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা পরিলক্ষিত হয় না। বরং যে সংঘ যত বেশি কার্যকর, সে সংঘের আইন প্রয়োগ তত বেশি দ্রুত। রাষ্ট্রীয় সার্বজনীন আইনের কার্যক্ষমতার সীমাবদ্ধতার করণে রাষ্ট্র বেশ কিছু সাময়িক ও সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে থাকে।

রাষ্ট্র নিজেই ঠিক করে দেয় কোন ধরণের সংঘ তার ভূখণ্ডে গড়ে উঠতে পারবে, আবার কোন ধরণের সংঘ সৃষ্টি করা আইনত নিষিদ্ধ। প্রতিটি সংঘই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা নিয়ে বেড়ে উঠে। কোন সংঘই তার আওতা বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে পারে না। আইন বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপের জন্য রাষ্ট্র যে কোন সংঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিতে পারে। কোন সংঘকেই রাষ্ট্র তার স্থলাভিষিক্ত হতে দেয় না। এমনকি রাষ্ট্রের সকল সংঘ মিলেও রাষ্ট্রের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। এখানেই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের বহিপ্রকাশ। কিন্তু রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রকৃতি একেবারেই অলীক নয়। লাস্কির মতে; "Its moral character is no different from that of any other association. It exacts loyalty upon the same grim condition that a man exacts loyalty from his friends. It is judged by what it offers to its members in terms of the things they deem to be good. Its roots are laid in their minds and hearts"

"ইহার (রাষ্ট্রের) নৈতিক চরিত্র অন্য যে কোন সভা-সমিতির নৈতিক চরিত্র থেকে আলাদা নয়। একজন লোক যে কঠোর শর্তে তার বন্ধু জনদের কাছ থেকে ভালবাসা/বিশ্বাস অর্জন করে, সে একই শর্তে ইহা (রাষ্ট্র) আনুগত্য লাভ করে। রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত যে সব জিনিস ইহার সভ্যগন ভাল বলে মনে করে, তার ভিত্তিতে ইহার বিচার করা হয়। তাদের হৃদয়-মনে ইহার মূল প্রথিত।"

কিন্তু কোন রাষ্ট্র যদি তার নৈতিক বৈধতা হারায় তবুও তার বিলুপ্তি ঘটে না। নৈতিক যৌক্তিকতা হারিয়ে শুধুমাত্র আইনের বৈধতা দিয়ে কোন সংঘ বেশিদিন তার কর্মকান্ড চালিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্রের নৈতিক যৌক্তিকতা না থাকলেও সে শুধু শক্তির বলেই বহুদিন টিকে থাকতে পারে। যেহেতু রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত জনগণ বাধ্যতামূলক ভাবেই রাষ্ট্রে নাগরিক এবং নাগরিক হওয়ার কারণেই বাধ্যতামূলক ভাবে রাষ্ট্রের প্রতি সবাইকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হয়। কোন

www.pathagar.com

নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করতে অসম্মতি জানালে রাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাকে দায়িত্ব পালনে বাধ্য করতে পারে। অন্যান্য সংঘের সদস্যের মতো সে রাষ্ট্র নামক সংঘাটি থেকে যখন-তখন বেরিয়ে আসতে পারে না। কোন নাগরিক অন্য কোন সংঘের সদস্য নাও হতে পারে বা একই সাথে বেশ কয়েকটি সংঘের সদস্য হতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রের সদস্য হওয়া যেমন বাধ্যতামূলক, তার প্রতি দায়িত্ব পালনও তেমনি বাধ্যতামূলক। ইচ্ছা বললেই কোন নাগরিক তার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এড়িয়ে চলতে পারে না।

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক ঃ রাষ্ট্র যে সব উপাদান নিয়ে গঠিত, তার আলোকে রাষ্ট্রকে সজ্ঞায়িত করা খুবই সহজ। এমনকি উপাদানের কথা নির্দেশ না করেও একে সংজ্ঞায়িত করা যায়।

Burgs মতে ঃ রাষ্ট্র মানবজাতির একটি অংশ, যাকে একটি সংগঠিত একক বলে বিচার করা হয়।

(The state is a particular portion of man kind viewed as an organised unit)

এখানে রাষ্ট্রের কোন উপাদানের কথাই উল্লেখ নেই। তবে কোন সমাজকে সংগঠিত রূপ লাভ করতে হলে রাষ্ট্রের শরীরি তিনটি উপাদান অর্থাৎ জনসংখ্যা, ভূ-খণ্ড ও সরকার যে লাগবেই এতে কোন সন্দেহ নেই। আবার এ তিনটি উপাদান সত্যিই সংগঠিত রূপ ধারণ করল কিনা, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে সার্বভৌম শক্তি অর্থাৎ 'অশরীরি' উপাদানের ক্রিয়াকলাপের উপর। কিন্তু এ সংজ্ঞাটিতে রাষ্ট্রকে মানবগোষ্ঠীর একটি একক হিসেবে আখ্যায়িত করার কারণে কেউ হয়তো এটিকে সম্পূর্ণরূপে অলীক কোন ধারণা মনে করে বসবে। সেদিক থেকে Woodrow wilson -এর সংজ্ঞা অধিকতর যুক্তিসংগত। তাঁর মতে নির্দিষ্ট ভূখন্ডে মানুষ যখন আইনের জন্য সংঘটিত হবে, তখনই তাকে রাষ্ট্র বলা ভাল। (The state is people organised for law within a definite territory) কিন্তু এ সংজ্ঞাটিতে রাষ্ট্রের আদর্শ রূপ ফুটে উঠেছে বেশি মাত্রায়। রাষ্ট্র সব সময়ই আইনের জন্য সৃষ্টি হয়েছে এমনটি বলা কঠিন। অনেকেই আবার রাষ্ট্রের সার্বভৌম রূপের উপর গুরুত্ব দিয়ে একে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। Oppenheim-এর মতেঃ "রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করবে যখন, তখন একটি জনগোষ্ঠী একটি দেশে এর নিজস্ব সার্বভৌম সরকারের অধীনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।" When a people is settled in a country under its own sovereign goverment)

কিন্তু এ সংজ্ঞাটিতেও রাষ্ট্রের সার্বভৌম উপাদানটির তেমন কোন সঠিক পরিচয় মিলে না। সম্ভবতঃ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে অন্যান্য উপাদানগুলোর সাথে এর সম্পর্ক নির্দেশ করে। অধ্যাপক গার্নার রাষ্ট্রের সবচাইতে সফল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতেঃ "রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও পাবলিক-এর একটি ধারণা হিসেবে রাষ্ট্র হল কমবেশী অসংখ্য লোকের একটি সম্প্রদায়, যার রয়েছে একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ড, যা বহির্নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন, এবং যার একটি সংগঠিত সরকার রয়েছে, যার প্রতি ব্যাপক অধিবাসী অভ্যাসগত আনুগত্য প্রকাশ করে"। ("State as a

www.pathagar.com

concept of political science and public law, is a community of persons more or less numerous, permanently occupying a definite portion of territory' independent or nearly so of external control and possessing an organised government to which the great body of inhabitants render habitual obedience")

বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা পর্যালোচনা করলে একটি কথা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, রাষ্ট্রের তিনটি শরীরী উপদান একে অপর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারে না। এদের পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই নিবিড় এবং মূলতঃ তিনটি উপাদান মিলেই একটি রাষ্ট্র নামক শরীর সৃষ্টি করে। এ শরীরটি নির্জীব থেকে যেতে পারে অর্থাৎ রাষ্ট্র সৃষ্টি নাও হতে পারে, যদি এতে সার্বভৌমত্ব নামক প্রাণ বায়ুটি না থাকে। সার্বভৌমত্ব থাকলেই শুধু রাষ্ট্রটি তার আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক কার্যাবলীর ক্ষেত্রে স্বধীনতা ভোগ করে। আর এ স্বাধীনতা সব সময়ই একেবারে নিরংকুশ হবে, এমনও কোন কথা নেই। পরিপূর্ণ স্বাধীনতা না ভোগ করে, শুধুমাত্র আপেক্ষিক অর্থে স্বাধীনতা ভোগ করলেই রাষ্ট্রের শরীরি উপাদানসমূহে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে বলে ধরা যায় এবং দেশটি সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি ঃ কোন একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হয়তো তেমন কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু সকল যুগের সকল রাষ্ট্রের প্রকৃতি একটি অলীক রাষ্ট্রের ধারণার মধ্যে সন্নিবেশিত করে এর সঠিক রূপ তুলে ধরা বেশ জটিল ব্যাপার। আর এ জটিলতার কারণে প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ ও তত্বের উদ্ভব ঘটেছে। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে যে সব মতবাদের বহুল প্রসার ঘটেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হলো

জৈব-শরীরিতত্ব ঃ এ মতবাদে রাষ্ট্রকে একটি জীবন্ত প্রাণির সাথে তুলনা করা হয়েছে। প্রকৃতিতে আমরা অসংখ্য জীব ও উদ্ভিদ প্রত্যক্ষ করি। যদিও প্রত্যেকটি প্রাণি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল, কিন্তু প্রত্যেক প্রাণির organism-ই একটি বিশেষ সূত্রে গাঁথা। প্রতিটি প্রাণির আকৃতি-প্রকৃতি যতই ভিন্ন হোক না কেন, এর মূল উপাদানের গঠন প্রকৃতিতে কিন্তু বড় ধরণের মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। শরীর গঠনের মৌলিক উপাদান প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এক এবং এর কার্যকারিতায় পরিলক্ষিত হয় এক ধরণের সার্বজনীনতা। সকল জীবজন্তু ও মানুষ তৈরিতে কোষের (Cell) ভূমিকাই মৌলিক। সকল জৈব-শরীরই কোষের সমষ্টি। ব্যক্তিকে যদি রাষ্ট্রের কোষ সদৃশ মনে করা যায়, তাহলে রাষ্ট্রও মানুষ নামক কোষের সমষ্টি। রাষ্ট্রকে যদি একটি শরীর ধরা হয়, তাহলে প্রতিটি ব্যক্তিই রাষ্ট্র সৃষ্টির একটি মৌলিক উপাদান। মানুষের শরীর যেমন একটি বিশেষ একক, সমাজ ও রাষ্ট্রকেও তেমনি একটি একক হিসেবে কল্পনা করা হয় জৈব-শরীরি তত্বে। মানুষের শরীরের কোষগুলো যদি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে, তাহলে মানুষ হিসেবে সেগুলো তার কার্যকারিতা পালনে অক্ষম হয়। মানুষের শরীরের জীবন্ত রূপের জন্য তার কোষসমূহের মাঝে একটি জৈব-শরীরি সম্পর্ক থাকা অত্যাবশ্যক। তেমনি রাষ্ট্রের জীবন্ত রূপের জন্য এর মানুষরূপী কোষসমূহেরও অনুরূপ জৈব-শরীরি সম্পর্কে আবদ্ধ থাকতে হয়। কোন দেশের মানুষ

www.pathagar.com

গুলো যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, কোন সূত্রেই যদি তারা আবদ্ধ না থাকে, তবে তাদের পক্ষে রাষ্ট্র সৃষ্টি করাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। সে কারণেই রাষ্ট্রকে একটি living Organism (জীবন্ত শরীর) এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। রাষ্ট্র কতগুলো ব্যক্তি-মানুষের সমষ্টি নয়, বরং ঐ ব্যক্তি-মানুষগুলো সবাই মিলে একটি রাষ্ট্র রূপী জীবন্ত শরীর সৃষ্টি করে। ঐ প্রকান্ড শরীরটির যেন অসংখ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; যদি শরীরটি হয় মানুষরূপী, প্রতি ব্যক্তিই রাষ্ট্রের একটি হাত তুল্য। আর যদি শরীরটি হয় একটি গাছতুল্য, তবে প্রতিটি ব্যক্তিই একটি পাতা তূল্য। মানুষের শরীর থেকে তার হাত বিচ্ছিন্ন হলে বা গাছ থেকে পাতা ঝরে গেলে অঙ্গ হিসেবে হাত বা পাতা উভয়ই হারায় তার কার্যকারিতা। ব্যক্তি-মানুষও রাষ্ট্র থেকে আলাদা হয়ে গেলে সেও ঝরা পাতার মতো অকেজো বা বিচ্ছিন্ন হাতের মতো নির্জীব হয়ে পড়ে।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে জৈব-শরীরি তত্ব যে মতবাদটি দাঁড় করিয়েছে, তা অনেকটাই কাল্পনিক এবং জীববিদ্যার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এ তত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গার্ণার বলেন ঃ "জৈব-শরীরি তত্ব অন্য চরম দিক নিয়ে আলোচনা করে এবং রাষ্ট্রকে একটি বাস্তব ব্যক্তি হিসেবে চিত্রায়িত করে, একটি জীবন্ত প্রানি, যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, যা জীব বা উদ্ভিদের অনুরূপ কার্যাদি সম্পন্ন করে। ইহা জীব বিজ্ঞানের একটি ধারনা যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ভাষায় রাষ্ট্রের বর্ণনা দেয়, এর অধিবাসীদের মতামতকে উদ্ভিদ বা জীব কোষের সমার্থক হিসেবে বর্ণনা করে, এবং তাদের ও সমাজের মধ্যকার নির্ভরশীলতা এবং জীবের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও পূর্ণ দেহের পরস্পর নির্ভরশীলতার মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপন করে"।

(The organic theory goes to the other extreme and pictures the state as a real person, a living organism possessing organs which performs functions analogous to those of an animal or plant .It is a biological conception which describes the state in terms of natural science, views of the individuals who compose it as analogous to the cells of a plant or animal, and postulates a relation of inter-dependence between them and society such as exists between the organs and parts of a biological organism and the whole structure)

এ বিশ্লেষণ থেকে একটি কথা পরিষ্কার যে, এ তত্বানুসারে রাষ্ট্র কোন নির্জীব যন্ত্র নয়; বরং এটি একটি জীবন্ত প্রাকৃতিক যান্ত্রিক জৈব-শরীর বিশেষ। ব্যক্তি মানুষের সাথে রাষ্ট্রকে জৈবিক বিধানের অনুরূপ কার্যকারিতায় দেখাতে প্রয়াসী হয়েছে এ মতবাটি। কিন্তু এ জৈবশরীরী সম্পর্কে নিছক কোন জন্তু বা উদ্ভিদের জৈবিক সম্পর্কের মতো করে চিন্তা করেননি এর প্রবক্তাগণ। এ মতবাদের প্রবক্তাগণ রাষ্ট্রকে মূলতঃ মানুষের শরীরে সাথে তুলনা করে ব্যাখ্যা করেছেন। এ ব্যাপারে Bluntchli এর মতামত প্রণিধানযোগ্য ঃ রাষ্ট্র একটি জীবন্ত সংগঠিত সত্ত্বা, কোন নির্জীব কৃত্রিম যন্ত্র মাত্র নয়"। ("The state is a living organised entity not a lifeless instrument")

www.pathagar.com

জৈব–শরীরী মতবাদের ইতিহাসঃ

এই মতবাদের বয়স প্রায় দুই হাজার পাঁচশত, বছর। গ্রীসে তখন প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের যুগ। নগর–রাষ্ট সমূহে সরকার–ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র–যন্ত্রের সকল গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডে প্রতিটি নাগরিক সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করত। নগর–রাষ্ট্র ও তার অধিবাসীদের নিবিড় সম্পর্কের উপরই নির্ভর করছিল উভয়ের সুখ ও সমৃদ্ধি। গ্রীকরা ছিল প্রকৃতিবাদী। প্রকৃতিকে তারা দেখেছিলেন সকল জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তির আধার হিসেবে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, প্রকৃতিতে কোন খামখেয়ালীপনা নেই। রাষ্টকে ঠিক প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে গড়ে তুলতে পারলেই সকল সমস্যার সমান সম্ভব। আর প্রকৃতিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ সৃষ্টির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে প্রতিটি জৈব–শরীরি গঠন–প্রণালী ও তার কার্যকারিতায়। তাই প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের মত দার্শনিকরাও রাষ্টকে জৈব–শরীরি যান্ত্রিকতার সাথে তুলনা করেছেন।

প্লেটো বলেন, " ব্যক্তি–মানুষের মত জ্ঞান, সাহস, সংযম ও ন্যায়ই হচ্ছে রাষ্ট্রের মৌলিক উপাদান। ব্যক্তির আত্মারও তাহলে মূল উপাদান হবে সংযম, সাহস ও জ্ঞান এবং এ তিনের পারস্পরিক সম্পর্কের সঙ্গতি–অর্থাৎ ন্যায়। ব্যক্তির মধ্যেও প্রবৃত্তি জানে তার কি কাজ। এবং সে সেই কাজই মাত্র করে। দেহের ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের উপায় করে। সাহস ও তেজ জানে তার কি কাজ। সে সেই কাজই মাত্র করে শত্রুর আক্রমণ এবং প্রয়োজনবোধে প্রবৃত্তির বিদ্রোহ–চেষ্টাকে দমন করে দেহকে সে রক্ষা করে। জ্ঞান বা বুদ্ধি দেহের প্রবৃত্তি ও সাহসকে শাসন করে। সে হচ্ছে দেহের আত্মা বা দার্শনিক। সে জানে কার কি করণীয় , কার কাজের কি সীমা। এ সঙ্গতি যে দেহ ও আত্মায় বিরাজ করে সেই দেহ তথা সেই আত্মাকেই আমরা সুস্থ দেহ, সুস্থ আত্মা বলি।"

প্লেটো রাষ্টকে সুস্থ ও মহান ব্যক্তির সাথে তুলনা করে তার আদর্শ রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করেছেন। প্লেটোর মহৎ ব্যক্তি জ্ঞানী, ন্যায়বিচারক ও সদা কর্মতৎপর। জ্ঞানের কারণেই ব্যক্তি–মানুষ তার সকল কাজে বুদ্ধিমান ও সংযমী হয়। অসংযমী মানুষকে প্লেটো পরিপূর্ণ মানুষই বলতে নারাজ। "তাদের পানাহারের অসংযম, যুবতী–আসক্তি এবং আলস্যে সময় ক্ষেপণের স্বভাব যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পরিত্যাগ করতে না পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ঔষধ, তপ্ত লোহার দহন, মন্ত্র বা মাদুলী – কোন কিছুই তাদের কোন উপকার সাধন করতে পারবে না।" প্লেটোর মতে এরূপ মানুষ নিজেই তার সবচাইতে বড় শত্রু। নিজেই যদি সে তার ভিতরের শত্রু ধ্বংস করতে না পারে, তাহলে কোন আইন–কানুনই তাকে পরিপূর্ণ মানুষে রূপান্তরিত করতে পারে না। ঠিক তেমনিভাবে প্লেটো সব রাষ্টকে সঠিক অর্থে রাষ্ট্র বলতে রাজী নন। "শুধু ব্যক্তি নয়, যে রাষ্ট্র এরূপ মানুষের ন্যায় আচরণ করে তাকেও নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসা করবে না। অথচ এমন রাষ্ট্রেরতো অভাব নেই, যেখানে নিয়ম–শৃংখলার অস্তিত্ব নেই, কিন্তু চরম দন্ডের হুমকি দিয়ে সেখানে সংবিধানের সব সংশোধন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।" যথার্থ রাষ্টকে যেসব গুণের অধিকারী হতে হবে, তার মধ্যে জ্ঞানই হচ্ছে সবচাইতে মুখ্য গুণ। যথার্থ রাষ্ট্র যেমন অন্যায় কিছু করতে পারবে না, তেমনি

www.pathagar.com

পরিপূর্ণ মানুষ সব সময়ই ন্যায়–নীতির সুবিচার বোধ দ্বারা নিজকে পরিচালিত করে। "আমাদের বর্ণিত রাষ্ট্র যথার্থই জ্ঞানী। কারণ আমাদের রাষ্ট্রের বিবেচনা উত্তম।" কিন্তু কোন রাষ্ট্রের জ্ঞানী হওয়ার জন্য কি রাষ্ট্রে বসবাসকারী সবাইকেই জ্ঞানী হতে হবে ? এটি কি আদৌ সম্ভব যে, কোন জাতির বা মানবগোষ্ঠীর সবাই যথার্থ অর্থে মানুষ হবে? এমন জাতি বা মানবগোষ্ঠীর সাথে ইতিহাসের সাক্ষাত ঘটেনি। প্লেটোও এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন এবং বলেছেন যে, সমাজের ক্ষুদ্র একটি অংশ জ্ঞানী হলেই চলবে। তবে ঐ জ্ঞানী, সংযমী ও ন্যায়–নীতিপরায়ণ অংশই কোন রাষ্ট্রের শাসন ও বিচার কার্য পরিচালনা করবে। এটিই যথার্থ রাষ্ট্র গঠনের পূর্বশর্ত। এ ব্যাপারে শাসক ও শাসিত উভয়েরই মাঝে ঐকমত্য থাকতে হবে। ঐ ঐকমত্য থাকবে রাষ্ট্রের সকল শ্রেণীর মানুষের কর্মপরিধি নির্ধারণের মাধ্যম।

শাসক বা শাসিতের কোন অংশই একে অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। প্রত্যেকেই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে হবে মনোযোগী। কিন্তু এ সার্বিক ব্যবস্থা কতখানি ভাল হবে তা নির্ভর করবে সমাজের ক্ষুদ্র জ্ঞানী অংশের উপরই। "রাষ্ট্রের এ অংশের বা ক্ষুদ্র এই শ্রেণীর জ্ঞানের কারণেই আমাদের রাষ্ট্র সামগ্রিকভাবে জ্ঞানী বলে অভিহিত হবে। কারণ প্রকৃতির বিধানে সকল শ্রেণীর ক্ষুদ্রতম এ শ্রেণীর মধ্যেই মাত্র যথার্থ জ্ঞানের অবস্থান ঘটতে পারে।" মানুষের শরীরের তুলনায় তার চিন্তাশীল মাথা বা সৃজনশীল আত্মাও বস্তুগত বিচারে হয় ক্ষুদ্র বা ধরাছোঁয়ার বাইরে। প্রকৃতিতেও দামী জিনিসপত্র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রই হয়ে থাকে। কাজেই সমাজে বা রাষ্ট্রে জ্ঞানী লোকের স্বল্পতা যথার্থ অর্থে রাষ্ট্র গঠনে কোন বাধা নয়। মূল ব্যাপার হচ্ছে রাষ্ট্রে জ্ঞানী লোকদের ঠিকমতো চিহ্নিত করা হচ্ছে কি–না এবং তাদের হাতে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পিত হচ্ছে কি–না।

অ্যারিষ্টটলের অভিমত ঃ অ্যারিস্টটলও রাষ্ট্রকে একটি জৈব–শরীরি ব্যবস্থার সাথে তুলনা করে রাষ্ট্র ও ব্যক্তি–মানুষের মাঝে সামঞ্জস্য খুজে বের করেছেন। কোন মানবগোষ্ঠী কোথাও স্থায়ীভাবে কল্যাণকামী সমাজ–ব্যবস্থা গড়ে তুললেই অ্যারিস্টটল তাকে রাষ্ট্র বলে আখ্যায়িত করতে চাননি। অ্যারিস্টটলের সময়ে কয়েক হাজার মানুষ মিলেই একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারতো। কিন্তু তিনি বলেনঃ "মনে করা যাক সুত্রধর, ভূমি কর্ষণকারী, চর্মকার প্রভৃতি বিভিন্ন দক্ষতার দশ হাজার মানুষ প্রায় নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করছে এবং তাদের পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সততা–অসততার নিয়ম–নীতি সকলে মেনে চলছে। এমন হলেও যতক্ষণ অবধি এই মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যবসাগত বিনিময় ও আত্মরক্ষাকে অতিক্রম করবে না, ততক্ষণ এরূপ মানুষের সংস্থাও রাষ্ট্র বলে বিবেচিত হবে না। "

অর্থাৎ রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য চারটি উপাদান এবং তাদের মাঝে বাঞ্ছিত পারস্পরিক সম্পর্ক থাকলেই অ্যারিস্টটলের মতে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়ে যায় না। রাষ্ট্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য যেমন, সকল ক্ষতিকর কাজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা বহিঃশত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা, দ্রব্যাদি ও

www.pathagar.com

সেবার বিনিময়ের ক্ষেত্রে নিয়ম-নীতি ও ন্যায়-অন্যায় মেনে চলা, উত্তম পারিবারিক জীবন-যাপনের ব্যবস্থা করা, এ সব কিছুকেই অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু এর সব গুলোকেও একত্রে তিনি রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট মনে করেননি। মানুষের আহার-বিহার, আমোদ-আহলাদ, বিবাহ-শাদি, বংশবিস্তার, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সবকিছুই তাঁর মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য জরুরী। কিন্তু মানুষ বেঁচে থাকলেই সে মানুষ হয় না। বেঁচে থাকার জন্যই বাঁচা হলে তাকে পরিপূর্ণ মানুষ বলা যায় না। মানুষ আর সব কিছুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করলেও সে যথার্থ অর্থে মানুষ নয়। রাষ্ট্রেরও তেমনি সার্বভৌমত্ব অর্জনই তার যথার্থতার প্রমাণ নয়। "আবেগ ও প্রবৃত্তির বশীভূত যে মানুষ, তাদের কারোর পক্ষেই সার্বভৌম হওয়া সংগত নয়। সার্বভৌমিকতার অধিকারী হবে কেবলমাত্র আইন। আইনই হবে সার্বভৌম।" অর্থাৎ অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রের একটি সঠিক আইনগত চরিত্র নির্ধারিত হওয়ার পূর্বে তাকে রাষ্ট্র বলতে নারাজ। মানুষের সকল গুণ থাকা সত্ত্বেও, যদি তার আদর্শিক কোন রূপ খুজে পাওয়া না যায়, তবে এ দৃষ্টিতে মানুষটিও অপরিপূর্ণ থেকে যায়। তাই অ্যারিস্টটল প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্যই একটি আদর্শিক রূপ খুজে বের করতে চেয়েছেন।

রাষ্ট্রের এ আদর্শিক রূপকে আমরা তার রাজনৈতিক চরিত্রও বলতে পারি। অ্যারিস্টটল মানুষের আবেগকে তার অনুরাগ থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা করেছেন। আবেগকে ক্ষতিকর, আর অনুরাগকে রাষ্ট্র গঠনে মৌলিক লক্ষ্য হাসিলের অপরিহার্য শর্ত হিসেবে ধরেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, উত্তম জীবন-যাপন ব্যবস্থার বিধানই রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্য। কিন্তু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সামরিক শক্তি, প্রশাসনিক শ্রীবৃদ্ধির মতো রাষ্ট্রের সবল গুণাবলীর কোনটা দিয়েই দীর্ঘ সময়ের জন্য যথার্থ উত্তম জীবন বিধান দেয়া সম্ভব নয়। তাঁর মতে এর জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল নাগরিকের মাঝে অনুরাগের আকর্ষণ, যার প্রতিফলন ঘটতে হবে সামাজিক জীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে। এখানেও প্লেটোর মতই রাষ্ট্রের মানবিক দিক এবং নগর-রাষ্ট্রের অধিবাসী ও সরকার-যন্ত্রের মধ্যকার প্রত্যক্ষ যোগ-সাজোশের ব্যাপারটির প্রতিই যেন ইংগিত করেছেন অ্যারিস্টটল।

অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রকে নিছক কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত না করে, একে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত মহৎ মানবিক কোন বৃহত্তর আদর্শের লক্ষ্যে নিবেদিত একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে আখ্যায়িত করতে চেয়েছেন। মানবিক মহৎ উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধের বিচারে প্লেটোর রাষ্ট্র-ধারণার সাথে অ্যারিস্টটলের মৌলিক পার্থক্য নেই। "কাজেই আমাদের অভিমত হচ্ছে, যে রাজনৈতিক সংস্থাকে আমরা রাষ্ট্র বলি তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কেবল মানুষের এক সঙ্গে বেঁচে থাকা নয়। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তম কার্য সাধন করা। কাজেই যারা এই উত্তম কার্যে অবদান রাখে তারাই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চরিত্র অর্জনে সহায়তা করে।"

প্লেটোর মতো এখানেও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, এ আদর্শিক রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা কারা পালন করবে। অ্যারিস্টটল যদিও এ ব্যাপারে আইনের ভূমিকাকেই মুখ্য বিবেচনা করে কোন

www.pathagar.com

শ্রেনীর মানুষকে বিশেষ মর্যাদা দেন নি, তবুও সার্বিকভাবে রাষ্ট্রের অধিবাসীদের চরিত্রের সাথে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চরিত্রের একটি যোগসূত্র স্থাপন করেছেন তাঁর জৈব-শরীরি মতবাদের আলোকে। তিনি রাষ্ট্রকে প্লেটোর মতো এতবেশি আদর্শিক না ভেবে একে স্রোতোস্বিনী নদীর সাথে তুলনা করেছেন। কোন নদীর পানি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রুপ ধারণ করলেও আমরা কিন্তু নদীর নাম পরিবর্তন করি না। অর্থাৎ কোন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চরিত্র খুব বেশি স্পষ্ট হয়ে ধরা না দিলেই যে রাষ্ট্র হিসেবে তার অস্তিত্ব টিকে থাকবে না, এমন কোন কথা নেই। রাষ্ট্রের অধিবাসীদের গুনগত মান খারাপ হলে, তা অবশ্যই রাষ্ট্রের প্রকৃতির উপর প্রভাব ফেলবে, কিন্তু তাই বলে সেখানে কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে হবে, এমনটি অ্যারিস্টটল বলতে চাননি। "নদীর পানিতে সর্বদা পরিবর্তন ঘটতে থাকলেও আমরা নদীর নাম পরিবর্তন করি না। একই নামে তাকে আমরা অভিহিত করি। তেমনি রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যেও এক পুরুষের স্থানে অপর পুরুষ জন্মলাভ করলেও পুরুষানুক্রমে আমরা তাকে একই রাষ্ট্র বলে অভিহিত করতে পারি। অপরদিকে আবার এও বলা যেতে পারে যে, অধিবাসীগণকে এভাবে এক বলা গেলেও রাষ্ট্র ভিন্নতর হয়েছে। কারণ, যেহেতু রাষ্ট্র হচ্ছে একটি বিশেষ শাসনব্যবস্থায় সংঘবদ্ধ একটি জনগোষ্ঠী, সেহেতু নাগরিকদের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে চরিত্রগতভাবে যখন ভিন্ন হয়ে যায়, তখন রাষ্ট্রেরও অনুরুপ পরিবর্তন সংঘঠিত হয়।"

রাষ্ট্রের এ চরিত্রগত পরিবর্তনও মানুষের শরীরের ক্ষয়-বৃদ্ধির পরিবর্তনের মতো। একটি শিশু জন্মগ্রহণ করেই মানুষ। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে পরিপূর্ণ মানুষ হতে তাকে জৈবিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। খাদ্য গ্রহণ ও শরীর বৃদ্ধির প্রক্রিয়া এক হলেও বালক থেকে যৌবন প্রাপ্তি, আর যৌবন থেকে বৃদ্ধ হওয়ার পরিণতি কিন্তু এক নয়। এ দৃষ্টিতে প্রতিটি মানুষ প্রতিদিনই একটি নতুন মানুষ। মানুষের শারীরিক বৃদ্ধির সাথে তার গুণগত পরিবর্তনের যোগাযোগ প্রত্যক্ষ। সঠিকভাবে শারীরিক বৃদ্ধি ও গঠনের ব্যাঘাত ঘটলে মানসিক বিকাশও সাংঘাতিক ভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি না ঘটলে তার আদর্শিক মজবুতী অর্জন সম্ভব নয়। কিন্তু রাষ্ট্রের আদর্শিক চরিত্র ঠিক না হলে তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিধ্বস্থ হয়ে পড়তে পারে। মানুষের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হলে তার পক্ষে যেমন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়ে, তেমনি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চরিত্র সঠিক না হলে সরকার-যন্ত্রই বিকল হয়ে পড়তে পারে।

মধ্যযুগীয় অভিমতঃ প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্র সম্পর্কিত জৈব-শরীরি তত্ত্ব ইতিহাস বিস্মৃত হয়ে পড়েনি। মধ্যযুগে John of salisbury Marsiglio, Johannes Althusius, John Locke সহ অনেকেই রাষ্ট্রকে জীবন্ত অরগানিজমের সাথে তুলনা করেছেন। কিন্তু মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টীয় ধর্মীয় চিন্তাধারার পোষাক পরানো হয়েছিল জৈব শরীরি রাষ্ট্রীয় তত্ত্বকে। মধ্যযুগে রাষ্ট্র-যন্ত্র ধর্মানুভূতির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেছিল বলেই রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তাধারায় ধর্মীয় রং ছিল প্রকট। গীর্জা ও রাষ্ট্র-যন্ত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।

www.pathagar.com

হবস ও রুশো মানুষ ও তার কৃত্রিম রাষ্ট্রকে একইভাবে দেখেছেন। হবস রাষ্ট্রকে একটি প্রকান্ড জলজন্তুর (Leviathan) সাথে তুলনা করেছেন। হবসের ঐ প্রকান্ড জলজন্তুটি আবার একটি কাল্পনিক কৃত্রিম মানুষের মতো। তাঁর এই কাল্পনিক মানুষটি সাধারণ প্রাকৃতিক মানুষের চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী। হবস রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে মানুষের আত্মার সাথে তুলনা করেছেন। মানুষের সবল দিক সমুহ যেন সার্বভৌম শক্তির ব্যবহারের মতোই। অন্যদিকে হবস রাষ্ট্রের দুর্বল দিক গুলোকে মানুষের বিভিন্ন রোগ-শোকের সাথে তুলনা করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিরুদ্ধে নানাভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হতে থাকে বিভিন্ন লেখকের চিন্তাধারায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সৃষ্ট সামাজিক চুক্তি মতবাদ তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়। আর তাই রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে জৈব-শরীরি মতবাদ নিয়ে নানাভাবে নতুন করে আলোচনা করেন Leo Schelling, Krause, Ahres, Smitthenner, Waitz, Qorres, Volgraffe, stahl, Zacharia, Frantz ও আরো অনেকে। Bluntschli এব্যাপারে সবার চাইতে অগ্রসর হয়ে বলেন যে, রাষ্ট্র কোন কৃত্রিম যন্ত্র নয়, বরং একটি 'living spiritual organic being' (জীবন্ত আধ্যাত্মিক সত্বা)

হার্বার্ট স্পেনসারের অভিমত Herbert Spencer তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ `Principles of Sociology'- তে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে জৈব-শরীরি মতবাদের পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করেন। তাঁর সমাজ নিজেই একটি আরগানিজম। যেভাবে জীবন্ত শরীর জন্মেই বৃদ্ধি পায়, তাঁর মতে ঠিক রাষ্ট্রও একইভাবে প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন মেনে চলে। সে উভয়েরই মৌলিক গুণাবলী এক ও অভিন্ন । স্পেনসারের মতেঃ

ক) সমাজ যেহেতু একটি অরগানিজম, তাই তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে এবং তাদের মাঝে জৈব-শরীরের মতো স্থায়ী সম্পর্ক বিদ্যমান।

খ) সমাজ ও অরগানিজম উভয়েই প্রথম একটি একক থেকে যাত্রা শুরু করে এবং পরে বৃদ্ধি পেয়ে জটিল আকার ধারণ করে।

গ) জীবের যেমন শরীর আছে, সমাজেরও তেমনি রয়েছে শরীর সদৃশ বহু প্রতিষ্ঠান।

ঘ) জৈব-শরীরে যেমন বিভিন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ একে অপরের উপর নির্ভরশীল, তেমনি সমাজের জীবন-প্রবাহের জন্যও প্রয়োজন এর সকল সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মাঝে পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক। শরীরের একটি অঙ্গ যেমন অপরটির সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না, তেমনি সমাজের এক অংশ অন্য অংশের সাহায্য ছাড়া অচল হয়ে পড়ে।

ঙ) জৈব শরীরে যেমন নানা ধরণের সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও বিতরণ ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়, সমাজ জীবনেও তেমনি এ ধরণের ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। স্পেনসারের মতে সরকার-যন্ত্র অনেকটা রাষ্ট্রের Nervous System এর মতো। Nervous System বিকল হলে যেমন

www.pathagar.com

জৈব–শরীর ঠিক মতো চলতে পারে না, তেমনি সরকার–যন্ত্র নষ্ট হলে রাষ্ট্র মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে।

জৈব–শরীরি মতবাদের পক্ষে বহু জোরালো যুক্তি পেশ করা সত্ত্বেও স্পেনসার জীবন্ত শরীর ও রাষ্ট্রের গঠন প্রণালীর মাঝে এক বড় ধরনের বৈসাদৃশ্যের কথা বলেছেন। তাঁর মতে জীবন্ত শরীরের গঠন যেমন সুনির্দিষ্ট, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক শরীরের গঠন তেমনটি নয়। জীবন্ত শরীরের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গগুলো যেমন জৈব নিয়মের অধীনে একেবারেই নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, রাজনৈতিক শরীরের ক্ষেত্রে তেমনটি হওয়া সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক শরীর বিভিন্ন ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক।

ম্যাকআইভারের অভিমতঃ ম্যকআইভার তাঁর গ্রন্থ 'আধুনিক রাষ্ট্র'–এ রাষ্ট্রের যে পরিচয় দিয়েছেন তাতেও জৈব–শরীরি মতবাদের বেশ কিছু প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। তাঁর দৃষ্টিতে পরিবার, সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রের মতো সকল সামাজিক বস্তুকেই জীবন্ত শরীরের সাথে তুলনা করা যায়। " প্রত্যেক সামাজিক বস্তুর তিনটি দিক রয়েছে, যাদের মোটামুটিভাবে তুলনা করা চলে দেহ, মন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে। এগুলো হলো প্রত্যেকটি জীবন্ত জিনিসের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য। পরিবারের 'দেহ' গড়ে উঠে 'যৌন' প্রবণতা , পিতৃত্ব ও স্বগোত্রতা দিয়ে। এর 'মন' বা অন্তরাত্মা গড়ে উঠে অনুভূতি, প্রবণতা, ভয়, ক্ষুধা, ভালবাসা, স্নেহ প্রভৃতি দিয়ে। যার ফলে এ বিষয়গুলো আরো জীবন্ত হয়ে ওঠে। এর পারিপার্শ্বিকতা স্থান পায় আত্মরক্ষা, কর্তৃত্ব ও পারস্পরিক সেবার কাজকর্মে। আরো কুশলী শব্দ প্রয়োগ করলে বলতে হয় যে, এ তিনে রয়েছে বস্তুগত, আত্মিক ও প্রতিষ্ঠানিক উপাদান যার সমন্বয়ে গড়ে উঠে কোন পরিপূর্ণ সামাজিক বস্তু।" ম্যাকআইভারের এ মতাদর্শানুসারে রাষ্ট্র একটি পরিপূর্ণ সামাজিক বস্তু। আর সামাজিক বস্তু হিসেবে রাষ্ট্রের সৌধ সবচাইতে বড় ও মজবুত। রাষ্ট্রকে যখনই আমরা উল্লিখিত ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলব, তখনই এটির একটি জীবন্ত শরীরি রূপ কল্পনা করতে হবে। কিন্তু রাষ্ট্রের দেহ, মন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ভেতর দিয়ে এতো বেশি পরিবর্তিত রূপ ধারণ করেছে যে, আদি যুগের রাষ্ট্রকে আজকের দিনের রাষ্ট্রের আলোকে রাষ্ট্র বলাই কষ্টকর হয়ে পড়ে।

গুণগত বিচারে বা ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমাতার তারতম্যের আলোকে যেমন একটি শিশু বা বালককে মানুষ হিসেবে আখ্যায়িত করলেই পরিপূর্ণ মানুষের ধারণা নিয়েই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তেমনি এক কালের রাষ্ট্রকে অন্য কালের রাষ্ট্রের সমতুল্য মনে করলে বা মানুষের মনের সাথে রাষ্ট্রের মনের তুলনা করলে বিভ্রান্তিই বেড়ে যায়। কিন্তু ম্যাকআইভার বিংশ শতাব্দীতে এসেও প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, সর্ব অবস্থাতেই রাষ্টের বস্তুগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উপাদানের সাথে সাথে এর আত্মিক উপাদানকেও অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। তার মতে "বিভিন্নভাবে প্রকাশিত নাগরিকত্বের ধারণা, যা থেকে জন্মলাভ করে জাতীয়তাবাদের পরিপূর্ণ

www.pathagar.com

রূপ–তাই হলো এর আত্মিক রূপ। " অতি সহজভাবে বলতে গেলে নাগরিকদের সামষ্টিক বা একটি আত্মিক রূপ তাদের রাষ্ট্র নামক সামাজিক বিরাট সৌধের ভেতরে আত্মপ্রকাশ করে, আর এটিকে নিছক বস্তুগত বিচারে মূল্যায়ন করা যায় না, বরং এটি শুধু মানবীয় আত্মিক গুণাবলীর আলোকেই বিচার্য হয়ে থাকে। আড়াই হাজার বছর পূর্বে জন্ম নিয়েও বিংশ শতাব্দি পর্যন্ত রাষ্ট্রের জৈব শরীরি এ দার্শনিক মতবাদটি যত শক্তিশালী হয়েই বেঁচে থাকুক না কেন, আধুনিককালে এটি যথেষ্ট সমালোচনারও সম্মুখীন।

জৈব–শরীরি মতাদের সমালোচনাঃএ মতবাদের বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে, তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

ক) গঠনের ভিন্নতাঃ জীবন্ত শরীর ও রষ্ট্রের গঠন প্রণালী এক নয়। জীবন্ত শরীর একযোগে থাকে ও চলে, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তেমনি সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের স্বরুপ ও চরিত্রের উপর নির্ভর করে তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাঝে দূরত্ব কমানো ও বাড়ানো সম্ভব । কিন্তু জীবন্ত শরীরের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়।

খ) এ মতবাদটি রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কে সন্তোষজনক জবাব দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সমাজতন্ত্রবাদী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী উভয় পক্ষের কিছু কিছু লেখক এ মতবাদকে তাঁদের পক্ষে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। অথচ এ দুটো মতবাদ পরস্পরবিরোধী পথের অনুসারী।

গ) জীবন্ত শরীরের ক্ষয় ও লয় সম্পর্কে যেমন সুনির্দিষ্ট কথা বলা সম্ভব, রাষ্ট্রের জন্ম বা মৃত্যু সম্পর্কে তেমন কিছু বলা প্রায়ই অসম্ভব।

ঘ) উৎপত্তির দিক থেকে দেখতে গেলে জীবন্ত শরীর ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় । একটি নতুন জীবন্ত শরীর সৃষ্টির জন্য এক জোড়া নর–নারীকে নীড় বাঁধতে হয়। অথচ রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রক্রিয়া এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তেমনি উভয়ের কার্যকরিতার পদ্ধতি ও ক্ষেত্র অভিন্ন নয়।

ঙ) জীবন্ত শরীরে অসংখ্য কোষের সন্ধান মিলে, যাদের মূলতঃ স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই। জীবন্ত শরীরটি মরে যাওয়ার সাথে সাথেই ঐসব কোষ মরে যায়। অথচ রাষ্ট্রের মৃত্যু হলেও তার বহু প্রতিষ্ঠান বেঁচে থাকে। ব্যক্তি–মানুষটি তার শরীরের কোষের উপর নির্ভর করে চিন্তা করে না। রাষ্ট্রকে অ্যান্যান্য প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করতে হয়। মানুষের চিন্তা–চেতনা সমগ্র সমাজের উপর প্রভাব ফেলতে পারে । রাষ্ট্রও বহু প্রতিষ্ঠানকে তেমন একটি প্রভাবিত নাও করতে পারে।

চ) জীবন্ত শরীর থেকে কোন অঙ্গ কেটে ফেললে তা অকেজো হয়ে পড়ে। অথচ কোন ব্যক্তি রাষ্ট্র বা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও তার মানবীয় সকল কার্যকলাপ অব্যাহত রাখতে সমর্থ। রাষ্ট্র ছাড়াই কোন ব্যক্তি দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে।

ছ) জীবন্ত শরীরের বৃদ্ধি বহুলাংশে প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর উপরই নির্ভশীল। অথচ রাষ্ট্রের বৃদ্ধি নির্ভর করে নাগরিকদের সক্রিয় সহযোগিতার উপর।

www.pathagar.com

জ) এ মতবাদ স্বেচ্ছাচারিতার জন্ম দিতে পারে। কারণ রাষ্ট্রকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন্ত শরীরে সাথে তুলনা করার ফলে রাষ্ট্রের নায়কগণ সাধারণ নাগরিকদের অধিকার অর্জনের পথে বাধা হয়ে দেখা দিতে পারে।

ঝ। রাষ্ট্র একটি দার্শনিক বা তত্ত্বগত ধারণা মাত্র, অথচ যে কোন জীবন্ত শরীর আদৌ কোন কাল্পনিক ধারণা নয়, বরং তার বাস্তব বস্তুগত রূপ রয়েছে।

আইনগত তত্ত্ব (The Juridical Theory):

আইনগত তত্ত্ব রাষ্ট্রকে ঠিক জৈব-শরীরি মতবাদের বিপরীতে স্থাপন করে। এই তত্ত্ব অনুসারে রাষ্ট্রের মূল পরিচয় হচ্ছে, এটি একটি আইন সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র শুধু আইনই তৈরি করে না, সকলের আইনানুগ অধিকার রক্ষা করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব । এ তত্ত্বের প্রবক্তাগণ রাষ্ট্রকে আইনের প্রধান উৎস মনে করে। তাদের মতে রাষ্ট্রের কোন বিচারালয় রাষ্ট্রীয় আইনের বাইরে গিয়ে কোন বিচার কাজ চালাতে পারে না। সর্বোপরি আইন ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না, আইন আছে বলেই রাষ্ট্র আছে।

এ তত্বানুসারে রাষ্ট্র এককটি Legal person (আইনানুগ ব্যক্তি)। রাষ্ট্রের আইনানুগ ব্যক্তিত্ব রয়েছে কি-না, এ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক থকেলেও উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মান লেখক Stahl, Stein, Derber, Lasson. Dierke, Jreitschke, Rehm, Bluntschli, Jellinek সহ অনেকেই রাষ্ট্রের Legal personality (আইনানুগ ব্যক্তিত্ব) রয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। এঁদের অনেকে মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও আইনবেত্তাদের সমালোচনা করেছেন রাষ্ট্রের আইননুগ ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে তাদের নির্লিপ্ততার জন্য। Dierke মধ্যযুগীয় আইন বিশারদদের তীব্র সমালোচনা করেছেন এ ব্যাপারে তাদের ব্যর্থতার জন্য। তিনি বলেন যেখানে রাষ্ট্রে অবস্থিত অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠান ও সংস্থারই আইনানুগ ব্যক্তিত্ব রয়েছে, সেখানে রাষ্ট্রের আইনানুগ ব্যক্তিত্ব থাকবে না, এ চিন্তাই করা যায় না। এ ব্যাপারে Bluntschli এর বক্তব্যঃ রাষ্ট্রকে কল্পনা করা হয় " পাবলিক 'ল-এর অর্থে একটি ব্যক্তি হিসেবে যার আইনগত ইচ্ছা রয়েছে যার অধিবাসীদের সামষ্টিক ইচ্ছা থেকে পৃথক, এবং কথা ও কর্মে যার ইচ্ছা প্রকাশের ক্ষমতা রয়েছে এবং যা অধিকার সৃষ্টি ও ধারণ করতে পারে। এর ব্যক্তিত্ব কেবলমাত্র কোন আইনগত বা রূপক কারণ নয়, বরং একটি বাস্তবতা।

("State is conceived as par excellence a person in the sense of public law, having a legal will of its own distinct from the sum of will of the individuals composing the state, and a capacity for expressing its will in words and acts and as the creator and possessor of rights . Its presonality is not merely a juristic function or retaphor but reality")

আইনগত তত্ত্বের প্রবক্তাগণ মত প্রকাশ করেন যে, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রে বসবাসকারী নাগরিকদের মাঝে স্বার্থের সংঘাত ঘটা খুবই সাভাবিক । রাষ্ট্রের যদি আইনানুগ ব্যক্তিত্ব না থাকবে, তবে তার পক্ষে

www.pathagar.com

স্থায়িত্ব লাভ করাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। ব্যক্তি–মানুষ তার বর্তমান স্বার্থ নিয়েই সদা ব্যস্ত। অথচ রাষ্ট্র শুধু বর্তমান নিয়েই ভাবে না। তাকে কাজ করতে হয় ভবিষ্যতে সমাজ গঠন ও তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। রাষ্ট্র তার নাগরিকদেরকে বিভিন্ন অধিকার দিয়ে থাকে এবং সেগুলো রাক্ষণাবেক্ষনও করে। আবার নিজের জন্যও একই অধিকার সংরক্ষণ করে। যেমন রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীরা সম্পত্তির অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্র সম্পত্তির অধিকার ভোগের নীতিমালা নির্ধারণ করে। আর রাষ্ট্র নিজ মালিকানায় সম্পত্তি রেখে দেয়। রাষ্ট্রের সম্পত্তি অর্জন ও বর্জনের নীতিমালা নাগরিকদের সম্পত্তি অর্জন ও বর্জনের নীতিমালা একরূপ হয় না। এ দিক থেকেও রাষ্ট্রের আইনানুগ ব্যক্তিত্বের স্বরূপ স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল।

আইনগত তত্ত্বের সমালোচনাঃ রাষ্ট্রের স্থিতি ও এর অবস্থান শুধু আইনের জন্য নিবেদিত, এরূপ ধারণা পোষণ করলে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় রাষ্ট্রকেই। রাষ্ট্র নিছক একটি আইন সৃষ্টি ও প্রয়োগকারী যন্ত্র মাত্র নয়। রাষ্ট্রের পক্ষে আইন দ্বারা সবকিছু নিয়ন্ত্রন করাও সম্ভব নয়। "জীবনে স্বতঃস্ফূর্ত সৃজন ধর্মী কাজগুলোর গতিপ্রকৃতি আইন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। রাষ্ট্রের মৌলিক অস্ত্র আইন এতো বেশি সাধারণ এতে বেশি হিজিবিজি, এতো বেশি আচারনিষ্ঠ যে, তা মানুষের চারিত্রিক বা গূঢ় কাজকর্মের গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতিতে অন্যান্য সামগ্রিক ক্রিয়া–কলাপের প্রয়োজন মেটায়।" (ম্যাকআইভার)

তাই বলে মানুষ রাষ্ট্রের প্রয়োজনিয়তাকে অস্বীকার করে না। অস্বীকার করে না এর আইনানুগ নিয়ন্ত্রণ দক্ষতাকে । কিন্তু মানুষ চায় রাষ্ট্র এমন একটি পরিপার্শ্বিক অবস্থার জন্ম দিক যেখানে সে নির্বিঘ্নে নিজের সৃজনশীলতার চর্চা করতে পারবে। নিজের সকল ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করে মানুষ তার জন্ম সার্থক ও অর্থবহ করে তুলবে। রাষ্ট্রের ভেতরে নাগরিকগণ তাদের পরিবার গঠন, ধর্মচর্চা ও অন্যান্য সংঘ সৃষ্টির জন্য একটি স্বাধীনতা ও সৃংখলার সুষম পরিবেশ পেতে আগ্রহী। এ ধরণের সুষম হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ রাষ্ট্র শুধুমাত্র আইন দ্বারা অর্জন করতে পারে না। রাষ্ট্রীয় আইনের প্রকৃতি যেহেতু সার্বজনীন ও কঠোরভাবে নিয়মনিষ্ঠ, তাই এর নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা সীমিত হতে বাধ্য। কিন্তু এর সীমিত ক্ষমতার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সার্বজনীনতার কারণে রাষ্ট্রীয় আইন তার বলপ্রয়োগ করার ক্ষমতাকে ইচ্ছা করে সীমিত রাখে। মানুষের উপর যত কম বল প্রয়োগ করে তাকে নৈতিকভাবে বলিষ্ঠ করে তোলা যায়, এটিই রাষ্ট্রীয় আইনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হওয়া দরকার। " আইন মেনে চলার প্রবণতার মূল হলো আগ্রহ, ইচ্ছা, ক্ষমতা ও বল প্রয়োগ নয়। তা যাই হোক, আইন অবশ্য পালনীয়। সুতরাং আইন সমাজের বাহ্যিক দিকের নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র। চরিত্রের বাহ্যিক দিকের উপর আইনের অনমনীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়া-------- কিন্তু বায়ু যেভাবে পানির উপরিভাগকে আন্দোলিত করে, রীতি ও ফ্যাশন তেমনিভাবে মনুষকে চালায়। তার উর্ধ্বে থাকে নৈতিক মূল্যবোধ, যা সংবেদনশীল ও সৃষ্টিধর্মী মনকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করতে পারে এবং বহু জটিল ও সমস্যাসঙ্কুল মূহর্তে এটা প্রমাণিত হয়েছে, যে নৈতিক মূল্যবোধ সমগ্র জাতির হৃদয়কে বিপুলভাবে আলোড়িত করতে সক্ষম।" (Ibid, p.18) আধুনিক কালের

www.pathagar.com

ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে কম্যুনিজমের যে পরাজয় ঘটল, তার পেছনে মুখ্য কারণ ছিল ঐ রাষ্ট্র যন্ত্র সমূহ নাগরিকদের নৈতিক সমর্থন হারিয়ে ফেলেছিল। সমাজতান্ত্রিক আইন দাবী করতো সকল সম্পত্তি রাষ্ট্রের, আর রাষ্ট্রীয় মালিকানার মাধ্যমে সকল সম্পত্তির মালিক জনগণ । কিন্তু রাষ্ট্রীয় মালিকানা বাস্তবে কমুনিষ্ট পার্টির মালিকানায় রূপান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে সমাজতান্ত্রিক আইনের দৌরাত্ম্য সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বিসহ হয়ে পড়লো। সে থেকেই কমুনিজমের এ করুণ দশা ঘটল। অথচ বাহ্যিকভাবে মনে হয়, কম্যুনিষ্ট বিশ্বের অনগ্রসরতাই সমাজতান্ত্রিক সরকার গুলোর পতনের মূল কারণ। আর কম্যুনিজমের লৌহ কঠিন আইনের শাসনই সমাজতান্ত্রিক মানুষ গুলোকে স্বাধীনতার জন্য পাগলপরা করে তুলেছিল। একশ্রেণীর অধিকতর অর্থনৈতিক সচ্ছলতা এবং অবাধ পাশ্চাত্য ধাঁচের স্বাধীনতা ভোগের আগ্রহ অবশ্যই কম্যুনিষ্ট সরকারসমূহের পতনের অন্যতম কারণ। কিন্তু মূল কারণ হচ্ছে, রাষ্ট্র–যন্ত্রকে অস্বাভাবিক রকম কঠিন সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর ভিতরে প্রবেশ করিয়ে মানুষকে শুধুমাত্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অধিকতর নিঃস্বার্থ প্রাণি হিসেবে গড়ে তোলার দর্শন ও পদ্ধতির ব্যর্থতা। কাজেই রাষ্ট্রকে যখনই শুধুমাত্র বল প্রয়োগের মাধ্যমে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করা হবে, তখনই সরকার যন্ত্রটি মানুষের নিকট সমর্থন হারিয়ে অকেজো হয়ে পড়বে।

যান্ত্রিক মতবাদ (The Mechanistic Theory) এ তত্ত্ব রাষ্ট্রকে একটি দালান কোঠা সদৃশ সৌধ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। যখনই আমরা বিরাট একটি বিল্ডিং দেখি, তখনই আমরা জানি এর মূল নক্সাটি প্রথম এসেছিল কোন স্থপতির মাথায়। একজন স্থপতি যেমন প্রথমে তাঁর নিজ চিন্তারাজ্যে এ বিল্ডিংটি ধারণ করে, তেমনি প্রতিটি রাষ্ট্রের এক বা একাধিক স্থপতি রয়েছে যারা সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। প্রতিটি রাষ্ট্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে অবশ্যই কিছু লোককে ঐ রাষ্ট্র সৃষ্টির পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। সে কারণেই হয়তো এ তত্ত্বের প্রবক্তাগণ রাষ্ট্রকে একটি কৃত্রিম সৃষ্টি কর্মের সাথে তুলনা করেছেন। প্রফেসর গার্নার এ তত্ত্ব সম্পর্কে বলেনঃ "ইহা (যান্ত্রিক মতবাদ) রাষ্ট্রকে কিছুটা প্রাসাদের সদৃশ এবং এর প্রতিষ্ঠাতাদেরকে একজন স্থপতির সদৃশ বলে মনে করে; একজন স্থপতি যেমন কমিশন নিয়ে নতুন প্রাসাদ নির্মানার্থে পুরাতন ভিত্তি ও ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে ফেলে এবং তার উপর একটি নতুন কাঠামো গড়ে তোলে, তেমনি কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের ভিত সরিয়ে ফেলতে পার, অতীতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে এবং ইতিহাস ও গতানুগতিকতার শক্তিগুলোকে উপেক্ষা করতে পারে এবং নির্মাণ করতে পারে ধ্বংসাবশেষের উপর তাদের আপাতঃ ধারণা ও দৃষ্টি ভঙ্গী মোতাবেক নতুন রাষ্ট্র সংগঠন।

যান্ত্রিক মতবাদের সমালোচনা ঃ ফরাসী বিপ্লবীরা এ মতটির প্রতি জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। তারা নিজেদের দেশটিকে তাদের মতাদর্শ অনুসারে একটি রাষ্ট্র গঠন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের বিশ্বাস ছিল তাঁদের চেষ্টায় ফ্রান্স তাদের ইচ্ছামতো একটি রাষ্ট্র যন্ত্রে রূপান্তরিত হবে। কিন্তু ইতিহাস তাদের বিশ্বাসের বাস্তবতা প্রমাণ বহন করে না। ফরাসী

www.pathagar.com

বিপ্লবের প্রভাব শুধু সে দেশটিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সমগ্র ইউরোপে তার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। বিপ্লবীরা যেমন রাষ্ট্র চেয়েছিল তেমন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় কোথাও ঘটেনি। এ প্রমাণ হয় কোন রাষ্ট্রই শুধুমাত্র Subjective factor (কর্তার কর্তৃত্বের উপাদান) এর ফসল নয়, বরং যে কোন রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ধ্বংসের পেছনে Objective facter (বাস্তব পারিপার্শ্বিক উপাদান) ই মুখ্য। লেনিন বা স্ট্যালিনের মত নেতা না থাকলেও রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিতো হতো এবং হয়তো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠাতা। কারণ রাশিয়ার দীর্ঘদিনের স্বৈরাচারী শাসন ও চরম পুঁজিবাদী শোষণের ফলে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা সহজেই হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছিল রুশ বুদ্ধিজীবীদের কাছে। অন্যদিকে গর্বাচেভ ছাড়াও কম্যুনিস্ট বিশ্বের রাষ্ট্র-যন্ত্র গুলো বিকল হয়ে পড়তো। কারণ সমাজতন্ত্র যে সব দাবী নিয়ে আবিভূত হয়েছিল, তা অর্জনে তার ব্যর্থতাই তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। গর্বাচেভ ব্যক্তিটি এখানে গৌণ। এ গর্বাচেভ না থাকলে নিশ্চয়ই অন্য গর্বাচেভ কম্যুনিজমের গলায় মৃত্যুর ঘন্টা ঝুলিয়ে দিত। রাষ্ট্র সৃষ্টির পেছনে ঐতিহাসিক বাস্তব পরিপার্শ্বিকতাই যে কর্তার ইচ্ছায় কীর্তন, এ তত্ত্বের চাইতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তা প্রফেসর গার্নারের কথায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; "রাষ্ট্র সকল প্রতিষ্ঠানের মত অবশ্য মানুষের কীর্তি কিন্তু ঐতিহাসিক শক্তি সমূহ, জাতীয় অভ্যাস ও গতানুগতিকতা উপেক্ষা করে নয়, বরং এদের সহযোগিতা নিয়েই মানুষ ইহা সৃষ্টি করেছে; সুতরাং একটি প্রসাদ বা পোষাক যে অর্থে একজন স্থপতি বা টেইলরের কীর্তি সে অর্থে ইহা পুরোপুরি খামখেয়ালিপূর্ন যান্ত্রিক সৃষ্টি নয়" (The state is, of course, like all institutaions, the work of men but of men working in cooperation with and not in disregard of historical forces and of national habits and traditions. It not therefore, purely arbitrary mechanical creation in the same sense that a building or a costume is the work of an architect or a tailor.)

মার্ক্সীয় এ তত্ত্ব **(The Marxian Theory)** : মার্ক্সীয় তত্ত্বানুসারে রাষ্ট্র মূলতঃ শোষণ প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট মানুষের যখন উৎপাদন ক্ষমতা ছিল খুব সীমিত, যখন সঞ্চয় করার ক্ষমতা ও উপায় মানুষের জানা ছিল না; তখন রাষ্ট্রও ছিল না। কিন্তু সমাজের এক শ্রেনীর মানুষ যখন সম্পদ কুক্ষিগত করা শুরু করলো, অন্যদের উপর শোষণ করেই শুধু সম্পদ করায়ত্ব করা সম্ভব ছিল, তাই এমন একটি ব্যবস্থা গৃহীত হলো যার মাধ্যমে সম্পদশালীর সর্বহারাদের শোষণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে পারে। এ পোষণ ও বঞ্চনামূলক ব্যবস্থা ধরে রাখার যে যন্ত্র তার নামই মার্ক্সীয় দর্শনে রাষ্ট্র। এ মতাদর্শানুসারে রাষ্ট্র এক সময় অনুপস্থিত ছিল এবং ভবিষ্যতে আবার যখন শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন আবার রাষ্ট্র নামক দানবটির বিলুপ্তি ঘটবে, অর্থাৎ শোষণমুক্ত সমাজে রাষ্ট্র-যন্ত্রটি তার প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে ফেলবে।

মার্ক্সীয় তত্ত্ব কিন্তু দাবী করছে না যে, রাষ্ট্র রাতারাতি সৃষ্টি হয়েছে এবং তা রাতারাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রক্রিয়া যেমন ইতিহাসের অনেকগুলো পাতা দখল করে আছে, তেমনি এর বিলুপ্তির প্রক্রিয়াও দীর্ঘ ও জটিল হবে। তবে রাষ্ট্রের বিলুপ্তির জন্য শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

অত্যাবশ্যক, আর শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব–শর্ত হচ্ছে কম্যুনিষ্ট বিপ্লব। সর্বহারার বিপ্লবের মাধ্যমে কম্যুনিষ্টরা প্রথম রাষ্ট্র–দানবটিকে নিজ দখলে আনবে, তারপর শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের কাজে ব্যবহার করে এটিকে নিষ্ক্রিয় করে দেবে। তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ রাষ্ট্র–যন্ত্রের উপস্থিতিকে অপ্রয়োজনীয় মনে করবে এবং এমনিতেই এটি বিলুপ্তি হয়ে পড়বে। এঙ্গেলসের মতে তখন রাষ্ট্র–দানবটিকে বিকল হাত পা সহ শুধুমাত্র মিউজিয়ামেই দেখতে পাওয়া যাবে। বলা মুস্কীল কবে সেদিন আসবে। তবে নিম্নলিখিত বক্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য ঃ

The Chinese leader struck the first blow on communism. And you (Gorbacheb) administed the second and seemingly the final-blow. Today we have nothing in the world called communism. But I would like to ask you emplateally not to be caught in the prison of the west and the Great Satan in tearing down the walls of Marxist illusions. Your Excellency Gorbachov! It is clear to all that from now on communism must locked up in the political history museums of the world, for marxism has no answer to any of the real requirements of human beings, beeause it is a materialist doctine.

(চীনা নেতা কমিউনিজমের উপর প্রথম আঘাত হেনেছেন দ্বিতীয়টি সংঘটিত করেছেন আপনি (গরবাচেব) এবং সম্ভবতঃ এটিই চূড়ান্ত। কমিউনিজম নামক বিশ্বে আজ আর আমাদের জন্য কিছু নেই। আমি গুরুত্ব সহকারে বলতে চাই যে, মার্কসবাদী কুহেলিকার প্রাচীর ভাংগতে গিয়ে পাশ্চাত্য ও বড় শয়তানের জিন্দানখানায় ধরা দিবেন না। .... সম্মানিত সর্বাচেভ, এ কথা আজ সকলের নিকট স্পষ্ট যে, এখন থেকে কমিউনিজম বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসের যাদুঘর গুলোতেই তালাবদ্ধ হয়ে থাকবে, কেননা মানব সন্তানদের সত্যিকারের প্রয়োজনের ব্যাপারে কোন উত্তর মার্কসবাদে নেই। কারণ এটি একটি বস্তুবাদী মতবাদ।"

মার্ক্সীয় তত্ত্বের সমালোচনা ঃ এ তত্ত্বটি রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফসল হিসেবেই চিহ্নিত করেছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তির পেছনে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পত্তি সঞ্চয়ের সুযোগ থেকেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি–মার্ক্সীয় এ মতবাদটি বড়ই এক পেশে তত্ত্ব, মানুষ শুধু উৎপাদনের জন্য জন্মগ্রহণ করেনি, তার সকল কার্য ক্রমই উৎপাদন কেন্দ্রিক, এমনটি হলফ করে বলা যায় না। মানুষ অর্থনৈতিক লাভ–লোকসানের বিবেচনা ছাড়াও অনেক কাজ করে থাকে। অবশ্য আধুনিক অর্থনৈতিক আকালের যুগে অর্থনৈতিক লাভ ছাড়া মানুষ খুব কম কাজই করে থাকে। তবুও মানুষের জীবনে এমন কিছু সময় থাকে যখন সে তার আত্মার পরিতৃপ্তির জন্য অনেক সৃজনশীল বা পরের উপকারের জন্য কাজ করে থাকে। অবশ্য একজন সর্বহারার এ ধরণের কাজ করার সুযোগ নেই বললেই চলে। তাই বলে একজন সর্বহারার আত্মিক বা মানসিক ক্ষুধা নেই এমনটিও ভাবা ঠিক নয়।

মার্ক্সীয় দর্শন অবশ্য মানুষের আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করে না। মানুষকে এ তত্ত্ব শুধু নিছক

www.pathagar.com

বস্তুগত সৃষ্টিই মনে করে। আর সে কারণেই বস্তু সৃষ্টিতেই তার সার্থকতার উপকরণ খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু মানুষের জীবনে অবস্তুগত উপাদান, যেমন প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, দয়া, হিংসা - বিদ্বেষ, পরোপকার-পরশ্রীকাতরতা ও লোভ-লালসার গুরুত্ব মোটে তুচ্ছ ন। বরং কখনো কখনো এসব অবস্তুগত উপাদানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বস্তুগত জিনিসের প্রভাব-প্রতিপত্তি ম্লান হয় পড়ে।

সবচাইতে বড় কথা হলো মার্ক্সীয় রাষ্ট্র দর্শন এখনো তার পক্ষে ইতিহাসের গতিধারা পরিবর্তন করতে সমর্থ হয়নি। রাষ্ট্র-যন্ত্রকে আমরা দিন দিন আরো অধিক শক্তিশালী রূপ পরিগ্রহ করতে দেখছি। এর ক্ষতিকর দিকের কথা বাদ দিলেও প্রতিটি রাষ্ট্র আজ বহু কল্যাণকামী কাজও করে যাচ্ছে। রাষ্ট্র -যন্ত্র ছাড়া আন্তর্জাতিক জীবনকে আরো অধিকতর মানবিক রূপ দেয়াও রীতিমত অসম্ভব! আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় কর্মকান্ডে রাষ্ট্রকে আরো অধিকতর কল্যাণকামী রূপ ধারণ করানোর উদ্যোগ আজ বিশ্বব্যপী। যে রাষ্ট্রযন্ত্র বেশি মানবিক তার টিকে থাকার যোগ্যতাও ততবেশি হবে, একথা প্রমাণ করার জন্যই সব রাষ্ট্র ও মনীষী চেষ্টা করছে। কেউ স্বীকার করতে চাইছে না যে, রাষ্ট্র একটি প্রয়োজনীয় ক্ষতিকর জিনিস, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় মানব সভ্যতাকে এর হাত থেকে মুক্তি দিতে হবে, বরং সভ্যতা, সংস্কৃতি, মানবতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, এমনকি আন্তর্জাতিকতাবাদের ধারক ও বাহক হিসেবে রাষ্ট্র-সমূহে বিশ্ব দরবারে তাদের অবস্থান উত্তরোত্তর সুসংহত করে নিচ্ছে।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ

রাষ্ট্র দর্শন ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি নিয়ে যতই বির্তক হোক না কেন, রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাপারে মানুষের আগ্রহে কিন্তু কখনোই ভাটা পড়েনি। মানুষ রাষ্ট্রে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করে সবসময়ই জানতে চেষ্টা করেছে। রাষ্ট্র কখন ও কিভাবে আদিতে তার যাত্রা শুরু করেছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি স্থল ও কাল আবিষ্কারের চিন্তা গবেষণা একের পর এক বেশ কটি মতবাদ ও তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে। অনেক মতবাদ ইতিহাসের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। আবার কিছু মতবাদ বেশ কিছু দূর্বলতা নিয়েই রাষ্ট্রের উৎপত্তির ইতিহাসের পাতায় অনেক খানি স্থান জুড়ে রয়েছে। যে সব মতবাদ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তাদের পেছনে দু'টি প্রধান কারণ পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ মতবাদগুলো মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের কোন বিশেষ উপাদান বা সংঘের ভূমিকাকে বড় করে চিত্রিত করতে সমর্থ হয়েছে, দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে কিভাবে ঐ সব উপাদান বা প্রতিষ্ঠান জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ জীবন যাপনে উৎসাহিত করেছে। মানুষকে সামাজিক জীব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও স্থিতিশীল করতে ঐ সব উপাদান কিভাবে তাদের ভূমিকা পালন করেছে। দ্বিতীয়তঃ প্রতিটি প্রতিষ্ঠিত মতবাদই হয় কোন বড় মনীষী বা চিন্তাবিদ দ্বারা উদ্ভাবিত, না হয় পরবর্তী সময়ে বড় মাপের কোন দার্শনিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বা আইনবেত্তা দ্বারা সক্রিয়ভাবে সমর্থিত। তাদের সমর্থনের কারণেই মতবাদগুলো প্রতিষ্ঠিত থাকতে পেরেছে বা নতুন করে জীবন্ত রূপ লাভ করেছে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সকল মতবাদের মধ্যে নিম্নলিখিত গুলোই সবিশেষ উল্লেখযোগ্যঃ

১। The Theory of Divine origin.
(রাষ্ট্রের উৎপত্তির ঐশ্বরিক মতবাদ)

২। The Force Theory.
(শক্তিপ্রয়োগ মতবাদ)

৩। The Contract Theory.
(চুক্তি মতবাদ)

৪। Patriarchal Theory.
(পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ)

৫। Matriarchal Theory.
(মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ)

৬। Evolutionery Theory.
(বিবর্তনমূলক মতবাদ)

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের উৎপত্তির ঐশ্বরিক মতবাদ ঃ রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি। এ কথাটির নানা ধরণের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ রয়েছে। সবকিছুই সৃজন করেন ঈশ্বর। তাই রাষ্ট্রেরও সৃষ্টিকর্তা তিনি। এটি একটি প্রাচীন মতবাদ। অনেকে আবার এটিকে দৈব মতবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। সৃষ্টিকর্তার নাম বিধাতা, ঈশ্বর, খোদা তা যা-ই বলা হোক না কেন, রাষ্ট্র সৃষ্টিতে তার অবদান, অনুমোদন, ইংগিতের ব্যাপারে অনেকেই একমত হয়েছেন, আবার অনেকেই দ্বিমতও পোষণ করেছেন। যারা এর পক্ষে মত পোষণ বা প্রকাশ করেছেন, তারা রাষ্ট্রকে সকলের জন্য একটি কল্যানকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিত্রিত করেছেন। সাধারণভাবে কোন সংঘই সমাজের সকলের জন্য কল্যাণকর হবে, এমনটি জোর করে বলা যায় না। কিন্তু রাষ্ট্র যেহেতু তার নিজ সীমানায় সকল জনগনকে নিয়েই গঠিত, তাই স্বাভাবিকভাবে ধরা হয় এ প্রতিষ্ঠানটি সকলের জন্যই মঙ্গল জনক। অথচ আমরা জানি শুধু সৃষ্টিকর্তাই পাপী-তাপী, জ্ঞানী-গুণী, অধম-মুর্খ, নর-নারী নির্বিশেষে সকলের জন্য করুনা ও কল্যাণের আধার। কাজেই যুক্তি প্রদর্শন করে অনেকেই বলতে চেয়েছেন মানুষকে একই ধরায় পাঠিয়েই সৃষ্টিকর্তা তাদের জন্য রাষ্ট্রের উৎপত্তি করেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রাষ্ট্র কি প্রকৃতির অন্যান্য সৃষ্টির মতই একটি সৃষ্টি? এখানেই মূল বিতর্ক।

রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি, অর্থাৎ তিনি নিজেই এর সৃষ্টির নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ কথাটির অর্থ দাঁড়ায়, মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও রাষ্ট্রের সৃষ্টি হতোই। আবার যদি বলা যায়, সৃষ্টিকর্তা মানুষকে এমন এক সামাজিক সত্ত্বা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, রাষ্ট্র সৃষ্টি না করে তার আর উপায় ছিল না, তাহলে মতবাদের তাৎপর্য ভিন্ন হয়ে পড়ে।

ঐশ্বরিক ক্ষমতা বনাম রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ঃ রাষ্ট্র সৃষ্টিতে বিধাতার ইচ্ছা, অনুমোদন, ইঙ্গিত কতখানি, এটি একটি দার্শনিক প্রশ্ন। বাহ্যিকভাবে এ প্রশ্নের উত্তর যাই হোক না কেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষতার কার্যকারীতার উপর এর কোন গুরুত্ব পূর্ণ প্রভাব থাকার কথা নয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পরিধি নির্ধারণে এবং এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ মতবাদের ভূমিকা মোটেই তুচ্ছ নয়। বরং আদিকাল থেকেই রাজা-বাদশারা এ তত্ত্বের সাহায্যে তাদের ক্ষমতাকে নিরংকুশ করার প্রয়াস চালিয়েছেন। রাষ্ট্রকে বিধাতার সৃষ্টি বলে চালিয়ে দিতে পারলে রাজা-বাদশাদের অনেক সুবিধা হয়। এ তত্ত্বের অনুসারীরা বিধাতা ও রাজার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মাঝে নিবিড় যোগাসূত্র স্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

এসব যোগসূত্রের পেছনে যে সমস্ত যুক্তিসমূহ প্রদর্শিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যমত হচ্ছেঃ

ক। রাজা মূলত ক্ষমতার মালিক হয় সরাসরি বিধাতার কাছ থেকে।

খ। রাজা জনগণের কাছে জবাবদিহি করে না।

গ। সকল আইনের প্রধান উৎস রাজা।

ঘ। জনগনের জীবন ও সহায়-সম্পত্তির উপর রাজার পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে।

www.pathagar.com

ঙ। যেহেতু রাজাই বিধাতার একমাত্র প্রতিনিধি, তাই রাজার সকল আদেশ-নিষেধের প্রতি আনুগত্য সকল নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক।

চ। রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সামিল।কাজেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে চালেঞ্জ করা যাবে না বা বিপ্লবের জন্য চেষ্টা করা যাবে না।

বিংশ শতাব্দীর বাস্তবতার আলোকে চিন্তা করলে আজ এ মতবাদ অর্থহীন বলে প্রমাণিত হতে বাধ্য। কিন্তু ইতিহাসের বিরাট অংশ জুড়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাপারে এ মতবাদ রীতিমত রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে রক্ষা ও লালন পালনের ক্ষেত্রে রক্ষা কবচের ভূমিকা পালন করেছে। প্রাচীন ভারত,চীন, মিশর সহ সর্বত্রই রাজাকে সৃষ্টিকর্তার অবতার মনে করা হতো। প্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে রাষ্ট্রকে বিধাতার সৃষ্টি বলে দাবী করেছে। প্রায় সকল স্থানীয় ও জাতীয় ধর্মই রাজাকে সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি ও ধর্মের রক্ষক বলে মনে করত। ইহুদীগণও এ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। খ্রীষ্ট ধর্মের অনুসারীদের অবস্থাও ছিল অনুরূপ।

" In the old Testament kings were found to have received the direct sanction of God and to have been instruments in carrying out the Divine will." (Gettells p.116)

"ওল্ড টেষ্টামেন্টে বর্নিত রাজারা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অনুগ্রহে ঐশ্বরিক নির্দেশাবলী পালন বা বহনের বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হতো।"

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী ব্যাপী এ ধারণার আলোকে সমগ্র খ্রীষ্টীয় বিশ্ব রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে শক্তিশালী করার প্রয়াস চালায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এ পদ্ধতি প্রায় সকল ইউরোপীয় দেশ সমূহে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে উল্লেখযোগ্য ভাবে শক্তিশালী করে তোলে। এ ব্যবস্থা ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। মজার ব্যাপার হচ্ছে খ্রীষ্টীয় বিশ্বে পোপরা ও রাষ্ট্রনায়করা প্রায় একইভাবে নিজেদেরকে বিধাতার প্রতিনিধি বলে দাবী করে।। এবং এ দাবীর প্রেক্ষিতে তারা একে অপরকে সাহায্য করে। কিন্তু ইউরোপীয় রেঁনেসা তাদের এ সখ্যতাকে বিনষ্ট করে দেয় এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের পেছনে বিধাতার প্রত্যক্ষ নির্দেশ আছে, এর পক্ষে আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে আসে।

রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশ্বরিক মতবাদের সমালোচনাঃ আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বাস্তবতা ও বর্তমান মানুষের মন-মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণা আদৌ এ মতবাদের পক্ষে সাড়া দেয় না। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে এ মতবাদটির বিপক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে, তা সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

১। প্রমাণের অভাব ঃ রাষ্ট্র নায়করা যেভাবে তাদেরকে সৃষ্টিকর্তার অবতার বলে নিজেদের দাবী করেছেন, তার পক্ষে সত্যিকার অর্থে কোন শক্তিশালী প্রমাণ অনুপস্থিত, কোন রাজাই প্রমাণ করতে পারবে না, কোথায় ও কিভাবে বিধাতা তাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সৃষ্টি ও প্রয়োগ করার দায়িত্ব দিয়েছেন।

২। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় মানবিক প্রাধান্য ঃ রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও এর স্থিতিতে মানুষের কর্মকান্ডের

www.pathagar.com

প্রভাব প্রত্যক্ষ। আর বিধাতাই মানুষকে এসব দুনিয়াবী কাজকর্মে স্বাধীনতা দান করেছেন। মানুষ অন্যান্য প্রাণী ও সৃষ্টিকুলের মত প্রাকৃতিক নিয়মে চলে না। বরং খোদা প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তা ও কর্মশৈলী স্বাধীনভাবে ব্যবহার করার সুযোগ পেয়ে থাকে। কাজেই রাষ্ট্র সংক্রান্ত মানবীয় কার্যাবলীতে বিধাতার সর্বক্ষণ হস্তক্ষেপের কথা চিন্তাই করা যায় না।

৩। দৈব মতবাদের অযৌক্তিকতা ঃ ইতিহাসের অধিকাংশ রাষ্ট্র-নায়করাই অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী। যদি তারা সত্যি সত্যিই বিধাতার প্রতিনিধি হতো, তাহলে এমনটি হবার উপায় ছিল না। কাজেই রাজা, বাদশা বা সম্রাট মানেই খোদার প্রতিনিধি এমন ধারণার কোন ধর্মীয়, নৈতিক বা সাংবিধানিক ভিত্তি নেই।

৪। সেচ্ছাচারিতার উদ্ভব ঘটায় ঃ রাষ্ট্র-নায়কদের ক্ষমতা খোদা-প্রদত্ত, এ বিশ্বাস খুবই বিপদজনক। কারণ, তাহলে তারা যা খুশী করার লাইসেন্স পেয়ে যাবে। এমনকি ধর্মগ্রন্থ রচনার দায়িত্বও তারা গ্রহণ করবে। আর ধর্মীয় বিধি-বিধান পরিবর্তন বা সংশোধনতো রাজা বাদশাদের জন্য কোন ব্যাপারই হবে না। যে কোন দমননীতি গ্রহণ বা প্রয়োগের পথে কেউ কোন কার্যকর বাঁধা প্রদান করতে পারবে না।

৫। একটি মাত্র সরকার ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ঃ এ মতবাদ অনুসারে রাজতন্ত্রই কেবলমাত্র সঠিক রাষ্টীয় ও সরকারী ব্যবস্থা বা পদ্ধতি। অর্থাৎ রাষ্ট্র যন্ত্র ও সরকারী কতৃর্ত্বের ব্যাপারে গবেষণা ও সৃজনশীলতার দ্বাররুদ্ধ থাকবে । অথচ এ সব ব্যাপারে মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও তার ব্যবহার মানুষের জন্য কল্যানকামী ব্যবস্থা বিনির্মাণে অপরিহার্য। সমাজের কোন এক অংশ বা শ্রেণী যাতে চিরদিনের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষীগত করতে না পারে, সেজন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নতুন নতুন নিয়ম-পদ্ধতির আবিষ্কার ও তার প্রয়োগের সুফল-কুফল বিবেচনা করার অধিকার নাগরিকদের থাকতে হবে।

বিধাতার ক্ষমতার ভুল ব্যাখ্যা ঃ এ মতবাদ মূলতঃ সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছে। কোন ধর্মগ্রন্থই সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের সম্পর্ক এমনভাবে নির্ধারণ করেন নি যে, মানুষ যা করবে, তা সৃষ্টিকর্তার কাজ হয়ে যাবে। রাজাকে আল্লাহর ছায়াস্বরূপ চিত্রিত করে এ মতবাদ মূলতঃ ক্ষমতাধর মানুষকেই ঈশ্বর বানিয়ে ফেলেছে। অন্যদিকে সাধারণ মানুষকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ব্যাপারে নির্লিপ্ত রাখার ব্যবস্থা করে। মানুষের কাছে এমন এক খোদার অস্তিত্বের বর্ণনা দিয়েছে যিনি পার্থিব সকল ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করেন। অথচ একথা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ্ মানুষের পার্থিব কর্মকান্ডে সব সময় হস্তক্ষেপ করেন না, শুধুমাত্র চূড়ান্তভাবে সীমালংঘনকারী গোষ্ঠী ব দলকে তিনি মানুষের মধ্য থেকেই তুলনামূলকভাবে কম জুলুমকারী অন্য একটি দল দিয়ে জব্দ করার ব্যবস্থা করেন।

শক্তি প্রয়োগ মতবাদ ঃ যদি প্রশ্ন করা যায় রাষ্টের প্রাণ-শক্তি কোথায় অবস্থিত? তখন হয়ত রাষ্ট্রে অবস্থিত বিভিন্ন ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ,শ্রেণী বা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু এ সব

www.pathagar.com

ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিসের বলে বলীয়ান? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, ক্ষমতার কারণেই মূলত রাষ্ট্রের এত দাপট। আজকের দিনে পৃথিবীর সর্বত্রই বলা হয়ে থাকে, জনগনই সকল ক্ষমতার উৎস। বহু রাষ্ট্রের সংবিধান এ কথার স্বীকৃতি দিয়ে আসছে এবং এর সত্যতা প্রমানের জন্য নানা তন্ত্র–মন্ত্র ও পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। আজকে আমরা যা প্রত্যক্ষ করছি, তা হল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রথম উৎপত্তি বিভাবে? কি পদ্ধতি অবলম্বন করে এটি আদিতে জন্মলাভ করেছিল? কেই কেউ বিশ্বাস করেন, সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জন্মের পেছনে একটি সত্যই কাজ করেছে, তা হল বলপ্রয়োগ। কথায় যাকে বলে, "জোর যার মুল্লুক তার।" ব্যক্তি, গোত্র বা দল যখন তাদের ক্ষমতা সমাজের সকলের উপর প্রয়োগ করে থাকে এবং একে অপ্রতিরোধ্য সার্বজনীন রূপ দেয়, তখনই সেই বলপ্রয়োগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় রূপান্তরিত হয়। রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে বল প্রয়োগের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে ম্যাকাইভার বলেন, "উৎপত্তির মূলে, ক্রমবিকাশে, সদস্যদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টায় এবং রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ শুধুমাত্র শেষ ভরসা স্থলই নয়; তা আদিম নীতিও বটে।" (পৃঃ১৯৬) আদিকালে রাষ্ট্রীয় শক্তি যখন তেমন একটি সংগঠিত রূপ লাভ করেনি, তখন অস্ত্রের জোরে কে কাকে বশীভূত করতে পেরেছে, বা কতদিন পর্যন্ত আধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছে, তার উপর মূলত নির্ভর করত কোথায় কোন রাষ্ট্রের জন্ম হলো বা ধ্বংস হলো। সে সময়ে রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে সামরিক শক্তির ভূমিকা ছিল প্রত্যক্ষ। কোন রাষ্ট্র কতখানি সাফল্যের সাথে তার সীমানার ভিতরে ও বাইরে তার শক্তি প্রয়োগ করতে পারতো, তার উপরই নির্ভর করত তার কৃতিত্ব ও টিকে থাকার অধিকারী। তাই হয়ত বোসাঙ্কটের মতে, "রাষ্ট্র সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যকর সমালোচনা হিসেবে মূলতঃ শক্তির নামান্তর।" রাষ্ট্র সৃষ্টির আদিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দর্প মানেই হিংসাত্মক যুদ্ধ বিগ্রহ ও সংঘাত। এ সংঘাতের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের জন্ম ও ক্রমবিকাশ। অর্থাৎ ছোট ছোট শক্তির সংঘাতের মধ্য দিয়ে বড় বড় শক্তির উদ্ভব। ছোট ও দূর্বল রাষ্ট্রের ধ্বংসের মধ্য দিয়েই বড় ও শক্তিশালী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন। এটিই হচ্ছে এ মতবাদের মূল কথা।

বল প্রয়োগ মতবাদটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশের ধারা যেভাবে বর্ণনা করে তাতে বুঝা যায় মানুষ ও তার প্রকৃতির ব্যাপারেও তার নিজস্ব চিন্তা–ভাবনা রয়েছে। বল প্রয়োগকে যখন রাষ্ট্র সৃষ্টির একমাত্র নিয়ামক ধরা হয়, তখন মানুষের একটি বিশেষ স্বরূপের দিকে ইঙ্গিত করা হয়। মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়ে তার কলহপ্রিয়তা, আক্রমনমুখীতা ও প্রভূকামীতা। আর ইতিহাসের প্রধান নিয়ামক হয়ে পড়ে অবিরত যুদ্ধ, রক্ত–ক্ষয়,সংঘাত ও আক্রমন। মানুষের এ যুদ্ধাংদেহী ভাব কখনও ব্যক্তি–মানুষকে, কখনও গোত্র বা জাতিকে প্রভুত্ব বিস্তারের লালসায় পাগলপারা করে দেয়। ফলে শুধু শাসক ও শাসিত নামেই দু'টি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে না; বরং প্রভু ও দাসের ইতিহাস সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্নভাবে যেভাবে দাসপ্রথা টিকে ছিল, তাতে এ মতবাদের পক্ষে বহু যুক্তি মিলে। বিজীত গোত্র বা রাষ্ট্রের লোকদেরকে বিজয়ী শক্তি সহজেই দাসে রূপান্তরিত করে নিত । এটাই ছিল প্রচলিত নিয়ম । এর কোন ব্যতিক্রম মানুষ বহুদিন ধরে

www.pathagar.com

জানতো না। আবার বিকল্প ব্যবস্থা বা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলেও তা কার্যকর করা যায় নি বল প্রয়োগ নীতির দৌরাত্মে।

রাষ্ট্র পর্যাপ্ত পরিমান শক্তিশালী না হলে, সে যে কোন সময় বহিঃশত্রুর আক্রমনের শিকার হতো এবং তার অস্তিত্ব রক্ষা করাই সম্ভব হতো না। তাই বল প্রয়োগ নীতির কার্যকারীতা প্রত্যক্ষ করতে কোনই অসুবিধে হতো না। কিন্তু শক্তি বৃদ্ধি ঘটানোর জন্য রাষ্ট্র তার নিজ অধিবাসীদের উপর প্রয়োগ করত কঠিন নিয়ম-কানুন। রাষ্ট্রীয় শক্তির ধারক ও বাহকরা নিজ অধিবাসীদের বিরাট অংশকে দাস বা দাসতূল্য করার মধ্যে অমানবিক কিছু খুঁজে পেত না। যদি নিজ প্রজাদের উপর আরোপিত কঠোর ব্যবস্থা রাষ্টের শক্তি বৃদ্ধি করতে পারত; তাহলে আভ্যন্তরীণ নিয়ম-নীতির ক্ষেত্রে কঠোরতা কেন, কোন নিষ্ঠুরতাই যেন তেমন কোন দোষের ব্যাপার ছিল না। অর্থাৎ রাষ্ট্রের উৎপত্তির বলপ্রয়োগ মতবাদ অনুসারে আইন হচ্ছে মূলতঃ শাস্তি বিধানের মাধ্যমে আনুগত্য লাভের হাতিয়ার বিজীত গোত্র বা দেশের উপরেই যে দমন নীতি কার্যকর করা হবে, এমন কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। বরং নিজ আদিসীদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। রাষ্ট্রীয় হুকুম অমান্য করলেই শাস্তির বিধন হয়ে যাবে, রাষ্ট্র ন্যায় না অন্যায় যেভাবেই সে হুকুম জারী করুক না কেন।

আদিতে যেহেতু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষীগত ছিল খুবই ছোট কোন গোষ্ঠী বা গোত্রের হাতে, তাই বল প্রয়োগ নীতির দৌরাত্বও ছিল সর্বত্র। রাষ্ট্রের কল্যাণের অজুহাতে সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার হতো অহরহ। ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হতো যত্র-তত্র। কাজেই বল প্রয়োগ নীতি নানাভাবে যুক্তিযুক্ত মনে হতো। সাধারণ ব্যক্তি-মানুষকে নির্যাতন করা সরকারী লোকদের জন্য তেমন কোন কষ্টকর ব্যাপার ছিল না। এমনকি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের রোষানলে পড়ে বহু সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কাহিনীও ইতিহাসে কম নয়। বহু গোত্র ও জাতি হয়েছে চরমভাবে নিষ্পেষিত। রাষ্ট্রের উৎপত্তির পেছনে শক্তি প্রয়োগের ভূমিকা মোটেই তুচ্ছ নয়। কিন্তু এ মতবাদটি রাষ্ট্রের উৎপত্তির পেছনে অন্যান্য উপাদানের ভূমিকা অনেকটা অস্বীকারই করে। মধ্যযুগ পর্যন্ত রাষ্ট্র মূলতঃ শক্তির প্রতীক হিসেবেই বেশী প্রতিভাত হতো। তারপর আক্ষরিক অর্থে "বল" অর্থাৎ শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় আইনের রক্ত-চক্ষু বা শক্তিশালী সামরিক শক্তি অর্জনের মধ্য দিয়েই কোন রাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে পড়ে। তবে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত জার্মানীতে এ মতবাদের পক্ষে নানা ধরণের যুক্তি প্রদর্শন অব্যাহত থাকে। বার্ণহাডি, সোরেল, নিটসের মত জার্মান চিন্তাবিদরাতো রাষ্ট্রের যে কোন নগ্ন বল প্রয়োগকেও সমর্থন জানিয়েছেন। হেগেলের মতবাদ অবশ্য এতটা নগ্ন ছিল না। তবে জার্মান জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য তারা এ মতবাদকে ব্যবহার করার পক্ষে ছিলেন। বিংশ শতাব্দীতেও আমরা তাদের মতামতের প্রভাব লক্ষ্য করি হিটলারের কার্যাবলীতে। ষ্টালীন এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিল কি-না বলা মুশকীল। তবে তার কর্মকান্ড অনুরূপ মতবাদে তার বিশ্বাসের কথা প্রমাণ করে।

www.pathagar.com

শক্তি প্রয়োগ মতবাদের সমালোচনা

মানব সমাজ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাঃ এ মতবাদ মানুষ ও পশুর রাজ্যের নিয়মাবলীকে আলাদা করতে পারেনি। মানব সমাজ এ মতবাদের দৃষ্টিতে বন্য সমাজেরই সমতুল্য। আদি থেকেই মানব সমাজকে একটি নৈতিকতা বির্বজিত, শুধুমাত্র শক্তির দৌরাত্বে শাসিত রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে এ মতবাদ।

মানুষ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাঃ এ মতবাদ মানুষের মাঝে শুধু ক্ষমতা লিপ্সাই দেখেছে। মানুষের মাঝে যে আরো ভালো-মন্দ বহু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সে ব্যাপারে মতবাদটি উদাসীন। মানুষের মাঝে যে প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা, দয়া-মায়া কাজ করে, এ মতবাদটি তা একেবারেই বিবেচনায় আনতে পারেনি।

যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাবঃ যুদ্ধ শুধু ক্ষমতা লিপ্সার কারণে ঘটে না। যুদ্ধের আরো বহু মনস্তাত্বিক কারণ রয়েছে। অনেক সময় নিজ বা অন্য গোত্রের বা রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর কিছু করার চিন্তা থেকেও যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। কখনও কোন ভূমি বা মানুষের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্তিও যুদ্ধের কারণ হতে পারে।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে ভুল চিন্তাঃ রাষ্ট্র শুধুমাত্র বল প্রয়োগের মাধ্যমেই টিকে থাকে না, এবং শুধুমাত্র এই একটি উপাদান থেকেই এর উৎপত্তিও সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় বন্ধনকে ধরে রাখার জন্যই শক্তি বা ক্ষমতা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অথচ এ মতবাদ অনুসারে শক্তি প্রয়োগ করেই এসব বন্ধনের সৃষ্টি করা হয়। বল প্রয়োগ করে কোন চেতনাই বেশীদিন ধরে রাখা সম্ভব নয়।

আইন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ঃ আইন শুধু শক্তি বা ক্ষমতার জোরে সৃষ্টি হয় না। আর যদি সৃষ্টি হয়ও তবে তা বেশীদিন কার্যকরী রাখা যায় না। তাছাড়া আইন মানব বা সমাজ জীবনের সকল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে নিজেই বেশীদিন স্থির থাকতে পারে না "কোন রূঢ় পুরুষ শক্তি গর্বে তার স্ত্রীকে প্রহার করতে পারে; দৈহিক পরিশ্রমের নিম্নতম পর্যায়ে শক্তি মুষ্ঠি ভিক্ষাও পেতে পারে; কিন্তু মানবিক সম্পদের মধ্যে এটি সব থেকে কম পুরুস্কার পায়। শক্তি বুদ্ধির নগন্যতম ভৃত্য। শাস্তির বিধান দিয়ে আইন চৌর্যবৃত্তি ও হত্যাকান্ড প্রতিরোধ করে। কিন্তু শাস্তির ভয়েই যে আমরা চুরি করি না বা হত্যাকান্ডে লিপ্ত হই না, তা নয়; আমাদের সমাজ বিরোধী প্রবনতাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের আভ্যন্তরীণ শুভ চেতনাগুলো দমন করে থাকে অথবা আমাদের চারিদিকে যে সমাজ তারই জনমতের বৃহত্তর নিন্দাবাদ নিয়ন্ত্রন করে।" ম্যাকাইভার (পৃঃ১৯৮)

মতবাদটির ঐতিহাসিক ভিত্তি বড়ই দূর্বলঃ যাদের শক্তি বেশী তারাই রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে, এমন ধারণার পক্ষে যথেষ্ট পরিমান শক্তিশালী যুক্তির অভাব রয়েছে। যাদের নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে তাদের সঙ্গে শাসকবর্গের কোন কোন পর্যায়ে সম্মতির একটা প্রয়োজন থাকে। এ ঐতিহাসিক

www.pathagar.com

নিয়মের দাবী সকল শাসককেই কোন না কোনভাবে মিটাতে হয়েছে। কোন স্বৈরাচারী শাসকই রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষমতা নিজ হাতে প্রয়োগ করতে পারে না এবং জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোন অংশের স্বার্থের শাসকবর্গের স্বার্থের সাথে একটি যোগসূত্র স্থাপন রাষ্ট্র সৃষ্টি এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অপরিহার্য শর্ত। আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্তরণের পূর্বে অবশ্য শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক তেমন একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু অতীতের বহু নগর রাষ্ট্রেই জনগণের মতামতের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ত রাষ্ট্র–যন্ত্র বিনির্মান ও তার রক্ষণাবেক্ষণের কার্যে। গ্রীক নগর–বাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কাজেই বল প্রয়োগ করেই রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমন ধারণা ইতিহাস প্রত্যাখান করে।

মতবাদটি গণতন্ত্র বিরোধী ঃ এ মতবাদটি যেহেতু শক্তিকেই কেবল সকল কিছুর চালিকাশক্তি মনে করে, তাই প্রকারান্তরে এ মতবাদটি স্বৈরতন্ত্রকেই সমর্থন জানায়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কোন স্থান এ মতবাদে নেই। দেশের জনগণের মতামতের কোন তোয়াক্কা যদি শাসক বা শাসকবর্গকে করতে না হয় তাহলে যে কোন সরকার ব্যবস্থাই স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হতে বাধ্য।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ ঃ রাষ্ট্রের উৎপত্তির পেছনে সাধারণ জনমানবের বিরাট ভূমিকা রয়েছে এবং ইহা কোন ঐশ্বরিক শক্তি বা বলপ্রয়োগ প্রক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ মাত্র নয়–– এ সত্য সার্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করতে মানব সভ্যতার অনেক সময় লেগেছে। যদিও বিচ্ছিন্নভাবে মানুষ বহু পূর্বেই রাষ্ট্রকে কোন দৈব শক্তি বা পাশবিক শক্তির সৃষ্টি হিসেবে মেনে নিতে চায়নি; তবুও রাষ্ট্রশক্তি ঐ দু' টি মতবাদকে আঁকড়ে ধরে রাখাকে নিজেদের জন্য লাভজনক বলে মনে করত। এতে ঝুঁকিও ছিল কম। দমন নীতিমূলক ও স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা এ দু' টি মতবাদকে ব্যবহার করেছে ষোল শতক পর্যন্ত।

দৈবশক্তি বা পাশবিক শক্তির সৃষ্টি হিসেবে রাষ্টের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, প্রকৃতি ও এর স্থিতি সম্পর্কে বেশ কিছু যুক্তিগ্রাহ্য মতবাদ ব্যক্ত করা সম্ভব হলেও এ দু' টি মতবাদের প্রবক্তাগণ শাসক ও শাসিতের মাঝে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হন। কারণ রাষ্ট্রের শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক মোটেই একটি নিছক দার্শনিক বা তাত্ত্বিক ব্যাপার নয়; বরং এটি একটি বাস্তব সমস্যা। এ সমস্যার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে কোন দেশে কিরূপ রাষ্ট্র ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে মুক্ত চিন্তার অবকাশ ছিল কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাসকরা ঠিক করত তাদের অধীনস্থদের সাথে তারা কিরূপ সম্পর্ক স্থাপন করবে। আর প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য সৃষ্টি হত বহু লেখক, দার্শনিক ও চিন্তাবিদ। ইউরোপীয় রেঁনেসা এ ধরনের বন্ধ্যাত্বপূর্ণ চিন্তা–ভাবনার মূলে আঘাত হানে। ফলে শাসক ও শাসিতের মধ্যকার সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা–ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কিভাবে বন্টিত ছিল ও কিভাবে বন্টিত হবে বা হওয়া উচিৎ এ সম্পর্কে জন্মলাভ করে নতুন মতবাদ। শাসক ও জনগনের মাঝে চুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা বন্টনের এ মতবাদের নামই হচ্ছে –সামাজিক চুক্তি মতবাদ।

www.pathagar.com

এ মতবাদ অনুসারে মানুষ রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে বসবাস করত "প্রকৃতির রাজ্যে" (State of Nature)। প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষের প্রণীত কোন আইন-কানুন ছিল না। কিন্তু মানুষ একেবারেই কোন নিয়ম-কানুন মানত না-এমনও ছিল না। প্রকৃতির মাঝে মানুষ যে সব বিধি-বিধান প্রত্যক্ষ করত, তার সাথে তাল মিলিয়ে তারা চলতে চেষ্টা করত। প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষ প্রাকৃতিক অধিকার ভোগ করত।কিন্তু প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষ সুখী ছিল, না অসুখী ছিল-তা নিয়ে এ মতবাদের প্রবক্তাগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ প্রাকৃতিক রাজ্যকে সুখের ও ন্যায়-নীতি সমৃদ্ধ সমাজ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অন্যেরা আবার ঐ সমাজের সর্বক্ষণিক জুলুম ও নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে মতবাদের বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এ মতবাদের প্রবক্তাগণ এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, প্রাকৃতিক রাজ্য থেকে মনুষ্য সৃষ্ট রাষ্ট্রের উত্থান ঘটেছে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে।

যদিও এ মতবাদটি ষোল শতক থেকেই প্রসিদ্ধি লাভ করে আসছে, তবু এ মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায় বহু পূর্বেই। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক কৌটিল্য এ মতবাদের আভাস দিয়েছে তার রচিত অর্থনৈতিক শাস্ত্র গ্রন্থে। সে সময়ে প্রচলিত অর্থনৈতিক লেন-দেন যে সব চুক্তির মাধ্যমে ঘটত, তার মাঝেই তিনি আবিষ্কার করেছেন সামাজিক চুক্তি। প্রাচীন গ্রীসের সফিষ্টগণ (Sophists) রাষ্ট্রকে চুক্তি সৃষ্ট বলে গন্য করেছেন। প্লেটো ও এ্যারিষ্টটল যদিও এ মতবাদের বিপক্ষে ছিলেন, তবুও তাত্ত্বিক জগতে তারাও এর অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করেন নি। রোমান আইনে চুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে রাষ্ট্র সৃষ্টির পেছনেও যে চুক্তির মূখ্য ভূমিকা থাকতে পারে, এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে। এরপর থেকে সামন্তবাদী সকল সমাজেই চুক্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে। চুক্তিতে সকল পক্ষ সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ না করে থাকলেও রাষ্ট্র ব্যবস্থা সৃষ্টিতে সকলের অলিখিত বা পরোক্ষ সম্মতি রয়েছে বলে ধরা হত। অর্থাৎ চুক্তিটি কোথাও স্বাক্ষরিত না হয়ে থাকলেও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপস্থিতিই যেন সামাজিক চুক্তির স্বাক্ষর বহন করত।

দশ শতক পর্যন্ত সামাজিক চুক্তি মতবাদ সম্পর্কে তেমন একটা সুনির্দিষ্ট নীতিমালার সন্ধান লাভ দূরহ ব্যাপার ছিল। এগার শতকে ধর্মযাজক ম্যানেগোল্ড (Manegold) এ মতবাদটিকে বেশ কিছু তথ্য ও তত্ত্বের মাধ্যমে যুক্তির বাঁধনে আবদ্ধ করতে প্রয়াসী হন। ম্যানেগোল্ড এ মতবাদের ইতিহাস বা উৎপত্তি স্থল নিয়ে তেমন একটা বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে প্রচলিত অলিখিত সাংবিধানিক কাঠামো ও রাষ্ট্রের প্রচলিত অন্যান্য নীতিমালায় চুক্তির ভাবধারা ও কার্যকারিতার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে এ মতবাদ বুদ্ধিজীবি মহলে তেমন একটা প্রাণবন্ত রূপ ধারণ করতে পারেনি।

ইউরোপে সামন্তবাদী ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার পর সবাই এ মতবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সবাই স্বাধীন এবং স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র চলবে, এ তত্ত্ব সকলের নিকট হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠে। তবুও এর তাত্ত্বিক দিক-এর বিকাশ জরুরী হয়ে পড়ে। এ ঐতিহাসিক দাবী

www.pathagar.com

পূরণে এগিয়ে আসেন ইংরেজ চিন্তাবিদ হবস্ (Hobbes) ও লক (Locke) অন্যদিকে ফরাসী দার্শনিক রুশো (Rousseaee) এ মতবাদের দার্শনিকও ঐতিহাসিক শক্ত ভিত্তি রচনা করেন। আর তাই এ মতবাদটি আজ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক দৃষ্টিকোন থেকে এতবেশী হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে উঠেছে। বহুল আলোচিত মতবাদটির প্রসিদ্ধি ঘটেছে পৃথিবী ব্যাপী। তারপরও এ মতবাদটির সার্বজনীন ব্যাখ্যা দেয়া কঠিন। কারণ এর প্রধান প্রবক্তাগণ অনেক ব্যাপারেই ঐক্যমত পোষণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আর সে কারণেই এ মতবাদের সমালোচনা আরো জটিল রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ মতবাদটি বুঝার এবং এর সঠিক সমালোচনার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে, এ মতবাদের তিন মুল প্রবক্তার মতামতের বিচার-বিশ্লেশণ ও তুলনামূলক আলোচনা এবং এসব মতামতের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের আদর্শবাদী তত্ত্ব

(The Idealist theory of the State)

রাষ্ট্রের আদর্শবাদী তত্ত্বকে দার্শনিক, আধিবিদ্যক বা সম্পূর্ণবাদী তত্ত্ব বলা যেতে পারে। তত্ত্ব হিসেবে এটি রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে একটি আদর্শ ও পরিপূর্ণ রূপ ব্যক্ত করতে আগ্রহী। কল্পনায় ও দার্শনিক চিন্তায় এ তত্ত্ব রাষ্ট্রকে এমনভাবে চিহ্নিত করে যে, তার সন্ধান বাস্তবে পাওয়া রীতিমত কষ্ট সাধ্য। তবে তাতে এ তত্ত্বের কোন আপত্তি নেই। কারণ রাষ্ট্র মূলতই একটি অবস্তুগত ধারণা ও দার্শনিক ব্যাপার। বাস্তবে যে সব রাষ্ট্র আমরা দেখি, তা এ তত্ত্বের আলোকে প্রকৃত রাষ্ট্রর ছায়া মাত্র।

এ তত্ত্বের প্রবক্তাদের মধ্যে কান্ট (Kant) (১৭২৪-১৮০৪)-এর নামই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। Immanuel kant কে আদর্শবাদী দর্শণের জনকও বলা যেতে পারে। দরিদ্র জার্মান পিতামাতার সন্তান হয়েও তিনি Konigsberg বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার ব্যবস্থা করতে সমর্থ হন এবং পরে ১৭৭০ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের যুক্তিবিদ্যা ও অধিবিদ্যা চেয়ারম্যান হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। নিজ দেশের তৎকালীন রাজনীতির প্রতি তার তেমন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল ঝোঁক। চলমান ঘটনা বা বাস্তব অবস্থার গতি-প্রকৃতি তাঁর মৌলিক চিন্তার খোরাক জোগাতো। মৌলিক ধ্যান-ধারণা অর্জনের জন্য তিনি রুশো ও মন্টেস্কুর গবেষণা কর্মকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতেন। অনেকে অবশ্য এ জন্য তাকে দোষারোপ করে বলতেন যে, তিনি মূলত তাদেরই ধ্যান-ধারণাকে নিজের রুপ-রস দিয়ে উপস্থাপন করেছেন।

কান্টের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার প্রমাণ মিলে তাঁর নিম্নলিখিত গ্রন্থ সমূহে।

1. Metaphysical First Principles of the theory of law.
   (আইনের তাত্ত্বিক আধিবিদ্যা সম্পর্কিত প্রথম নীতিমালা।)
2. For Perpetual Peace.
   (চিরস্থায়ী শান্তির জন্য)
3. The Principles of Political Rights.
   (রাজনৈতিক অধিকারের নীতিমালা)
4. The Natural Principles of the Political Order.
   (রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রাকৃতিক নীতিমালা।)
5. The Critigue of Pure Reason.
   (খাঁটি যুক্তির সমালোচনা)

www.pathagar.com

কান্ট যেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে বক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী যুগের নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটাতে চেয়েছিলেন। চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি যেন নতুন যুগের সূচনা করেন। তার মৌলিক অবদানের মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক বিষয়াদিতে নীতি–শাস্ত্রীয় ধ্যান–ধারণার প্রয়োগ। তিনি জোরের সাথে বলেন, রাজনীতিকে যদি ন্যায়–নীতির বাঁধনে আবদ্ধ করা না যায়, তবে তা অর্থহীন হয়ে পড়বে। নীতি–শাস্ত্রকে কান্ট রুশোর মত সকল চিন্তা ধারার ভিত্তি প্রস্তর হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে নৈতিকভাবে স্বাধীন হতে না পারলে কোন মানুষই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। বলা চলে যে, তিনিই "autonomy of the moral will " (নৈতিক ইচ্ছার স্বাধীনতা) নামক প্রবাদের জন্ম দেন। কিন্তু তিনি নিঃশর্ত স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন না। যে কোন ইচ্ছা পূরণের অবস্থাকেই তিনি স্বাধীনতা বলতে নারাজ। তার মতে যা খুশী তা করার নাম কোন অবস্থাতেই স্বধীনতা হতে পারে না। অন্যের জন্য একই অধিকার সংরক্ষিত করতে পারলেই শুধু ঐ অধিকার ভোগ করার অধিকার একজন লাভ করবে। আর ঐ সব অধিকার অবশ্যই সার্বজনীন প্রাকৃতিক আইন দারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে।

ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান ঃ কান্টের দর্শন অবশ্যই ব্যক্তিকে ঘিরে। ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা তার চিন্তাধারার মধ্যমনি। প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রতি ছিল তার অগাধ সম্মানের দৃষ্টি। তার দৃষ্টিতে প্রতিটি মানুষই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তির জন্য সৃষ্টি। মানুষ কোন মহৎ উদ্দশ্য অর্জনের নিছক উপাদান মাত্র নয়। ব্যক্তির স্বাধীনতার প্রতি ছিল কান্টের প্রগাঢ় ঝোঁক। ব্যক্তিকে তিনি রাষ্ট্রের জন্য উৎসর্গ বা বলি দিতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু তাই বলে সমাজের ও রাষ্টের মহৎতর উদ্দেশ্যের সম্পর্কে তিনি বেখেয়াল ছিলেন না। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, রাষ্ট ও ব্যক্তি – মানুষের সম্পর্ক পারস্পরিক বিসর্জনের নয়; বরং উভয়েই লাভবান হবে এমন পারস্পরিক সম্পর্কের উপর গড়ে উঠবে রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

এটি সত্য যে কান্টের স্বাধীনতার ধারণা আচার নিষ্ঠ ও তেমন স্পষ্ট নয়। কিন্তু তিনি স্বাধীনতার ব্যাপারটি শুধু রাজনৈতিক ধ্যান–ধারণার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চান নি, বরং স্বাধীনতার ব্যাপারটির প্রতি দার্শনিক দৃষ্টি দিয়ে একে যুক্তির কাঠামোর ভেতরে স্থান দিতে চেয়েছেন। এটিকে এক তরফা ভাবে রাষ্ট্র–যন্ত্র বা ব্যক্তি–মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল দেখতে চান নি। কান্টিই হচ্ছেন প্রথম জার্মাণ চিন্তাবিদ যিনি স্বাধীনতা, সাম্য, ও সম্পত্তিতে অধিকারের মত বিষয়গুলোকে মৌলিক অধিকার হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং রাষ্ট্র ও নাগরিক উভয় পক্ষকেই এ ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে চেয়েছন।

সামাজিক চুক্তি ঃ সামাজিক চুক্তির ব্যাপারটিকে কান্ট নিছক কোন ধারণা "Mere idea" হিসেবে গ্রহণ করেন নি। তিনি এটিকে রাষ্টের উৎপত্তির সাথে জড়িত কোন মতবাদ হিসেবেও গ্রহণ করেন নি। বরং এরূপ মতবাদকে বিপদজনক ও অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করতেন। তিনি সামাজিক চুক্তি বলতে এমন একটি অবস্থাকে বুঝাতে চেয়েছেন, যেখানে কোন ব্যক্তি–মানুষ

www.pathagar.com

আইনকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ না করেনই আইন পালন করতে থাকেন। চুক্তি অনুসারে সে কিছু সময়ের জন্য স্বাধীনতা বিসর্জন দেয় আরো ভালোভাবে স্বাধীনতা পুনরায় লাভ করার স্বার্থে। কান্ট সামাজিক চুক্তির ব্যাপারটিকে একটি সাংবিধানিক অবস্থার সাথে তুলনা করেছেন; যেখানে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে জনগণ ও সরকার উভয়ের স্বার্থেই। সাংবিধানিক ব্যবস্থার কাজই হচ্ছে সরকার ও জনগনকে একই সূত্রে গাঁথার ব্যবস্থা করা।

কান্টের মূল ভাবনা ছিল কীভাবে সমাজের সকল মানুষের ইচ্ছাকে একটি সামগ্রিক সাধারণ ইচ্ছায় রুপান্তরিত করা যায়। সামগ্রিক সাধারণ ইচ্ছাটি আবার এমন হবে যে, এতে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটবে। সকলের জন্য সুবিচারই হচ্ছে এরূপ ব্যবস্থ আর পূর্বশর্ত। অর্থাৎ স্বাধীনতা থেকে ব্যহ্যিকভাবে কাউকে যদি বঞ্চিত করা হয়, এবং তা যদি সমাজের সকলের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হয়, তাহলে আমরা এরূপ কাজকে স্বাধীনতা বিরোধী বলতে পারি না। তবে স্বাধীনতার এরূপ রক্ষণবেক্ষণ শুধুমাত্র আইন ব্যবস্থা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতে হবে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সীমাঃ কান্ট রাষ্ট্রের হাতে খুব বেশী ক্ষমতা অর্পন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। মানুষ স্বভাবতঃই ক্ষমতা লিপ্সু ও যশ লিপ্সু। লাভ-লোকসানের হিসেবের বেলায় মানুষ বড়ই সচেতন। এ অবস্থাকে কান্ট " The War of all against all" (সকলের বিরুদ্ধে সকলের যুদ্ধ) বলে অভিহিত করেছেন। কান্টের মতে, রাষ্টের উচিত হবে না, মানুষের নৈতিক স্বাধীনতার ব্যাপারে সরাসরি হস্তক্ষেপ করা। এ ব্যাপারটিকে ব্যক্তিগত পর্যায়েই রেখে দেয়াই ভালো। তবে রাষ্টের উচিৎ মানুষের অসৎ বা মন্দ বৈশিষ্ট্য সমূহ চর্চার ক্ষেত্রে বাঁধা প্রদান করা, যাতে করে সুকুমার প্রবৃত্তির চর্চা সহজ হয়। রাষ্ট্র সকল মন্দ কাজের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করার চেষ্ট করবে। কিন্তু তাই বলে সকল ভাল কাজই রাষ্ট্র শক্তি দ্বারা সম্পদিত হওয়া সম্ভব নয়। নাগরিকরাই সব ভাল কাজের আয়োজন করবে নিজেদের তাগিদে। রাষ্ট্র শুধু সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে। রাষ্ট্র শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বদাই সংযত থাকবে। কারণ কখন কোন দুর্যোগ মোকাবিলা করতে কি পরিমান শক্তি সামর্থের দরকার পড়বে তা আগে ভাগেই বলা মুশকিল।

সরকারের প্রকারভেদঃ কান্ট তিন ধরনের রাষ্ট্র ও দুই ধরণের সরকারের কথা বলেছেন। তিন ধরণের রাষ্ট্র হচ্ছে; ১। Autocracy (স্বৈরতন্ত্রী) ২। Aristocracy (অভিজাততন্ত্র) ও ৩। Democrcy (গণতন্ত্র) দুই ধরণের সরকার হচ্ছে ঃ ক। Republican (প্রজাতন্ত্রী) ও খ। Despotic (স্বৈরতন্ত্রী)। কোন সরকার প্রজাতন্ত্রী হবে না স্বৈরতন্ত্রী হবে, কান্টের মতে সেটি নির্ভর করবে রাষ্ট্রে আইন ও নির্বাহী ক্ষমতার পৃথকীকরণ আছে কিনা তার উপর। তার মতে প্রতিনিধিত্বমূলক নয়, এমন সরকার ব্যবস্থা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। তার দৃষ্টিতে রাজা, অভিজাতশ্রেনী বা নির্বাচিত প্রতিনিধির কাউকে না কাউকে রাষ্টের প্রতিনিধিত্ব করতে হয়। যদিও আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা জনগণের উপরই ন্যস্ত। তবুও কান্টের মতে শাসকও আইন প্রনয়নকারীর ভূমিকা পালন

www.pathagar.com

করতে পারে। কিন্তু শাসক যদি সংবিধান লংঘন করে, তবে তার উপর আর কোন নিয়ন্ত্রন থাকে না।

সম্পদ ঃ কান্ট সম্পত্তির উপর মানুষের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করেছেন। তবে এ ব্যাপারে তিনি চরম কোন নীতির সমর্থক ছিলেন না। মানুষের ইচ্ছার স্ফুরণের জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রয়োজন রয়েছে। তাই বলে ব্যক্তি–মানুষ সকল জায়গায় সকল জিনিসের মালিক হতে পারবে, এ নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। কোন মানুষ কিছুতেই তার প্রতিবেশীর স্বার্থ অবজ্ঞা করতে পারে না। ব্যক্তি মালিকানা হচ্ছে একটি আরোপিত অধিকার, এটি কোন প্রাকৃতিক অধিকার নয়। ব্যক্তি মালিকানার ব্যাপারটি কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়; বরং একজনের এ অধিকারটি অন্যদের একই অধিকারের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত।

শাস্তি ঃ কান্ট শাস্তিকে শুধু শাস্তির জন্যই ব্যবহার করার পক্ষপাতী। শাস্তির ভয়ে অপরাধ প্রবণ মন আগে থেকেই ভীত ছিল কিনা, এটি কোন মুখ্য ব্যপার নয়। রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করলেই সুবিচারের স্বার্থে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। শাস্তি লাভের পর অপরাধী বা সীমা লংঘন কারী সংশোধিত হলো কিনা তা গৌন ব্যাপার। কাজেই দেখা যাচ্ছে, কান্ট শাস্তির সংশোধন (Reformative) বা প্রতিরোধ (deterrent) মূলক কোন তত্ত্বেই বিশ্বাসী ছিলেন না। শাস্তিকে কর্মের ফল হিসেবে দেখেছেন।

অধিকার ও কর্তব্য ঃ কান্ট ব্যক্তি–মানুষের অধিকার ও কর্তব্যের ব্যাপারে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি অধিকারকে নৈতিক স্বাধীনতার সমতুল্য করে ভেবেছেন। অন্যের ক্ষতি না করে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারাই হচ্ছে অধিকারের সার্থকতা। কিন্তু প্রতিটি অধিকারের পেছনেই রয়েছে একটি দায়িত্ব। এ দায়িত্ব কখনও তার নিজের প্রতি, কখনও বা অন্যের বা রাষ্ট্রের প্রতি। এ বিবেচনায় প্রতিটি অধিকারের পেছনে ও রয়েছে বিশেষ দায়িত্বানুভুতি।

কান্ট অধিকারের চেয়ে মানুষের দায়িত্বানুভূতির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দায়িত্বানুভূতিকে তিনি অধিকারের মত আরোপিত না ভেবে মানুষের আভ্যন্তরীন সচেতনতার সাথে সংযুক্ত করেছেন। দায়িত্বানুভূতিকে অনেকটা স্বেচ্ছায় নিজের উপর কর্তব্য বলে কান্ট চিহ্নিত করেছেন। দায়িত্বানুভূতি তার বিবেচনায় সুনির্দিষ্ট কোন ব্যাপার নয়, বরং এটি একটি সাধারণ আলিখিত ধারনার মত। এটি অধিকভাবে পালিত হবে কিনা, তা নির্ভর করবে সমাজের মানুষের সঠিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার উপর।

সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঃ কান্টের মতে সভ্যতা কোন কৃত্রিম ব্যাপার নয়। এটি একটি প্রাকৃতিক অবস্থার মত। তবে বহুলাংশেই সচেতনভাবে বেড়ে উঠা ব্যবস্থা। সভ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে সমাজের সর্বত্র। অন্যদিকে সংস্কৃতি মানুষের ইচ্ছাধীন সৃষ্টি, যার প্রভাব সমাজের অভ্যন্তরে গ্রথিত। সাংস্কৃতিক প্রভাব মানুষের মনোজগতেই বেশী প্রতিফলিত হয়। সংস্কৃতিমনা হওয়ার জন্য মানুষকে কোন সমাজের অংশ হয়ে বহুদিন ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে সাধনা করতে হয়। আন্তরিক

www.pathagar.com

চেষ্টা ও সাধনার মানোভাব ছাড়া সংস্কৃতিমনা হওয়া প্রায় অসম্ভব। এ কাজটিতে ব্যক্তি–মানুষকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয়। অধিকাংশ মানুষ সাংস্কৃতিমান হলেই শুধু একটি সভ্যতার গোড়াপত্তন ও লালন–পালন সম্ভব।

কান্টের রাষ্ট্র–দর্শনের সমালোচনা ঃ কান্টের দর্শনের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ হচ্ছে, এর অলীকতা এবং ত্রুটিকে গবেষনালব্ধ জ্ঞানের নিয়ম–মাফিক ব্যবহারের অসুবিধা। কান্টের সমালোচকগণ তার স্বাধীনতা, অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত মতামতকে বহুলাংশে বাস্তবতা বিবর্জিত বলে অভিহিত করেন। অনেকে কান্ট–এর আদর্শবাদীতাকে প্রতিষ্ঠিত শোষন ও তোষনমূলক প্রশাসন যন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণে সহায়ক বলে মনে করেন। কান্ট সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বিপক্ষে ছিলেন বিধায় তার মতবাদ রাষ্টের উন্নতি ও প্রগতির বিরুদ্ধাচরণর দায়ে অভিযুক্ত। কান্টের সমালোচকরা মনে করেন স্বাধীনতার ব্যাপারে কান্ট মন স্থির করতে পারেননি, কোন ধরণের স্বাধীনতার পক্ষে তিনি কথা বলবেন। রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও প্রকৃতির ব্যাপারেও তার মতামত স্পষ্ট নয়। তার মতাদর্শ বিশ্লেষন করলে মনে হয় তিনি কখনও ব্যক্তিস্বতন্ত্রবাদী , আবার কখনও আদর্শবাদী।

কান্টের মতাদর্শ জটিল হওয়ার কারণে তা শুধু কিছু বুদ্ধিজীবির মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল ও আছে। সাধারণ গণমানুষ পর্যন্ত তাঁর মতামত পৌঁছায় নি। সাধারণ মানুষের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য তার নিকট কোন সূত্রের সন্ধান লাভও সম্ভব হয়নি। তবে সকলের দায়িত্বানূভূতি বৃদ্ধি করার এবং মানুষকে অধিকতর সংস্কৃতমনা ও সভ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তার প্রয়াসকে সকলে প্রশংসা করেছেন। কিন্তু ঐ অবস্থা কীভাবে অর্জণ করা যাবে, এ ব্যাপারে কান্ট কোন বাস্তবসম্মত প্রক্রিয়া পেশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তবে তার যুদ্ধ নয়, শান্তি নীতি এবং রাজ্য জয় নয়, সংঘ সৃষ্টির ধারণা আজও পৃথিবীব্যাপী সমাদৃত। তিনিই মূলত আধুনিক সার্বজনীন একটি সংঘ গড়ার প্রথম শক্তিশালী প্রবক্তা।

www.pathagar.com

উইলহেম ফ্রেডরিক হেগেল (১৭৭০–১৮৩১)

Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)

কান্টের মত হেগেল দরিদ্র পবিরের ছেলে ছিলেন না। হেগেল ছিলেন সরকারী কর্মকর্তার ছেলে। ছোট বেলা থেকেই লেখাপড়া করার প্রচুর সুযোগ ছিল তাঁর । তিনি রুশোর সকল গ্রন্থ পড়েন মনোযোগ সহকারে। খ্রীষ্টান ধর্ম সম্পর্কেও তাঁর ছিল অগাধ জ্ঞান। তিনি ফরাসী বিপ্লবকে "A glorious mental down" (একটি গৌরবোজ্জল আত্মিক সকাল) হিসেবে আখ্যায়িত করেন। আবার খৃষ্ট ধর্মকে তিনি একটি নৈতিক ভুল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি Heidelberg ও Berlin বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এ সময়ে তিনি জ্ঞানের প্রকৃতি, সৃষ্টিকর্তা, বিশ্বজগৎ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল কীভাবে সবকিছুকে তার নিজের অবস্থানে রেখে জানা যায় এবং যুক্তিসংগতভাবে এ সব জ্ঞানের ব্যাখ্যা দেয়া যায়। তার মাতদর্শ সম্পর্কে কে কি ভাবল সে ব্যাপারে তিনি মোটেই মনোযোগী ছিলেন না। এদিক থেকে হেগেলকে আধুনিক দুনিয়ার সবচাইতে আত্মপ্রত্যয়ী দার্শনিক বলা যায়।

হেগেল সমস্ত বিশ্বজগতের জন্য যুক্তিনির্ভর সংবিধান সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। জ্ঞান আহরণের এ উচ্চভিলাসের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে অনেকেই বলেছেন হেগেলের যুক্তির কাছে ঈশ্বরও কোন কিছু গোপন করতে পারেন নি। হেগেলের দার্শনিক মতবাদের সন্ধান মিলে তার নিম্নলিখিত কর্মসমূহে ঃ

1. The Phenomenology of spirit(1807) (আত্মার ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য বস্তু তত্ত্ব)

2. Logic (যুক্তি)

3. The Philosophy of Right. (সত্য দর্শন)

4. Philosophy of History. (ইতিহাস দর্শন)

রাষ্ট্র ও রাজনীতি সম্পর্কিত হেগেলের মতাদর্শের বেশীর ভাগই রয়েছে "আত্মার ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য বস্তু সম্মন্ধীয় তত্ত্ব" গ্রন্থে। তিনি সঠিক উপলব্ধির জন্য সচেতনতার ছয়টি দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলেছেন। এগুলো হচ্ছেঃ স্বাভাবিক সচেতনতা, আত্ম–সচেনতা, যুক্তি, আত্মিক উপলব্ধি, ধর্ম ও পরিপূর্ণ জ্ঞান।

স্বাভাবিক সচেতনতা দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও প্রমাণ সাপেক্ষ বাস্তবতার পরিমাপ করা যায়। আত্ম–সচেতনতার সাহায্যে শুধুমাত্র বাহ্যিক দুনিয়ার বাস্তবতা জানা যায়। যুক্তি সচেতনতা ও আত্ম – সচেতনতা জ্ঞানকে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে। বিভ্রান্তি ছাড়াও যুক্তির সাহায্যে আহরিত

www.pathagar.com

জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বাহ্যিক ও প্রকাশ্য দুনিয়ার বাইরে যুক্তি প্রবেশ করতে অক্ষম। হেগেলের মতে শুধু আত্মার সাহায্যে সঠিক বাস্তবতার সত্য ও নির্ভূল জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। আত্মার সাহায্যে ও ধর্মের মাধ্যমে মানুষ পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারে। আত্মা যে সত্য উৎঘাটিত করে, তা অবশ্যই নৈতিক, আর নৈতিক অবস্থানই ধার্মিকতা। হেগেলের লেখনীতে আত্মা, নৈতিকতা, ধর্ম ও পরিপূর্ণতা এক জটিল সম্পর্কে আবদ্ধ।

Dialectic of Hegel:

(হেগেলের যুক্তিসিদ্ধ তর্কশাস্ত্রীয় প্রেক্ষিত)

হেগেলের মতে মানব সভ্যতার উন্নতি কখনই সোজা পথ অনুসরণ করেনি। মানব সভ্যতার ইতিহাসের গতিপথ বড়ই আঁকা-বাঁকা, যেন " A ship tacking against an unfavourable wind" (একটি জাহাজের যেন প্রতিকূল বাতাসের বিপরীতে পাল তোলা অবস্থা।) দর্শন শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ই হচ্ছে অবস্থা, প্রকৃতি ও বিশ্বজগতের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে উপলব্ধিতে এনে তার সর্বাঙ্গীণ যুক্তি সংগত ব্যাখ্যা প্রদান। পৃথিবী কোন স্থির বস্তু নয়। এটি অবশ্যই সর্বদা চলমান বা গতিশীল। তাই সত্য ধারণা সদাই সক্রিয় ও গতিশীল এবং সংস্কার সাধণের পক্ষপাতী। ক্রমবিকাশ অর্থই হচ্ছে কোন অনুন্নত ও একক জিনিসের উন্নতি, ভাঙ্গণ ও উর্ধ্ব গমণ, আর এ প্রক্রিয়ায় তার পরস্পর বিরোধী রূপ ধারণ। তারপর আবার নতুন অবস্থায় পরস্পর মিলন এবং এভাবেই ভিন্নতার মাঝে ঐক্যতান। ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়ায় উচ্চতর অবস্থাই হচ্ছে নিম্নতর অরস্থার পরিবর্তিত ও প্রকাশ্য রূপ। কিন্তু উচ্চতর পর্যায়ে পৌছেই সে নিম্নতর অবস্থাকে অস্বীকার করে। জিনিসটি আর পূর্বের মত থাকে না। নতুন উচ্চতর অবস্থাতেই এটি সংরক্ষিত হয়। মূলতঃ পুরাতন জিনিসটিই নতুন রূপে মহৎ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। ক্রমবিকাশের এ ধারাকেই হেগেল diacetic (যুক্তি সিদ্ধ তর্কশাস্ত্রীয় প্রেক্ষিত) নামে আখ্যায়িত করেছেন।

ডায়ালেকটিক কথাটি Sophists সহ অন্যান্য গ্রীক দার্শনিকরা ব্যবহার করেছেন। তারা এটিকে সত্য আবিষ্কার বা জানা সত্য প্রদর্শনের কোন পদ্ধতি হিসেবে ব্যাখ্যা করেন নি। এ কথাটির সার কথা ছিল, কোন বিতর্কিত পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ, যার মূল উদ্দশ্য ছিল, বক্তার কথাকেই তর মূল বক্তব্যের বিপরীতে দাঁড় করানো। এভাবে ডায়ালেকটিক ব্যবহৃত হতো আদালতে, সভাকক্ষে বা দর্শন শাস্ত্রীয় আলাপ আলোচনায়। এটি মূলত দ্ব্যর্থবোধক ও ভাষাসংক্রান্ত বিষয়াদির উপরই সীমাবদ্ধ থাকতো। তবে ডায়ালেকটিক প্রক্রিয়ার মাধ্যেমে চিন্তাকে বিন্যস্ত করে কোন জিনিসকে সংগঠিত করা বা যুক্তি নির্ভর কোন পদ্ধতির আবিষ্কার ঘটানো হয়েছে গ্রীসেই।

হেগেল কিন্তু ডায়ালেকটিক দিয়ে শুধুমাত্র যুক্তি নির্ভর কোন ধ্যান-ধারণার জন্মের প্রক্রিয়াকে বুঝাতে চান নি। তার মতে দুনিয়ার সকল ধ্যান-ধারণার উদ্ভব ঘটেছে এ প্রক্রিয়ায়। হেগেল বিশ্বাস করেন যে, ইতিহাসের ক্রম বিকাশের ধারা নিরবচ্ছিন্ন ও যুক্তি নির্ভর ভাবে ঘটে থাকে। ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ের নিজস্ব চরিত্র রয়েছে। এ চরিত্র তার শিল্পকলা, ধর্ম ও দর্শনে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। হেগেল সব বাস্তবকেই যুক্তি সংগত এবং সব যুক্তি সংগত ব্যাপারকেই

www.pathagar.com

বাস্তব বলে ধরে নিয়েছেন। তবে তিনি স্বীকার করেছেন মানব ইতিহাসের ক্রমবিকাশের ধারায় ব্যহ্যতঃ বেশ কিছু বিভ্রান্তির সন্ধান মিলে এবং এর সমাধান তাঁর মতে একমাত্র ডায়েলেকটিকই দিতে পারে।

প্রকৃতি জগতের সর্বত্রই বৈপরীত্য ও বিরোধিতা বিরাজমান। কিন্তু গ্রীক দার্শনিকরা প্রকৃতির সর্বত্রই অবলোকন করেছেন শুধু সামঞ্জস্য। হেগেল পরস্পর বিরোধী শক্তিকে ইতিহাসের চলমান ধারার জন্য একটি নিয়ামক বলে মনে করেন। ইতিহাসের চাকা ঘোরানোর জন্য এবং এর গতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য প্রয়োজন রয়েছে বিপরীতমুখী সংঘর্ষশীল শক্তির।

সমগ্র সৌরজগৎ ও আমাদের অভিজ্ঞতার পৃথিবী সর্বদাই প্রবাহমান। এ গতিধারা অব্যাহতভাবে অগ্রসর হচ্ছে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। ক্রমবিকাশের এ ধারার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। ক্রমবিকাশের এ প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট যুক্তিসংগত নিয়মাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। ইতিহাসে আমরা যে উত্থান-পতন দেখছি ক্রমবিকাশের যে আবহমান গতিধারা প্রত্যক্ষ করছি, তা কিন্তু আদৌ কোন অযৌক্তিক ও অর্থহীন ঘটনা প্রবাহ নয়, বরং প্রতিটি ঘটনা প্রবাহে নিহিত রয়েছে একটি সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা।

হেগেল ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়ায় অন্তর্নিহিত যুক্তিসংগত ধারার সাথেই ডায়েলিকটিক পদ্ধতি সম্পৃক্ত করেই এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এটি তাঁর thesis (অস্তি) antithesis (নাস্তি) ও synthesis (সংশ্লেষ) প্রক্রিয়া।

প্রথমে তিনি সার্বজনীন কোন অলীক ধারণাকে নাম দিয়েছেন thesis. এরূপ কোন ধারণা অবশ্যই জন্ম দেবে বিপরীতমুখী অন্য একটি ধারণার। যারে নাম হবে antithesis. পরস্পরবিরোধী দুটি ধারণা আপোষরফায় পৌছে জন্ম দেয় একটি synthesis. কোন প্রাণীর জন্ম-সূত্রের ক্রম বিকাশ এ ধারার পক্ষের যুক্তিকে জোরালো করে। একটি ডিমের বাচ্চায় রূপান্তরিত হওয়ায় লুকায়িত জীবণী শক্তি যদি হয় thesis তাহলে ডিমের ভিতরকার পদার্থ নিঃশেষ হয়ে যাওয়াকে ধরা যায় antithesis. বাচ্চা সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় ডিমের নিঃশেষিত হয়ে যাওয়া কিন্তু নিছক কোন ক্ষয় বা লয় নয়। বরং সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টির আলামত, আর ডিম থেকে যে বাচ্চাটি বেরিয়ে আসল তা-ই-হচ্ছে synthesis.

জীব বিজ্ঞানের এ প্রক্রিয়ার কার্যকরীতা হেগেল সমাজ বিজ্ঞানের নিয়মাবলীতে একই রূপে দেখতে চেয়েছেন। যদিও জীববিজ্ঞানের নিয়মাবলী একইভাবে সমাজবিজ্ঞানে পাওয়া দুষ্কর, তবুও হেগেলের দৃষ্টিতে " Despotism" যদি thesis হয় তবে democracy কে ধরা যায় antithesis" আর সেক্ষেত্রে constitutional Monarchy হয়ে দাঁড়ায় synthesis অন্যভাবে যদি কল্পনা করা যায় তাহলে পরিবারকে thesis ধরলে, বুর্জোয়া শ্রেণী antithesis হয়, আর রাষ্ট্র নিজেই দাঁড়ায় synthesis.

হেগেলের এ দৃষ্টিতে সর্বত্রই রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় ঠিক এ নির্দেশিত প্রক্রিয়ায়। অর্থাৎ ইতিহাসের দা

www.pathagar.com

মিটানোর জন্যই প্রতিটি রাষ্ট্রের উদ্ভব। তাঁর মতাদর্শনুসারে বাংলাদেশের সৃষ্টিও মূলত ইতিহাসের অমোঘ বিধান। বাঙালী জাতির একটি অংশ নিজেদের ইচ্ছায় নিজের জন্য একটি পৃথক সার্বভৌম আবাসস্থাল সৃষ্টি করেছে, এমন কথা হেগেলীর শাস্ত্র বিশ্বাস করে না। হেগেলীয় যুক্তিমতে বৃটিশ-ভারত thesis, ১৯৪৭ সালে সৃষ্ট পাকিস্তান antithesis. আর বাংলাদেশ হচ্ছে synthesis, ঠিক একইভাবে জার সাম্রাজ্য হচ্ছে thesis, বলশেভিক রাশিয়া হচ্ছে antithesis, আর গর্ভাচেব উত্তর রাশিয়া হচ্ছে synthesis.

এ ধরণের যুক্তি যতই আপাতগ্রাহ্য ও যুক্তিসংগত মনে হোক না কেন, প্রতিটি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ও সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তনে এ ধরণের যুক্তির প্রয়োগ সম্ভব নয়। তাই ইতিহাসের ক্রমবিকাশের ধারায় ডায়েলেকটিক পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রেই অকেজো বা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। কিন্তু হেগেল তার উদ্ভাবিত পদ্ধতিটিকে অধিকতর রূপক ও বৃহত্তর আঙ্গিকে ব্যবহার করে বলেছেন, যে কোন কর্মই-thesis, আর যে কোন ধর্মই হচ্ছে antithesis আর তার দর্শন শাস্ত্রই হচ্ছে synthesis. Art ও religion এ দু'টি কীভাবে thesis ও antithesis হলো এ নিয়ে অনেকেই আপত্তি তুলেছেন। কিন্তু হেগেল এ দু'টি ধারণাকে নিছক প্রচলিত অর্থে ব্যবহার না করে বরং আরো ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। দার্শনিকভাবে দেখতে গেলে সকল কাজই মানুষের সৃজনশীলতার ফসল, আর ধর্ম মানেই স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টিকর্তার বিধান। কাজেই একটি অপরটির antithesis হতে আপত্তি কোথায়?

হেগেল যদি তার ডায়েলেকটিক পদ্ধতিটিকে শুধুমাত্র বর্ণনা শৈলী বা কৌশল হিসেবে ব্যবহার করতেন তবে হয়ত তার এ পদ্ধতির ব্যাপারে কমই আপত্তি উঠত। কিন্তু তিনি এটিকে logical law (যুক্তিসংগত আইন) বলে আখ্যয়িত করায় অনেকেই এর বাস্তব প্রায়োগিক যোগ্যতাকে অস্বীকার করেছেন।

ইতিহাস সম্পর্কে হেগেলঃ হেগেল ইতিহাসকে মানুষের আত্মার তীর্থযাত্রা হিসেবে চিত্রিত করেছেন। মানুষের আত্মা নিজের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়। মানুষের এ ভ্রমন আবার এলোপাতাড়ি নয়; বরং যুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানুষই ইতিহাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আর মানব সভ্যতার ইতিহাসে ন্যায় নীতি ও সুবিচারই মুখ্য। সুবিচার মানেই এক পক্ষের জয় আর অন্য পক্ষের পরাজয়। হেগেলের মতে সত্যই শুধু বিজয়ী হয়। আর তাই বিজয়ই হচ্ছে সুবিচারের প্রমাণ। মানব সভ্যতা ও স্বাধীনতার ইতিহাসকে তিনি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেনঃ প্রাচ্য, গ্রীক, রোমান ও জার্মান। স্বাভাবতঃই তিনি জার্মান সভ্যতা ও স্বাধীনতাকে সবার উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে সভ্যতা জার্মানীতে এসে তার পরিপক্ক রূপ লাভ করেছে।

ইতিহাসকেই হেগেল সঠিক বিচারক বলেছেন। তাঁর মতে মানুষ ইতিহাস তৈরী বা নিয়ন্ত্রন করতে পারে না। মানুষ ইতিহাসের অমোঘ বিচারের যৎসামান্যই বুঝতে পারে। ইতিহাস সবচাইতে জ্ঞানী ব্যক্তির চেয়েও অনেক বেশী বুদ্ধিমত্তার সাথে চলে। মানুষ কোন সামাজিক

www.pathagar.com

প্রক্রিয়া বা রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থার অর্ন্তনিহিত যুক্তি বুঝে তখন, যখন সে প্রাক্রয়া বা ব্যবস্থা হয় মৃত বা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জ লড়ে। হেগেলের এ দৃষ্টিতে কম্যুনিজম বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা সাধারণভাবে মানুষ বুঝতে পেরেছে তখন, যখন এটি আধুনিক কোন অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক পদ্ধতি হিসেবে তার আবেদন হারিয়ে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। হেগেলের দৃষ্টিতে ইতিহাস জ্ঞানীকে পথ দেখায়, আর মুর্খকে প্রত্যাখান করে।

হেগেলের মতে ইতিহাস মানে কোন পরিবর্তন নয় বা মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোন ঘটনা প্রবাহ নয়। ইতিহাস হচ্ছে সমাজের অর্ন্তনিহিত শক্তিসমূহের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার জের, সে কারণেই মানুষের সার্বিক আত্মিক অবস্থার সাথে হেগেল ইতিহাসের ক্রমবিকাশের ধারাকে তাঁর ডায়েলিকটিক পদ্ধতির সাহায্যে এত নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছেন।

মানুষের ইচ্ছা শক্তি সম্পর্কে হেগেলঃ হেগেলের মতে মানুষের ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন। এটি আত্মার বিশেষ অলীক গুণ ও অবস্থান। ইচ্ছাশক্তি শ্বাশত, সার্বজনীন, আত্মসচেতন এবং স্ব-নিয়ন্ত্রিত। ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা ও সার্বজনীনতা বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশিত হয়। আইন ও নৈতিকতার মাঝেই এর প্রথম আত্মপ্রকাশ। রাষ্ট্রে অবস্থিত সকল সংঘ ও প্রভাব বলয়, যা রাষ্ট্রকে ন্যায় পরায়ন হতে সাহায্য করে, তাতেও রয়েছে ইচ্ছাশক্তির বহিঃপ্রকাশ। আইন যেহেতু ব্যক্তিত্ব, সম্পদের ব্যবহার ও চুক্তিসহ বহু কিছুর কাঠামো নির্ধারণ করে, তাই আইনেও মানুষের ইচ্ছাশক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। নৈতিকতায় রয়েছে ইচ্ছাশক্তির আরো গভীরতর প্রভাব।

পরিবার গঠণেও আমরা মানুষের ইচ্ছাশক্তির বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই। পরিবার গঠনের প্রথমে হয় মনোজগতে। এর পেছনে রয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক ইচ্ছার প্রতিফলন। হেগেলের মতে পরিবার কোন চুক্তি বা আবেগের ফসলমাত্র নয়। এটি হচ্ছে নৈতিক ও সামাজিক একক এবং রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান। এক স্বামীর সাথে এক স্ত্রীর স্থায়ী বসবাসই হেগেলের মতে সভ্যতা ও উচ্চতর রাষ্ট্র বাবস্থার পরিচায়ক।

রাষ্ট্র সম্পর্কে হেগেলঃ হেগেলের মতে " State is a mareh of God upon the earth" (মাটির ধারায় ঈশ্বরের পথযাত্রাই হচ্ছে রাষ্ট্রে), হেগেল যেহেতু রাষ্ট্রের একটি ঐশ্বরিক রূপ দিতে চেয়েছেন, তাই ব্যক্তি-মানুষকে সদা রাষ্ট্রের অনুগত থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন। রাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মধ্যেই ব্যক্তি-মানুষের কৃতিত্ব। রাষ্ট্র থেকে আলাদা হলে ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ব্যক্তির কোন অধিকার নেই রাষ্ট্রদ্রোহী হওয়ার। মূলতঃ হেগেল রাষ্ট্রকে এমনভাবে দেখেছেন যেন সমাজ ও রাষ্ট্র একই জিনিস। তাই তাঁর মতে রাষ্ট্রের অনুমতির বাইরে মানুষ কোন অধিকার ভোগ করতে পারে না। আর রাষ্ট্রকে চিত্রায়িত করেছেন মানুষের স্বাধীনতা, নৈতিকতা ও ব্যক্তিত্বের আধার হিসেবে। পরিবারকে থিসিস ধরেই তার রাষ্ট্রীয় ধারণার জন্ম।

মানুষ পরিবারের ভিতরে সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইচ্ছা ও অভিলাষ পূরণ করতে সক্ষম নয়। তার অর্থলিপ্সা ও শক্তিশালী হওয়ার ইচ্ছা তাকে ধনিক ও বনিকে রূপান্তরিত করে। তাই

www.pathagar.com

বুর্জোয়া সমাজই হচ্ছে তার ভাষায় পরিবারের antithesis. ধনিক-বনিকরা স্বভাবতই স্বার্থপর হয়। তাদের মাঝে ক্ষমতা ও অর্থ লাভের প্রতিযোগিতা তাদেরকে সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত রাখে। এ প্রতিযোগিতা নিয়ম-কানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন পড়ে। কাজেই আইন, পুলিশ ও বিচার বিভাগ গড়ে উঠে। ফলে রাষ্ট্রের জন্ম অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। অর্থাৎ রাষ্ট্রই হচ্ছে হেগেলের synthesis.

হেগেল রাষ্ট্রের উৎপত্তির পেছনে সৃষ্টিকর্তা, ইতিহাসের অমোঘ বিধান, আত্মার চাওয়া-পাওয়া, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইচ্ছা অভিলাষের ব্যাপারগুলো এমনভাবে যুক্ত করেছেন যে, রাষ্টের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ না করে তার উপায় ছিল না। রাষ্ট্রকে তিনি মানুষের স্বাধীনতা ও যুক্তি বুদ্ধির চূড়ান্ত অভিব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। রাষ্ট্র তার দৃষ্টিতে সঠিক ও সার্বজনীন ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটায়। তাই রাষ্ট্র ভুল করতে পারে না। ব্যক্তিই ভুল করে। ব্যক্তির উচিত রাষ্ট্রের কাজে এমন ভাবে আত্মনিয়োগ করা, যাতে রাষ্ট্র শক্তিশালী হতে পারে। এ দৃষ্টিতে তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদীদের বিপক্ষে তার যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। রাষ্ট্র ও ব্যক্তি-মানুষকে তিনি একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছেন, যে বন্ধনে মানুষ খুশী হবে, স্বাধীনতা ভোগ করবে, ইচ্ছা শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে। কিন্তু নাগরিকের কোন কাজই রাষ্ট্র বিরোধী হবে না।

সংবিধান সম্পর্কে হেগেলঃ হেগেলের মতে রাষ্ট্র সংবিধানের মাধ্যমে আত্ম-পরিচয় লাভ করে। অর্থাৎ সংবিধানই হচ্ছে রাষ্ট্রের পাসপোর্ট ও তার ক্ষমতার সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি। তার মতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রধান তিনটি বিভাগ হচ্ছেঃ আইন প্রনয়ন সম্বন্ধীয়, প্রশাসন সম্পর্কিত ও রাজতন্ত্রীয়। এর মধ্যে হেগেল রাজতান্ত্রিক ক্ষমতাকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। কারণ তাঁর মতে এ ক্ষমতার সাহায্যেই রাষ্ট্রের সংহতি রক্ষা করা যায়। রাজতান্ত্রিক ক্ষমতার মাধ্যমেই আইন প্রনয়ন ও নির্বাহী বিভাগ এ দু'টিকে রাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। হেগেলের বিশ্বাস ছিল সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের মাধ্যমেই শুধু পরিপর্ণ যুক্তি-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো সম্ভব। তিনি মনে করতেন যে, সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের মাধ্যমে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের গুনাবলীর সমন্বয় সাধন সম্ভব। অর্থাৎ সাংবিধানিক রাজতন্ত্র উল্লেখিত তিনটি ব্যবস্থার প্রধান দোষাবলী থেকে মুক্ত হয়ে আইন প্রনয়ন ও তার প্রয়োগ করতে সমর্থ হবে। সাংবিধানিক রাজতন্ত্রে ক্ষমতার কেন্দ্রে রাজা থাকলেও নির্বাহী ক্ষমতা আরো অনেক লোকের উপর ন্যস্ত থাকবে। এবং আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে আরো বেশী লোক জড়িত থাকবে।

রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব কারো একার উপর ন্যস্ত থাকবে না। বরং দার্শনিক দৃষ্টিতে প্রতিটি মানুষ নিজেই শুধু এরূপ ক্ষমতার মালিক। বাস্তব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাও কতিপয় লোকের উপরই ন্যস্ত থাকে। কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে কোন রাষ্ট্রের সকল জনগন একত্রে সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ করতে পারে না। কাজেই চূড়ান্ত বিবেচনায় যে কেউ একজনই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হয়ে পড়ে। কাজেই হেগেল রাজাকেই সার্বভৌম ক্ষমতার কর্তৃত্বের ধারক হিসেবে ধরে নিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে মূলতঃ প্রত্যেক রাষ্ট্রেই এ ধরণের নীতি কার্যকর রয়েছে। কিন্তু তিনি

www.pathagar.com

আইন প্রণয়ণের সময় রাষ্ট্রের সকল জনগণ ও শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষামূলক ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। তার সাংবিধানিক রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন শুধু সাধারণ নীতিমালা নির্ধারণ করে। আর নির্বাহী ক্ষমতার সাহায্যে ঐ সমস্ত নীতিমালার প্রয়োগ ঘটানো হয় বাস্তব সমস্যার সমাধান কল্পে। রাজা শুধু হস্তক্ষেপ করে তখনই, যখন ঐসব নীতিমালা লংঘিত হওয়ার মত ঘটনা ঘটে। তাই হেগেলের দৃষ্টিতে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র স্বাধীনতার পক্ষে কোন বাঁধাতো নয়ই বরং এ ব্যবস্থাই স্বাধীনতার উত্তম রক্ষক। তাঁর যুগে এরূপ ভাবনার বিকল্প তেমন একটা জোরদার ছিল না।

স্বাধীনতা সম্পর্কে হেগেলঃ হেগেলের মতে স্বাধীনতাই মানুষের মর্মবানী। এ গুণ মানুষকে অন্য সব কিছু থেকে আলাদা করে। কিন্তু ব্যক্তি একাকী স্বাধীন থাকতে পারে না। তার স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় রক্ষা কবচ হতে পারে জাতি-রাষ্ট্র। হেগেল মূলত স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে জার্মান জাতি ও তাদের রাষ্ট্রের প্রতি বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জার্মান রাষ্ট্রের জন্য ভাল জার্মান নাগরিক সৃষ্টির ইচ্ছাই হয়ত হেগেলকে এ ব্যাপারে বেশী অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকবে। সে কারণেই তিনি নাগরিকদের কাছে রাষ্ট্রের জন্য নিঃশর্ত আনুগত্যের দাবী করেছেন এবং এর ভিতর দিয়েই সকলের স্বাধীনতা সংগত ও নিশ্চিত করার পক্ষে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। জার্মানীকে তিনি একটি অখন্ড ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চেয়েছেন এবং এ ব্যাপারে ফরাসী বিপ্লবের শিক্ষাকেও বাস্তবে কাজে লাগাতে চেয়েছেন।

যুদ্ধ সম্পর্কে হেগেলঃ জাতি-রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিই হচ্ছে টিকে থাকার সংগ্রামে সদা সতর্কাবস্থা। তার মতে প্রতিটি জাতি রাষ্ট্রই ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যে নিবেদিত। কোন রাষ্ট্রই এককভাবে পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে না। অন্যদিকে তার মতে একই সময়ে একাধিক জাতি ঈশ্বরের ইচ্ছার পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটাতে পারে না। ইতিহাসের নির্দ্দিষ্ট অধ্যায়ে একটি মাত্র জাতিই ঈশ্বরের অভিলাষ পূর্ণ করে থাকে। ঐ জাতির ব্যর্থতার পর স্বর্গীয় দায়িত্বটি বর্তায় অন্য জাতির উপর। সে কারণেই যুদ্ধ বিগ্রহকে তিনি "Irony of the divine will" (স্বর্গীয় ইচ্ছার পরাকাষ্টা) হিসেবে তেমন একটি দোষের কিছু ভাবেন নি; বরং যুদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্রকে দূর্নীতি ও ব্যক্তির বল্গাহীন ধনলিপ্সু ও যশলিপ্সা থেকে মুক্ত করে বলে অভিমত পেশ করেন। কাজেই যুদ্ধ পরিপূর্ণভাবে দোষের কিছু নয়; বরং একটি প্রয়োজনীয় সমাধান। দীর্ঘ সময় ধরে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ না হলে সমাজ দুর্নীতিতে ভরে যায়। তাছাড়া বড় ধরণের জেগে উঠা অশুভ শক্তির মোকাবিলায় যুদ্ধের কোন বিকল্প হেগেল খুঁজে পান নি। তাই তার মতে সভ্য মানুষের ইতিহাস বির্নিমানে যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

দু'টি বিবাদমান পক্ষ যখন যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন কে কার উপর বিজয়ী হবে তা নির্ধারিত হয় world Spirit (বিশ্ব-আত্মা) দ্বারা। বিশ্ব আত্মা দিয়ে হেগেল সৃষ্টিকর্তা বা বিধির বিধানের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যুদ্ধের বিজয়ী পক্ষই world Spirit এর পক্ষ ধরে নিতে হবে। তা না হলে তার পক্ষে জয় লাভ করাই সম্ভব হতো না। কিন্তু বিজয়ী রাষ্ট্রটির তার ভবিষ্যত সম্পর্কে সচেতন না থাকাই স্বাভাবিক। জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানের প্রচ্ছন্ন ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ এখানে আমরা

www.pathagar.com

দেখতে পাই হেগেলীয় চিন্তাধারায়। যুদ্ধের মাধ্যমে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জার্মানরা প্রমাণ করতে পারলে হয়ত তারা দাবী করতে পারত যে তারাই world Spirt এর পক্ষে। হিটলারও হয়ত সে সুযোগ নিত। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হওয়াতে জার্মানরা সে সুযোগ থেকে শুধু বঞ্চিতই হয় নি; বরং হেগেলের যুক্তি অনুসারে জার্মানরাই ছিল world Spirt এর বিপক্ষে। যুদ্ধকে এতখানি নির্দোষ হয়ত গত শতব্দীতে ভাবা যেতে, কিন্তু বর্তমানে তেমনটি ভাবার উপায় নেই।

হেগেলে দর্শনের সমালোচনাঃ হেগেলের রাষ্ট্র দর্শন ব্যাপকভাবে যেমন বুদ্ধিজীবিদের আলোড়িত করেছিল, তেমনি তাঁর মতাদর্শ কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয় বিভিন্ন সময়ে। তার দর্শনের যে সব সমালোচনা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত সার এরূপঃ

১। হেগেল রাষ্ট্র ও সমাজের মাঝে পার্থক্য নির্ধারণ করেন নি। অথচ সমাজ ও রাষ্ট্রের মাঝে পার্থক্য অতি স্পষ্ট। রাষ্ট্রকে সর্বগ্রাসী করে একে একক সমাজে রূপান্তরিত করার কুফল অনেক। তাহলে ব্যক্তি তার সকল স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলবে। ফলে রাষ্ট্র-যন্ত্র অতি সহজেই স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরাচারী রূপ পরিগ্রহ করতে পারে।

২। হেগেল ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদীদের মোকাবিলায় এক চরম সর্বকর্তৃত্ববাদী বা সার্বাত্মকধর্মী (totalitarian) সরকার যন্ত্র সৃষ্টির পক্ষে জোর মত ব্যক্ত করেন। রাষ্ট্র সৃষ্টি পিছনে সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ রয়েছে এবং এটিকে আত্মার অভিব্যক্তি রূপে চিহ্নিত করতে গিয়ে রাষ্ট্রকে তিনি সকল ভুলের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন এবং রাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু দাবী করা বা বলাকে অনেকটা খোদাদ্রোহীতার সমতুল্য করে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের বেদী-মূলে আত্মাহুতি দিতে হবে চরমভাবে হেগেলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায়। ব্যক্তিকে শুধু রাষ্ট্রর প্রতি তার সকল দায়িত্ব পালন করলেই চলবে। রাষ্ট্র ভূল বা অন্যায়ভাবে কোন আনুগত্য দাবী করছে কিনা সে ব্যাপারে কোন ব্যক্তির মাথা ঘামানো চলবে না। হেগেলীয় এরূপ চরম আনুগত্য মার্ক্সীয় দর্শনও দাবী করে বসে।

৩। হেগেলের রাষ্ট্র দর্শন ছিল মুলত জার্মান জাতি ভিত্তিক। কীভাবে জার্মান জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে শক্তিশালী রাষ্ট্র সৃষ্টি করা যাবে, এটি তার দার্শনিক চিন্তার বিরাট অংশ জুড়ে থাকার ফলে রাষ্ট্র সম্পর্কে তার মতবাদ সার্বজনীন রূপ ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

৪। ইতিহাসকে হেগেল স্বার্গীয় আত্মার সৃষ্টি বলে মনে করেছেন। সকল যুদ্ধ বিগ্রহকে তিনি ইতিহাসের সঠিক বিচার বলে মনে করতেন। যুদ্ধকে তিনি ক্ষতিকারক মনে করতেন-ই না; বরং সৃষ্টির ও সমৃদ্ধির জন্য জরুরী পূর্বশর্ত মনে করতেন। কোন রাষ্ট্র এ ধারণের নীতিতে বিশ্বাসী হলে তার নায়করা সহজেই আগ্রাসী হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

৫। হেগেলের ডায়েলেকটিক পদ্ধতির প্রায়োগিক যোগ্যতা খুবই সীমাবদ্ধ। ইতিহাসের অল্প ঘটনাই বা খুব কম রাষ্ট্র ও সরকার পদ্ধতির উদ্ভব এরূপ পদ্ধতি মেনে চলে। শুধুমাত্র অল্পকিছু রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও সরকার পদ্ধতির বিলুপ্তিতে হেগেলীয় যুক্তি ও পদ্ধতির যথার্থতা উপলব্ধি করা সম্ভব।

www.pathagar.com

ঐসব ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে ইতিহাসের অমোঘ বিধান না বলে ইতিহাসের দূর্ঘটনা বলাই হয়ত অনেকাংশে যুক্তিযুক্ত।

৬। হেগেল যে আদর্শবাদী রাষ্টের চিত্র অংকন করেছেন, তাতে শুধুমাত্র একটি রাষ্ট্র যেহেতু সামগ্রিকভাবে সভ্যতা ও মানবতার ধারক হবে, সেহেতু তার মতাদর্শে আন্তর্জাতিক আইন ও ব্যবস্থা অনুপস্থিত। অথচ আন্তর্জাতিক জীবন ও ব্যবস্থা ইতিহাসের এমন এক যুক্তিসংগত পরিনতি, যার অর্থ হচ্ছে মানব সভ্যতার সার্বজনীনতার বুকে ছুরিকাঘাত করা এবং উগ্র জাতীয়তাবাদ লালন করা। উগ্র জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র এমন কি দীর্ঘ সময়ের জন্য তার নিজ নাগরিকদের জন্যও শান্তিপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করতে পারে না। উগ্র-জাতীয়তাবাদ শুধু অন্য জাতির সংগে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয় না, এমন কি গৃহযুদ্ধকেও অবশ্যম্ভাবী পরিনত করে তোলে।

৭। হেগেল রাষ্ট্রীয় আইনের বন্ধন এমনভাবে অপ্রতিরোধ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যেখানে নৈতিকতার স্থান হয় অনুপস্থিত, নয় বড়ই সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। রাষ্ট্র কোন ব্যাপারেই নৈতিকভাবে কারো কাছেই দায়ী না থাকলে সরকার যন্ত্র সহজেই আইনকে সকল দমননীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। হোগেলের **world spirit** যে সর্বদাই রাষ্ট্রকে অন্যায় ও অসংযত কাজ থেকে বিরত রাখতে পারবে, তেমন কোন ব্যবস্থা হেগেলীয় রাষ্ট্র দর্শন নির্দেশ করতে পারে নি।

৮। রাষ্টের সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে হেগেল রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাঝে এমনভাবে সম্পৃক্ত করেছেন যে, সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে অধিকতর গণমুখী করার রাস্তা এতে বাঁধাগ্রস্থ হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। বিংশ শতাব্দীর সরকার ব্যবস্থায় আমরা রাজতন্ত্রের স্থান ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসতে দেখছি; অথচ হেগেল সাংবিধানিক রাজতন্ত্রকেই সর্বোৎকৃষ্ট সরকার ব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

৯। রাষ্ট্র, আইন, স্বাধীনতা, আনুগত্য সম্পর্কে হেগেলের আদর্শবাদীতা নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক প্রলাপে আচ্ছন্ন, যা অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবতা বিবর্জিত। বাস্তব জীবনে এমন আর্দশিক রাষ্ট্র ও আইন সৃষ্টি করা বা লালন করা মোটেই সম্ভব নয়। বিশেষ করে আধুনিক রাষ্ট্র আকারেও বড় এবং এর জটিলতারও কোন শেষ নেই।

১০। হেগেলীয় দর্শন যথেষ্ট জটিল ও সাধারণ মানুষের বোধগম্য হওয়ার উপযোগী নয়। হেগেলীয় দর্শনের জটিলতা ও দুর্বোধ্যতা সম্পর্কে বহুল শ্রুত একটি কথা রয়েছে। হেগেল নিজেই নাকি তার মৃত্যু শয্যায় শেষ দিনগুলো অতিবাহিত করার সময় বলেছিলেন, তাঁর একজন ছাত্র ছাড়া আর কেউ তার দর্শন শাস্ত্র সঠিক ও পর্যাপ্ত পরিমাণে বুঝতে পারে নি। যে কোন বিষয়ের দার্শনিক দিকগুলো এমনিতেই সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে, তদুপরি যদি কোন দর্শন কেউ ঠিকমত বুঝতেই না পারে তবে তার মূল্যায়ন হবে কীভাবে?

আদর্শবাদী রাষ্টে চিন্তার ক্ষেত্রে আরো যেসব গুনীজন তাদের অবদান রেখেছেন, তাদের মধ্যে

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য হলেন; Johans Gotlieb Fichte (১৭৬২-১৮১৪) Thomas Hill Green (১৮৩৬-১৮৮২) F. H. Bradley (১৮৪৬-১৯২৪) Bernard Boranquet (১৮৪৮-১৯২৯)

এরা সকলেই রাষ্ট্রের এমন এক রূপ কল্পনা করেছেন, যার অস্তিত্ব মূলতঃ বাস্তবে নেই। তবুও রাষ্ট্রকে অধিকতর কল্যাণকামী করে তোলার চেষ্টায় এদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা তাত্ত্বিকভাবে আইনবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবীসহ বুদ্ধিজীবির চেতনায় সাড়া দিতে সমর্থ। বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার গভীরতা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ সব বিখ্যাত লোকদের গবেষণা কর্ম একজন আধুনিক মানুষকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে সমর্থ। তবে এদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঐতিহাসিক অবস্থা ও পরিবেশের আলোকে বুঝার চেষ্টা না করলে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে অন্য কোন পদ্ধতির সাহায্যে এ সব আদর্শবাদী চিন্তাবিদদের বোঝার চেষ্টা মূলত তাদের প্রতি অবিচার করারই নামান্তর।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক বা বিবর্তন মতবাদ

HISTORICAL OF EVOLUTIONARY THEORY

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে যে কয়টি মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে, তার সবগুলোর সমর্থনে বেশ কিছু প্রবক্তা অনেক জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করলেও এর কোনটাই ক্রটিমুক্ত নয়। বেশ কিছু মতবাদ মূলতঃ রাষ্ট্র সৃষ্টির কোন একটি উপাদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেই তাদের সৌধ গড়ে তোলে। আর সে কারণে প্রায় সবগুলো মতবাদই একদেশদর্শী। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবেই ঐতিহাসিক বা বিবর্তন মতবাদের সৃষ্টি। এ মতবাদটি প্রকৃত পক্ষে সবগুলো মতবাদের সংমিশ্রন। অধ্যাপক গার্নার বলেন, "The state is neither the hand work of God nor the result of superior physical force, nor the creation of resolution or convention, nor a mere expansion of the family":

" অর্থাৎ রাষ্ট্র কোন স্রষ্টার সৃষ্টিও নয়, কোন অলৌকিক শাক্তির ফলাফলও নয়, কোন প্রথাভূক্ত চিন্তা-চেতনা বা সিদ্ধান্তগত সৃষ্টিও নয় এমনকি এটি পরিবারের বিকশিত রূপও নয়। "

এ ধরণের বক্তব্যে একটি কথাই পরিষ্কার যে, একদিনে কেউ রাষ্ট্র সৃষ্টি করেনি বা কোন একটি বিশেষ নিয়মের অধীন এটির গোড়াপত্তন হয়নি। বরং এটি মানব সমাজের নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশের ফসল। ক্রমবিকাশের এ ধারার ধারক ও বাহক হচ্ছে ইতিহাস নিজে। তাই ক্রমবিকাশের এ মতবাদকে অনেকে ঐতিহাসিক মতবাদ নামে অভিহিত করেছেন। আর এ মতবাদটি সাধারণভাবে সমর্থনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমে রাষ্ট্র অনেক ক'টি ধাপ বা স্তর অতিক্রম করেছে। সামাজিক জীবনে উথানের মধ্য দিয়েই মূলতঃ রাষ্ট্রের আদি রূপের উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু রাষ্ট্র তার প্রথম উৎপত্তি স্থলেই পূর্ণ বিকশিত রূপ লাভ করেনি। বরং এক জটিল পথ ধরে অগ্রসর হতে হতে নানাবিধ নিয়ামক থেকে আহার ও পানীয় সংগ্রহ করে সবার অলক্ষ্যেই যেন এ বিশাল রূপ পরিগ্রহ করেছে। একটি চারা বটগাছ ও পরিপূর্ণ বটগাছের মধ্যে পার্থক্য এত বেশী যে, চারা গাছটিকে বটগাছ নামে অভিহিত করাই বাস্তবে অযৌক্তিক। বিশেষ করে তাদের পক্ষে যারা বটগাছের মহীরূপ ধারণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অজ্ঞ। আদি গোত্রীয় রাষ্ট্র বা নগর রাষ্ট্রের তুলনায় আজকের আধুনিক রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও কার্যাবলী এত বেশী যে, আদি রাষ্ট্রগুলোকে রাষ্ট্র বলে অভিহিত করাই যেন যুক্তি গ্রাহ্য নয়। এমনকি কয়েক শতাব্দী পূর্বেকার রাষ্ট্রও যেন যথার্থ অর্থে পরিপূর্ণ রাষ্ট্র নয়। প্রতিষ্ঠান বা সংঘ হিসেবে আধুনিক রাষ্ট্র যে সব স্তর পেরিয়ে এসেছে তাকে হয়ত বা নিচের ছকের মত করে সাজানো যেতে পারে-

ব্যক্তি → পরিবার → গোত্র → উপজাতি → জাতি → রাষ্ট্র

www.pathagar.com

এ ধরণের ছকে রাষ্ট্রের সাথে জাতির যে সম্পর্কে দেখানো হয়েছে তা ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু আধুনিক যুগে যেহেতু জাতিরূপেই রাষ্ট্রের অধিকতর শাক্তিশালী রূপ, তাই হয়ত এরূপ চিত্রায়ণ যথেষ্ট গ্রহণ যোগ্যতা লাভ করেছে।

রাষ্ট্রের বিবর্তনবাদে যে সব উপাদানের যথেষ্ঠ পরিমান ভূমিকা রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলঃ রক্তের সম্পর্ক, ধর্ম, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, যুদ্ধবিগ্রহ, সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা।

রক্তের সম্পর্ক ঃ কোন মানুষের পক্ষেই রক্তের সম্পর্ক অস্বীকার করার উপায় নেই। রক্তের সম্পর্কের জন্য আত্মীয়তার বন্ধন স্থাপন অপরিহার্য। অর্থাৎ পরিবার স্থাপন করার কোন বিকল্প নেই, যদি কোন মানুষ তার আত্মীয়তার বন্ধন ও রক্তের সম্পর্ক সৃষ্টি করতে চায়। বিবাহ-বন্ধন ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় মানুষকে সহজেই বেড়ী পরিয়ে দেয়। বিবাহ-বন্ধন থেকে পারিবারিক বন্ধন আরো শক্তিশালী হয়। কিন্তু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নারী-পুরুষের মাঝে রক্তের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না। অথচ ঐ বন্ধন থেকে সৃষ্টি হয় রক্তের সম্পর্ক। এই রক্তের সম্পর্কের গভীরতায় রয়েছে মানুষের এক অকৃত্রিম নাড়ীর টান। বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেলেও ঐ বন্ধন থেকে সৃষ্ট রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করার উপায় নেই। এ এক অদ্ভুত জটিল ধরনের সম্পর্ক। শুধু মৃত্যুই রক্তের সম্পর্কের ইতি টেনে দিতে পারে। রক্তের এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রক্ষার তাগিদেই মানুষের মাঝে গড়ে উঠে সংঘবদ্ধভাবে জীবন যাপন করার অভ্যাস। অনেকেই হয়ত বিবাহ বন্ধনকে এখানে প্রাধান্য দিতে চাইবেন; কিন্তু রীতিসিদ্ধ আনুষ্ঠানিক বিবাহের যাত্রা কখন কিভাবে শুরু হয়েছিল এবং এর প্রকৃতি কেমন ছিল, এ নিয়ে বহু পরস্পর বিরোধী বিশ্বাস ও যুক্তি রয়েছে। যদিও আদিতে দীর্ঘ সময় ধরে কোন একক স্থায়ী বৈবাহিক সূত্র প্রতিষ্ঠার আলামত ইতিহাস খুঁজে পেতে অক্ষম, তবুও রক্তের সম্পর্কের অবদান অস্বীকার করা যায় না।

একটি নবজাতকের জন্য আকর্ষণ প্রতিটি মানুষেরই একটি স্বাভাবিক অনুভূতি। আর নব জাতকটি যদি হয় মানব সন্তান, তবে তার প্রতি ভালোবাসা, মায়া-মমতা খুবই স্বাভাবিক মানব-ধর্ম। তাকে হয়তো ক্ষণিকের জন্য অবজ্ঞা করা যায় বা স্বার্থপর হয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরানো যায়। কিন্তু তার প্রতি বাবা-মা কেউ নাড়ীর সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারে না। নিজ নিজ বংশধরদের প্রতি এই যে এক আদিম টান, একে নিয়েই সমগ্র পারিবারিক ব্যবস্থার সৌধ নির্মিত।

ম্যাকআইভারের মতে, রক্তের সম্পর্কের টানাপোড়েনে গঠিত আত্মীয়তা ভিত্তিক সামাজিক একক একদিকে যেমন ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে বিস্তৃতি লাভ করেছে। স্বগোত্রীয়তার স্বীকৃতির ফলে আত্মীয়তা ভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠেছে এবং কালক্রমে তা সমাজের স্তরে রূপান্তরিত হয়েছে। (পৃষ্ট-২০) তাহলে দেখা যাচ্ছে, রক্তের সম্পর্ক শুধু আদি সামাজিক সংগঠন পরিবারকেই রক্ষা করেনি, বরং রাষ্ট্রের উৎপত্তির পেছনেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

ধর্ম ঃ ধর্মানুভূতি মানুষের জন্য কতটুকু সহজাত তা আজ অবশ্য বিতর্কিত। কারণ, ধর্মের বাঁধন ছাড়াই বিংশ শতাব্দীতে বহু মানুষ জীবন যাপন করে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বাঁধন তাদের জন্য

www.pathagar.com

যথেষ্ট মনে হয়। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় আইনের বাঁধনে বেশ কিছু দেশে এখন আর ধর্মের তেমন একটা প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, ধর্ম রাষ্ট্রের উৎপত্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল কীভাবে? মূলতঃ এমন এক সময় ছিল, যখন আইন বলতে বুঝাতো ধর্মীয় আইন। ধর্ম, প্রথা ও আইনের মাঝে পার্থক্য খোঁজে বের করা ছিল অসম্ভব ব্যাপার।

সৃষ্টিকূলের মধ্যে মানুষই একমাত্র প্রাণী যে সকল অবস্থাতেই উপাসনালয় তৈরী করেছে। ইতিহাসে অনেক প্রমাণ রয়েছে যে, মানুষ স্থায়ী বাসস্থানের নির্মানেরও বহু পূর্বে থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে একত্রিত হয়ে কিছু এবাদত জাতীয় ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হত। আর এজন্য নির্দিষ্ট স্থান ও পদ্ধতির সন্ধান মিলে ইতিহাসের পাতায় পাতায়। স্বভাবতই সামাজিক ও অন্যান্য কর্মকান্ডেও ধর্ম ও পুরোহিতদের প্রভাব ছিল প্রত্যক্ষ। কখনো কখনো বৈবাহিক, পারিবারিক ও আত্নীয়তার বন্ধনের সকল দিকই ধর্ম নিয়ন্ত্রন করত।

Divine 'prohibition or divine sanction accompanied almost every act, customary obligation regulated conduct, and the idea of change was abhorrent. The fond of unity within the group was esssentially a relegious one, and the ultimate authority behind every rule of action, whatever its origin, was the will of gods (GETELL'S; page-21)

আদিতে কোন বিশ্ব-ধর্মের সন্ধান পাওয়া যায় না। মূলতঃ বৌদ্ধ ধর্মকেই আধুনিক পরিভাষায় প্রথম বিশ্ব-ধর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সে ক্ষেত্রে খ্রীষ্টান ধর্ম আর ইসলাম ধর্ম ছাড়া আর কোন বিশ্ব-ধর্ম নেই। বাকী সবগুলো ধর্ম হয় দেশীয়, স্থানীয় বা আঞ্চলিক। এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গীতে পুরাকালের ধর্মগুলোর প্রত্যেকটি ছিল গোত্রীয় বা স্থানীয়। সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে তাদের ধারণাও ছিল খুবই সংকীর্ণ। প্রকৃতির কিছু কিছু অনবদ্য সৃষ্টি ও আলামতকে হয় তারা উপাসনা করত বা ঈশ্বর বলে ধরে নিত।

The earliest social object were "toten groups" distinguished by the sign of some natural object, which was of ten worshipped (Ibid)

অতি প্রাকৃতিক কোন শক্তির উপর নির্ভরশীলতা বা আনুগত্য মানুষের স্বভাব ধর্ম। শুধু প্রাকৃতিক দূর্যোগ, অনিয়ম ও দূর্ঘটনার মোকাবিলাই নয়; শক্তিধর মানুষ, নিষ্ঠুর গোত্র প্রধান, অত্যাচারী শাসক এমনকি অন্যায়কারী পুরোহিতের বিরুদ্ধে অসহায় বোধ করেও মানুষ ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ ও বিচার কামনা করে। অতি প্রাকৃতিক কোন শক্তিতে একেবারেই বিশ্বাস নেই, এমন মানুষ কিন্তু নেই বললেই চলে। রাষ্ট্রীয় যাঁতাকলে আটকে পড়ে ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মানুষ নিজেদেরকে ঢালাওভাবে নাস্তিক দাবী করে আসলেও, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, সারাজীবন নিরবিচ্ছিন্নভাবে নাস্তিকতাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণকারী লোকের সংখ্যা একেবারেই হাতে গোনা। এ নশ্বর জীবনের ভাবনা শেষ পর্যন্ত মানুষকে খোদার সন্ধান দেয়। আধুনিকতম প্রযুক্তিও এখানে অসহায়। মানুষের এই স্বাভাবজাত আস্তিকতাবোধকে কেন্দ্র বা পূঁজি

www.pathagar.com

করে ইতিহাসে পাশাপাশি বহু ন্যায় ও অন্যায় কাজ সম্পাদন করেছে রাজ-শক্তি, রাষ্ট্র-যন্ত্র ও শাসক গোষ্টি। আর তাই যুগ যুগ ধরে ধর্ম রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং এর পেছনে সমর্থন দানকারী শক্তিশালী নিয়ামক বা উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। অনেকের মতে যেহেতু আদিতে ধর্মই মানুষের পারিবারিক বন্ধন গড়ে দিত ও একে টিকিয়ে রাখার বিধান দিত এবং আত্মীয়তা ও রক্তের সম্পর্কের গোড়াপত্তন করত তাই মূলতঃ ধর্ম হচ্ছে রাষ্ট্র সৃষ্টির সবচাইতে আদি ও শক্তিশালী উপাদান।

এ কথা ঠিক যে আদিতে বংশীয় ও গোত্রীয় সম্পর্কের বিরাট অংশই নিয়ন্ত্রিত হত ধর্মবিশ্বাস দ্বারা। কিন্তু সে ধর্মবিশ্বাস আজকের মত এমন সুষ্ঠু ছিল না। অনেক সময়ই নিছক প্রথা বা গোত্রীয় আচার-অনুষ্ঠানকেই অত্যন্ত পবিত্র ও সকল সমালোচনার উর্ধ্বে রাখার চেষ্টা হত নিষ্ঠার সাথে। সে দিক থেকে বিভিন্ন গোষ্টি বা গোত্রই ছিল ধর্ম বিশ্বাসের ধারক ও বাহক। তাই রক্তের বা আত্মীয়তার চাইতেও ধর্ম রাষ্ট্র উৎপত্তির পেছনে বেশী অবদান রেখেছিল। সে বিতর্কে যেতে রাজী নয় বিবর্তনবাদ। ঐতিহাসিক মতবাদ রাষ্ট্র সৃষ্টির কোন একটি উপাদানকে অন্যটির উপর গুরুত্ব না দিয়ে সম্ভবে সবগুলো উপাদানের মিল করে নেয়ার পক্ষপাতী। এ উপাদান গুলোর সব কটিই যে ইতিহাসের যোগ্য সন্তান, যারা সবাই মিলে আসলেই রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেছে।

যুদ্ধ বিগ্রহঃ যুদ্ধবিগ্রহের সাথে মানুষের জন্মগত কোন স্বভাবের সম্পর্ক আছে কি-না, তা হয়ত বলা মুশকিল, তবে মানুষের সমগ্র ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে যে অসংখ্য ছোট-বড় যুদ্ধের সন্ধান মিলে, তা অস্বীকার করার যো নেই। যুদ্ধ শুধু ধ্বংসের সূচনা করে না, গড়ার যাত্রায় কখনো এনে দেয় গতিবেগ। যুদ্ধ শুধু অন্যায়কারীদের জয়ী করে না, অন্যায় অত্যাচার রুখতে সমর্থ হয়েছে। এমনকি যুদ্ধের মাধ্যমে দোর্দন্ড প্রতাপশালী অত্যাচারীকে শাস্তির বিধানও করা গেছে। তাই ঐতিহাসিক মতবাদ যুদ্ধকে কোন নির্ভেজাল ভালো-মন্দের মানদন্ড বলে না। একে ইতিহাস বিনির্মানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করে। রাষ্ট্র যেহেতু 'মানব সৃষ্ট একটি অতীব জটিল ও জরুরী ব্যবস্থা, তাই এ উপাদানটি রাষ্ট্রের উৎপত্তির পিছনে কোন ভূমিকা পালন না করে নির্বাক হয়ে বসে থাকবে, এমনটি কল্পনা করা যায় না।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সৃষ্টি করার অর্থই হচ্ছে অধিবাসীদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক আনুগত্য দাবী করা এবং তাদের জন্য বেশ কিছু অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করা। কাজেই সমাজের কিছু লোক যদি রাষ্ট্রীয় শক্তিকে মোটেই মানতে রাজী না হয়, তবে বিদ্রোহ, সংঘাত এমনকি যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

তাছাড়া উদীয়মান কোন রাষ্ট্র শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য আঘাত বা হস্তক্ষেপ আসা বিচিত্র কিছু নয়। সে ক্ষেত্রে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। তাছাড়া বিভিন্ন সহায়-সম্পত্তি নিজের বা কোন ভূমির উপর দুপক্ষের একই সঙ্গে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংঘাত মিমাংসার জন্য যুদ্ধই ছিল আদিমতম সমাধানের রাস্তা। যুদ্ধ ছাড়া অন্য উপায়ে বংশীয় বা গোত্রীয় আধিপত্য বিস্তার করার কথা চিন্তা

www.pathagar.com

করা যেত না। আন্তঃগোত্রীয় সন্ধি সমূহও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল যুদ্ধের জের, তাই শুনতে খারাপ শুনালেও বা অমানবিক মনে হলেও যুদ্ধ-বিগ্রহও রাষ্ট্রের উৎপত্তির পেছনে যথেষ্ট শক্তিশালী মাল মসলা যোগান দিয়েছে।

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডঃ মানুষ শুধু আত্মীয়তা, গোত্রীয়, ধর্মীয় ও শৌর্য্য-বীর্যের মনোভাব নিয়েই বাঁচতে পারে না, জীবন ধারণের জন্য এবং উন্নত জীবনযাত্রা হাসিলের জন্য তাকে নানাভাবে জীবিকার সন্ধান করে বেড়াতে হয়। একাকী জীবিকা আহরণ করা প্রায়ই কঠিন হয়ে থাকে। সম্মানজনক জীবিকার জন্য চাই ভাল সামাজিক পরিবেশ। সুন্দর ও সুবিন্যস্ত আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ছাড়া নিরাপদভাবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ধনসম্পত্তির মালিক হতে গেলে এবং তা ভোগ করতে হলে সবাইকে কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। উৎপাদনের প্রক্রিয়া গতিময় রাখার জন্য নূতন নূতন আইন-কানুন সৃষ্টি করতে হয়। সে সব বিধি বিধানের প্রতি আবার সকলের আস্থা ও আনুগত্য থাকতে হয়। তা-না হলে সমাজ জীবনে নেমে আসে নৈরাজ্য।

আদিতে কৃষি বা কুটির শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যেমন কিছু নিয়ম-কানুনের প্রয়োজন ছিল, তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচার ও পণ্য বিনিময় ব্যবস্থাকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সর্বজন গ্রাহ্য কিছু নিয়ম-কানুন প্রচলিত ছিল এবং ভবিষ্যতেও এসব রাখতে হবে। এসব নিয়ম-কানুন অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হওয়ায় এবং অর্থনৈতিক বিভিন্ন ক্রিয়ালাপ থেকে উদ্ভূত বিরোধ মিমাংসা আইন বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ অত্যাবশ্যকীয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

তাছাড়া সমাজ থেকে বৈষম্য দূরীকরণের জন্য এবং দুর্বল ও অসহায়দের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্যও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে আইনের নিয়ন্ত্রণ থাকা জরুরী। তা-না হলে শুধু গরীব দুঃখীরাই বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়বে এমন নয়, ধনী ও সম্পদশালীরাও চরম নিরাপত্তা হীনতায় ভুগবে। কারণ জীবণ ধারনের নূন্যতম উপায়-উপাদান থেকে দীর্ঘদিন বঞ্চিত থাকার দরুণ মানুষ শুধু হতাশাগ্রস্থই হয় না। সাথে সাথে চরমভাবে প্রতিশোধ প্রবণও হয়ে পড়ে। আর এ প্রতিশোধ প্রবণতা তাকে যে কোন অসম্ভব ও অন্যায় কাজ করতে সাহস ও সরঞ্জাম যোগায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আদি থেকেই মানুষ যেমন সম্পদ কুক্ষীগত করার প্রয়াস চালিয়ে আসছে, তেমনি এর একটা আইনানুগ বন্টন ব্যবস্থা স্থাপন করতে আগ্রহশীল ছিল। উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে জড়িত করতে সে চেয়েছিল যত বেশী সম্ভব মানুষকে। আর তাই বলা চলে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিশ্চয়ই রাষ্ট্রের উৎপাত্তির পেছনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

রাজনৈতিক চেতনাঃ মানুষ যে সামাজিক জীব তার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ তার রাজনৈতিক চেতনায় ও সংঘবদ্ধতায়। কোন মানুষ যদি রক্তের সম্পর্ক থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পর্যন্ত সকল ব্যাপারে তার নির্লিপ্ততা প্রকাশ করে, তবুও সে তার রাজনৈতিক চেতনাকে অস্বীকার করতে পরে না। রাজনৈতিক চেতনা বলতে আজকের দিনের মানুষ হয়ত প্রধানতঃ কোন মানুষের দলীয়

www.pathagar.com

চরিত্রের দিকে ইংগিত করতে চাইবে। কিন্তু আদিতে আজকের মত দলীয় রাজনৈতিক মনোভাবের সন্ধান পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

সংঘবদ্ধভাবে জীবন যাপন করার পেছনে যত বস্তুগত উপাদানের কথা বলা যাক না কেন, অবস্তুগত উপাদানের ভূমিকাও মোটেই তুচ্ছ নয়। আত্মীয়তা ও ধর্মীয় বন্ধনে অনেক সময় মনোজগতের ভূমিকাই রীতিমতো প্রধান্য বিস্তার করে। কিন্তু তাতে হয়ত সবসময়ই সরাসরি রাজনৈতিক চেতনার রূপ সুনির্দিষ্টভাবে লুকিয়ে থাকে না, অর্থনৈতিক ও যুদ্ধ বিগ্রহের মত উপাদান গুলোর ভিতরে স্বার্থপরতা, অর্থ ও ক্ষমতা লিপ্সুতার মত কারণ সরাসরি বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এসবের পেছনেও অনেক নৈতিক এমন কি আধ্যাত্মিক কারণ খুঁজে বের করা কষ্টকর নয়। যুদ্ধ ও অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলীর পেছনে মানুষ অনেক অবস্তুগত কারণ দাঁড়া করায়। গোত্রীয়, বংশীয় ও ধর্মীয় গৌরব রক্ষাকল্পে বা তা সুসংহত করার মানসে মানুষ অনেক ধরণের শক্তিশালী অর্থব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা, মারণাস্ত্র ও যুদ্ধকৌশল আবিষ্কার করেছে। কিন্তু এসব কিছুর পেছনে লুকানো রয়েছে তার রাজনৈতিক চেতনাবোধ। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কোন দিকের স্বরূপ কী হবে তা প্রথমে মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা দ্বারা কল্পিত ও নির্ধারিত হয়ে থাকে।

অর্থ, ক্ষমতা, ধর্ম সহ সকল প্রকার স্বার্থরক্ষার জন্য কি ধরণের পদক্ষেপ নেয়া উচিত তা প্রথমে আলোড়ন তুলে মানুষের মনোজগতে। মনোজগতের এ আলোড়নকে হয়ত বা মনস্তাত্তিক ও আধ্যাত্মিক কারণ হিসেবে চিহ্নিত করাই বেশী যুক্তি সংগত মনে হবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কতৃর্ত্ব ও আইনের ব্যাপারে ইদানিং মনোজগতের তোলপাড় ও আনুসাঙ্গিক বহিঃপ্রকাশকে আমরা রাজনৈতিক সচেতনা ও তার জের হিসেবেই আখ্যায়িত হতে দেখি।

এখানে সবচাইতে বড় কথা মানুষ কোন জড় পদার্থ নয় বা অন্য কোন প্রাণীর মত বিবেকহীন নয়। বিবেকের তাড়না ও দংশন তাকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে শক্তির ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার ব্যবহারকে নিয়মসিদ্ধ করতে প্রয়াসী করে তোলে। চিন্তাশীল প্রাণী হিসেবে মানুষ রাজনৈতিক মতাদর্শের অধিকারী। আর তাই রাজনৈতিক সচেতনার উম্মেষ ঘটে রাষ্ট্র ব্যবস্থায়, এত কোন সন্দেহ নেই।

রাষ্ট্রের উৎপত্তির পেছনে উপরোক্ত উপাদানগুলো ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নয়, বরং একযোগে মিলে মিশে কাজ করেছে। তার প্রমান পাওয়া সহজ, কারণ এর যে কোন একটির আলোচনা করতে গেলেই বাকী সবগুলো তাদের ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চায়। এরা প্রত্যেকেই যেন রাষ্ট্র-সৌধটির নির্মান কাজের শুরুতে ভিত্তি প্রস্তরের উপাদান গুলোর মত পারস্পরিক সম্পর্কে অত্যন্ত নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য হয়ে পড়ে। তর্কের খাতিরে ধরা যাক কোন একটি গোত্র, গোষ্টি বা অঞ্চলের অধিবাসীরা শুধুমাত্র রাজনৈতিক সচেতনতার কারণেই একটি রাষ্ট্রের জন্ম দিতে চায়। প্রচেষ্টার শুরুতেই দেখা যায় তাদের পক্ষে জনগোষ্ঠির মাঝে বিরাজিত আত্মীয়তা বা রক্তের সম্পর্ক, ধর্মীয় বা গোত্রিয় সম্পর্ক অর্থনৈতিক বা সামাজিক সম্পর্ক সহ অন্যান্য ব্যাপারে উদাসীন থাকা মোটেই

www.pathagar.com

সম্ভব নয়। বরং এ সব ব্যাপারে উদ্যাক্তাদের নির্লিপ্ততা বাকী সবাইকে রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার প্রতি আগ্রহশীল করতে ব্যর্থ হবে। কেউ যদি দাবী করে করে বসেন, মূলতঃ একককভাবে ধর্মীয় কারণ দ্বারাই রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছিল বা হওয়া সম্ভব, তা হলেও দেখা যাবে দাবীটি অনেক খানি একদেশদর্শীতার দূর্বলতা দ্বারা আক্রান্ত। ধর্ম আর যাই হোক না কোন, সে রক্ত যা আত্মীয়তা সম্পর্ক অস্বীকার করতে পারে না, করলে তা অধর্ম হয়ে পড়বে। কোন মানুষ যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন; বেঁচে থাকার তাগিদে তাকে কোন না কোন উপায়ে জীবিকা অর্জন করতে হয়। জীবিকা উপার্জনের প্রতিটি প্রচেষ্টাই কোন না কোন ভাবে উৎপাদন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পর্কিত। যুদ্ধ লেগে গেলে এর প্রভাব ও জের থেকে কেউ সম্পূর্ণভাবে রেহাই পাওয়ার কথা ভাবতে পারে না। ধর্মানুভূতি মানুষকে রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা থেকে মোটেই বঞ্চিত করে না। বরং সঠিক ধর্ম চর্চা মানুষকে সার্বজনীন কল্যাণকামীতার দিকে অনুরাগী করে তোলে। সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া না পড়ার ব্যাপারটি একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার হতে পারে। কিন্তু সুস্থ ধর্মীয় বা সামাজিক কল্যাণমুখী রাজনৈতিক সচেতনার মাঝে পার্থক্য খুবই ছোট হয়ে উঠে, যদি তা ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে থাকে। মানুষ সহ সকল সৃষ্টির সাথে মর্যাদাশীল ভাবে বেঁচে থাকার পদ্ধতি হিসেবেই যেহেতু রাষ্ট্রের উদ্ভব, তাই মানুষের মাঝে প্রবল, এমন একটি উপাদানের প্রয়োজনীয়তা এতে অনস্বীকার্য।

সার্বভৌমত্ব

সাধারণতঃ দেখা যায় সার্বভৌমত্বের আলোচনা শুরু হয় তার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ধারণ দিয়ে। আর শেষ হয় এর প্রকারভেদ দিয়ে। কিন্তু এ ধরণের আলোচনা সরকার, আইন, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির সাথে সার্বভৌমত্বের নানাবিধ সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রেই স্পষ্ট করে তুলতে ব্যর্থ হয়। এর মূল কারণই হচ্ছে সার্বভৌমত্বের আত্মা-সদৃশ্য রূপ। এ কথা সবাই মানে যে, সার্বভৌমত্ব হচ্ছে রাষ্টের জীবন ও আত্মা। রাষ্ট্রের এ উপাদানের উপরই নির্ভর করে রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ জন্ম। রাষ্ট্রের স্থিতি, উন্নতি ও সমৃদ্ধির সাথে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের নানাবিধ সম্পর্ক রয়েছে । তাই জটিল এই ধারণাটি বুঝার জন্য সবচাইতে ভাল উপায় হচ্ছে, এ ব্যাপারে বড় বড় মনিষীদের বক্তব্য মেনে নিয়ে তা সমালোচনার দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণ করা।

কিন্তু এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী দুটি প্রধান সমস্যার সম্মুখীন। প্রথমত প্রায় ঃ প্রত্যেক নামকরা রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ও আইনবেত্তাই সার্বভৌমত্ব সম্পকর্কে কিছু না কিছু নতুন কথা বলার চেষ্টা করেছেন। কাজেই এ সকল মনিষীর বক্তব্য এক সাথে পর্যালোচনা করার উপায় নেই।। দ্বিতীয়তঃ আধুনিক সার্বভৌমত্বের বয়স পাঁচশত বছর হলেও এ ধারণাটি কমপক্ষে ২৫০০ বছরের পুরানো। কাজেই আমরা শুধুমাত্র এমন সব কয়েকজন মনিষীর বক্তব্য নিয়েই আলোচনা করব, যাতে আধুনিক চিন্তার বহিঃপ্রকাশের সাথে সার্বভৌমত্বের দার্শনিক ও ঐতিহাসিক দিকগুলো পরিষ্কার হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

এ কাজের জন্য প্রথমে JEAN BODIN (জীন বোদিন) ও HUGO GROTIUS (হুগো গ্রোটিয়াস) কে বেছে নেয়া যাক।

জীন বোদিন (১৫৩০-১৫৯৬) মূলত একজন দার্শনিক হিসেবেই পরিচিত। তবে এই ফরাসী দার্শনিক একজন খ্যাতিমান আইনজ্ঞ। তিনি শুধুমাত্র একজন তাত্ত্বিকই ছিলেন না, সরকারী কর্মচারী হিসেবে আইনের ব্যবহারিক দিকের সাথে ছিল তার প্রত্যক্ষ পরিচয়। কাজেই তার লিখনীতে তাত্ত্বিক বাড়াবাড়ি নেই; নেই বড় ধরণের কোন কল্পনা বিলাস।

তাঁর রচনাবলী তাঁকে একজন রাষ্ট্র বিষয়ক দার্শনিকের মর্যাদা দিয়েছে। আধুনিক লেখকদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইতিহাসকে দার্শনিক ব্যাখ্যার উপর দাঁড় করানোর প্রায়াস চালান। তাঁর রাষ্ট্র সংক্রান্ত মতবাদ ও মূল তত্ত্ব সমূহ রয়েছে তার "THE SIX BOOKS OF THE REPUBLIC" রচনায়। তিনি আইন শাস্ত্রের উপর তার গবেষণায় একই সাথে ঐতিহাসিক ও তুলনা মূলক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও আইন ব্যবস্থার তুলনা রাষ্ট্র বিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত জরুরী বিষয়। আর এ জরুরী বিষয়টির উপর গবেষণা চালাতে হয় ঐতিহাসিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার আলোকে ও অভিজ্ঞতায়। বোদিনের এ গবেষনা পদ্ধতি হব্‌স ও মন্টেস্কু কতৃক অনুসৃত হয়েছিল। মূলতঃ বোর্দিনের রাজনৈতিক তত্ত্ব এরিষ্টটলের বিখ্যাত গ্রন্থ "পলিটিস" দ্বারাই গভীর ভাবে প্রভাবিত ছিল। অন্যদিকে ম্যাকিয়াভ্যালীর চিন্তাকে তিনি মুক্ত করে অধিকতর যুক্তি গ্রাহ্য করতে উৎসাহী ছিলেন। সে কারনেই বোদিন সার্বভৌমত্বের মত জটিল ব্যাপারটিকে আইনের সাথে নানাভাবে সম্পর্কিত রেখে অনেক মূল্যবান কথা বলে গেছেন।

তিনি আইন ও নৈতিকতার মাঝে পার্থক্য করেছেন। কিন্তু ম্যাকিয়াভ্যালীর মত এ দুটিকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করেন নি। বোদিন বিশ্বাস করতেন যে, ন্যায়-বিচার ও নৈতিক-আইন রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি মানবীয় সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রাকৃতির আইনের নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকার কথা স্বীকার করতেন। আর নৈতিক আইন ও প্রাকৃতিক আইনকে তিনি এক করে দেখেছেন। তাঁর মতে সবচাইতে শক্তিশালী সার্বভৌম শক্তিও প্রাকৃতিক বিধি-বিধানকে অস্বীকার করতে পারে না এবং নৈতিকতা ছাড়া কোন সরকারই চলতে পারে না। কল্যাণকামী কোন রাষ্ট্র বা ব্যক্তিকে অবশ্যই নৈতিক ও যুক্তিগ্রাহ্য নিয়মাবলী মেনে চলতে হয়। বোদিন রাষ্ট্রীয় শক্তির অভ্যূদয়ের পেছনে পরিবার, ইতিহাস এবং তাদের যুক্তিসংগত ক্রমবিকাশকেই সবচাইতে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি সামাজিক চুক্তি মতবাদের কোন কিছুকে রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন নি। তাঁর মতে মানুষের সহজাত প্রকৃতির কারণে মানুষ পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় গোষ্টি গড়ে তোলে। আর বিভিন্ন গোষ্টির মাঝে যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে বিজিত গোষ্টির লোকেরা পরাধীন জাতিতে পরিনিত হয় এবং বিজয়ী গোত্র বা গোষ্টির সেনা নায়কেরা সার্বভৌমত্ত্বের দাবীদার হয়ে পড়ে । এভাবেই গোত্রীয় একত্রীকরণের মাধ্যমেই চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের উদ্ভব ঘটে।

www.pathagar.com

পরিবার ও গোত্রীয় সমন্বয় বিধানের ক্ষেত্রে বোদিন মূলতঃ রোমান আইনের নীতিমালার উপর নির্ভর করেই তার চূড়ান্ত সার্বভৌম শক্তির ব্যাখ্যা দেন। পরিবারকে রাষ্ট্রের আদিমতম উপাদান হিসেবে ধারণা করে তিনি রাষ্ট্রকে পারিবার সমূহের প্রধানদের সামষ্টিকে নাগরিক সংঘ বলেছেন। গ্রীকদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে বোদিন বলেন যে, রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকেই রাষ্ট্রের জনজীবন সংক্রান্ত প্রতিটি বিষয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে, সার্বভৌমত্ব শক্তির সৃষ্টির জন্য এমন কোন বাধ্যবাধকতার দরকার নেই। এমনকি পরিবার প্রধানদের বেলায় এ ধরণের কোন রাষ্ট্রীয় নিয়ম থাকার দরকার নেই বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। যা দরকার, তা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় চূড়ান্ত ক্ষমতার প্রতি সকলের সাধারণ আনুগত্য। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতি যে সকলেই আনুগত্যশীল তার বাহ্যিক প্রতিফলনই সার্বভৌম শক্তির উপস্থিতির প্রমাণ।

বোদিন সার্বভৌমত্বের কেন্দ্রীয় ধারণাতে যা বলতে চেয়েছেন, সংক্ষেপে তার মর্মার্থ দাঁড়ায়ঃ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, এমন ক্ষমতা ব্যবহার করার মত শক্তিই হচ্ছে সার্বভৌমত্ব। যেহেতু সার্বভৌম শক্তিই আইন প্রনয়ন করবে, তাই তাকে নিয়ন্ত্রন করতে যাওয়া আইনের জন্য যুক্তিসংগত নয়, সার্বভৌমত্বকে সব কিছুর উপর আইননুগ স্থান দিয়ে বোদিন যে আইনকেই স্বেচ্ছাচারী করে ফেলতে পারেন, সে ব্যাপারে তিনি সজাগ ছিলেন। তাই তিনি বলেছেন যে, সার্বভৌম শক্তিকে অবশ্যই ঐশ্বর ও প্রাকৃতিক আইন মেনে চলতে হবে । অন্য সার্বভৌম শক্তি ও নিজ জনগণের সাথে সম্পাদিত চুক্তি সমূহ মেনে চলতে হবে নিষ্ঠার সাথে। বোদিন তার চিত্রায়িত সার্বভৌমত্বের উপর শুধু নৈতিক নিয়ন্ত্রণের কথাই বলছেন। কিন্তু তা কীভাবে কার্যকর হবে, সে ব্যাপারে তিনি আর অগ্রসর হননি।

বোদিন অবশ্য এ কথা বলেছেন যে, সার্বভৌম শক্তির অধীনে এমনিতে কিছু নীতিমালা গড়ে উঠবে, যার পরিবর্তন করা আর সম্ভব হবে না। উদাহরণ স্বরূপ ফ্রান্সের Salic law -র কথ উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, রাষ্ট্র ইচ্ছা করলেই এর পরিবর্তন সাধন করতে পারবে না। এ কথা থেকে বুঝা যায় যে, বোদিন একটি প্রাথমিক সাংবিধানিক অপরিহার্য মতাদর্শের কথা চিন্তা করেছেন। এরূপ কোন সতাদর্শ যে শুধু প্রথার উপর নির্ভর করে সচল থাকতে পারে না, সে কথাও তিনি ব্যক্ত করেছেন। প্রথা থেকে আইনকে আলাদ করে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আইনের পেছনে অবশ্যই সার্বভৌম শক্তির স্বীকৃতি থাকতে হবে। আর নূতন শাসক এসে কোন অবস্থাতেই যেন পূর্বের সকল আইন রদ করে ফেলতে না পারে, সে ব্যবস্থাও থাকা দরকার এখানে বোদিনের নীতি "হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না"–এরূপ দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ঈশ্বর ও প্রাকৃতির আইনের বিরোধিতাকারী শাসকদের তিনি স্বেচ্ছাচারী বলেছেন। স্বেচ্ছাচারীরা আইনগতঃ সার্বভৌমত্বের ক্ষমতার মালিক থাকে বটে, কিন্তু তা নৈতিকতা বিরোধী ম্যাকিয়াভ্যালির মত বোদিন রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে নৈতিকতার স্থান অস্বীকার করেন নি, তবে আইনানুগ দায়িত্ব থেকে নৈতিক দায়িত্ব আলাদা করেছেন। কিন্তু রাজার এ দুই ধরনের দায়িত্ব

www.pathagar.com

কর্তব্য কীভাবে আলাদা করা যাবে, সে ব্যাপারে বোদিন নিরুত্তর। বোদিন তার জীবদ্দশায় তার নিজ দেশে, ইংল্যান্ডে ও স্পেনে শক্তিধর রাজাদের শাসন প্রত্যক্ষ করেছেন এবং রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার কোন বিকল্প তিনি নির্দেশ করতে পারেন নি। রাজার ক্ষমতাকে তিনি খোদা প্রদত্ত মনে করতেন।

বোদিনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সরকারী ক্ষমতার মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সরকারকে তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক দেখতে চাননি। এ ক্ষমতা শুধু রাষ্ট্রের কাছেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ব্যবহার পদ্ধতি নির্ধারণ করে সরকার পদ্ধতি কেমন হবে। বোদিনের মতে পার্লামেন্ট জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠান সার্বভৌমত্বের কোন অংশের দাবীদার হতে পারে না। কারণ এসব প্রতিষ্ঠান শুধু সরকারী ক্ষমতাই ব্যবহার করে। নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ ও রাজাকে উপদেশ দেয়ার মাধ্যমে তাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। রাজার ক্ষমতা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হওয়াকে তিনি সংগত মনে করতেন । তবে এ ক্ষমতায় মেয়েদেরকে তিনি অধিষ্টিত করা সংগত মনে করেন নি। শক্তিশালী ও সৎ রাজাকেই তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঠিক অধিকারী হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন যে, ধ্বংসযজ্ঞ ও জরুরী অবস্থা মোকাবিলা করার জন্যই রাজা সর্বোত্তম ব্যক্তি। এ্যারিষ্টটলের মত বোদিন মনে করতেন যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাষ্ট্র গঠনে সহায়ক নয়; বরং গনতান্ত্রিক ব্যবস্থাই বিপ্লবের জন্ম দেয়।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ ও আইন কাঠামোর পরিবর্তনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কোন ক্ষতি সাধিত হয় না বলে বোদিন দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করেন। তবে সার্বভৌম শক্তির উচিত জনগণের ইচ্ছা, অভিরুচী ও সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য ও অবস্থা বিবেচনা করে আইন প্রণয়ন করা। সরকার পদ্ধতিতে দেশীয় আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাব রাখা অত্যাবশ্যকীয়। তিনি দাস প্রথার নিন্দা করেছেন এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতাকে উৎসাহিত করেছেন। তিনি সরকারী ক্ষমতা ও ধন-সম্পদ অল্প কিছু লোকের হাতে কুক্ষিগত করাকে বিপদজনক ব্যবস্থা হিসেবে চিত্রিত করেছেন সত্য, কিন্তু আবার কিমিউনিস্ট টাইপের সাম্য ব্যবস্থা প্রত্যাখান করেছেন। তিনি শাসকদেরকে জনগণের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে বারণ করেছেন।

রাজাদেরকে ক্ষমতা ব্যবহারের ব্যাপারে তিনি সাবধান করেছেন এবং বিচার সংক্রান্ত কোন ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখতে নিষেধ করেছেন। রাষ্ট্র যে একটি মজবুত আইনগত ব্যক্তিসত্বার অধিকারী, এ ব্যাপারটিই বোদিনের সার্বভৌমত্ব মতবাদে পরিস্ফুট হয়েছে। তবে বোদিন বিশেষ নজর রেখেছেন, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানগুলো ও ব্যক্তিদের প্রতি। রাষ্ট্রের সীমানায় কেউ যাতে রাষ্ট্রের আইনানুগ ব্যক্তি সত্বার কোন ক্ষতি করতে না পারে বা একে চ্যালেঞ্জ করতে না পারে, সে ব্যাপারে তিনি বেশ সচেষ্ট ছিলেন। আর এ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পেছনে কারণ হিসেবে কাজ করেছে তৎকালীন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা। বোদিন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, পোপ ও সামন্ত প্রভুদের দৌরাত্ম্য কমাতে না পারলে পূঁজিবাদী ব্যবস্থার উথান সম্ভব নয়। পূঁজিবাদী ব্যবস্থায় উত্তরণ মানেই ছিল অধিকতর সহজ শর্তে উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ লাভ।

www.pathagar.com

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ফ্রান্সের অন্তর্ভূক্তির জন্য প্রয়োজন ছিল, খৃষ্টান পুরোহিত ও সামন্ত প্রভুদের শোষণ থেকে ফ্রান্সের অধিবাসীদের মুক্ত করা। রাজার হাত শক্তিশালী করা, গৃহযুদ্ধ বন্ধ করা, সারাদেশে একই কেন্দ্রীয় আইন বলবৎ করা।

এ সমস্ত কারণেই বোদিন সার্বভৌমত্বের আভ্যন্তরীণ দিকে নিয়েই বেশী কথাবার্তা বলেছেন। তিনি রাষ্ট্রের বহিঃদেশীয় ব্যাপারে তেমন একটা আগ্রহ প্রাকাশ করেননি। বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করাকে তিনি কোন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য গৌরবজনক মনে করতেন না। অর্থাৎ তিনি মনে করতেন যে, প্রতিটি রাষ্ট্রেরই উচিত অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হওয়া, যাতে সে সত্যিকার অর্থে সার্বভৌমত্বের অধিকারী হতে পারে। ম্যাকিয়াভ্যালির সাথে দ্বিমত পোষন করে বোদিন বলেন যে, প্রতিটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের উচিত আর্ন্তজাতিক চুক্তি মেনে চলা, বিশেষ করে যদি তা সুবিচার মূলক হয়।

হুগো গ্রটিয়াস

হুগো গ্রটিয়াসকে আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের জনক বলা হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সার্বভৌমত্বের সাথে জড়িত বিভিন্ন সমস্যাদি নিয়ে গবেষণার ফসলই তাকে আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য এনে দিয়েছে। ১৬২৫ সালে প্রকাশিত তাঁর " De Jure Belli De Pacis", একটি আর্ন্তজাতিক আইন ব্যবস্থার নমুনা পেশ করে। তার পূর্বসূরীদের থেকে শুরু করে রোমান ও গ্রীক আইন ব্যবস্থা পর্যন্ত গমন করে সকল মূল্যবান রসদ সংগ্রহ করেছিলেন তিনি নিজ মতবাদের জন্য। তিনি আর্ন্তজাতিক আইনকে আইনতত্ত্ব ও নীতি শাস্ত্র থেকে আলাদা করার প্রয়াস চালান। তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, মূলতঃ যুদ্ধ ও শান্তির ব্যপারে সকল জাতির মাঝেই একই ধরণের সাধারণ আইন বিদ্যমান।

গ্রটিয়াসের জন্ম হল্যান্ডে। তিনি ছিলেন একজন আইনজীবি। তিনি বিভিন্ন সরকারী কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং বিভিন্ন মিশন নিয়ে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে ভ্রমন করেন। তিনি প্রত্যাক্ষভাবে ইংল্যান্ড, স্পেন ও নিজ দেশের ধর্মীয় ও সামাজিক গোলযোগের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তিনি নিজ মাতৃভূমি নেদারল্যান্ডের মত ক্ষুদ্র দেশটির শান্তি ও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও স্পেনের গোলযোগও তাকে ভীষনভাবে নাড়া দেয়। তিনি একথা বুঝতে পারেন যে, ইউরোপীয় শক্তিশালী দেশগুলোতে স্থিতিশীল নিয়মতান্ত্রিক সরকার না থাকলে, তা যে কোন সময় তার নিজ দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকী হয়ে পড়বে। তাই তিনি কিছু সার্বজনীন নীতিমালার সন্ধানে গবেষণা চালান। তার বিশ্বাস ছিল যে, প্রতিটি দেশই যদি একই ধরণের সার্বভৌমত্বের নীতি অনুসরণ করে, তবে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কেও সার্বজনীন নীতিমালা অর্জন করা কঠিন হবে না। গবেষণার ফলে তার বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, প্রকৃতিতেই এমন সব নীতিমালা রয়েছে, যা প্রত্যেকের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করতে চায়। মানুষের কাজ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম শক্তিকে এমন হাতে ন্যস্ত কর, যাতে তা সার্বিক শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে যায় এবং

www.pathagar.com

যুদ্ধের পরিস্থিতিতে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়। মূলতঃ গ্রটিয়াসের মতবাদের প্রধানমত বিষয় হচ্ছে প্রকৃতিক আইন, আর্ন্তজাতিক আইন ও সার্বভৌমত্ব। এ তিনটি বিষয়কে তিনি একই শান্তির সূত্রে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।

গ্রটিয়াস প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুই অত্যবশ্যকীয় ন্যায়-নীতি মূলক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাই তিনি চেয়েছিলেন মানুষ ও জাতির মাঝেও যেন একই ধরণের সুবিচার এবং ন্যায়-নীতি বোধ বিরাজ করে। তিনি আইনকে দু'ভাগে ভাগ করেন। যথা Nautral law (প্রাকৃতিক আইন) ও Voluntary law (ইচ্ছধীন আইন)। প্রাকৃতিক আইনে এমনিতেই সঠিক যুক্তি ও ন্যায়-নীতি বোধ বিরাজ করে। আর তাই তা ঐশ্বরিক সূত্রের সাথে আবদ্ধ। প্রাকৃতিক আইনকে তিনি চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই একে অপরের সাথে মিশতে চায়। এটি হচ্ছে মানুষের সামাজিক প্রবৃত্তি (social instinct)। আর মানুষের এ সামাজিক প্রবৃত্তি মূলতঃ প্রাকৃতিক আইনেরই অংশ। কাজেই সামাজিক অস্থিত্বের জন্য মানুষও কিছু বিধি-বিধান তৈরী করবে এটাই স্বাভাবিক। আন্তর্জাতিক আইনকেও তিনি ইচ্ছাধীন আইনের অর্ন্তভূক্ত করেছেন। সবচাইতে মজার ব্যাপার হচ্ছে, ঈশ্বরের নির্দেশও ইচ্ছাধীন আইনের অর্ন্তভূক্ত হতে পারে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে মানুষ সৃষ্টি করে খোদা মানব জাতিকে স্বর্গীয় ইচ্ছাধীন আইন (Divine voluntary law) দান করেছেন। অর্থাৎ তিনি একদিকে খোদার আইনকে প্রাকৃতিক আইন থেকে আলাদা করে ভেবেছেন, অন্যদিকে প্রাকৃতিক আইনকে আন্তঃজাতীয় সম্পর্ক নির্নায়ক আইন থেকে পার্থক্য করেছেন। তবে সুবিচার মূলক আইন সৃষ্টির জন্য প্রাকৃতিক আইনের সাথে সামঞ্জস্য মূলক বিধানের লাভ ও তার অনুসরণ করা জরুরী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

গ্রটিয়াস প্রাকৃতিক ও আর্ন্তজাতিক আইনের ধারনা ব্যক্ত করতে গিয়ে বার বার সার্বভৌমত্বের ধারণার দিকে ফিরে এসেছেন। কারণ অন্যথায় তাঁর মতবাদ ভিত্তিহীন হয়ে পড়ত। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেও সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি কোন ধারণা দেননি। রাষ্ট্রকে তিনি মুক্ত স্বাধীন মানুষের মিলন ক্ষেত্র হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাঁর মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে আইনের মাধ্যমে সকলের নিরাপত্তা বিধান করা এবং সকলের জন্য কল্যাণকর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাপারে তিনি গ্রীক ও রোমান দর্শনের একটি মিশ্ররুপ দেখানোর চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ মানুষ প্রাকৃতিক কারণেই শুধু নয়, বরং রাষ্ট্রের প্রয়োজনীতার কথা ভেবেও রাষ্ট্র সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। গ্রটিয়াসের সার্বভৌম ধারণার অনেক কিছু বোদিন ও Suarez থেকে ধার করা মনে হতে পারে। সার্বভৌমত্বকে তিনি রাষ্ট্রের এমন চুড়ান্ত ক্ষমতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যে ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য। বাস্তবে তিনি ইউরোপীয় দেশসমূহের জন্য সার্বভৌমত্বের প্রয়োগ কল্যাণকর মনে করেছেন। কারণ সব রাষ্ট্রকে যদি সার্বভৌমত্বের অধিকারী হতে হয়, তবে তাদেরকে অন্যের প্রতি বেশী সচেতনতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হয়। অন্যথায় রাষ্ট্রগুলো তাদের সার্বভৌমত্বের প্রমাণ দেয়ার জন্য

www.pathagar.com

যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে একে অপরের সাথে। মূলতঃ গ্রটিয়াসের দেখা ইউরোপ যুদ্ধ ও গোলযোগ দ্বারা বিধ্বস্থ, তাই তার সার্বভৌমত্বের ধারণা প্রকৃত প্রস্তাবে সার্বভৌমত্বের বহিঃদেশীয় বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষন মাত্র।

যদিও গ্রটিয়াস **External aspect of sovereignty** নিয়ে বেশী ব্যস্ত ছিলেন। তবূও সার্বভৌমত্বের আভ্যন্তরীণ দিকের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন না। তিনি জনগণের সার্বভৌমত্বকে একদিকে ভয় পেয়েছেন, আবার অন্যদিকে পরোক্ষভাবে কিছুটা অনুমোদন দিয়েছেন। তাঁর মতে সরকার পদ্ধতি নির্বাচনে জনগণ স্বাধীন। তবে একবার সরকার পদ্ধতি ঠিক হয়ে গেলে সবাইকে বাধ্যতামূলক তা মানতে হবে। অর্থাৎ তিনি রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁর মাঝেই জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তার পরিস্থিতি দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তবে তাঁর মতবাদের সবচাইতে বড় কথা, সকল রাষ্ট্রই একই ধরনের সার্বভৌমত্বের অধিকারী এবং সব রাষ্ট্রের উচিত প্রতিটি রাষ্ট্রকে একই ধরণের সার্বভৌমত্ব অর্জনে সাহায্য করা। এই ধারণাকেই আমরা আধুনিক রাষ্ট্রের গতানুগতিক **(Typical)** সার্বভৌমত্বের ধারণা বলতে পারি।

www.pathagar.com

সার্বভৌমত্বের মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলী

সার্বভৌমত্বের যে সব মতবাদ আলোচিত হয়েছে, তাতে এর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়ে। বিভিন্ন মতবাদের মাঝে যথেষ্ট পার্থক্য ও পরস্পর বিরোধিতা সত্ত্বেও সার্বভৌমত্বের ধারণার মাঝে এ সব বৈশিষ্ট্যের কোন না কোন প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়।

স্থায়িত্ব (Permanence) ঃ কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ব্যাপারটি রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের সাথে এমন ভাবে জড়িত যে, এটি রাষ্ট্রের মতোই স্থায়িত্বের অধিকারী। রাষ্ট্রের ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত সার্বভৌমত্বেরও কোন বিলুপ্তি ঘটে না। একটি রাষ্ট্রের সরকার বৈধ বা অবৈধ দু'ভাবেই পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্নই থাকে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ধ্বংসকালের মধ্যে সার্বভৌমত্বের এ স্থায়িত্ব তার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সার্বজনীনতা (Universality) ঃ রাষ্ট্রের সার্বজনীনতা নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। রাষ্ট্র তার সকল নাগরিক ও সম্পদের উপর সমান ভাবে কর্তৃত্বের দাবীদার। তার কর্তৃত্ব আবার আইনানুগ ভাবে সকলের উপর সমান ভাবে প্রযোজ্য। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যে কোন ব্যক্তি বা সংঘকেই সে তার আইন মানতে বাধ্য করে। নাগরিকদের ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বের এ সার্বজনীনতার কোনই ব্যতিক্রম হবার কথা নয়। এমনকি কূটনৈতিক কাজে নিয়োজিত গ্রহীতা রাষ্ট্রের আইন থেকে দায়মুক্ত বিদেশী নাগরিকগণকেও গ্রহীতা রাষ্ট্র অবাঞ্ছি ত ঘোষণা করে বিদায় নিতে বাধ্য করতে পারে। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের এ সার্বজনীনতা দেশের বাইরে ও ভেতরে স্বীকৃত।

অবিভাজ্যতা (Indivisibility) ঃ সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের প্রাণবায়ু বা আত্মাতুল্য বলেই একে অবিভাজ্য হিসেবে কল্পনা করা হয়। এ সার্বভৌম শক্তিই রাষ্ট্রে সকল নাগরিককে এক সূত্রে বেঁধে দেয়। কাজেই চূড়ান্ত মাত্রায় প্রয়োগের স্বার্থে এর মৌলিক প্রকৃতির বিভাজন করা যায় না। আত্মার বিভক্তি যেমন শরীরকেই ধ্বংস করে দেয়, তেমনি সার্বভৌমত্বের খণ্ড-বিখণ্ড অবস্থা রাষ্ট্রের বিলুপ্তির কারণ হয়ে পড়ে। প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নানাভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু প্রয়োজনে ঐসব ক্ষমতা রাষ্ট্রের একক সার্বভৌমত্বের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য।

পূর্ণতা বা চরমতা (Absoluteness or illimitability) ঃ রাষ্ট্রীয় সীমানায় বহু ধরণের কর্তৃত্ব থাকা খুবই স্বাভাবিক । কিন্তু সার্বভৌমত্ ছাড়া বাকী সব কর্তৃত্বই পরনির্ভরশীলতায় ভোগে। সার্বভৌম শক্তি অন্য সব ক্ষমতার ধরণ বা প্রকৃতি পাল্টে দিতে পারে। কিন্তু সে নিজে যে কোন চরম শক্তি প্রদর্শণ করতে পারে। আইনের স্রষ্টা হিসেবে রাষ্ট্র অপরিসীম ক্ষমতার মালিক।

হস্তান্তর অযোগ্যতা (Inalienaity) ঃ সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগকারী হিসেবে কোন সরকারই সার্বভৌমত্ব কাউকে দান বা বিক্রি করে দিতে পারে না। সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের সব কিছুতেই এমনভাবে থাকে যে, এটি সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তরের অযোগ্য। কোন সরকার যদি এটিকে

www.pathagar.com

হস্তান্তর করতে চায়, তবে হয় ঐ সরকারের বিলুপ্তি ঘটবে বা রাষ্ট্রটিরই মৃত্যু ঘটবে। কোন রাষ্ট্রই সার্বভৌমত্বকে অন্যের হাতে দিয়ে বা রেখে নিজের অস্তিত্বের কথা চিন্তা করতে পারে না।

এককত্ব (Exclusiveness) ঃ একই রাষ্ট্রের একাধিক সার্বভৌমত্বের কথা চিন্তা করা যায় না। একই সীমানায় একাধিক সার্বভৌমত্বের দাবীদার থাকা মানেই রাষ্ট্র সৃষ্টি না হওয়া। একটি রাষ্ট্রের চূড়ান্ত সার্বভৌম শক্তির একক হবে একটিই, এটিই সার্বভৌমত্বের দাবী। অন্যথায় রাষ্ট্র অচল হয়ে পড়তে পারে যে কোন সময়।

সর্বব্যাপিতা বা ব্যাপকতা (All Comprehensiveness) ঃ সার্বভৌমত্বকে শুধু এককত্বের বৈশিষ্ট্যের হলেই চলবে না। তার এককত্ব সর্বজনবিদিত ও সর্বজনগ্রাহ্য হতে হবে। রাষ্ট্রের ভেতরে কেউ সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করে টিকে থাকতে পারে না। চ্যালেঞ্জকারী শক্তি যে বা যারাই হোক, রাষ্ট্র তার সর্বব্যাপিতার গুণেই তাকে জব্দ বা শায়েস্তা করতে পারবে।

অনন্যতা বা মৌলিকত্ব (Originality) ঃ সার্বভৌমত্ব তার কর্তৃত্ব কারো কাছ থেকে ধার করে আনে না। সে নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অনন্য সাধারণ। তার ক্ষমতার উৎস সে নিজেই। কারো দয়া বা দাক্ষিণ্য তার প্রয়োজন নেই। সে নিজেই সবাইকে দয়া বা করুণা করতে পারে।

স্বরূপে লুক্কায়িত থাকা (Imprescriptibility) ঃ সার্বভৌম শক্তি যখন-তখন তার নিজ মূর্তি প্রকাশ করবে, এমন কোন কথা নেই। কখন সে কি পরিমাণ শক্তি প্রদর্শন করবে বা কি পরিমাণ লুক্কায়িত রাখবে এ ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। চরম ক্ষমতা প্রয়োগ করা থেকে যদি সার্বভৌমত্ব নিজকে কিছুদিন বিরত রাখতে চায়, তবে কেউ তাকে বাধ্য করতে পারে না ক্ষমতা প্রয়োগ করতে। আর এজন্য তার অস্তিত্ব অস্বীকারও করা যায় না।

সার্বভৌমত্বের প্রকারভেদ

সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্যাদির আলোচনা থেকে এ কথা পরিষ্কার যে, সার্বভৌমত্ব সব সময়ই একইরূপে এবং একইভাবে থাকতে পারে না। আর তাই সার্বভৌমত্বের পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের জন্য এর প্রকারভেদ জানা প্রয়োজন। সার্বভৌমত্বের প্রকার ভেদ বলতে মূলতঃ বিভিন্ন ধরণের সার্বভৌমত্বকে বুঝায় না, বরং সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন রূপের কথা বুঝায়।

আইনগত ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব (Legal Sovereighty and political Sovereignty) ঃ বিভিন্ন রূপের মধ্যে সম্ভবতঃ সার্বভৌমত্বের আইনগত ও রাজনৈতিক রূপই সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আইনগত সার্বভৌমত্ব মূলতঃ কোন সুনির্দিষ্ট চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষের প্রতি নির্দেশ করে। আইনের ভিতর দিয়েই কোন দেশের আইনগত সার্বভৌমত্বের প্রকাশ। প্রতিটি রাষ্ট্রের একটি চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ থাকে। এ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য প্রয়োজ্য। অর্থাৎ এ কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ বিধি-বিধান প্রণয়ন করে এবং সে সব নিয়ম-কানুন সকল আদালত কর্তৃক স্বীকৃত ও অবশ্য পালনীয়। আইনই হচ্ছে এ কর্তৃপক্ষের মানদন্ড ও অস্ত্র। যে

www.pathagar.com

ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ রাষ্ট্রীয় চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে আইন প্রণয়ন ও নির্দেশ জারি সহ সকল মাধ্যম ব্যবহার করে রাষ্ট্রের সকলের নিকট আনুগত্য দাবী করতে পারে, সে কর্তৃপক্ষই হচ্ছে আইনগতভাবে সার্বভৌম।

নৈতিকতা, ধর্মীয় নিয়ম-কানুন, দলীয় আইন-কানুন, এমনকি জনমতও যদি আইনগত সার্বভৌমত্বের বিপক্ষে থাকে, তবুও তার বাহ্যিক কর্তৃত্বের কোন প্রকার হের-ফের হয় না। আইনগত সার্বভৌমত্বের কোন মাধ্যমের সাথে সংঘর্ষে গিয়ে আচার আচরণের নিয়ন্ত্রণকারী অন্য কোন সূত্রের আশ্রয় বা অবলম্বন প্রার্থনা নিরর্থক। আদালতকে এ কথা বুঝিয়ে লাভ নেই যে, তার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত আইনটিই সঠিক নয় বা নৈতিকতা ও ধর্মীয় অনুশাসন বিরোধী আইনটিই তার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে। আদালতের রায়কে নিজ পক্ষে আনার জন্য আইনের সূত্র ধরেই চেষ্টা করতে হবে। রাষ্ট্রের অনুশাসন শুধু আইনের মানদন্ডেই বিবেচ্য। কোন আইন জনমতের সাথে কতখানি সংগতিপূর্ণ তাও বিচারকদের জন্য কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। দেশের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা আইন পাশ করেছে, তাই সকল আদালতে এটি সমভাবে প্রযোজ্য। সার্বোচ্চ আইন প্রণয়কারী সংস্থা একবার আইন প্রণয়ন করার পর, যতক্ষণ না সে নিজেই তা আবার রদ করল, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ আইনের পেছনে আইনগত সার্বভৌমত্বের সূত্রটি ক্রিয়াশীল বলে ধরে নিতে হবে। সকল প্রকার আইনবিদের কাছে আইনগত সার্বভৌমত্বই প্রকৃত সার্বভৌমত্ব। অস্টিন ও তাঁর দেশ ইংল্যাণ্ডে রাজা/রানী সমেত পার্লামেন্ট (King/ Queen-in-parliament) আইনগত সার্বভৌমত্বের অধিকারী। রাজা বা রানীকে সম্মত রেখে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্ট যে কোন আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং যে কোন অনুষ্ঠানিক আনুগত্যের দাবী করতে পারে।

এই যে আইনগত সার্বভৌমত্বের কথা আমরা বলছি, তার বৃহত্তর কোন ভিত্তি বা সূত্র ছাড়া এটি অচল হয়ে পড়তে পারে। আনুষ্ঠানিক আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে আইন যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তা বেশিদিন স্থায়ী হতে পারে না, যদি সমাজের প্রভাবশালী অংশ সচেতনভাবে ঐ আনুষ্ঠানিক আনুগত্যের প্রতি বাহ্যিক সমর্থন না যোগায়। আনুষ্ঠানিক আনুগত্যের জন্য আইন ছাড়া কোন সূত্রের ব্যবহার বাহ্যতঃ পরিলক্ষিত হয় না সত্য; কিন্তু আইন প্রণয়নকারী সংস্থা আইন তৈরি করার সময় তা দেশের প্রচলিত লোকাচার, ধর্মাচার, প্রথা ও নৈতিকতাকে বেমালুম ভুলে থাকতে পারে না; বরং এ সবের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাকে আইন প্রণয়ন করতে হয়। অন্যথায় আইন শুধু কাগজী বচন বা ছাপার লেখা রূপেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাই অধ্যপক ডাইসী বলেন, " আইনবিদ যে সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দেন, তার পশ্চাতে অপর একটি সার্বভৌমত্ব বিদ্যমান, যার নিকট আইনগত সার্বভৌমত্ব অবশ্যই মাথা নত করে।"

(Behind the sovereign which the lawyer recognises, there is another sovereign to whom the legal sovereign must bow)

আইনগত সার্বভৌমত্বকে যে আর একটি শক্তির তোয়াক্কা করে চলতে হয়, তাকেই আমরা রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব বলতে পারি। এ শক্তির উৎস হচ্ছে রাজনৈতিক সচেতনতা (political

www.pathagar.com

consciousness). রাজনৈতিক সচেতনতার কোন সুনির্দিষ্ট মাধ্যম বা সূত্র নেই। তাই রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বকে অত্যন্ত অনির্দিষ্ট ও অসংবদ্ধ অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। এখানেই আইনগত সার্বভৌমত্বের সাথে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের বৈপরীত্য। ভোট দানের মাধ্যমে, জনমতের মাধ্যমে, সাধাণরভাবে সমাজের মানুষের ন্যায়-নীতি বোধের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে, এমনকি ভোটারদের মনোভাবের মাধ্যমেও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। এ মাধ্যমের কোন একটি একক ভাবে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব সৃষ্টি করে না বা এর রূপ নির্ধারণ করে না, বরং এগুলো সহ আরো বহু মাধ্যম মিলেই কোন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। আর সেই রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের উপর ভিত্তি করেই আইনগত সার্বভৌমত্ব তার নিজ বর্ণ-গন্ধ, রূপ-রঙ, ইচ্ছা-অভিরুচির আনুষ্ঠানিকতা, সুনির্দিষ্ট ও চূড়ান্ত আকার নির্ধারণ করে আইনরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

আইনগত ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের মাঝের পারস্পরিক তাত্ত্বিক ও বাস্তব সম্পর্কটি বেশ জটিল। তবে সার্বভৌমত্বের এ দু'টি দিকের যত বেশি সমন্বয় করা যায়, ততই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়। চূড়ান্তরূপে দু'টিকে একই ভাবে একই রূপে পাওয়া খুবই কষ্টকর ব্যাপার। তবে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে চূড়ান্ত রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব ও আইনগত সার্বভৌমত্বের মাঝে তেমন বড় ধরণের কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। আইন তৈরি ও রাষ্ট্রীয় আদেশ জারি করার প্রক্রিয়ায় যদি সমগ্র নাগরিক মণ্ডলী সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে, তবেই এ দুই ধরণের সার্বভৌমত্বের মাঝে প্রায় পরিপূর্ণ সমন্বয় সাধন সম্ভব। কিন্তু আধুনিক যুগে সমগ্র নাগরিকমণ্ডলীর পক্ষে চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রকৃতি ও প্রয়োগের ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ অসম্ভব। তাই জন্ম নিয়েছে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। এ পরোক্ষ গণতন্ত্রের যুগে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের মালিক হচ্ছে সমগ্র নির্বাচকমণ্ডলী। আর আইনানুগ সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত থাকে আইন পরিষদের হাতে। কিন্তু প্রয়োগের ব্যাপারটি আরো জটিল। সমগ্র নির্বাচকমণ্ডলী এমনকি নির্বাচনে পর্যন্ত অংশগ্রহণ করে না। খুব কম দেশেই শতকরা ৫০ ভাগের বেশি ভোটার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। আবার আইন পরিষদের সব সদস্যই যে কোন আইনের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করবে, এমনটি আশা করা যায় না। তাছাড়া আইন প্রণয়ন করার জন্যও এটা জরুরী নয়। আইন প্রণয়ন ও রদ করার জন্য শুধু আইন পরিষদের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যের সম্মতিই যথেষ্ট।

তাহলে দেখা যাচ্ছে এই দুই ধরণের সার্বভৌমত্বের মাঝে বিরোধ দেখা দেয়া খুবই স্বাভাবিক। আর এ বিরোধের মাত্রা দু'দিক থেকেই বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সব সময় থেকেই যায়। বিরোধ দেখা দিলে আইনগত সার্বভৌমত্বই বহাল থাকে, যদি না কোন জনসমর্থনপুষ্ট সফল বিপ্লব অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। জনসমর্থন পুষ্ট বিপ্লবের চাইতে বাস্তবে যা ঘটে, তা হচ্ছে অবৈধ বা অসাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতা দখল। এ ক্ষেত্রে আদালত আইনানুগ সার্বভৌমত্বকেই মেনে চলে। কিন্তু এতে সুবিচার ও সুশাসন ব্যাহত হয়। কোন সমাজের

রাজনৈতিক সচেতনতা ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আইন মান্য করার উপরই নির্ভর করে সার্বভৌমত্বের এই দুই রূপের সমন্বয় সাধনের প্রকৃতি ও তার সার্থকতা।

নাম সর্বস্ব ও প্রকৃত সার্বভৌমত্ব (Titular Sovereighty and Real sovereignty) ঃ রাজনৈতিক ও আইনগত সার্বভৌমত্বের আলোচনার সাহায্যে সার্বভৌমত্ব প্রয়োগের সমগ্র ব্যাপারটি পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে না। কারণ আইনগত সার্বভৌমত্বের অধিকারী কর্তৃপক্ষের স্বরূপ সকল দেশে একই রূপে হয় না। আদি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাজারাই মূলতঃ রাষ্ট্রের প্রকৃত সার্বভৌমত্বের অধিকারী ছিল। নাম সর্বস্ব সার্বভৌমত্বের তেমন কোন স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেত না।কিন্তু ধীরে ধীরে রাজা-বাদশাহদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়ে। বর্তমানে ইংল্যাণ্ডই নাম সর্বস্ব ও প্রকৃত সার্বভৌমত্বের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টিকারী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইংল্যাণ্ডে সমগ্র শাসন ব্যবস্থা রাজা বা রানীর নামেই পরিচালিত হয়ে থাকে। অথচ প্রত্যক্ষ ভাবে কোন শাসন কাজই তিনি করেন না। তাই বলা হয়ে থাকে ব্রিটেনের রাজা বা রানী " রাজত্ব করেন মাত্র, শাসন করেন না।" কাজেই ইংল্যাণ্ডের রাজা রানী নাম সর্বস্ব সার্বভৌমত্বাধিকারীর উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। প্রকৃত সার্বভৌমত্বের অধিকারী হলো ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্ট। ঠিক এই যুক্তি ব্যবহার করে আজকের উন্নত বিশ্বের সকল রাজা বা রানীকেই নাম সর্বস্ব সার্বভৌমত্বের প্রতীক ধরা যায়। ইংল্যেণ্ডে ও ফ্রান্সে এ ধরণের ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে যথাক্রমে ১৬৮৮ ও ১৭৭৯ সালের বিপ্লবের পর। রুশ সাম্রাজ্যের জারদের ক্ষেত্রে এ নিয়ম কখনোই পুরোপুরি কার্যকর ছিল না, তবে ১৮ ও ১৯ শতকে পূর্বের তুলনায় জারদের ক্ষমতাও অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল।

বর্তমানে যে সব রাষ্ট্রে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার প্রবর্তিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটির প্রেসিডেন্টকেই নাম সর্বস্ব সার্বভৌমত্বের প্রতীক বলা যায়। এ দৃষ্টিতে বর্তমানে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের আইনগত অবস্থা খুবই কাছাকাছি। কিন্তু পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তুলনামূলকভাবে বেশি শক্তিশালী। বেনজীর ভুট্টোকে ১৯৯০ সালে ক্ষমতাচ্যুত করে প্রেসিডেন্ট গোলাম ইসহাক খান প্রমাণ করেছেন যে তিনি শুধু নাম সর্বস্ব সার্বভৌমত্বাধিকারীই নন, বরং তার চাইতে আরো কিছুটা বেশি। সংসদীয় পদ্ধতির সরকার যেখানেই প্রতিষ্ঠানিক দুর্বলতায় ভোগবে, সেখানেই প্রেসিডেন্ট নাম সর্বস্ব সার্বভৌমত্বাধিকারী হওয়া সত্বেও মাঝে মাঝেই সে প্রকৃত সার্বভৌমত্বাধিকারীর মতো আচরণ করার সুযোগ লাভ করবে। যে সকল রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য ও মজবুত আইন ব্যবস্থা লালিত নয়, সেখানে এ ধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটা বিচিত্র কিছু নয়।

বাস্তব সার্বভৌমত্ব ও আইনসম্মত বা আইনানুমোদিত সার্বভৌমত্ব (De facto sovereignty and De jure sovereignty) ঃ ইতিহাসের বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই বা রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন সন্ধিক্ষণে সার্বভৌমত্বের ব্যহ্যিক হাত বদলের প্রক্রিয়ায় বাস্তব

www.pathagar.com

ও আইনসম্মত সার্বভৌমত্বের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। সহজভাবে বলতে গেলে যখন কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দল রাষ্ট্রের ভেতরে প্রায় সকলের উপরে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ সে বা তারাই বাস্তব সার্বভৌমত্বের অধিকারী। লার্ড ব্রাইসের ভাষায়ঃ ঐ ব্যক্তি বা ব্যক্তি বর্গই বাস্তব সার্বভৌমত্বের অধিকারী এবং প্রকৃত আনুগত্য প্রাপ্ত হয়, যে বা যারা তাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে সমর্থ, হোক সে ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য আইন সম্মত বা আইন বিরুদ্ধ। (The person or a body of pesons who can make his or their will prevail whether with the law or against the law; he or they, is the de facto ruler, the person to whom obedience is actually paid)

বাস্তব সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে আইনের অবস্থান মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। যারা সার্বভৌম ক্ষমতার দাবীদার, তারা যদি তাদের ইচ্ছাকে রাষ্ট্রের ভিতরে কার্যকর রাখতে পারে, তা হলেই যথেষ্ট। সে শক্তির ইচ্ছা ও অনিচ্ছার ব্যাপারটি কতখনি আইনসম্মত তা আদৌ বিবেচ্য নয়। জনগণ তাদের স্বাধীন ইচ্ছায় নাকি পরিস্থিতির শিকার হয়ে বাস্তব সার্বভৌম শক্তির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, বাস্তব সার্বভৌমত্বের জন্য তাও কোন পুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।

মুসোলিনী, হিটলার ও স্ট্যালিনের মতো নেতারা মূলতঃ বাস্তব সার্বভৌম শক্তিই প্রয়োগ করেছিলেন। জনগণের ইচ্ছা–অনিচ্ছা ও ন্যায়–নীতির বিবেচনায় এর বৈধতা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। মিশরের প্রেসিডেন্ট নাজীব বা পাকিস্তানের আইয়ুব খান বা ইয়াহিয়া খান যেভাবে ক্ষমতা দখল করেছিলেন, তাতেও আইনের বৈধতার কোন বালাই ছিল না। ১৯১৭ সালে বলশেভিকারা যখন ক্ষমতা দখল করেছিল, তাও আইন সম্মত ছিল না। কিন্তু বাস্তব ভাবে সার্বভৌম শক্তির প্রয়োগকারী দল বা গোষ্ঠী কোন না কোন ভাবে তাদের ক্ষমতাকে আইন সম্মত করে নেয়। অধ্যাপক গার্ণারের মতে, " স্বীয় ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ সার্বভৌম শক্তিই স্বাভাবিক ভাবে সময়ের বিবর্তনে জনগণের নীরব বশ্যতা বা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির মাধ্যমে আইন সম্মত সার্বভৌম শক্তিতে পরিণত হয়, ঠিক যেমন ভাবে দীর্ঘকাল ভোগ দখল স্বত্বের মাধ্যমে প্রকৃত দখল আইনম্মত মালিকানায় রূপান্তরিত হয়।" (The sovereign who succeeds in maintaining his power usually becomes in the course of time the legal sovereign, though the acquiscence of the people or the recognition of the state, somewhat as actual possession in private law sipens into legal ownership through prescniption) এক কথায় বলতে গেলে বাস্তবে সার্বভৌমত্ব কোন রাষ্ট্রের বা কর্তৃপক্ষের জন্য একটি সামাজিক অবস্থা মাত্র। যুদ্ধ বা বিপ্লবের সময় ক্ষমতার দাবীদার বা ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সমর্থ দল বা গোষ্ঠী, পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে হয় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে বা ক্ষমতাকে আইন সম্মত করে তুলতে সমর্থ নয়।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ একটি De facto স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। প্রবাসী বাংলাদেশী সরকারই ছিল বাস্তব সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। ১৬ই ডিসেম্বরের

www.pathagar.com

বিজয় বাস্তব সার্বভৌমত্বকে আইন সম্মত সার্বভৌমত্বে রূপান্তরিত করে। আইনানুমোদিত সার্বভৌমত্ব আভ্যন্তরীণ ভাবে যেমন আইন দ্বারা স্বীকৃত, বহির্বিশ্বেও তার সর্বজনবিদিত স্বীকৃতি থাকে। ১৯৯১ সালে তিনটি স্বাধীন বাল্টিক রাষ্ট্র সৃষ্টির ঘটনাবলী এই বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার করে তোলে। মূলতঃ ১৯৮৯ সাল থেকেই সাবেক এ তিনটি প্রজাতন্ত্র মস্কোর কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নাগপাশ থেকে মুক্ত ছিল। কিন্তু তাদের এ স্বাধীনতা মস্কো স্বীকার করেনি, বাহির্বিশ্বেও এর কোন স্বীকৃতি ছিল না। ১৯৯১ সালের আগষ্ট মাসে তিনটি বাল্টিক রাষ্ট্রই মস্কো ও ওয়াশিংটন থেকে একত্রে স্বীকৃতি লাভ করে। যদি গর্বাচেব এ বাল্টিক রাষ্ট্রগুলোর বাস্তব সার্বভৌমত্বকে নিঃশেষ করে দিতে পারতেন, তবে এরা আর আইন সম্মত সার্বভৌমত্বে পৌছাতে পারতো না। ১৯৪০ সালে ষ্ট্যালিন এ তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্রের আইন সম্মত সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করেই এদেরকে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত করেন। ইতিহাসের সব ঘটনাই এ কথা প্রমাণ করে যে, শুধুমাত্র বাস্তব সার্বভৌমত্ব মূলতঃ একটি সাময়িক ও অপূর্ণাঙ্গ অবস্থা। এতে কোন রাষ্ট্রই বেশি দিন সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। শাসক ও শাসিত উভয় দলই নিজেদের স্বার্থে একে আইন সম্মত রূপ দিতে প্রয়াসী হয়।

জনগণের সার্বভৌমত্ব (Popular sovereignty) ঃ সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ। জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। এ সব উক্তি আজ বহুল প্রচলিত ও সর্বাধিক সমাদৃত। সার্বভৌমত্বের আর সকল রূপেই দ্রুত কালিমা পড়তে পারে। দেখা দিতে পারে সংকট। কিন্তু জনগণই সার্বভৌম–আধুনিক গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তি হিসেবে এর মূল অনেক বেশি বিস্তৃত। যদিও ধারণাটি আধুনিক, কিন্তু প্রাচীন রোমেও এর প্রচলন ছিল। মতবাদ হিসেবে জনগণকে সকল ক্ষমতার বা সার্বভৌমত্বের আধার মনে করা সহজ। কিন্তু এর রূপায়ন বাস্তবে ঘটানো যথেষ্ট কষ্ট সাধ্য ও জটিল ব্যাপার। তাই অতীতে এ ধারণার বিকাশ না ঘটে বরং রোম সভ্যতার পতনের পর এর বিলুপ্তিই ঘটেছিল। রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এ ধারণার অবলুপ্তির মূল কারণ। খৃষ্টীয় ষোল ও সতের শতকে রাজতন্ত্র বিরোধী প্রবল আন্দোলন ও সচেতনতাই আবার জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণাটিকে পূনরুজ্জীবিত করে। মধ্যযুগীয় রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নাগপাশ থেকে মুক্তি লাভের লক্ষ্যে জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণাটি খৃষ্টীয় সমগ্র বিশ্বে ব্যবহৃত হয়েছে। ওকহামের উইলিয়াম (William of Ocham) পদুয়ার মার্সিলিও (Marsilio of Padua) দৃঢ়কাণ্ঠে জনগণকেই প্রকৃত ও চূড়ান্ত সার্বভৌমত্বের মালিক ঘোষণা করলেও মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র–ব্যবস্থা ও জনগণের চিন্তা চেতনাকে তখন পর্যন্ত এ ধারণা বিশেষভাবে নাড়া দিতে সমর্থ হয়নি। ষোল ও সতের শতকে অ্যালথুসিয়াস ও জন লক জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণাটিকে কিছুটা হলেও জনপ্রিয় করে তোলেন। রুশোর চিন্তাধারা ও লেখনিতে এ মতবাদটি যেন হারানো জীবন লাভ করে। জনগণের সার্বভৌমত্বের তাত্ত্বিক দিকের প্রচার ও প্রসারে যেমন দারুণ গতির সঞ্চার হয়েছিল, তেমনি আঠারো শতকের ইউরোপীয় ও আমেরিকান বিপ্লবী ঘটনা প্রবাহ এর পক্ষে ইতিহাসের রায় ব্যক্ত করেছিল জোরালোভাবে। ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা

www.pathagar.com

যেন জনগণের সার্বভৌমত্বের গলায় চূড়ান্তভাবে বিজয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছিল। একদিকে রুশো সার্বভৌমত্বকে হস্তান্তরের অযোগ্য ঘোষণা করে একে চূড়ান্তভাবে জনগণের হস্তে ন্যস্ত করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন, অন্যদিকে আমেরিকান জননেতা জেফারসন জনসাধারণের জন্য শাসকবর্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার সংরক্ষিত রেখে সত্যিকার অর্থেই জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। আইন প্রণয়নে জনগণের সম্মতির ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হওয়ার কারণেই কার্যতঃ জনগণের সার্বভৌমত্ব কথাটি আধুনিক গণতন্ত্র চর্চার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণাটি আজ বিশ্বব্যপী বহুল প্রচলিত ও সমাদৃত হওয়া সত্ত্বেও সার্বভৌমত্বের এ ব্যাপারটি নিয়ে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমতঃ 'জনগণ' কথাটি বড়ই অস্পষ্ট। তার উপর 'জনগণের সার্বভৌমত্ব' ধারণাটি আরো দ্ব্যর্থক ও অনির্দিষ্ট। সাধারণতঃ 'জনগণ' বলতে রাষ্ট্রের অসংগঠিত সমগ্র জনগোষ্ঠীকে বুঝায়। সমগ্র জনগোষ্ঠীর জনমত যাচাই করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। অসংগঠিত ও অসেচতন জনগোষ্ঠীর পক্ষে সার্বভৌমত্বের অধিকারী হওয়া বা সে অধিকার প্রয়োগ করা মোটেই সম্ভব নয়। অধিকংশ রাষ্ট্রেই জনগণের ক্ষুদ্র একটি অংশ জনগণের নাম করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নেয়। তারা জনগণের গুণগান গায় ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে। অধিকংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তারা মূলতঃ সাধারণ জনগণের কেউ নয়। তবুও জনগণকে রাজনৈতিক শক্তির উৎস ধরলে এবং তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করতে পারলে সবচাইতে খারাপ শাসকশ্রেণীও জনগণের ইচ্ছা অভিরুচিকে সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করতে পারে না।

ব্যাপক অর্থে জনগণের সার্বভৌমত্ব চর্চার ব্যাপারটিকে যতই গণতান্ত্রিক ও আদর্শিক বলে মনে করা হোক না কেন, এর ব্যবহারিক জটিলতার কারণে এর সংকীর্ণ ধারনাটিই বেশি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সংকীর্ণ অর্থে জনগণের সার্বভৌমত্ব চর্চা মানে নির্বাচকমন্ডলীর ভোটাধিকার প্রয়োগ। এ অর্থেও জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণাটি ত্রুটিমুক্ত নয়। প্রথমতঃ নির্বাচকমণ্ডলী জনগণের একটি অংশ মাত্র। দ্বিতীয়তঃ ভোটার হওয়ার উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও নানা কারণে বহু নাগরিকের কোন ভোটাধিকার থাকে না। তৃতীয়তঃ বিরাট সংখ্যক ভোটার সর্বদাই ভোট দানে বিরত থাকে। আবার অন্যদিকে ভোটার নয় এমন জনগোষ্ঠী সরকার ও প্রশাসনযন্ত্রের উপর যথেষ্ট কার্যকর প্রভাব ফেলতে পারে। যেমন ছাত্র সমাজের এক বিরাট অংশই ভোটার নয়, অথচ অনুন্নত বিশ্বে সরকারের উপর তাদের আন্দোলনের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। একদিকে ভোটারদের অধিকাংশ অশিক্ষিত থাকায়, অন্যদিকে ছাত্ররা রাজনৈতিক ভাবে মাত্রতিরিক্ত সচেতন বিধায় এবং সংগঠিত ভাবে সরকারী কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করতে সমর্থ হয় বলেই তাদের গণতান্ত্রিক চর্চা রীতিমত সার্বভৌমত্ব চর্চায়ও রূপ নিতে পারে।

যারা সার্বভৌত্বের চর্চাকে সংকীর্ণ অর্থে দেখতে চান না, বরং সর্বদাই ব্যাপক অর্থে বুঝাতে চান, তারা গণভোটকে সত্যিকার অর্থে সার্বভৌমত্ব চর্চা বলেন। কিন্তু আধুনিক জনবহুল রাষ্ট্রে ঘন ঘন

www.pathagar.com

গণভোট অনুষ্ঠান ব্যয় বহুল ও কষ্ট সাধ্য। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র চর্চা তো রীতিমত অসম্ভব। অনেকেই আবার গণ-আন্দোলন বা বিপ্লবের মাধ্যমে আইন সম্মত সরকারের পরিবর্তনের অধিকারকেই মুলতঃ জনগণের সার্বভৌমত্ব বুঝাতে চান। কিন্তু ঘন ঘন গণ-আন্দোলন বা বিপ্লব শুধু স্থায়ী আইন ব্যবস্থারই পরিপন্থী নয়, বরং এটি জনগণেরই স্বার্থবিরোধী এবং নৈতিকতার মাপকাঠিতেও পরিত্যাজ্য।

জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণাটির পক্ষে ও বিপক্ষে যে যুক্তিই প্রদর্শিত হোক না কেন বা এর সুবিধা ও অসুবিধা যাই হোক না কেন, এটি নানা দিক থেকে আজ রাষ্ট্রীয় জীবনে কিছু বাস্তব প্রতিফলন ঘটায়। সংবিধান প্রণয়ন ও পরিবর্তন গন-ভোট ও সাধারণ নির্বাচন প্রক্রিয়া, গণপ্রতিনিধিগণের কাছে সরকারের দায়িত্বশীলতা, বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি সবই মূলতঃ জনগণের সার্বভৌমত্ব ধারণাটির বিভিন্ন ধরণের বহিঃপ্রকাশ। রাষ্ট্রীয় সকল ব্যাপারেই আজকাল দূরবর্তীভাবে হলেও এক ধরণের 'গন-নিয়ন্ত্রণ' (popular control) পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। তাই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে এক ধরণের 'গণ-সার্বভৌমত্ব' বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ, এর বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং এর প্রকারভেদের কোন আলোচনাই সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে বিতর্কের অবসান ঘটাবে না। তাছাড়া কোন প্রকারভেদ বা মতবাদই এ ধারনাটিকে স্পষ্ট করে তুলবে না, যদি একে খণ্ডিত করে দেখার চেষ্টা করা হয়। এ ধারণাটিকে অখণ্ডিত অবস্থায় দেখতে হবে। কোন বিশেষ মতবাদ বা প্রকারভেদ এর সঠিক রূপের কোন একটি দিক ধরেই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে হবে। আইন প্রণয়নকারী সংস্থার সার্বভৌমত্বের পাশেই রাজনৈতিক ও জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণা পোষণ করতে হবে। নাম সর্বস্ব ও প্রকৃত সার্বভৌমত্বকে একীভূত করেই বুঝতে হবে সার্বভৌমত্বের মূল স্বরূপ। ইতিহাসের পট পরিক্রমায় এক যোগে হিসাব কষতে হবে বাস্তব ও আইন সম্মত সার্বভৌমত্বের। তবেই রাষ্ট্রের আত্মা স্বরূপ সার্বভৌমত্বের ধারণাটি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে আইন ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্রদের হৃদয়পটে।

www.pathagar.com

আইন

তিন অক্ষরের " আইন" শব্দটির বর্তমান ধারণ ক্ষমতা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। শুধুমাত্র আভিধানিক বা বুৎপত্তিগদ অর্থ দিয়ে একে বুঝার সময় পেরিয়ে গিয়েছে বহু আগেই। কেবলমাত্র সংজ্ঞার সাহায্যে আজ আর আইনের বিভিন্ন দিক তেমন একটা সষ্ট করে ব্যাখ্যা বা বিচার বিশ্লষণ করা যায় না। তাই আইন সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনা দাবী করে কিছু মৌলিক দার্শনিক ব্যাখ্যা।

একজন আধুনিক নাগরিক প্রতিনিয়ত আইনের মুখোমুখী। কি পথে-ঘটে কি অফিস আদালতে, সর্বত্রই আইন তাকে ঘিরে রাখে। আইন যেন ন্যায়-অন্যায় দুভাবেই মানুষকে শান্তি ও শাস্তি দেয় প্রতিদিন। কখনও ইচ্ছায় আবার কখনও অনিচ্ছায় সে আইন মানে ও ভাঙ্গে। আইনকে মানুষ শুধু ভয় বা সমীহই করে না; তাকে সযত্নে লালন পালন করে, আবার এড়িয়েও চলে। তাই প্রশ্ন জাগে মানুষ কখন, কিভাবে "আইন" নামক এ জিনিসটির জন্ম দিয়েছে ? নাকি মানুষের অজান্তেই এটি আবির্ভূত হয়েছে ? আইনের এ দৌরাত্ব কি আদিকাল থেকেই চলে এসেছে ? কীভাবে আইন এত রিষ্ট-পুষ্ট হলো ? কোন কোন উৎস থেকে সে খাবার গ্রহণ করে ? তার কি মৃত্যু হওয়া সম্ভব নয় ? এসব প্রশ্নের সদুত্তরের জন্য যাত্রা শুরু করতে হবে অন্য একটি প্রশ্ন দিয়ে। আইন মূলত কি করে ? সাধারণত আমরা বলতে পারি, আইন বিচার করে, শাসন করে। অর্থাৎ বিবাদ- বিসংবাদ মীমাংসা করে; কাউকে শাস্তি দেয়, কাউকে আবার করে পুরস্কৃত। কিন্তু এ সব কিছুই হচ্ছে আইনের প্রয়োগের ফল। আইনের মূল কাজ হচ্ছে নিয়ম নীতি নির্ধারণ করা। অর্থাৎ কোনটা করা যাবে, আর কোনটা করা যাবে না, তা ঠিক করে দেয় আইন। এ বিচারে আইনকে একটি পরিমাপ যন্ত্রের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কোন কাজ, কথা, উদ্যোগ, অবহেলা বা নির্লিপ্ততা এ যন্ত্রের উপর ফেললেই সে বলে দেবে এটি তার দৃষ্টিতে বৈধ কি অবৈধ। বৈধ-অবৈধ ও ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি স্বরূপ এ যন্ত্রটির এত জটিলতার কারণ কি ? মানুষ সৃষ্টির জটিলতম প্রাণী। মানুষের সকল কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ ও পরিমাপ করাই হচ্ছে আইনের মূল কাজ। শুধু ব্যক্তি মানুষের নয়। পরিবার গঠন থেকে শুরু করে রাষ্ট্র-যন্ত্রের সাথে জড়িত মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডকেই আইন নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়াসী । আবার সরকারী-বেসরকারী ক্রিয়াকলাপ থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক ব্যক্তি ও সংগঠনের জন্যও সে নীতি নির্ধারনী ভূমিকা পালন করে।

আইন যদি শুধুমাত্র নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করেই শান্ত হতো, তাহলে হয়ত সে আজ আর এত জটিল রূপ ধারণ করত না। সে তার নিয়ম-কানুণের রক্ত-চক্ষু দিয়ে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। নিয়ন্ত্রণ করতে চায় সকল উল্লেখযোগ্য বস্তুর প্রাপ্তি ও

www.pathagar.com

গমনাগমন ক্ষমতাকে। তাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তিলে তিলে বেড়ে মহীরূপ পরিগ্রহ করতে তাকে শক্তি সঞ্চয় করতে হয়েছে অনেক। প্রতিযাগিতায় নামতে হয়েছে ধর্ম, প্রথা ও লোকাচারের মত শক্তিশালী আচার-আচারণ নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানের সঙ্গে। কখনও সে এদের সাথে সমরে নেমেছে। আবার কখনও বা করেছে মিতালী। কিন্তু কি বন্ধুত্বে, কি শত্রুতায় সে তার স্বকীয়তায় সর্বদা সমুজ্জল থাকতে স্বচেষ্ট হয়েছে। তার চলার পথে সর্বদাই যে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে এমন নয়, মাঝে মাঝে তাকে পরাজয়ও স্বীকার করতে হয়েছে। গ্রহণ ও বর্জনের প্রক্রিয়ায় আইন আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে তূলনামূলক ভাবে অনেক দ্রুত চলতে পারে বলেই, সে আজ এত বেশী ক্ষমতাবান। কখনও কখনও তার দৌরাত্বে রাষ্ট্র-যন্ত্র সরকার-যন্ত্র এমনকি রাজাধিরাজরা পর্যন্ত দিশেহারা হয়ে পড়ে। সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন কোন অংশকে আত্মাহুতী দিতে হয় আইনের চিতায়। কিন্তু তবুও সকল সভ্য সমাজ আইনকে পেতে চায় রক্ষ কবচ হিসেবে। বিধি যখন বাম হয়, সরকার যখন তার প্রতিপক্ষ হয়, তখনও মানুষ আইনের কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করে। কোন নির্দিষ্ট আইন যে বা যারা সৃষ্টি করে কখন কখনও ঐ আইন তার বা তাদের বিরুদ্ধেও কাজ করে। তাই সে কারণেই আইনের দার্শিনিক ভিত্তি যথেষ্ঠ প্রসারিত। সে জিনিসের দার্শিনিক ভিত্তি যত প্রসারিত, সে জিনিস নিয়ে চিন্তা-ভাবনার বৈচিত্রতাও ততবেশী। তাই আইনকে কোন ভাষায় সংজ্ঞায়িত করার পূর্বে আইন সম্পর্কিত কিছু মতবাদ আলোচিত হওয়া জরুরী।

আইনের বিভিন্ন মতবাদ

দার্শিনিক মতবাদঃ এ মতবাদ আইনকে কোন নির্দিষ্ট রূপে দেখার চাইতে একে সাধারণভাবে ন্যায়-বিচারের নৈতিক অনুশাসন সম্বন্ধীয় নীতিমালা হিসেবে ব্যখ্যা করতে আগ্রহী। এ মতবাদ কোন নির্দিষ্ট স্থানে বা কালে আইন কেমন ছিল বা আছে, তা নিয়ে বেশী মাথা ঘামাতে রাজী নয়। আইন ন্যায়-নীতির স্বপক্ষে কি-না, দূর্বলকে সবলের মোকাবিলায় রক্ষা করছে কি-না, এটিই তার মূল্য বিবেচ্য বিষয়। আইনের দার্শনিক মতবাদ মানুষকে এক অসাধারণ প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত করে। অর্থাৎ এ মতবাদ অনুসারে মানুষ যেখানে যেভাবেই বসবাস করুক না কেন সে নিজেই কিছু নীতি ও নিয়ম পদ্ধতি মেনে চলতে চায়। মানুষ নিজে ভাল সংস্কার বা বিধি বিধান দিয়ে নিজের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করেই ক্ষান্ত হয় না; বরং ঐসব নিয়ম-কানুন যাতে অন্যারাও পালন করে সে ব্যাপারেও তাকে যথেষ্ট সচেতন দেখতে পাওয়া যায়। এক কথায় বলতে গেলে আইন মানুষের এক প্রকার মজ্জাগত সৃষ্টি। আইন সুনির্দিষ্ট হতে হবে এমনও কোন কথা নেই। এ মতবাদ অনুসারে আইন সমাজে এবং মানুষের মাঝে এমনভাবেও বিরাজ করতে পারে, যা শুধু উপলদ্বিই করা যায় বা যার কার্যকারিতাই শুধু চোখে পড়ে। আইন নিজে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্টার ক্ষেত্রে অলীক ও নৈতিক নীতি মালার রূপ নিয়েই বিরাজ করতে পারে।

তুলনামূলক মতাবাদঃ এ মতবাদ আইনকে কোন অলীক বস্তু বা ধারণা হিসেবে দেখতে আগ্রহী নয়। এ মতবাদের মূল কথা হচ্ছে পৃথিবীতে সময় বিভিন্ন ধরণের আইন ব্যবস্থা চালু ছিল, আছে

www.pathagar.com

ও থাকবে। আইনের ছাত্রদের কাজ হচ্ছে, বিভিন্ন ধরণের আইন ব্যবস্থার তুলনামূলক বিচার - বিশ্লেষণ করে সুনির্দিষ্ট অভিমত ব্যক্ত করা।

কোন আইন ব্যবস্থাই যেহেতু এক দিনে গড়ে উঠেনি এবং সব সময়ই একই রূপে আত্মপ্রকাশ করেনি; তাই কোন আইন ব্যবস্থা সম্পর্কে চূড়ান্ত মতমত ব্যক্ত করা অনেক সময়ই কঠিন হয়ে পড়ে। কোন নির্দিষ্ট সময়েও নির্দিষ্ট রাষ্ট্রে একটি আইন ব্যবস্থা ভাল প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু সে ব্যবস্থাটিই অন্য সময়ে বা অন্যদেশে খারাপ ফলও বয়ে আনতে পারে।

তাই দার্শনিক মতবাদের ন্যায়-নীতির ব্যাপারটি যেমন অপেক্ষিক তেমনি তুলনামূলক মতবাদের সাহায্যে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণও জটিল। আজ যে আইন ব্যবস্থা ভাল, কাল সে আইন ব্যবস্থাই মন্দ বলে প্রতিভাত হতে পারে। এত দ্রুত পরিবর্তনশীল ভাল-মন্দের মাপকাঠি দিয়ে সঠিকভাবে সমস্যা মোকাবিলা করা দুরূহ হয়ে পড়ে।

সমাজতাত্ত্বিক মতবাদঃ এ মতবাদ অনুসারে আইন হচ্ছে সমাজিক বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফসল। সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্যই সমাজ আইন সৃষ্টি করে। সঠিকভাবে সমাজ ও সাধারণভাব মানুষ উপকৃত হয় বলেই মানুষ আইন সৃষ্টি করে এবং তা মেনে চলে। আইন যদি সমাজকে তার ফল দিতে ব্যর্থ হত, তাহলে মানুষ আইন মানত না। আইনের কাজ হচ্ছে মানুষের জন্য যত বেশী পারা যায় বৈধ সন্তুষ্টি বিধান করা। মানুষ নিজ ক্ষমতা বলে যা করতে পারে, সবই তাকে লাগামহীন ভাবে করতে দেয়া যায় না। আবার লাগামের শিকল যত পারা যায় শিথীল করেই বেশী মানুষের কল্যাণ সাধন আইনের লক্ষ্য। এ মতবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে Duguit, Krabbe ও Laski নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ঐতিহাসিক মতবাদ ঃ এ মতবাদ আইনকে ইতিহাসের সৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করে। অর্থাৎ আইন ইতিহাসের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধীর গতিতে সামাজিক প্রক্রিয়ার জন্ম লাভ করেছে।

বাহ্যিকভাবে আইনকে কোন রাষ্ট্র, দল বা গোষ্ঠীর সৃষ্টি বলে মনে হলেও, আইন মুলত সমাজে বিরাজমান পরিবেশ পরিস্থিতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ধর্ম ও নৈতিকতায় উপর ভিত্তি করে নিজ সৌধ গড়ে তোলে। আর এ সৌধটির ভিত্তি প্রস্তর ও শ্রীবৃদ্ধি গড়ে উঠে ইতিহাসের মালমশল দিয়ে। এ মতবাদ অনুসারে আইনের প্রকৃতি জানার জন্য মানুষকে আবাহমান কাল থেকে চলে আসা সামাজিক অবস্থায় সাথে নিবীড়ভাবে সংযুক্ত হয়ে আইনের উদ্ভব এবং এর প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করতে হয়ে। Savigny, Sir Henry Maine ও Zane এর নাম এ মতাবলম্বীদের মাঝে উল্লেখযোগ্য।

বিশ্লেষানত্মক মতবাদ ঃ এ মতবাদটি আইনকে সার্বভৌম শক্তির সুনির্দিষ্ট আদেশ-নিষেধ ও নিয়ম-নীতির সমষ্টি মনে করে। যেহেতু বেশী শক্তিমানের আদেশ কম শক্তিধর বা ক্ষমতাবা

www.pathagar.com

ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মানতে বাধ্য, তাই চূড়ান্তভাবে সার্বভৌম শক্তির নির্দেশই আইন হিসেবে টিকে থাকে। অপর সকল শক্তি, নিয়ম-কানুন ও রীতি-নীতি তার বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

এ মতবাদে আইন বুঝা বেশ সহজ হয়। সহজেই আইনের রূপ ও কার্যকরিতা প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু কম সমাজেই এরূপ আইনের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। রাজতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আধুনিক রাষ্ট্র সৃষ্টির ফলেই মূলত আমরা সরাসরি আইনকে রাজ-শক্তি বা রাষ্ট্র শক্তির সাথে এতবেশী নিবিড়ভাবে আবদ্ধ দেখতে পাই। ভিন্ন কথায় আধুনিক কালেই আইনকে এতবেশী কঠোর ভাবে রাষ্ট্র-শক্তি বিশেষ করে সরকারের করায়ত্ব দেখতে পাওয়া যায়। John Austin, Bentham and Hobbes কে আমরা এ মতবাদের প্রবক্ত বলতে পারি।

মার্ক্সীয় মাতবাদ ঃ অন্য কোন মতবাদই কোন ব্যক্তির নামে এমনভাবে পরিচিতি লাভ করেনি। কিন্তু আইন সম্পর্কিত কমিউনিষ্ট ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনা কোন ব্যক্তির নাম ধারণ করলো কেন ? এ প্রশ্নের অনেক উত্তর হতে পারে। তবে দুটি কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। কমিউনিষ্ট আদর্শ আইনের মৃত্যুতে বিশ্বাস করে। এ আদর্শ আইনকে শ্রেণী সংগ্রামের ফসল মনে করে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ আইনকে পুঁজিপতি ও পুঁজিবাদ ধ্বংস করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এক পর্যায়ে তাকে ধ্বংস করার ওয়াদা নিয়েই মাঠে নামে। যদিও বাস্তবে তেমনটি ঘটেনি। কাজেই কমিউনিষ্ট বা সমাজতান্ত্রিক আইন নাম না দিয়ে মার্ক্সীয় আইন নাম দেয়াতে পাঠক ও গবেষক সহ সকলের জন্যই ব্যাপারটি সহজ বোধ্য হয়েছে। তাছাড়া মার্ক্সীয় আইন-দার্শনের স্থপতি অবশ্যই কাল মার্ক্স ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস। যদিও এরূপ নামকরণ এঙ্গেলেসের প্রতি বেশ একটু অবিচারমূলক, তবুও বিশ্বব্যপী এ নামেই এটি পরিচিত।

মার্ক্সীয় আইন দর্শনের মূল কথাই হচ্ছে, সমাজের অতি ক্ষুদ্র একটি শ্রেণী আইনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে অধিকাংশ লোকের উপর জুলুম নির্যাতনকে বৈধ করে নেয়। দাসপ্রথায় দাসপ্রভূগণ, সামন্তবাদী সমাজে জমিদারগণ এবং পুঁজিবাদী সমাজে ধনিক-বণিক শ্রেণী সমাজের বাকী সকলের উপর শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য আইন সৃষ্টি করে এবং এর পরিবর্তন ঘটায়। আইন সৃষ্টিতে বাকীদের তেমন কোনই ভূমিকা নেই। এদিকে থেকে চিন্তা করলে মার্ক্সীয় আইন-দর্শন বিশ্লেষণাত্মক মতবাদের কিছুটা হলেও কাছাকছি। কিন্তু মার্ক্সীয় দর্শন যেহেতু সার্বভৌম শক্তির ধারক ও বাহক, সরকার-যন্ত্রটির মৃত্যু ঘটাতে চেয়েছে, তাই এর আইন-চিন্তা বাকী সকল মতবাদ থেকে দারুণভাবে আলাদা হয়ে পড়েছে। এ মতবাদ শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই আইনকে একটি প্রয়োজনীয় ক্ষতিকারক হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত, আর বাকী সব ব্যবস্থাতেই একে কেবলমাত্র ক্ষতিকারক ও নির্যাতনমূলক হাতিয়ার হিসেবে চিত্রিত করেছে।

বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক আইন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার কারণে মার্ক্সীয় আইন-দর্শন দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সত্য; তবে এ মতবাদ সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে গেছে এমনটি বলা যায় না। কারণ কোন দেশে যখনই অধিকাংশ মানুষ অর্থনৈতিকভাবে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের প্রকাশ্য শোষণের

www.pathagar.com

শিকারে পরিণত হবে, আর আইন নিরব ভুমিকা পালন করবে; সেখানেই আবার মার্ক্সীয় দর্শন হালে পানি পেয়ে যাবে। যেহেতু আধুনিক আইন ব্যবস্থার নিপীড়নমূলক দিক খুবই প্রচ্ছন্ন, তাই মার্ক্সীয় আইন ব্যবস্থার পূণর্জীবন প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়। তবুও কল্পনার জগতে সম্পূর্ণ শ্রেণীহীন, বৈষম্যহীন ও নিরঙ্কুশক সাম্যের রাজ্য কমিউনিজম কাউকে না কাউকে নাড়া দেবে। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের চিন্তার মত এত দীর্ঘস্থায়ী আবেদন মার্ক্সীয় আইন-দর্শনে থাকার সম্ভাবনা অবশ্য বড়ই ক্ষীণ বলে মনে হয়। কারণ আইনের মৃত্যু এখন পর্যন্ত কোথাও তরান্বিত হয়নি। বরং এটি আরো জৌলুস লাভ করছে। প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে এর প্রায়োগিক ক্ষমতা ও প্রভাব বলয়।

আইনের সংজ্ঞা

আইন বিষয়ক দার্শনিক চিন্তা এবং বিভিন্ন মতবাদের ভীড়ে আইনকে সর্বজন স্বীকৃতভাবে সংজ্ঞায়িত করা দুরূহ ব্যাপার। তবুও প্রতিটি ধারণার যখন কোন না কোন সংজ্ঞা দেয়া হয়, আইনের তেমনি বহু সংজ্ঞার সাথে আমরা পরিচিত হতে পারি। আইনের ছাত্ররা অতি সহজেই প্রতিটি সংজ্ঞার সবল ও দুর্বল দিক খুঁজে বের করতে পারে। কারণ প্রতিটি সংজ্ঞাই আইনের উৎসগত ও বৈশিষ্ট্যগত ব্যবহারিক কোন দিকের প্রতি বেশী মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। প্রথমেই আমরা অস্টিনের বিখ্যাত সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করব। অস্টিনের মতে, " Law is the command of the sovereign"

সার্বভৌম শক্তির নির্দেশই যদি আইন হয়, তবে আইনের পরিধি এতই ছোট হয়ে আসবে যে অধিকাংশ নিয়ম কানুনকে আইন বলেই অভিহিত করা যাবে না। যেমন, বিচার কার্যে ব্যবহৃত বহু আইন, যার প্রতি সার্বভৌম শক্তির সরাসরি কোন নির্দেশ নেই; সন্ধি থেকে উদ্ভূত আইনসমূহ- যেখানে সরকার হয় আদৌ কোন পক্ষ নয় বা পক্ষ হলেও এক তরফা ভাবে নির্দেশ দেয়ার ক্ষমতা তার নেই। তাছাড়া প্রথা, ধর্ম, লোকাচার বা কোন বিখ্যাত লোকের চিন্তা বা গবেষণা কর্মের যে সব অংশ সমাজে মূলত আইনের ভূমিকা পালন করে এবং সার্বভৌম শক্তি অনেক সময় ইচ্ছা করে ঐ সব আইনের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকে, সেসব নিয়ম-নীতিকে আইনের আওতা বর্হিভূত করে ফেলতে হবে। এক কথায় আইন ব্যবস্থাই তাতে অচল হয়ে পড়বে।

Holland একটু ভিন্নভাবে আইনকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তার মতে " More briefly, law is general rule of external human action enforced by a sovereign political authority. All other rules for the guidance of human action are laws merely by analogy; and propositions which are not rules for human action are laws by metaphor only."

এখানে একটি কথা স্পষ্ট হয়েছে যে আইনের কাজ কারবার শুধুমাত্র বাহ্যিক আচার আচরণ নিয়ে মনোজগতের বা যে সব আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-কলাপ কোনভাবেই অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না সে সব কর্মকাণ্ড আইনের আওতাধীন নয়। তবে অস্টিনের মত সার্বভৌম শক্তির উপর বেশী জোর এ সংজ্ঞাতেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। অবশ্য এ কারণেই হয়ত আইনকে শুধুমাত্র সাধারণ নিয়ম

www.pathagar.com

(general rule) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অথচ আমরা জানি আইন বলতে শুধু সাধারণ নিয়ম নীতিকেই বুঝায় না, বরং অসংখ্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন, ধারা-উপাধারাও আইনের সংসারের প্রত্যক্ষ সদস্য Gray-এর সংজ্ঞাটি অস্টিন ও হল্যান্ডের সংজ্ঞা দুটির দুর্বল দিক থেকে নিজকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছে। তার মতে " The law of the state or of any organised body of men is composed of the rules which the courts- that is, the judicial organs of that body-law down for the determination of legal rights and duties."

Gray আইনকে শুধু রাষ্ট্রের সৃষ্টি না বলে, অন্য যে কোন সংগঠিত প্রতিষ্ঠানেই আইন সৃষ্টি করতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে শর্ত হচ্ছে, সে সব আইন আদালত গ্রাহ্য হতে হবে এবং সকল আইন ও আদালতের মূল কাজই হবে আইনগত অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ। আইনের উৎপত্তিগত বিচারে Gray -এর সংজ্ঞাটি সম্প্রসারিত বটে, কিন্তু প্রয়োগের দিক থেকে এটি শুধুমাত্র আদালত পর্যন্তই সীমাবদ্ধ।

গধভমথরটঢমতত আইনকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেনঃ Law is "a set of rules imposed and enforced by a society with regard to the distribution and exercise of powers over persons and things."

Vinogradloff আইনকে রাষ্ট্র বা অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আরোপিত না বলে এক সমাজ কর্তৃক আরোপিত ও প্রতিষ্টিত বলেছেন। এতে উৎপত্তি ও প্রয়োগ উভয় দিক থেকেই আইনকে সম্প্রসারিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। অপর দিকে তিনি ব্যক্তি ও বস্তুর উপর কার কতখানি ক্ষমতা তা নির্ধারণ ও বন্টনকেই আইনের একমাত্র কাজ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পাই, আইন শুধু ক্ষমতা বন্টন করেই ক্ষান্ত নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে আইন বহু নৈতিক ও মানবিক স্বার্থ রক্ষা করে থাকে, যার সাথে ক্ষমতার সরাসরি তেমন কোনই সম্পর্ক নেই।

Woodrow Wilson আইনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, আইন হচ্ছে সমাজের নৈতিক অগ্রসরতাব প্রতিফলন।

আইনের উৎসের বিবেচনায় এটি একটি সফল ব্যাখ্যা। কারণ আইন তো সমাজে প্রচলিত চিন্তা চেতনা ও অভ্যাস থেকেই তার খাদ্য সংগ্রহ করে।

কিন্তু কোন নির্দিষ্ট আইন গঠনকারী উপাদান সমূহ সমাজে ঠিক যেভাবে বিরাজ করে, ঠিক সেভাবে তা ধরে রাখবে এমন কোন কথা নেই। সে বহু কাঁচামাল হজম করে নতুন উপাদান সৃষ্টি করে। প্রকৃতিতে আমরা দেখি পশু পাখি খাদ্য গ্রহণ করে নিজেই আবার মানুষের খাদ্যের জন্য উৎসর্গ করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এক খাদ্য অন্যের মাঝে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। চিন্তা-চেতনা, অভ্যাস ও আইনের ক্ষেত্রেও এরূপ নিয়ম দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই আইন সমাজে বিক্ষিপ্ত চিন্তা-ভাবনা ও আচার-অনুষ্ঠানকে গ্রহণ করে তাকে ঐ সমাজের জন্য সর্বজনীন রূপ দিতে প্রয়াস

www.pathagar.com

পায়। আর এ কাজটি যেহেতু সরকারী শক্তি ও ক্ষমতা দ্বারাই দ্রুত সম্পন্ন হওয়া সম্ভব, তাই Wilson একে সরকারের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। কিন্তু বাস্তবে আমারা বহু বেসরকারী আইন দেখতে পাই এবং সমাজে সার্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করে বহু আইনকে বহাল তবিয়তে চলতে দেখা যায়।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর সবল ও দুর্বল দিক বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আইনের কোন সার্বজনীন সংজ্ঞা দেয়া রীতিমত অসম্ভব ব্যাপার তাই বোধ হয় ঈফটডর্প্রমভণ একটু ভিন্নভাবে বলেছেনঃ "Law in its most general and comprehensive sense signifies a rule of action and is applied indiscriminately to all kinds of actions, whether animate or inanimate, national on international. Thus, we say the laws of gravitation, or optics or mechanics, as well as the laws of nature and of nations."

এ সংজ্ঞাটি প্রাকৃতিক জগতে ক্রিয়াশীল সকল নিয়ম কানুনকেই আইনের আওতাভুক্ত করতে প্রয়াসী। প্রাণিজগত ও বস্তুজগতে সর্বাদাই কোন না কোন আইন বা নিয়ম-কানুনকে আমরা কার্যকর দেখি। কিন্তু আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় একটু ভিন্ন প্রকৃতির। আমরা মূলত মানুষকে কর্মকান্ডের সাথে জড়িত রেখে তার জন্য সমাজ রাষ্ট্র ও সরকার-যন্ত্র কর্তৃত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ধারিত বা অনুসৃত নিয়ম-নীতিকেই আইন বলতে চাই। প্রাকৃতিক জগতের আইনকে আমরা বৈজ্ঞানিক বা আল্লাহ্‌র আইনের বিষয়বস্তু ভেবে "রাজনৈতিক" আইন থেকে আলাদা করে রাখতে চাই। এ দৃষ্টিতে নৈতিক আইন ও আলাদা প্রতিপাদ্য বিষয়। রাজনৈতিক আইন কথাটি একসাথে ব্যপক অর্থে ব্যবহৃত হলো। সমাজ বা রাষ্ট্রে প্রচলিত সকল নিয়ম কানুনকেই আমরা রাজনৈতিক আইন বলতে পারি। কারণ এসব আইন সৃষ্টি প্রয়াস ও বিলুপ্তির ব্যাপারে রাজনৈতিক মতাদর্শ, রাষ্ট্রনীতি ও সরকার পদ্ধতির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আইনের উৎস

আইন কি ? আইনের দর্শন কি ? আইনের সংজ্ঞা কি ? এসব প্রশ্নের উত্তর পূর্ণাঙ্গ রূপে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়, যদি না আমরা জানি আইনের উৎস সমূহের গতি-প্রকৃতি। কোন কিছুর উৎস, আর উৎসারিত জিনিস এ দুটিকে অনেক সময় একে অপর থেকে আলাদা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। মানুষের উৎস যদি মানুষকেই ধরি তাহলে অনাগত সকল মানুষই এক। আবার মানুষের উৎস যদি প্রকৃতি বা সৃষ্টিকর্তাকে ধরি তবে উভয়ের মাঝে স্রষ্টা ও সৃষ্টির পার্থক্য স্পষ্ট। কিন্তু তাই বলে মানুষকেও বহু কিছুর সৃষ্টা হতে বাধা দেয়া হয়নি। তেমনিভাবে আইন তার উৎস সমূহের সাথে এক জটিল বন্ধনে আবদ্ধ। আইনের উৎস সমূহের মাঝে ধর্ম, প্রথা, বিচারকের রায়, আইন সম্পর্কিত গবেষণা, ন্যায়পরতা, বৃটিশ কমন আইন, পৌর আইন, আইন সভার আইন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোন উৎস থেকে আইন নিজ বিশাল চাকচিক্যময় ইমারত তৈরী করেছে, তা জানার জন্য প্রতিটি উৎস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

www.pathagar.com

ধর্ম ঃ কথায় বলে প্রতিটি জিনিসের ধর্ম আছে। এখানে "ধর্ম" শব্দটি দিয়ে নিয়ম-কানুন বা আইন বুঝানো হচ্ছে। কিন্তু বস্তু বা মানুষ ছাড়া অন্য সব প্রাণীর ধর্মই ঐ বস্তু বা প্রাণী নিরপেক্ষ। অর্থাৎ অন্য সব জীব-জন্তু ঐ সব আইন না মেনে চলতে পারে না। সে তার স্বহজাত গুণেই ঐ সব নিয়ম-কানুন মেনে চলে। তার এ গুণকে এক ধরণের সৃষ্টিগত দুর্বলতাই বলা চলে। তবে প্রাণীকুলের মাঝে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বুদ্ধিমান প্রাণীরা এ দুর্বলতা কিছুটা কাটিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তা একেবারেই সাময়িক ও ব্যতিক্রম ধর্মীতায় জর্জরিত। কিন্তু মানুষ এসব দুর্বলতার অনেক উর্দ্ধে।

মানুষ শুধু বুদ্ধিই রাখে না, সে চিন্তাও করতে পারে। তার বিবেক আছে। আছে তার অফুরন্ত ইচ্ছা শক্তি। এ ইচ্ছা শক্তির বলেই সে ঠিক করতে পারে সে কোন ধর্ম (এখানে নিয়ম-কানুন বা আইনের সমষ্টি হিসেবেই ধরা ভাল।) গ্রহণ করবে বা প্রত্যাখ্যান করবে। কিন্তু অবাক ব্যাপার হচ্ছে মানুষই একমাত্র প্রাণী যে নিজের স্বহজাত ধর্ম (আভ্যন্তরীণ নিয়ম-কানুন) নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেনি। নীরবে এককী তার সৃষ্টার বন্দনা গেয়েও ক্ষান্ত হয়নি। সে স্বরবে, স্বগৌরবে তার সৃষ্টাকে ডাকার জন্য উপাসনায় সৃষ্টিতে তৎপর হয়েছে একেবারে আদি থেকে। এ প্রক্রিয়া কখনই বন্ধ হয়নি। আবিষ্কৃত হয়েছে নানা মতবাদ গোত্রীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, একেশ্বরবাদী আবার বহু ঈশ্বরাদী। কিন্তু সব ধর্মের মাঝেই কোথায় যেন ঐক্যতান রয়েছে। সবাই তার সৃষ্টাকে পেতে চায়। আবিষ্কার করতে চায় সৃষ্টার সান্নিধ্য লাভের নিয়ম-কানুন।

সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক করতে গিয়ে মানুষ দেখল সে কি দারুণভাবে অন্য সব সৃষ্টির সাথে জড়িত। তাই প্রতিটি ধর্মের একটা অংশ যেমন সৃষ্টি ও সৃষ্টির সম্পর্কের ব্যাপার; আবার এর আর একটা অংশ মানুষে-মানুষে এবং মানুষের সাথে অন্য সব প্রাণীকুল জড়-অজড় সকল বস্তুর সাথে তার আচারণ সম্পর্কিত। আর তাই আমরা ধর্মকে দেখতে পাই সবচাইতে প্রাচীন আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী মাপকাঠি ও শক্তি হিসেবে।

ধর্ম যেহেতু একধারে সৃষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ের সাথে মানুষকে সম্পর্কিত রেখেই তার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে, তাই তার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ছিল বিশ্বাস। সে মানুষের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দুই দিকেই দিক নির্দেশনা দিতে চেয়েছে; নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার সকল ক্রিয়াকলাপ। তাই আইন (সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত) তার উষালগ্নেই বিপদে পড়েছে ধর্মকে নিয়ে। মানব সভ্যতার আদিতে ধর্মের সব নিয়ম-কানুনই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি লাভ করে আইনের রূপ পরিগ্রহ করেছে। Woodrow Wilson এর মতেঃ "Law is the mirror of the moral progress of society." কিন্তু মানুষের কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি ও ভিন্ন ধর্মী মানুষের সাথে যোগাযোগের সুযোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে সকল সমাজেই আইন ও ধর্ম সমার্থক থাকেনি। আভ্যন্তরীণ ভাবে একটি মানুষ কতবেশী ধর্মনিষ্ট বা সৎ, তা নিয়ে আইন নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারেনি মানবিক ও রাষ্ট্রীয় কারণেই। ধর্মের তুলনায় আইন মানব জীবনের আচার

www.pathagar.com

আচরনের অনেক ছোট অংশ নিয়েই নিজকে সুখী রাখতে চেয়েছে। কারণ এতেই তার পক্ষে ক্ষমতার দাপট ও শক্তির দৌরাত্ব প্রদর্শণ সহজতর হয়েছে। সে কারণেই সময় ও ধর্ম ভেদে বিভিন্ন সমাজে ধর্ম ও আইনের মাঝে পূনঃপুনঃ সম্পর্কের পরিধির রদ-বদল ঘটতে দেখা গেছে। নতুন আইন পুরাতন হয়েছে। ধর্ম যেমন আইনকে প্রশ্রয় দিয়েছে, আইনকেও হার মানতে হয়েছে ধর্মের কাছে। এক অপরকে ছাড় দিয়েছে, গলাগলি করে চলেছে, আবার এক অপরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও ঘোষণা করেছে। জন্ম দিয়েছে ভাঙা-গড়ার ইতিহাস। সৃষ্টি করেছে বিপ্লবী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নতুন নতুন ধর্মের অর্বিভাবের সাথে সাথে জন্ম নিয়েছে নতুন নতুন আইন ব্যবস্থার। আইন লাভ করেছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, নতুন রূপ-যৌবন। ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে উত্তরণের ইতিহাসের সাথে প্রক্রিয়াগত দিক থেকে এক আইন ব্যবস্থা থেকে অন্য আইন ব্যবস্থার সৃষ্টির অনেক মিল রয়েছে। নতুনটি পুরতানটির এক ধরণের গর্ভজাত ঐতিহাসিক সন্তান।

ইউরোপীয় রেঁনেসা-পূর্ব ইতিহাসে আইনকে ধর্মের প্রতি অত্যন্ত শিষ্টাচার দেখাতে হয়েছে। অতি সহজে সে কোন ধর্মীয় নিয়ম-কানুনের উপর প্রকাশ্য খবরদারি করতে চেষ্টা করেনি আইন। কিন্তু ইউরোপীয় বস্তগত উন্নতিতে খৃষ্ট ধর্মের উপর্যোপরি অন্যায় হস্তক্ষেপের কারণে আইন তার খড়্গ হস্ত ব্যবহার করতে শুরু করে অতি নির্মমভাবে। ফলে রাষ্ট্রীয় সেক্যুলারিমজ রূপ পরিগ্রহ করে রাষ্ট্রীয় "নাস্তিকতা ধর্মে"। "খোদা বিরোধী ধর্মকে" আইন বেশী দিন রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেনি। আইন অনেক ক্ষেত্রে আপোষ করে চলেছে। তাই বলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বন্টন বা এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে আধুনিক আইন এখনও ধর্মকে তেমন একটা ছাড় দেয়নি।

বর্তমান কালে ধর্ম ও আইনের পারস্পরিক সম্পর্ক মূলত নির্ভর করে কোন সমাজ বা রাষ্ট্রের ধর্মীয় শক্তির অধিকারীরা কি পরিমান কল্যাণময়ী ও গণমুখী হিসেবে নিজেদেরকে প্রমাণ করতে পেরেছে তার উপর। বিগত দুই-তিন শতাব্দীতে ধর্ম ও আইন যেন দুই সতীনের সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিল। কিন্তু এখন উভয়েই যেন আপোষকামী হয়েছে। কল্যাণকামী রূপ প্রদর্শনী প্রতিযোগিতায় উভয়ই কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে।

প্রথা ঃ প্রথার সাথে কার বেশী নিবিড় সম্পর্ক ? আইনের না ধর্মের ? এসব প্রশ্নে একাত্ববোধক উত্তর দেয়া কঠিন। প্রথাকে অনেকেই আইনের সবচাইতে আদি উৎস মনে করে। এ বিবেচনায় প্রথার সাথে আইনেরই নিবিড়তম সম্পর্ক হওয়ার কথা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে কি মানব সভ্যতা ধর্মহীন ছিল বহুকাল? যদি তাই হয় তবে প্রথার জন্ম হলো কি করে? এ ব্যাপারে সবচাইতে হৃদয়গ্রাহী উত্তর হচ্ছেঃ

আগাছাপূর্ণ মাঠের মাঝখানে দিয়ে মানুষ চলতে চলতে যেমন পথের সৃষ্টি হয়, প্রথাও সমাজে একই নিয়মেই তৈরী হয়। উত্তরটি শুনতে যতই যুক্তি সংগত মনে হউক না কেন, এতে বিরাট ফাঁক রয়েছে। যিনি প্রথম পথ চললেন তিনি কি একে নিজ প্রথা নামে আখ্যায়িত করেছেন, নাকি নিজ ধর্মের কথা বলেছেন। যদি ধরা যায় আদিতে মানুষ অনেক বেশী বর্বর, অসভ্য ও অবুদ্ধিমান

www.pathagar.com

ছিল, তাহলে তার তো ন্যায় পথে স্বেচ্ছায় গমন প্রায় অসম্ভব ছিল। সে ক্ষেত্রে যুদ্ধকেই বরং আইনের প্রাচীনতম উৎস বলা চলে। কারণ যুদ্ধে পরাভূত গোত্র বা জাতিকেই বিজয়ী শক্তির প্রথার অনুসরণ করানো সহজতর হতো। কিন্তু এমন যুক্তি কেউ তেমন একটা মানছে না। এ সমস্যার সমাধান কল্পে Woodrw Wilson একটি আপোষ ফর্মূলা দেনঃ তার এ আপোষ ফর্মূলায় ধর্ম ও প্রথাকে একই বয়সী মনে করা হচ্ছে এবং একই ভাবে আইনের জন্য রসদ সরবরাহকারী কাঁচামাল হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। ধর্ম যেহেতু কিতাবী রূপ লাভ করেছে অনেক পরে; আর প্রথা তো নিজে কিতাবী রূপ গ্রহণ করতেই আগ্রহী নয়, তাই আদি কালে এরা সহোদর ছিল, এমনটি ভাবা হয়ত বা সত্যের তেমন কোন অপমান নয়। যে সব রীতি-নীতি সমাজে প্রচলিত ছিল তাকেই একই সাথে প্রথা ও ধর্ম নামেই অভিহিত করা যেত। মূল ব্যাপার ছিল মানুষ সে সব আচার-অনুষ্ঠান কতখানি সার্থকভাবে সৃষ্টা ও সৃষ্টির সাথে কম-বেশী নিবিড়ভাবে বেঁধে দিয়েছিল।

ধর্মের মতই প্রথা যে এক সময় আইনের খুবই শক্তিশালী উৎস ছিল তাতে কোনই সন্দেহ নেই। আইন সহজেই প্রথার পথ রুদ্ধ করতে চাইত না। কারণ তাতে অকারণ আইনের শক্তি লোপ পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। অবশ্য অধিকাংশ মানুষ বা শাসক গোষ্ঠী যদি কোন প্রথাকে উৎখাত করতে চাইত, তাহলে আইনকে প্রথার প্রতি বৈরী মনোভাবাপন্ন হয়েই কাজ করতে হত। তবে এ ধরণের ক্ষেত্রে সব সময়ই যে আইন শুভ ফল আনতে পেরেছে তেমনটি নয়। ঠিক এ কারণেই ভারত বর্ষে মুসলিম শাসন আমলে মুসলিম রাজা-বাদশারা সতী-দাহ প্রথার বিরুদ্ধে আইন করতে সাহস পায়নি। ইতিহাসের পরিবর্তনের ধাপে ধাপে হিন্দুদের সহযোগীতায় ইংরেজরাই সতী-দাহ প্রথা রহিতকরণ আইন সৃষ্টি করে। মুসলমান রাজা-বাদশাদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার অভাব তো ছিলই, তদুপরি তারা এ কাজটি করতে গেলে ব্যাপারটি হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা সৃষ্টি করতে পারত। ইংরেজদের আইন করে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করার মাঝে ধর্মের কোন রূপ-রং ছিল না। মুসলমানরা করতে গেলে এতে উভয়ের ধর্মীয় আইন মুখোমুখি সমরে অবতীর্ণ হত। এ একটি ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয়, আইন, ধর্ম ও প্রথা এই সেদিন পর্যন্ত কত নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ ছিল।

বর্তমানে আইনের উৎস হিসেবে প্রথা প্রায় ম্রিয়মান। তবুও একবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। বর্তমান সমাজে কোনটি প্রথা, আর কোনটি প্রথা নয়, এ বিতর্ক বড়ই জটিলতার সৃষ্টি করে। ধনিক-বনিক শ্রেণীর মাঝে যে প্রথা প্রচলিত, গরীব-দুখী, কৃষক-মজুর মেহনতি মানুষের মাঝে তার প্রচলন নেই বা থাকতে পারে না। শিক্ষিত-প্রাশ্চাত্যমুখী মানুষ যে সব প্রথা চালু করেছে, অশিক্ষিতরা তা গ্রহণ করেনি। নগরবাসী গ্রামীণ প্রথা ধুয়ে মুছে নতুন প্রথার জন্ম দিয়েছে; গ্রামবাসী পুরাতন প্রথাকে নতুন ঢংগে সাজিয়ে নিয়েছে। কোন আধুনিক রাষ্ট্র বা সরকার এখন আর প্রথা নির্ভর হয়ে আইন সৃষ্টি করার যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না। তবুও কিন্তু রক্ষণশীল সমাজে আইন প্রথাকে যথেষ্ট সমীহ করে চলে। এবং প্রথামটি দ্বিতীয়টির দ্বারস্থ হয়। মাঝে মাঝে যে সব জাতি বা গোত্রে প্রথা-আইনের উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এখনও পরিলক্ষিত হয়। তার মধ্যে বৃটিশ

www.pathagar.com

ইহুদী ও মুসলমানদের মাঝে আরব ও ইরানী জাতির নাম প্রসঙ্গত উল্লেখ্য হিন্দুদের মাঝে জাত প্রথাও সম গুরুত্বের দাবী রাখে।

জাতি বা গোত্রের মাঝে সে সকল প্রথা কোন না কোন ভাবে আইনের ভূমিকা পালন করে, সে সমস্ত প্রথাগুলোর সাধারণত বেশ কিছু বৈশিষ্ট পরিলক্ষিত হয়। কারণ সমাজের বহু প্রথাই ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে যায় বা কালের গর্ভে বিলিন হয়ে যায়। আবার বহু প্রথা খুবই সংকীর্ণ অর্থে প্রথা বিধায় আইন-আদালতের দারবারে তাদের স্থান সংকুলান হয়নি। খুবই ছোট পরিসরে স্থায়ীন প্রথা হিসেবেই তাদের উদ্ভব ও বেঁচে থাকা। আদালত কর্তৃক স্বীকৃত প্রথার মৌলিক বৈশিষ্টের মাঝে অন্যতম হচ্ছেঃ বিরতিহীনতা, প্রাচীনত্ব, যুক্তিগ্রাহ্যতা, সুনির্দিষ্টতা, কল্যাণকামীতা, শান্তিময়তা, নিরপেক্ষতা ইত্যাদি। তবে প্রথার বিশাল ভান্ডার থেকে প্রথা-আইন শুধু তার গুনাবলীর কারণেই আইনের মর্যদা আসীন হয়েছে, এমনটি ভাবা ঠিক হবে না। কারণ এসব গুনাবলীগুলো সবই মূলত অপেক্ষিক। প্রথা মূলত আইনের পরিবাবভুক্ত হয় দীর্ঘ পট পরিক্রমায় অবশ্য প্রথা হিসেবে স্পষ্টতা না থাকলে আইনে পরিনিত হয়ে সফলতা অর্জন করা কঠিন হয় বা প্রক্রিয়াটি আরো বেশী সময় স্বাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে পড়ে। কাজেই আইন হুট করেই কোন প্রথাকে তার বংশভূত করে না। পুর্বে প্রথা-আইন সৃষ্টির পেছনে সরকার যন্ত্র ও সমাজের উপকারিতার হিসাব-নিকাস ছাড়াও আইন তার নিজের লাভ ক্ষতিকেও মোটেই উপেক্ষা করতো না। কোন প্রথাকে আশ্রয় করে বেড়ে উঠার চাইতে যদি এমনিতে বেড়ে উঠাই যদি তার জন্য আয়াস সাধ্য হয় তবে প্রথা নিয়ে টানাটানি করা আইন তেমন একটা পছন্দ করে না। কোন নির্দিষ্ট আইন তার জন্ম ও প্রয়োগে যদি সময় ও সম্পদ ব্যবহার তার মিতব্যয়ীতার স্বাক্ষর রাখতে ব্যর্থ হয়, তবে তার নিজের জীবনই হয় বিপন্ন। কাজেই প্রথাকে আইন জীবনী শক্তি ধার করে তখনই, যখন তার নিজের লাভবান হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

বিচারকের রায়ঃ আইন থাকলেই বিচার ব্যবস্থা থাকবে। থাকবে আদালত ও বিচারক। বিচার আচার বিহীন আইন ব্যবস্থা কল্পনাবিলাস মাত্র। কিন্তু বিচারক কি শুধু আইন মাফিক বিচারই করেন, না কি আইন সৃষ্টির পেছনে তারও কিছু অবদান আছে ? জীবন উত্তরোত্তর জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। লিখিত বা গৃহীত আইন কখনও পূর্ব থেকেই সকল সমস্যার সমাধান বলে দিতে পারে না। দিতে পারে না অভূতপূর্ব সব ঘটনার আগাম সংবাদ। তাই তো আইন বিচারকের হাত-পা খুব শক্ত করে বেঁধে দিয়ে বিচার করতে বলে না। সকল আইন ব্যবস্থার অধীনেই বিচারকগণ বেশ খানিকটা স্বাধীনতা ভোগ করেন আইনের ব্যাথা ও তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে। উচ্চতর আদালতের বিচারকগণের রায় নজীর হিসেবে নতুন নতুন আইনের জন্ম দেয়। এ সব নতুন আইন যদি সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক রহিত না হয় বা এ সবের সাথে সংঘর্ষশীল কোন আইন যদি আইনসভ্য তৈরী না করে, তবে তা পরিপূর্ণ আইনের মর্যাদা লাভ করে। এসব আইনকে মামলাজাত (Case made) আইন বা বিচারক কর্তৃক গৃহীত আইন (Judge made law) বলে। আধুনিক যুগে আইনের এ উৎসের পরিধি বড় সমৃদ্ধ ও বিচিত্র। অধিকাংশ রাষ্ট্রের সুপ্রীম

www.pathagar.com

কোর্টের রায়সমূহ সমগ্র দেশের সকল আদালত, প্রশাসন ও জনগণের জন্য আইনের মর্যাদা ভোগ করে থাকে।

গবেষণা গ্রন্থঃ আইনের মৌলিক গবেষণামূলক গ্রন্থ শুধু প্রচলিত আইনের চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যাই করে না, বরং আইনে ভুল ত্রুটিও নির্দেশ করে। কোন আইন কি পরিমাণ ভাল বা মন্দ ফল দিচ্ছে এবং কি করে এর মন্দ বা দুর্বল দিক দূর করা সম্ভব, তার পথ নির্দেশনা মেলে কিছু কিছু বিখ্যাত আইনবেত্তার গবেষণা কর্মে। কারো গবেষণা কর্ম আইনের উৎস হওয়ার জন্য দুটি শর্ত পূরণ হতে হয়। প্রথমতঃ গবেষককে খুবই উচ্চমাপের আইনবেত্তা হতে হয় এবং তার গবেষণার ফসল মৌলিক কিছু হতে হয়। দ্বিতীয়তঃ আদালত কর্তৃক ঐসব কর্ম স্বীকৃতি লাভ করতে হয়। ইংলেন্ডে Kent, Lore, Hale, Littleton, Blackstone ও Anson -এর আইন সম্পর্কিত মতামতকে সহজেই বৃটিশ আইনের উৎস ধরা যায়। শক্তিশালী আইন ব্যবস্থার অধিকারী প্রতিটি রাষ্ট্রেই এমন কিছু আইনবেত্তার সন্ধান মেলে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে Story ও Kent এ মাপের গবেষক। মূলত মৌলিক গবেষণা দ্বারা এসব লেখক দেশকে অনেক সংকটময় মুহূর্তে মূল্যবান ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী উপহার দিয়ে থাকে।

প্রথা ও ধর্ম অতীত অভিজ্ঞতা দিয়ে আইনেকে সাহায্য করে। আর বিচারকের রায় যদি হয় আইনের যমজ ভাই, তবে মৌলিক আইন-গবেষনা হচ্ছে আইনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।ময় সন্তান।

সাম্য, সুবিচার ও ন্যায়পরতা ঃ সাম্য ও ন্যায় বিচারের নীতির দু'টি দিক রয়েছে মানুষের মৌলিকতার বিচারে মানুষ কেউ কারো মত নয়, মানুষ কিন্তু সাধারণ বিচারে সবাই সবার মত। আকৃতি, প্রকৃতি ও গঠন প্রণালীতে মানুষের মাঝে মূলত গুণগত মৌলিক কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না; যা কিছু পার্থক্য বাহ্যত চোখে পড়ে, তা নিতান্তই রং ও রূপগত। আর খুব বেশি হলে একে কাঠামোগত পার্থক্য বলা চলে। অবশ্য মেধা ও সৃজনশীলতায় মানুষের পার্থক্য চিরন্তন। তাই আইন যে সব মৌলিক দর্শনের উপর দাঁড়িয়ে আছে, সাম্য নীতি তার মধ্যে অন্যতম। অর্থাৎ সকলেরই ন্যায় বিচার পাবার সমান অধিকার রয়েছে।

ধর্ম, প্রথা, বিচারকের রায় ও আইনজ্ঞদের গবেষণা কর্মের মত প্রতিটি আইনের উৎসের মাঝে সাম্য ও ন্যায়পরতার নীতি লালন-পালন প্রক্রিয়া অবিষ্কার করা আইনের ছাত্রদের জন্য কঠিন ব্যাপার নয়। প্রতিটি মতাদর্শ রাজনৈতিক দর্শন, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এক ধরণের বিশেষ সাম্যবাদ ও ন্যায়পরতার ধারণার সন্ধান পাওয়া যায়। তাই প্রতিটি আইন ব্যবস্থাই তার অনুসৃত আদর্শে থেকে উৎসারিত সাম্য ও ন্যায়পরতার নীতি প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কাউকে কোন প্রকার সম্পত্তি আহরণে বাধা না দিয়ে সবাইকেই ইচ্ছামত ও সাধ্যমত সম্পত্তির মালিক করতে তৎপর। আবার সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিজম ব্যবস্থা ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে বঞ্চিত করে সবাইকে একই কাতার বন্দী করতে তার অসীম আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেছে। কোন আইন ব্যবস্থাই যেন অন্যায় প্রবণতার সাথে নিজকে কোনভাবেই যুক্ত রাখতে রাজী নয়।

www.pathagar.com

অনেকেই আবার সাম্য ও ন্যায়-নীতিকে আদর্শ বা মতবাদের সাথে সম্পর্কিত না করে একে প্রকৃতির নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যশীল ভাবতে উৎসাহ বোধ করেছেন। প্রকৃতিতে যেমন সর্বত্রই এক ধরণের সামাঞ্জস্য মূলক ন্যায়-বিচারের সুর ধ্বনিত হয়, আইনেরও কাজ হচ্ছে অনুরূপ সবার জন্য ন্যায়পরতা নিশ্চিত করা। Salmond নীতিকে তিনভাবে দেখার আগ্রহের কথা প্রকাশ করেছেন। প্রথমতঃ ন্যায় মানেই প্রকৃতিগত সুবিচার। দ্বিতীয়তঃ সবার জন্য তার ন্যায্য পাওয়া নিশ্চত করা। তৃতীয়তঃ আইনের বাধ্যবাধকতা ও কঠোরতাকে ন্যায়পরতার পথ রুদ্ধ করতে না দেয়া

আইন যাতে কোন অজুহাতেই অন্যায়পরতা সৃষ্টি করতে না পারে, এটা নিশ্চিত করাই ন্যায়পরতার লক্ষ্য। আক্ষরিক বিচারে আইন যতই আইনানুগ বা বৈধ বলে প্রতিভাত হউক না কেন তাকে পরিবর্তন বা সংশোধন করে যতদূর পারা যায় সত্য ও ন্যায়ের কাছে নিয়ে আসাই এ নীতির কাজ। সাম্য ও ন্যায়পরতা বোধ আইনেকে তার ভাষা ও যুক্তির হের-ফের ডিঙিয়ে তার মূল লক্ষ্য অর্জন ব্রতী করে। এ নীতি সকল অবস্থাতেই ন্যায়নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী, তাই কোন ব্যাপারে যখন আইনের ভাব ও ভাষা অনুপস্থিত বা অক্ষম, সেখানে ন্যায়পরতা তার একমাত্র অবলম্বন। আধুনিককালে ন্যায়পরতার কিছু সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে।

কমন ল'ঃ যদি কমন উৎসটিকে আমরা দুটি আদালতের (Kings bench, Exchequer and court of common pleas) সৃষ্টি ধরি, তাহলে এটিকে বর্তমান ইংল্যেন্ডের আইনের উৎস বলতে পারি। কিন্তু কমন ল'ক আইনের জগত অনেক বড় অর্থে তার উৎস মনে করে। বৃটিশ আইনকেই হয়ত অনেকে ইংরেজ বা ইংল্যান্ডের আইন বলবেন। কিন্তু ব্রিটিশ বিশাল সামাজ্যের অধিবাসীদের কতভাগ ছিল ইংরেজ ? এ আদালত তিনটিতে প্রণীত আইন কোন কোন পথে প্রবেশ করল ইংল্যেন্ডে ছাড়া বৃটিশ সাম্রজ্যের বাকী অংশগুলোতে ? এ প্রশ্নগুলোর যে কোন একটি উত্তর বিরতিহীন বিতর্কের সূচনা করবে। কিন্তু এ আদালত সমূহ তাদের আইন সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় যে মূলত ইংরেজদের প্রথা, আচার-আচরণ ও ন্যায়-নীতির ব্যাপারে তাদের মূল্যবোধ এবং সর্বোপরি বৃটিশ আইন দ্বারা লালিত রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত হত, এতে কোন সন্দেহ নেই। সুনির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ আইন বা তার নীতিমালা যখন বাস্তব সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হত তখন বিচারকগণ যে নতুন নিয়ম নীতির সাহায্য গ্রহণ করে সমস্যার সমাধান করত, তাই কমন ল' রূপ ধারণ করত। কিন্তু এ ধরণের ব্যাখ্যায় ঐ উৎসটিকে মামলাজাত বা ন্যায়পরতাজাত আইনের সমার্থক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আদতে কমন ল' কিন্তু তা নয়।

সম্ভবতঃ বিধিবদ্ধ আইনের সাথে কমন ল' এর তুলনাই আইনের এ উৎসটির গূঢ়ত্ব পরিষ্কার করার সবচাইতে ভাল উপায়। বৃটিশ সামাজ্যের বিস্তারের সাথে ইংল্যান্ডের ভিতরে ও বাইরে আইন সম্পর্কিত কার্যাবলীর পরিধি এত দ্রুত বেড়ে গেল যে, শুধুমাত্র বিধিবদ্ধ আইন দিয়ে বা বিচারকের

www.pathagar.com

রায়ের নজীর দিয়ে এত সমস্যার মোকাবিলা করা ছিল অসম্ভব। তাই বৃটিশ আইনে এক ধরণের সুকৌশলী নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠল। এ দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে আইনের কোন উৎসেই কোন সমস্যা না মিললেও ইংরেজ জাতি বসে থাকত না। বরং বৃটিশ স্বার্থ রক্ষা পায় এমনভাবে যুক্তিযুক্ত যে কোন সমাধান আইন গ্রাহ্য করত। তখন বৃটিশ স্বার্থ বলতে প্রতিটি ইংরেজের স্বার্থই ধরা যেতে পারত। কারণ সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে ইংরেজ জাতিকে বাহিরের বিশ্বে এসে যোগ্যতার পরিচয় দিতে হত। আর যে ইংরেজ তার নিজ ভূমিতে শাসন বা বিচার কার্য দ্রুত ও পারদর্শিতার সাথে সম্পন্ন করতে পারবে না, ঔপনিবেশিক কোন দেশে কাজ করার যোগ্যতা তার কোথায় । আবার যে আইন ইংল্যান্ডেই সামস্য মোকাবিলায় অক্ষম, সে আইন কিভাবে ঔপনিবেশিক দেশে এসে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করবে? তাই বৃটিশ আইনে এক অভূতপূর্ব গতির সঞ্চার হয়। আর সে কারনেই লিখিত আইন সৃষ্টির ব্যাপারে ইংরেজরা ছিল বড়ই সবধানী। লিখিত আইন সৃষ্টি করে উপনিবেশগুলোতে পাচার করার চেষ্টা করলে ইংরেজদের সাথে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাকী সব জাতিগুলোর মাঝে সরাসরি মনস্তাত্ত্বিক বিরোধ বেধে যেত। বাকী সব জাতিগুলো আগে ভাগেই জেনে যেত কি ধরণের আইন বৃটিশরা তাদের উপর চাপাচ্ছে। কিন্তু বহুলাংশে অলিখিত আইন ব্যবস্থা ইংরেজদেরকে সে সমস্যা থেকে রক্ষা করেছে। তবে কমন ল' পাচারের ব্যাপারটি কিন্তু জোর শোরে কার্যকরী হয়েছে বৃটিশ সাম্রাজ্য ভেঙ্গে হাওয়ার পর ।

উপনিবেশগুলো ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর দেখলো তাদের নিজের কোন আইন ব্যবস্থা নেই। ইংরেজদের আগমনের পূর্বে প্রচলিত আইন ব্যবস্থা হয় বিকৃত, না হয় অবলুপ্ত। তাছাড়া ঐ সব ব্যবহার করার উপযোগী জনশক্তি সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। অন্যদিকে আংশিক হলেও ইংরেজদের প্রণীত আইন চালু করা সম্ভব। কারণ ইংরেজরাই কিছু প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশাসক, আইনজ্ঞ ও বিচারক সৃষ্টি করে রেখে গেছে এবং আরো বেশী সংখ্যক সৃষ্টি করে দেয়ার ছিল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে। কাজেই বৃটিশ আইনের স্পষ্ট-অস্পষ্ট লিখিত-অলিখিত সকল মৌলিক নীতিমালার ও আদালতে ব্যবহৃত সকল নিয়ম কানুনই প্রায় সকল বৃটিশ উপনিবেশের জন্য আইনের অন্যতম উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

কিন্তু আইনের এ ধরনের শিথিল দৃষ্টিভঙ্গী কি ইংরেজদের জন্য বিপদজনক নয়? মোটেই বিপদজনক নয়। কারণ বৃটিশ পার্লামেন্ট সার্বভৌম। যে কোন প্রয়োজনে কমন ল' থেকে উৎসারিত যে কোন আইন যে কোন সময় বাতিল ঘোষণা করতে পারে। আবার প্রয়োজনে ঐ ধরণের কোন আইনকে সংহিতাবদ্ধ করে বিধিবদ্ধ আইনের আওতাধীন করার ব্যবস্থা করতে পারে। সে কারণেই কমন ল' উৎসটি মূলত ইংরেজদের প্রথা আইনের মৌলিক নীতিমালা ও বিচার সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার সাথে নিবিড়ভাবে মিশে থাকতে দেখা যায়। তাই পুরো বৃটিশ আইন ব্যবস্থাকেই আমরা কমন ল' বলতে পারি। উৎস হিসেবে এটি সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য সৃষ্টি ও লালন-পালনে ইংরেজদের জন্য গুরুত্বপুর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু বৃটিশ উপনিবেশগুলোতে এর ভূমিকা মোটেই সাধারণ জনগণের জন্য কল্যাণকর বলে প্রমানিত হয়নি।

www.pathagar.com

বৃটিশ উপনিবেশগুলোতে সৃষ্ট স্বাধীন তাই রাষ্ট্র সমূহে এর ভূমিকা মোটেই সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। আইন ব্যবস্থা সৃষ্টিতে এ উৎসের ভূমিকা ও মনস্তাত্ত্বিকতার বিচারে বৃটিশ উপনিবেশগুলোর বিচার ব্যবস্থা ও আইনজীবীগণ কমন ল' ছাড়া অচল।

সিভিল ল–এর অর্থ যদি আমারা " নাগরিক আইন" ধরি তবে অনেকে হয়ত আপত্তি করবেন। কারণ এ ধরণের আইনের সঠিক পরিমন্ডল নির্ধারণ করা কঠিন হবে। কন্তু Twelve Tables of Rome কে যদি প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সিভিল ল বলি এবং একে "নাগরিক আইন" নামে অভিহিত করার মৌলিক কারণটি নির্ণয় করি, তাহরে নাগরিক আইন কথাটি হয়ত তেমন একটা আপত্তিকর হবে না। খৃষ্টপূর্ব পাঁচশত বছর পূর্বে আইনের এ ধরণের সংহিতাবদ্ধ করণ এই প্রথম। রাষ্ট্র সুনির্দিষ্ট করে দিল তার নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য পরিমন্ডলের বিভিন্ন দিক। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় শক্তি কর্তৃক নাগরিক আইনই ছিল সিভিল ল। তখন যেহেতু নাগরিকদের সংখ্যা ছিল কম এবং দাস–দাসীর সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক আর দাস–দাসীরা আইনানুগ কোন অধিকারই ভোগ করত না, তাই নাগরিক আইন কথাটি অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল।

Napoleonic Code কে যদি আদুনিক সিভিল ল'র মূল ভিত্তি ধরি, তবে নাগরিক আইন কথাটিকে আমরা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে বুঝি। কমন ল'র উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধির ইতিহাস যেভাবে বৃটিশ ইতিহাসের সাথে জড়িত, অনেকটা সেভাবেই ফ্রান্সের ইতিহসের সাথে সিভিল ল' এর ক্রম বিকাশ জড়িত। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণের জন্য সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধরণের আইনকে সংহিতাবদ্ধকরণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট রোমান আইন দর্শন ও নীতিমালার উপর ভিত্তি করেই ফ্রান্সের আইন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াস চালান। এর ফলে ১৮০৪, ১৮০৬, ১৮০৮ ও ১৮১০ সালে যথাক্রমে দেওয়ানী বিধি, দেওয়ানী কার্যবিধি, ফৌজদারী বিধি, ফৌজদারী কার্যবিধি ও দন্ডবিধি প্রণীত হয়। এ নেপোলিয়ন বিধিগুলোই পরবর্তীতে সংশোধিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত হয়ে সমগ্র কন্টিনেন্টাল ইউরোপের আইন ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয় এবং ল্যাটিন আমেরিকা, উত্তর আফ্রিকা ও জাপান এসব বিধিগুলোর অনেকাংশ নিজের করে নেয় । সিভিল ল'র আর একটি উদাহরণ হচ্ছে Justinian Code at Constantinople.

সিভিল ল' কে অনেকটা সংহিত ও বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার আইন বলা চলে। আদি উৎসের কথা বিবেচনা করলে এ ব্যবস্থা রোমান আইনের কাছেই সবচাইতে বেশী ঋণী। আর দেশ হিসেবে এর সৃষ্টিতে ফ্রান্স ও জার্মানীর ভূমিকা অগ্রগণ্য। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সংহিত ও বিধিবদ্ধ আইন ব্যবস্থার আকারে আইনের কোন উৎসের সবলতা বেশীদিন টিকে থাকার কথা নয়। কারণ সুনির্দিষ্টভাবে বিন্যস্ত বিধায় এর দুর্বল দিকসমূহ প্রকট আকার ধারণ করার কথা। কিন্তু রেঁনেসার সময় ও পরবর্তীতে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করার পেছনে সিভিল ল' –র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। এ আইনের ভূমিকা সর্বজনীন হওয়ার কারণে এটি আর নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর আইন না হয়ে রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীর আইনানুগ অভাব পূরণে সচেষ্ট। আর যেহেতু এটি এখন আর

www.pathagar.com

কোন নির্দিষ্ট দেশ বা দুই একটি সংহিতার উপর নির্ভশীল নয়, তাই আইনের উৎস হিসেবে এর অবদান আজ সর্বত্রই স্বীকৃত।

আইন প্রণয়ন ঃ কোন আইন ব্যবস্থা যে কয়টি উৎসের উপরই নির্ভর করুক না কেন, আধুনিক কোন রাষ্ট্র আইন সভা বা আইন পরিষদের মত স্থায়ী কোন কর্তৃপক্ষ দ্বারা নতুন নতুন আইন সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারে না। কমন ল' বা সিভিল ল' অনুসৃত দেশসমূহের জন্য এটি সমভাবে প্রযোজ্য। জীবনের গতি আজ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ চারণভূমি মাহাশূন্য পর্যন্ত হয়েছে বিস্তৃত। তাই তার কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনও দেখা দিয়েছে দারুণভাবে। আর সে প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রতি বছরই নতুন নতুন বিধি-বিধান সৃষ্টি আজ জীবনের দাবী। দাবী সর্বাঙ্গীন কল্যাণকামী প্রতিটি নাগরিক ও দেশের। তাই প্রতিটি রাষ্ট্রেই আজ আমরা সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা দেখতে পাই। ভিন্ন ভিন্ন দেশে এর ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং আইন প্রণয়ন করার প্রক্রিয়াও সকল দেশে এক নয়। কিন্তু আইনসভা ও আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সর্বত্রই প্রায় এক ও অভিন্ন। তাই আইন সভা প্রতিটি দেশে তার কার্যাবলীকে জনজীবন ও জনগণের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করতে তৎপর। সঠিকভাবে জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রতিটি আইনসভা তার নিজ ক্ষমতা বলেই আজ আইনের উৎস হিসেবে মুখ্য হয়ে পড়ছে। বাকী সব উৎসকে সে যেন ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিতে চাইছে।

আইন ও আন্তর্জাতিক নীতি ঃ যান্ত্রিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে পৃথিবী আজ সকল জাতির কাছেই যথেষ্ট ছোট হয়ে এসেছে। বেড়েছে আন্তঃজাতীয় মেলামেশার গন্ডী। কোন রাষ্ট্রই আজ আর উপেক্ষা করতে পারছে না বাইরের বিশ্বের সাথে তার বহুমুখী সম্পর্ক। আর আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের সংখ্যা ও প্রভাব বলয় দুইই বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণে। তাই প্রতিটি রাষ্ট্রই নিজ গরজেই খেয়াল রাখছে সে যেন আন্তর্জাতিক আইন বা নিয়ম কানুনের পরিপন্থী কোন আইন তৈরি না করে বসে। অবশ্য দু' একটি রাষ্ট্রকে এ ভাবনা তেমন একটা করতে হয় না। এই সেদিন পর্যন্ত রাশিয়াকে নিজের দেশের জন্য আইন তৈরি করতে আন্তর্জাতিক আইন বা বিশ্ব জনমত কোনটাকে তেমন একটা আমল দিতে হয়নি। কিন্তু এখন তাকেও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হচ্ছে নিজ স্বার্থেই। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যদি ও আইনের এ উৎসের প্রতি খেয়াল না রাখে তবে এজন্য তাকেও মূল্য দিতে হতে পারে।

www.pathagar.com

আইন ও নৈতিক অবক্ষয়

মানুষকে ভাল ও মন্দ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়তো সহজ। কিন্তু তার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ হচ্ছে ভাল-মন্দ, সৎ ও অসৎ নিরূপনের মাপকাঠি নির্ধারণ করা। কোন মানুষই নিজেকে মন্দ বা অসৎ হিসেবে চিহ্নিত হতে দিতে চায় না। কিন্তু তাই বলে সব সময়ই ব্যক্তি-মানুষ সকল মন্দ কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে সচেষ্ট থাকে, এমন দাবী করা কঠিন। কে কতটা ন্যায়পরায়ন বা নীতিবান তার চেয়েও বড় প্রশ্ন হচ্ছে, কোন সমাজের সার্বিক ধ্যান-ধারণায় ও কর্মকান্ডে সুবিচারের নীতিমালা কিভাবে গৃহীত হয় এবং সেগুলো কি কি উপায় ও পদ্ধতিতে রক্ষিত বা লালিত পালিত হয়। আদিকাল থেকে মানুষের মাঝে ন্যায় ও অন্যায়ের প্রতি প্রবণতা ও ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। ন্যায় ও অন্যায়ের দিকে প্রতিটি মানুষের ঝোঁক প্রবণতা সমান কি-না, তা হয়তো হলফ করে বলা যাবে না। কিন্তু অসৎ পথে যাত্রার গতিবেগ যে দ্রুত বৃদ্ধি পায়, এতে কোন সন্দেহ নেই। অথচ ন্যায়-নীতি ও সুন্দরের দিকে পথ যাত্রায় গতির সঞ্চার করা অনেক ক্ষেত্রেই যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষকে সত্যিকার অর্থে মানুষরূপে গড়ে তোলার জন্য কি কি শক্তিশালী উদ্দীপক অবিষ্কার করা হয়েছে? এগুলোর কোনটি কোনটির চেয়ে বেশী কার্যকর? কোন মানুষকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি কেন অসৎ হলেন তাহলে স্বভাবতঃই উত্তর আসবে তার পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রই তাকে অসৎ করার পেছনে দায়ী। ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে সকলের প্রতি ক্ষুদ্ধ হয়েই সে অসৎ পথে পা বাড়িয়েছে। পক্ষান্তরে, কোন সৎ সানুষকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তার সততার পেছনে মুখ্য কারণ কি। তাহলে হয়তো স্বাভবতই উত্তর আসবে, তার ইচ্ছাশক্তি ও প্রচেষ্টাই তাকে সৎ রেখেছে। মানুষের সৎ বা অসৎ হবার পেছনে কি কি কারণ রয়েছে তা খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

মানুষ যে সমস্ত কারণে সৎ থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো নিম্নরূপঃ-

১। শিশুকাল থেকেই তাকে সৎভাবে গড়ে তোলা হয়েছে;

২। সুশিক্ষা তাকে ন্যায়-নীতিবান ও আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলেছে;

৩। সমাজে মানুষের নিন্দার ভয়ে সে অসৎ পথ থেকে দূরে থাকছে;

৪। ন্যায়ের প্রতি অবিচল আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ থেকে অন্যায় ও অবিচারের প্রতি মনস্তাত্বিকভাবে ঘৃণা জন্মেছে, তাই এ পথ থেকে সে নিজেকে দূরে রেখেছে।

৫। অনুসৃত ধর্মের প্রতি কঠিন অনুরাগ তাকে সৎ মানুষ রূপে রূপান্তরিত করেছে।

কোন মানুষ যখন সৎ বা অসৎ পথে পা বাড়ায়, তখন হয়তো কোন কারণটি তার ওপর কতখানি

www.pathagar.com

কার্যকর সে সম্পর্কে সে বেখেয়াল থাকে। কারণ মানুষের মধ্যে আবেগ–অনুভূতি, মায়া–মমতা, অনুরাগ, আসক্তি, ন্যায়–অন্যায় বোধ, নিজেকে প্রকাশ ও গোপন করার প্রবণতা সব কিছুই বিখন্ডিত অবস্থায় বিরাজ করে। জীবনে চলার পথে যে কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনা তার জীবনের গতি–প্রকৃতি দারুনভাবে বদলে দিতে পারে। কিন্তু কোন একটি ঘটনার প্রভাব মানুষের জীবনে বড় ধরণের পরিবর্তনকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সমর্থ না হওয়ারই কথা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানুষের জীবন ও চরিত্র বিনির্মানের কিছু উপাদান একযোগে কাজ করে। একটি উপাদান তার কার্যকরিতার অক্ষমতা প্রকাশ করলে অন্য একটি এসে সে অভাব পূরণ করে দেয়। প্রকৃতিতে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যেমন বেশ ক'টি উপাদানের প্রয়োজন পড়ে, তেমনিভাবে মানুষকে সত্যিকার অর্থে মানুষ হতে হলে একই সঙ্গে অনেক উপাদানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মানুষের চরিত্র বিনির্মাণে অনেকগুলো উপাদানের একযোগে কাজ করার প্রক্রিয়া কিন্তু সহজেই চোখে পড়ে না; বরং কোন একটি উপাদানকে আশ্রয় করে সে যাত্রা শুরু করে পথিমধ্যে বাকী সব উপাদানগুলোকে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজে লাগায়। যেমন, ধরা যাক, ধর্মকে অবলম্বন করে যিনি সৎ হয়েছেন, তার যাত্রা যদিও ধর্মনুভূতি থেকেই শুরু হয়েছে, কিন্তু পরবর্তীতে সমাজের একজন মানুষ হিসাবে অন্যান্য বেশ কিছু উপাদান হয় তাকে সাহায্য করেছে, না হয় তাঁকে বাঁধা দিয়েছে। ধরা যাক, একজন শিক্ষিত মানুষ সৎ হিসেবেই গড়ে উঠেছে। এই ক্ষেত্রে তার শিক্ষিত হবার কারণটি তার জীবনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু তাই বলে তার পরিবার, সমাজ, বন্ধু–বান্ধব, কর্মস্থলের পরিবেশ এবং দেশের সার্বিক আইন ও নৈতিক পরিস্থিতির ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, শাসনকর্তা, সাধারণ নাগরিক সহ সমাজের সর্ব স্তরের মানুষের ক্ষেত্রেই এই ধরনের একটি প্রক্রিয়া কাজ করে থাকে, যার ফলে সার্বিকভাবে গড়ে উঠে একটি সমাজ ববস্থা।

আজকে আমাদের যে সমাজ ব্যবস্থা, তা যতখানি সৎ বা অসৎ হোক না কেন, তা কোন একদিন বা এক বছর, এমনকি এক যুগেরও সৃষ্টি নয়। এতে কোন ব্যক্তি–মানুষ বা গোষ্ঠীর ভূমিকাও নিরঙ্কুশ নয়। ধীরে ধীরে, যুগের পর যুগ, সামাজিক, রাজনৈকি, নৈতিক ও ধর্মীয় উপাদানের বিভিন্ন মুখী কার্যকারিতার ফসল হিসেবে এ সমজের মানুষ আস্তে আস্তে আজকের অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

আজকে আমাদের সমাজের প্রকৃত কি ? আমাদের রাষ্টব্যবস্থা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? আমাদের শিক্ষা ও বিচার ব্যবস্থা কতখানি সৎ থাকতে পেরেছে? ভাল মানুষের কদর সমাজে বাড়ছে, না কমছে ? ক্ষমতা ও অর্থের মোকাবিলায় সততা ও ন্যায় পরায়নতা কতখানি বলিষ্ঠভাবে দাঁড়াতে পেরেছে ? এটিই এখন মুখ্য প্রশ্ন।

সর্বত্রই আজ আমারা বলাবলি করছি সততা ও ন্যায় পরায়নতার বড় অভাবের কথা। ভূত পরীর গল্প যেমন আমারা সবাই শুনি, কিন্তু বিশ্বাস করি না, তেমনি সৎ, নিষ্টাবান, পরোপকারী লোকের

www.pathagar.com

বহু গল্পও আমরা শুনি, কিন্তু কাউকে ঐ শ্রেণীর মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করার উপায় বা সাহস আমাদের নেই। পৃথিবীর সকল দুস্প্রাপ্য বস্তু আমাদের সমাজে বসেই কেউ লাভ করতে পারে, কিন্তু সৎ মানুষষের সন্ধান যেন আজ বাঘের দুধ বা ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছে। সততা আজ অর্থের মূল্যে ওজন করা যায়। কোন লোক যখন তার জীবন পরিচালনায় দুর্নীতির আশ্রয় যেমন মিথ্যা, ঘুষ বা কোন রকম অন্যায় করতে অস্বীকার করে, তখন দুটি প্রশ্ন খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। প্রথমতঃ লোকটি কত টাকার ঘুষ খায় না, দ্বিতীয়তঃ তার কর্মস্থলে ঘুষ খাওয়ার আদৌ কোন উপায় আছে কি? এ প্রশ্ন দুটো উথাপিত হয়ে আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চায় ভাল অংকের ঘুষ আজ অতি প্রচলিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সাথে সমাজ, আইন ও নৈতিকতা কোনটাই যেন তেমন কোন বৈরীভাব পোষন করে না। সমাজ এখন আর ঘুষখোরকে নিন্দাবাদ তো করেই না; বরং তার ক্ষমতা ও অর্থের দাপটের জন্য তাকে সমীহ ও শ্রদ্ধাবোধ দেখায়। এ ব্যাপারে নৈতিকতার কোন বাঁধা নেই। কারণ ঘুষের টাকা বা তথাকথিত উপরি টাকা তাকে পরিবারের সদস্য ও আত্নীয়-স্বজনের কাছে প্রয়োজনীয় সন্মানের আসনে সমাসীন করেছে। অন্যভাবে বলতে গেলে ঐ অন্যায় পথে রোজগার না থাকলে তার বর্তমান আদর-সমাদর কিছুই রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। আইনও তাই এসব ব্যাপারে বড়ই নির্বাক ও অক্ষম।

ঝানু ঘুষখোর বা মোটা অংকের উপরি টাকার মালিককে আইন রীতিমত সমীহ করে চলে। তাকে স্পর্শ করতে আইন প্রয়াগকারী সংস্থা হয় ভয় পায়, নয়তো ইচ্ছাকৃত ভাবেই এড়িয়ে চলে। আর যদি এরূপ কোন ব্যক্তিকে আইনের কাঠগড়ায় দাঁড়াতেই হয়, তবে সেখানে তার পক্ষে আইনগত সাহায্য সহযোগীতা এত বেশী পরিমানে পাওয়া সহজ হয় যে, তার পক্ষেই আইন ঝুঁকে পড়ে। বেআইনী পথের নতুন যাত্রী যখন ঐ পথে হাঁটি হাঁটি পা করে, তখন তার বিপদ ঘটতে পারে দুই কারণে। প্রথমতঃ ঐ পথে তার অভিজ্ঞতার অভাব। দ্বিতীয়তঃ ঐ পথে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সক্রিয় সমর্থনের অভাব। যে কারণেই বিপদ ঘটুক, যদি নতুন ঐ পথে যাত্রার বিপদ ঘটেই যায়, তাহলেও তার ঐ পথ থেকে পিছু হটার উপায় নেই। হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়, তবে তার দুই ধরণের ব্যবস্থা হতে পারে। প্রথমত অসৎ উপায় অবলম্বন করে প্রথম অপরাধ থেকে মুক্তি পেতে পারে। প্রথম অপরাধটির জন্য আইনের কাছে আটকা পড়ে যাবার কারণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্তা ব্যক্তিদেরকেই বড় ধরনের "এনাম" দিয়ে প্রথম অপরাধটির থেকে রেহাই পাবার ব্যবস্থা করে নিতে পারে। আর এর ব্যতিক্রম ঘটলেও প্রথম অপরাধটির শাস্তি ভোগ করা কলে সে বড় ধরণের অপরাধী বনে যায়। যেমন, কোন চোর একজোড়া জুতা চুরির অপরাধে জেল খেটে ডাকাতে পরিনত হলো বা কোন সাইকেল চোর জেল খেটে গাড়ী হাইজ্যাকারে পরিনত হলো বা ব্যাংক ডাকাতি নতুবা জালিয়াতির কৌশল রপ্ত করল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন এমন হয় ? তবে কি মানুষ জন্মগতভাবেই অপরাধী ? আইন অমান্য করার মাঝেই কি তার স্বস্তি ও পরিতৃপ্তি ? আইন মানা না মানার সাথে ভাল মানুষ হবার সম্পর্ক কি প্রত্যক্ষ ? পৃথিবীর সর্বত্রই আজ আইন অমান্যকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলেই মনে হয়।

www.pathagar.com

অপরাধীরা এখন আশ্রয় নিচ্ছে সব নব নব কৌশলের, যার ফলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ তাদেরকে মোকাবিলা করতে গিয়ে রীতিমত হিমসিম খাচ্ছে। এবং সেজন্যই আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমুহে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে শুধুমাত্র কর্তব্যপরায়ন ও দক্ষ হলেই চলে না, বরং তাদেরকে হতে হয় কঠোর নিষ্টাবান ও আত্নত্যাগী। অপরাধ প্রবনতা রোধ কল্পে কখনও কখনও তাদেরকে জীবন বলিও দিতে হচ্ছে। এমনি এক পরিস্থিতিতে আমাদেরকে বিচার-বিশ্লেষন করে দেখতে হবে, আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি ।

সেদিন কোন এক পত্রিকার একজন সাংবাদিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাজে নিয়োজিত একজন কর্মীকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি তার কর্তব্য পালন করতে গিয়ে অবৈধ পথে টাকা পকেটস্থ করেন কিনা, অথাৎ সোজা ভাষায় ঘুষ খান কিনা। উত্তরে তিনি বললেন, এদেশে ঘুষ খায় না এমন লোক আছে নাকি আবার ? উত্তরদাতা পুলিশ করষ্টেবলকে সাধুবাদ জানাই এজন্য যে তিনি নিজ অপরাধের কথা গোপন করেন নি। এই উত্তর থেকে স্পষ্টতই প্রমানিত হয় যে, আইন আজ আমাদের কাছে একটি কাগুজে ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। আইন যেন শুধুমাত্র দুর্বল ও অসহায় কিছু কথা; ঠিক যেমন লেখা থাকে ছোটদের আদর্শ লিপিতে, কে না শৈশবে বহুবার পড়েছে, সদা সত্য কথা বলিবে।

একবার ছোট এক অবুঝ শিশু বারবার উচ্চঃস্বরে চিৎকার করে পড়ছিল উদ্ধৃত এই মহৎ উক্তিটি। সে সময় তার বাবার খোঁজে একজন ভদ্রলোক এলেন। মা শিশুটি শিখিয়ে দিলেন, " খোকা বলে দাও, বাবা বাড়ী নেই।" নিষ্পাপ শিশুটি মনের অজান্তেই প্রতিবাদ করে বসলো, বাবা তো ঘরেই আছেন। মায়ের আদশ মানতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত শিশুটি বলে বসলো ঃ "মা বলেছেন, বাবা বাড়ী নেই। " আমরা যারা অপরাধ করি, অন্যায় ও অসৎ কাজে লিপ্ত হই, তারা কিন্তু ঐ শিশুর মত নিষ্কলুষ মনের অধিকারী নই। যদি তা হতাম, তবে মিথ্যাচারীতা করতে গিয়েও সত্যেরর অনুসারী হয়ে যেতাম, ঝগড়া করতে গিয়ে সন্ধি স্থাপন করে ফেলতাম। যেমনটা করেছিল টলষ্টয়ের চিত্রিত দুটো ছোট্ট শিশু। শিশু দু'টি যদিও ঝগড়ার সুত্রপাত করেছিল, কিন্তু সে ঝগড়াকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে দুই পক্ষের অভিভাবকদের মধ্যে যে তুমুল লঙ্কাকান্ড ঘটে গিয়েছিল, তাতে কিন্তু তারা যোগ দেয়নি; বরং তারা বাবা মার ঝগাড়াকালীন সময়েই নিজেদের মধ্যে মিতালীর ভাব স্থাপন করেছিল।

তবে কি সত্য ভাষণ আজ কেবল আদর্শলিপির পর্ঙক্তি হয়েই থাকবে? নাকি শুধু নাটক, উপন্যাস ও গল্পের আদর্শবান নায়ক-নায়িকার সংলাপের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে? এ সমস্যা আজ আর কোন দার্শনিক বা তত্বগত সমস্যা নয়; বরং জীবনের দাবী হচ্ছে, এ সমস্যার সমাধান কল্পে বস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ।

গতকাল যে ছেলেটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলো সে ছেলেটি একদিনেই হঠাৎ করে সন্ত্রাসী হয়ে যায় না। যদি তাই হতো, তবে জাতি এতদিনে বিশ্ববিদ্যালয় সহ সকল উচ্চ বিদ্যাপীঠ বন্ধ করে

www.pathagar.com

কোন রাষ্ট্রের আইন ব্যবস্থা সমাজের প্রচলিত ন্যায়–অন্যায় সম্পর্কে চিন্তাধারার একটি ক্ষুদ্র অংশকেই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই ক্ষুদ্র অংশটির কার্যকারিতা যেমন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের আরও বহু উপাদানের সাহায্যে ছাড়া চলতে পারে না, তেমনি আধুনিক যুগে এ অংশের অবসন্নতা বা নির্লিপ্ততা বাকী সব আচার–আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী উপাদান সমুহকে নিষ্ক্রিয় বা নির্জীব করে দেয়। একজন শিক্ষানবীশ যত দৃঢ় চরিত্রের অধিকারীই হোক না কেন, যখন সে দেখবে তার পরিচিত গন্ডির ভেতরে লোকজন বেআইনী কাজ করে তর তর করে সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে উপরের সিড়ি পর্যন্ত বেয়ে উঠে যাচ্ছে, তখন একদিন তার কাছে আইনের বিধি–বিধান নিতান্তই মূল্যহীন হয়ে পড়বে।

আজ আমরা সকল সমস্যার জন্য নৈতিক অবক্ষয় ও দরিদ্রতাকে দায়ী করি। কিন্তু কোন জাতির জীবনে এর কোনটিই একদিনে নেমে আসে না। এমনকি দুই চার যুগের মধ্যেই কোন জাতির ভয়াবহ ভাগ্য বিপর্যয় ঘটা সম্ভব নয়। এটি একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। আর সে প্রক্রিয়ার ধারক ও বাহক হচ্ছে সমাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন। প্রচলিত বাস্তব জীবন অধিকাংশ মানুষের জন্য ঠিক করে দেয় তার কর্মকান্ড কতখানি আইনানুগ হবে। মানুষের বাস্তব মন এমন একটি জিনিস যা তাকে স্বার্থপর হতে শেখায়। এ স্বার্থপরতা তার আত্মরক্ষার জন্য জরুরী। কিন্তু মানুষের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা অন্যান্য জীবজন্তুর বেঁচে থাকার প্রক্রিয়া থেকে আলাদা। তাই মানুষ শুধু নিজের আচরনকে নিয়ন্ত্রন করার জন্যই আইনের আশ্রয় গ্রহন করে না, বরং আইনের আশ্রয় প্রার্থী হিসেবে নিরপরাধ ও অপরাধী উভয়কেই একই সারিবদ্ধ রাখা হয়। প্রথম পর্যায়ে বিচার শেষেই শুধু অপরধীরা সমাজের অন্য সব নিরপরাধ মানুষ থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। আলাদা হবার এ প্রক্রিয়ায় যদি লঘু পাপে গুরু দন্ড দেয়া হয়, আর বড় পাপে লঘু দন্ড দেয়া হয়, তাহলেও আইন ও শাসন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কোন সমাজের জন্য কোন আইন কখন কীভাবে প্রণীত হয়েছে ,এটি যেমন সমাজ বিনির্মাণে অতীব জরুরী বিষয়, তেমনি গ্রহীত আইন সমুহ কীভাবে কার্যকর করা হচ্ছে এটিও মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখন আমরা যে অবস্থায় বসবাস করছি তাতে আইনে কী বলা আছে সেটি আজ আর আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়, যদি তাতে কোন ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর স্বার্থ চরিতার্থ না হয়। অর্থাৎ ব্যক্তিগত, দলীয় বা গোষ্ঠীর কোন স্বার্থের বিপক্ষে যদি কোন আইন থাকে, তবে সে আইন তারা মানে না। সে আইনকে আমারা আইনের মর্যাদা দিতেও নারাজ। সবচেয়ে বড় কথা সে আইন আমরা শুধু ভাঙবোই না, বা উপেক্ষাই করবো না, বরং; বেআইনীভাবে নিজ স্বার্থ চারিতার্থ করে সমাজের আর সবার কছে বাহবা বা সাধুবাদও পেতে চাইব। আবার প্রয়োজনে সেই একই আইন অন্য দল বা গোষ্ঠীর মোকাবিলায় প্রয়োগ করে তাদেরকে কাবু করতে চাইব। ফুটবল খেলার মাঠে নিজের দল যে ভাবেই গোল করুক না কেন সেটাই সঠিক বিজয়। আর অন্য দল যত নিয়ম–নীতি মাফিক গোল করুক না কেন, তা হবে বেআইনী ও অসত্য বিজয়। এ মনোবৃত্তি সমাজের জন্য ভয়াবহ পরিস্থিতি ডেকে আনে।

www.pathagar.com

আজ সমাজে এমন কোন বড় অপরাধ নেই যা খুব দ্রুত রাজনৈতিক বা দলীয় রূপ পরিগ্রহ করে না। যদি একান্তই কোন অপরাধের কোন রাজনৈতিক রূপ-রং না থাকে, তাহলেও তার সাথে কোন না কোনভাবে দলীয় স্বার্থ জুড়ে দেয়ার প্রয়াস চালানো হয়। ভবিষ্যতে ঐ শক্তিধর "সুপুরুষ" অপরাধীকে নিজ দলীয় স্বার্থে পাবার আশায় যখন কোন দল বা ব্যক্তি এই কৌশল অবলম্বন করে, তখন সে এতে নিজের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা দেখে না, বরং দ্রুত স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যেই সে এ নীতি অবলম্বন করে। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই একদিন এই কৌশল অবলম্বনকারীকেও মূল্য দিতে হয়। আর এর ফলে সমাজ জীবন হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত, রাজনৈতিক জীবনের ক্রিয়াকলাপ হয়ে পড়ে চরমভাবে কলুষিত।

অনেক সময় সমস্যা চিহ্নিত করা সহজ। কিন্তু সমস্যার সমাধান দেওয়া কঠিন। আবার কখনও কখনও ভুলভাবে সমস্যার প্রকৃতি নির্ণয় করার ফলে সমাধানে পৌঁছানো কষ্টকর হয়ে পড়ে। চরমভাবে ন্যায়নীতি বিবর্জিত কোন রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা কোন আয়াস সাধ্য ব্যাপার নয়। বিপর্যস্ত সমাজ ব্যবস্থায় সমগ্র মানবগোষ্ঠীর মধ্যে আইনের অনুশাসন কার্যকর করাও রীতিমত অসম্ভব ব্যাপার।

মুসলিম মন-মানসিকতার কারণে আমরা পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার কঠোর সমালোচক হয়ে পড়েছি। অনেক সময় তাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থার কোন ভাল অবদান স্বীকার করাও যেন বিশ্বাসহীনতা ও মোনাফেকীর লক্ষণ। অথচ ধীরে ধীরে মুসলিম দেশ সমুহ আইন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের দেশসমূহের অনুকরণ ও অনুসরণ করা ছাড়া কোন কার্যকর বিকল্প ব্যবস্থা নিজেদের জন্য গ্রহণ করতে সমর্থ হয়নি। তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশের মত মুসলিম দেশ সমূহে পাশ্চাত্যের আইনব্যবস্থা গৃহীত হয়ে থাকলেও তা কাংখিত ফল বয়ে আনতে পারেনি। এ ব্যাপারে আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যে আইন ব্যবস্থা বৃটেনে এখন পর্যন্ত আইনের শাসনের ভিত্তিকে যথেষ্ট মজবুত রেখেছে, সে ব্যবস্থাই আবার আমাদের দেশে অনুসৃত হয়ে আমাদেরকে আইনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করেছে।

কেন বৃটিশ আইন ব্যবস্থা আমাদের সমাজের সমস্যার সমাধান দিতে পারছে না? এর উত্তরে বহু দার্শনিক ও তত্ত্বগত বিতর্কের অবতারণা করা যেতে পারে। আমরা বিতর্কে না গিয়ে সাদামাটাভাবে দু' একটা বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের ক্ষুদ্র একটি অংশ বিপুল সম্পদের মালিক হয়ে যায়। কিন্তু ক্ষুদ্র অংশটি সরকারের সাথে মিলে ঐ সমগ্র সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে শোষণ করার সাথে সাথে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করে। কিন্তু আমাদের সমাজে ধনীক-বনিকদের প্রায় সবাই সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শুধু উত্তরোত্তর শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি করে যাচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের দৈন্যদশার মোকাবিলায় পুঁজিবাদ এখন আরও হিংস্র রূপ পরিগ্রহ করার মতলব আঁটছে। এ হিংস্রতার মূলে রয়েছে বল্গাহীন ভোগ ও বিলাসীতার জন্য আমৃত্যু বিবেকহীন ভাবে লড়ে যাওয়ার মানসিকতা। ধনলিপ্সা মানুষকে অতি সহজেই পশুর স্তরে নামিয়ে দিতে

www.pathagar.com

পারে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মতবাদ হিসেবে মানুষকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে শুধু ধনলিপ্সু হিসেবেই পেতে চায়। কিন্তু পাশ্চাত্যের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদকে মানবিক রূপ দেয়ার স্বার্থে এ মতবাদকে অনেক কিছুর সাথেই আপোষ করতে হয়েছে। দরিদ্রদেরকে বেকার ভাতা সহ বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিক সাহায্য দানের বিধান করা হয়েছে।

এরূপ বিধান উন্নততর পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় কোন ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা নয়। যেমন, জন মেজরের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পেছনে একটি বড় কারণ ছিল, তিনি একজন সাধারণ বাস কন্ডাকটর-এর জীবন থেকে রাজনীতির এত উপরের সিঁড়িতে পা রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। অন্যদিকে মাইকেল হ্যাজেলেটাইন একজন বিরাট শিল্পপতি। বৃটিশ আইনের কোথাও একথা লিখিত নেই যে, একজন বড় শিল্পাপতি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। তাছাড়া রক্ষণশীল দলকে সবাই পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী দল হিসেবেই জানে। কিন্তু যখন মাইকল হ্যাজেলটাইনের মত একজন ধনী লোককে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য দলীয় সমর্থনদানের প্রয়োজন পড়ল, তখন রক্ষণশীলরাই প্রাক্তন বাস কন্ডাক্টরকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী করে। অন্যদিকে, পাকিস্তানে মত দেশে ভূটো বা নেওয়াজ শরীফের মত ধনী লোক নির্বিঘ্নে দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে সমাসীন হন। উল্লেখ্য, নেওয়াজ শরীফ পাকিস্তানের প্রথম দশজন ধনীর লিষ্টকে অলঙ্কৃত করেছেন। বেনজীর ভূটো ও তার স্বামীও পাকিস্তানের অন্যতম ধনী ব্যক্তি।

এ দুটো ঘটনা থেকে একটি সত্য অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, শুধু আইনের লিখিত বানীই কোন দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার গতি-প্রকৃতির সবটুকু নির্ধানর করে দেয় না। প্রতিটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার দার্শনিক, মনস্তাত্বিক ও নৈতিক ভিত্তি থাকে আইনের কাঠামোর চেয়ে অনেক বেশী প্রশস্ত। এ ব্যাপারে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, তা যেন আমরা কেউ নিশ্চিতভাবে জনি না। তবু আশার কথা, দেরীতে হলেও আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের সরকার কাঠামো বা সাংবিধানিক নীতিমালার ক্ষেত্রে কিছু সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছি। যেমন ঋন-খেলাপীদরেকে নির্বাচনে প্রার্থী হতে না দেয়া।

কোন সমাজ, বিশেষ করে সে সমাজ যদি হয় দারিদ্রগ্রস্ত এবং শতাব্দীর পর শাতাব্দী ধরে জটিল বিকারগ্রস্থ তাহলে সে সমাজে শুদ্ধি অভিযান চালানো কষ্টকর হয়ে পড়ে কয়েকটি কারণে-

ক) শুদ্ধি অভিযানে নিয়োজিত ব্যক্তিই দুর্নীতিপরায়ন লোকদের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মিতালীতে জড়িয়ে পড়ে।

খ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমুহ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাহায্যের যোগান দিতে ব্যর্থ হয়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ এবং তার সাথে জড়িত ব্যক্তিরা সমাজ শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়াকে দারুন ভাবে বাধাগ্রস্থ ও বিলম্বিত করে তোলে।

গ) শুদ্ধি অভিযানের আকৃতি ও প্রকৃতি নিয়ে জাতীয় ও প্রশাসনিক ঐক্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

www.pathagar.com

ঘ) যে সরকারের তত্ত্বাবধানে শুদ্ধি অভিযান চলে, তাকে জনসাধারণের সম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করে বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের পাঁয়তারা অনেক সময়ই সরকারকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখে।

ঙ) শুদ্ধি অভিযান শুরু করে তাকে সরকার পরিবর্তন নির্বিশেষে চালিয়ে নেবার মত সৎসাহস, যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব লক্ষ্য করা যায়।

তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কি আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাকে চূড়ান্তভাবে মনুষ্য বসবাসের অনুপযোগী করে তুলবো? মানব সভ্যতার ইতিহাস অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলে দেয়, মানুষ কখনোই বন্য জীবজন্তুর আচার-আচরনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে না। অথচ আমরা আজ যেভাবে অগ্রসর হচ্ছি -এ যাত্রাপথে শক্তি আর অর্থের উম্মাদনায় আমাদের সমাজের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ বিভোর, আর বাকী বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তার শিকার। এ উম্মাদনা আজ এতদুর পর্যন্ত বিস্তৃত যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও নিজেদেরকে সামান্যতম সংযত জীবন যাপন করতে উদ্বুদ্ধ করে না। কি কথায়, কি কাজে, সংসদের ভেতরে ও বাইরে তাদের কার্যকলাপ বিবেকবান মানুষকে দারুনভাবে আহত করে। সংসদের হাতাহাতি, মারামারি বা জুতো তুলে শক্তি প্রদর্শনের উম্মদানার কথা না হয় বাদই দিলাম। দেশ আজ এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন যেখানে শুধু সরকার পক্ষের সাংসদের নন, বরং সকল সাংসদদের আহার নিদ্রা বিঘ্নিত হবার কথা, যদি তারা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে সমান্যতম দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে চান।

অথচ আমরা কি দেখছি? লাল পাসপোর্ট ও বর্ধিত বেতন ভাতাদি নির্ধারনের ক্ষেত্রে তাদের উত্তপ্ত বাক-বিতন্ড আমাদেরকে তাদের সম্পর্কে কি ধারণা এনে দেয়? কেউ কেউ তাদের শত-কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ পরিশোধ না করার ব্যাপারটি একান্ত ব্যক্তিগত বলে উড়িয়ে দিতে চান। এমন কি ব্যাংক ঋণ সম্পর্কিত এসব তথ্য প্রকাশকে তাদের জন্য মানহানিকর বলে আখ্যায়িত করেন। আইনের প্রতি বেশ খানিকটা কটাক্ষ করেই বলা হয়, এখানে সংসদের কিছু করার নেই, কারণ বিধিসম্মত ভাবেই এসব ঋণ গ্রহণ করেছেন তারা।

আসুন আরেকবার আমরা পাশ্চাত্যের দিকে নজন দেই। প্রয়ই আমরা পাশ্চাত্যের সমাজ ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র এক বিরল লজ্জাহীনতার প্রতীক হিসেবে গণ্য করি। একথা অনস্বীকার্য যে, ফ্রি সেক্সের করাল গ্রাসে আজ পাশ্চাত্যের বহু দেশ ও মানুষ নিপতিত। একথা তারা নিজেরাও স্বীকার করে। কিন্তু ক্ষমতায় সমাসীন ব্যক্তিদের আচরণকে তারা সব ব্যাপারে সংযত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্যারি হার্টের কথা। ঐ সমাজের সার্বিক মূল্যবোধের বিবেচনায় সামান্য নারীঘটিত ব্যাপারই তার সম্ভবনাময় রাজনৈতিক জীবনের অকাল মৃত্যুর কারণ। এক মহিলা মডেল তারকা সাথে সমান্য আলাপ চারিতার এবং বিশেষ ভঙ্গীতে বসার কারণে কিছুদিন আগে একদিনে ব্রিটিশ মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হল। বৃটেনের রাজ

www.pathagar.com

পরিবারের কয়েকজনকে রাজ প্রসাদ ছাড়তে হয়েছে এ ধরনের অভিযোগে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একধিক দক্ষ ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিচারকের সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন দান করলেও তাদের নিযুক্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠে কংগ্রেসে। তাদের নিযুক্তির বিপক্ষে যেসব যুক্তি প্রদর্শিত হয়, তার মধ্য অন্যতম হচ্ছে তারা ছাত্রাবস্থা বা কর্মজীবনের প্রথমদিকে কোন এক সময় একটু আধটু সময়ের জন্য নেশার বুদ হয়েছিলেন বা কোন শিক্ষক, অভিভাবক বা কোন ভদ্রমহিলা তাদের চরিত্র সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ না করার যুক্তিযুক্ত কারণ খোঁজে পেয়েছেন।

এবার দৃষ্টি ফেরানো যাক আমাদের দেশের প্রতি। এমন কোন অপরাধ আমাদের দেশে নেই যা একাধিকবার করেও ক্ষমতার উচ্চশিখরে আহোরণ করা যায় না; বরং ক্ষমতায় উঠার সিঁড়ি ভাঙার পথে যে যত বেশী ঘৃণ্য অপরাধ করতে পারে তার উপরে উঠার সিঁড়ি তত প্রশস্ত হয়। অন্যদিকে সাধারণ একজন মানুষের পদ মর্যাদা নিয়ে এমন মাতামতি করতে দেখা যায়, যেন এ সমাজের বাকিরা সবাই ফেরেস্তাতুল্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। মূলতঃ ব্যাপারটি হচ্ছে কে, কখন কাকে বেকায়দা ফেলবে। আর এ পরিস্থিতি আজ আমাদের সমাজের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উত্তরনের পথ কি হবে? বর্তমান পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার অবকাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটানোর জন্য কোন বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। এ মূহুর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সমাজের উপরিকাঠামোতে একটি প্রলয়ঙ্করী ঘুর্নিঝড় সৃষ্টি করা। কারণ কোন একজন সাধারণ মনুষের বড় ধরনের অপরাধও জাতির জন্য বা সার্বিকভাবে সমাজের জন্য বিরাট ক্ষতি বয়ে আনতে পারে না। যেমন কেরানীর দশ টাকা ঘুষ খাওয়া অন্যায় ঠিকই, কিন্তু আমাদের জন্য সেটি বিরাট আপদ নয়। কিন্তু একজন জেনারেল বা সচিব বা উপাচার্য পর্যায়ের কোন ব্যক্তি যখন এ পথে পা বাড়ান, তখন জাতির জন্য অশনি সংকেত বেজে উঠে। প্রশ্ন হচ্ছে, এ অশনি সংকেত কবে থেকে বাজতে শুরু করেছে? তার প্রভাব আজ কতদুর পর্যন্ত বিস্তৃত? শুধুমাত্র শিক্ষঙ্গনে সন্ত্রাস, পথে-ঘাটে ছিনতাই ও পাড়ায় পাড়ায় মাস্তানদের চাঁদা আদায় করার ঘটনার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত জোর দিলে বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরোর মত ঘটনা ঘটবে। মূলতঃ হচ্ছেও তাই। প্রতিটি অভিযানে চুনোপুটিদের নিয়ে মাতামাতি হয়। অথচ রুই কাতলরা সহজেই রং বদলিয়ে পুনরায় নিজ নিজ আসনে সমামীন থাকেন মজবুত ভাবে। এতো সেদিনের কথা, এরশাদ সরকারের কুচক্রীদের বেশ বড় একটি অংশ ইতিমধ্যেই নিজেদেরকে যথেষ্ট সুন্দরভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে বর্তমান ব্যবস্থার সাথে। মূলতঃ দুচার জনকে কয়েক মাসের জন্য হাজতে পাঠানো, বিশেষ দায়িত্ব প্রেরণ বা বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ করানো ছাড়া সরকার এখন আর কোন রুই কাতলার বিরুদ্ধে তেমন কিছু করতে পারে না।

দুর্বল সরকার কোন জাতির জন্য কতবেশী দুর্ভোগের কারণ হতে পারে, তা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। বার বার অস্থিতিশীল সরকার যে কোন জাতির জন্য বড় ধরনের দুর্ভোগ বয়ে আনতে

www.pathagar.com

পারে। এ কাজে বিরোধী দলের ভূমিকাকে মোটেই খাটো করে দেখা উচিত হবে না। আইনকে করে তুলতে হবে সরকার ও বিরোধী দলের হাতে ব্যবহৃত একই অস্ত্রের এপিঠ–ওপিঠ। আর এ কাজটি তখনই সম্ভপর হবে, যখন ক্ষমতা ও অর্থের চক্রের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের আচার–আচরন নিয়ন্ত্রন করার মত যোগ্যতা, সৎসাহস ও নিষ্ঠা একসঙ্গে–একযোগে একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে।

আমাদের অবস্থা যতই খারাপ হোক না কেন এ শতাব্দীতে বেশ কবার এ জাতি প্রমান করেছে যে, কঠিন সংকট কালে নীতিগতভাবে তারা এক হয়ে কাজ করতে পারে। আজকের এ মুহূর্তে প্রথমে নৈতিকভাবে আমাদের এক জোট হয়ে প্রমান করতে হবে যে, কোন অবস্থাতেই আমরা আমাদের জাতীয় ও আর্থ–সামাজিক স্বার্থ গুটি কয়েক লোকের হাতে বিসর্জন দিতে পারি না। আর তাই প্রভাবশালী সকল দল ও গোষ্ঠীকে জন সাধারণের সম্মুখে বারবার জবাবদিহি মূলক পরিস্থিতির সামনে ফেলতে হবে। কোন ব্যাপারেই কাউকে ইজারদারের মত যথেচ্ছ ক্ষমতা ও অর্থ ব্যবহার করতে দেয়া যাবে না। আর এটিকে কোন সুবচন হিসেবে দেখা চলবে না, বরং আইনের কঠিন বেরসিক ভাষায় ও কাজে রূপান্তরিত করতে হবে। রুই মাছের যখন পচন শুরু হয়, যত দ্রুত পারা যায় এর মাথাটি কেটে ফেলে দিয়ে বাকী অংশের সদ্ব্যবহার করা উচিত।

প্রকৃতি ও জীবজগতে সুবিচার এবং নিয়ম–কানুন আপন গতিতেই চলে। কিন্তু মানুষের সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া বড়ই জটিল। কারণ মানুষ এ প্রক্রিয়ায় একজন সক্রিয় পক্ষ। অন্যায় অবিচার, শোষন, বঞ্চনা ও পশু প্রবৃত্তির মোকাবিলা করে সমাজ জীবনে মনুষ্যত্ব লালন করা বড়ই দুসাধ্য হয়ে পড়েছে মানুষের জন্যে। সত্য–মিথ্যা, ন্যায় ও অন্যায়ের এই নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রমে উভয় পক্ষই মনুষ। অন্যায়কারীরা কুচক্রী মহল গড়ে তোলে। অপরাধীদের এ মহল নিজেদের মধ্যে এক কঠিন সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে। আইনের গতিকে হার মানিয়ে কাজ করাই এদের ধর্ম। আর তাই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার যে কোন ধরনেরে বড় পরিবর্তনের সাথেও এরা দ্রুততার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফেলে। রাষ্ট্র যন্ত্র ও প্রশাসনিক সব স্তরে এরা ইচ্ছা করলে সহজেই নিরপরাধ ও সৎ মানুষদের হয়রানি করতে পারে। সবচাইতে দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে, এদের হাতেই আইন ব্যবহৃত হয়। এরাই আইনের সৃষ্টা ও দৃষ্টা।

যদি ধরা যায়, ঘুষ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন করা গেল। অপরাধীদের চাকুরীচ্যুত করার ব্যবস্থা করা হল। তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবার বিধান করা হল। তাহলে দেখা যাবে বড় অপরাধীরাই ছোট ছোট অপরাধীদেরকে দ্রুততার সাথে আইনের ফাঁকে আটকে ফেলবে। এমনকি নিরাপরাধ লোকদেরকেও এ আইনের বিধি মোতাবেক শাস্তি পাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলবে। ফলে দ্রুত ঐ আইনটির বিপক্ষে কথা উঠবে। এমনকি জনমতের উপর প্রভাব ফেলার শাক্তিও কুচক্রী মহলদেরই বেশী। পরিস্থিতি যখন এমন ভয়াবহ, তখন উত্তরনের কোন সহজ সরল পথ নির্দেশ সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

উপায় হতে পারে একটাই, দৃষ্টভ্ডমূলকভাবে আইন প্রয়োগরে ক্ষেত্র নির্ণয় করে নিতে হবে অত্যন্ত ছোট করে। এই ক্ষেত্রটি যারা প্রয়োগ করবে এবং যাদের উপর আইন প্রয়োগ করা হবে, উভয় দলই হবে সংখ্যায় কম এবং তাদের এই আওতাভূক্ত করে বেশীদিন রাখা হবে না। এদের উপর আইনের কঠোরতা স্বাভবিক মাত্রাকে ছাড়িয়ে যাবে। এ ব্যবস্থা যে একেবারেই নুতন, কিন্তু তা নয়। সব দেশেই এমন কিছু বিভাগ থাকে, যেখানে আইন শুধু বেরসিকই থাকে না, বরং সাধারণ আইনের মাপকাঠিতে তা নিষ্ঠুর প্রতিভাত হয়। এ জন্য বেশী দুরে যাবার দরকার নেই। সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোতে শাস্তির যেসব বিধান রয়েছে, তা আপাততঃ দৃষ্টিতে অনেক সময় নির্যাতনমুলক মনে হয়। অথচ এ বিশেষ ব্যবস্থার ফলে এ সমস্ত বিভাগগুলোতে আইনকে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে কাজ করতে দেখা যায়, যা আমাদের সার্বিক পরিস্থিতিতে মোটেই স্বাভাবিক নয়। তাই কোন প্রচলিত সাধারণ আইন ব্যবস্থা দ্বারা এর মোকাবিলা করা আদৌ সম্ভব নয়।

আমাদের সামাজিক ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলোকে আইনের নিয়ন্ত্রনে আনার স্বার্থে এমন সব নিয়ম কার্যকরী করা উচিত, যাতে করে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা কোন অবস্থাতেই সমাজে বিরাজমান আইনের শূন্যতা ও দূর্নীতি পরায়নতার অজুহাতে নিজেদেরকে আর দশজনের মত আইনকে বেআইনী আর বে-আইনীকে বিধিসিদ্ধ করার মত কাজ করতে সাহস না পায়।

জাতি হিসেবে আমরা জীবনে বহু গৌরবজ্জ্বল ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়েছি। আবার সাথে সাথে একজন মীর জাফর নয়, হাজারো মীর জাফরদের ফাঁদে পড়ে নিজেদের সর্বনাশ প্রত্যাক্ষ করেছি। কিন্তু এসব কোন ঘটনাকেই আমরা দীর্ঘদিন জাতীয় মানসপটে অক্ষয় ও অব্যয় করে রাখার ব্যবস্থা করতে আজো সমর্থ হইনি। অথচ নিজ ইতিহাস, তা ভালো-মন্দ যাই হোক না কেন, যে জাতি যত স্পষ্টভাবে সুসংহত করতে পেরেছে, সে জাতি তত ভাগ্যবান।

আমরা আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি জাতীয় স্বার্থের কথা বলা ও শোনা উভয়ই নিছক আনুষ্ঠানিকতায় রূপান্তরিত হয়েছে। দেশপ্রেম আজ মতলববাজ রাজনীতিবিদদের ফাঁকা বুলিতে হাবুডুবু খাচ্ছে। কাজেই জাতীয় স্বার্থ ও দেশপ্রেমের কোন কথাই যেন আজ আর আমাদের মনকে তেমন একটা নাড়া দেয় না। ব্যক্তি স্বার্থের জন্য আমরা যে কোন বড় ধরণের জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে কুন্ঠাবোধ করি না। প্রায়শঃই দেখা যায় যে, কোন প্রতিষ্ঠানের এক দু'জন কর্তাব্যক্তির অপসারন জাতীয় স্বার্থের জন্য অতীব জরুরী, অথচ তাদের বিরুদ্ধে হাজারো অভিযোগ সত্বেও কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না। এখানেই আজ আমাদের প্রচলিত আইন ব্যবস্থার মৌলিক চরিত্র সম্পর্কে কথা উঠে।

সাধারণ আইনের নীতি হচ্ছে অপরাধী প্রমানিত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত কোন অভিযোগের জন্য তাকে শাস্তি দেয়া যায় না। আমাদের সমাজের শতকরা ৮০ জন এখন

www.pathagar.com

দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে। শতকরা ৫০ জন অর্ধাহারে–অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। এমনি এক সমাজে পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক আইনব্যবস্থা শুধুমাত্র ক্ষমতাধর ও দুনীতিবাজদের হাতকেই মজবুত করে। কারণ, এরা সহজেই সামাজিক ও সার্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়ার সুযোগে আইনকে কিনে ফেলে। তাই আমাদেরকে অর্থনৈতিক অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে নজীর বিহীন কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যারা গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন রয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উথাপিত হলে প্রথমেই তাকে কুচক্রী মহল থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। খোঁজ খবর নিতে হবে তার জীবন যাত্রার ধরণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে। তার নিজের ও নিকট আত্মীয়দের কাছে জমাকৃত নগদ অর্থ ও সহায়–সম্পত্তির হিসাব চূড়ান্ত করতে হবে সরজমিনে। ব্যক্তিস্বাধীনতার ধূয়া তুলে তাদেরকে আইনের ফাঁক ফোঁকড় ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখতে হবে। দারিদ্রক্লিষ্ট অসহায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জানার অধিকার রয়েছে আমাদের সমাজের কর্তাব্যক্তিদের জীবন যাপন পদ্ধতির ধরণ সম্পর্কে। অর্থাৎ তারা কত বেতন পান, আর কত টাকা খরচ করেন; আর কিভাবে তাদের হাতে এত সহায়–সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়। বর্তমানে শতকরা দশ জনের হাতে দেশের প্রায় আশি ভাগেরও বেশী সম্পদ পুঞ্জভূত হয়েছে।

যাত্রা যদি এভাবেই শুরু করা যায়, তাহলেই শুধু সত্যিকার অর্থে আমরা আইনের সুবিচার আশা করতে পারি। কারণ একজন অন্নহীন, বস্ত্রহীন মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা আর সমাজের উপরতলার মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার ধরণ এক নয়। কাজেই উভয়ের জন্য প্রচলিত আইনও এক হতে পারে না। এটি "আইনের চোখে সমান" এ নীতির বরখেলাফই নয়, বরং সত্যিকার অর্থে আইনের চোখ সবাই সমান এ নীতি অনুসরণের সঠিক মাপকাঠি।

যে কোন অপরাধের জন্য সাধারণত শাস্তি হয় একইরূপ। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে শাস্তির তারতম্য হতে বাধ্য। নিরন্ন মানুষকে চুরির জন্য শাস্তি দেয়া অন্যায়। ধর্ষণের শাস্তি সকল অপরাধীর জন্যই একরূপ। কিন্তু আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন ব্যক্তি যখন এ অপরাধ করে, তখন শাস্তি কঠোরতম হতে হয়। একজন পুলিশ বা আনসার যখন ধর্ষণ করে, তখন তার মৃত্যুদন্ডও হতে পারে। কিন্তু একজন যুবককে পুলিশে চাকুরীতে পুষে মোটাতাজা করার ব্যবস্থা করলেই তার প্রতি দায়িত্ব পালন শেষ হয়ে যায় না। তার পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকসমূহের সমন্বয় সাধন অত্যন্ত জরুরী। দিনরাত যৌন উত্তেজনাকর নাচ–গান ও বেল্লালপনার শিকার করা হচ্ছে নিরীহ যুবক–যুবতীদের। কাজেই পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা জড়িয়ে পড়ছে এসব অপরাধের সাথে। পুলিশও তো রক্ত–মাংসের গড়া মানুষ। অনেক পুলিশ থেকে যাচ্ছে বহু বছর ধরে অবিবাহিত। আবার বিবাহিতরা পারিবারিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে নানাভাবে। পুলিশের প্রতি আইন কঠোর হতে হবে অবশ্যই। তবে তাদের এসব সমস্যার সঠিক সমাধান হওয়া অত্যন্ত জরুরী। আর এজন্য পুলিশ বাহিনীর ভিতর তাদের খোঁজ–খবর রাখার জন্য নিজস্ব গোয়েন্দা সংস্থা থাকা দরকার। যে সংস্থা সেনাবাহিনীর মত করেই পুলিশ বাহিনীকে অপরাধমূলক কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখবে।

www.pathagar.com

আইন ঃ অধিকার ও কর্তব্য
(LAW : RIGHTS AND DUTIES)

আইন দর্শন ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানে 'অধিকার ও কর্তব্য' বিষয়টি বেশ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। রাষ্ট্রীয় জীবনে অধিকারের বিষয়টি কেবল একটি দার্শনিক বিষয়ই নয়। এর ব্যবহারিক মূল্যও অনেক। অধিকার না থাকলে কর্তব্য পালন সম্ভব নয়। সকল কার্যাবলীতেই অধিকার ও কর্তব্য পাশাপাশি অবস্থান করে। একটির উপস্থিতিই অন্যটির অস্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এটি একটি সাধারণ কথা যে, রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে অধিকার সংরক্ষণ করে। এ অধিকার সংরক্ষণ করতে গিয়েই রাষ্ট্র অধিকার ও কর্তব্যের কোন দর্শন ও প্রক্রিয়াকে গ্রহণ করে। কোন রাষ্ট্রের সাথে অধিকারের কেমন সম্পর্ক তার উপর নির্ভর করে ঐ রাষ্ট্রের চরিত্র। তাই তো অধিকার সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লাস্কি প্রথম বাক্যেই বলেছেনঃ

রাষ্ট্র যে সব অধিকার সংরক্ষণ করে, তা দিয়েই তার পরিচয় জানা যায় (Every State is known by the rights it maintains)

অধিকারের প্রশ্নে শুরুতেই কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক প্রশ্ন উঠেঃ রাষ্ট্র কিসের জোরে ও কীভাবে অধিকারের ব্যাপ্তি নির্ধারণ করে? রাষ্ট্র কি শুধু শক্তির বলেই নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করে? নাগরিকদের কি এ ব্যাপারে করণীয় কিছুই নেই? আধুনিক রাষ্ট্রে নাগরিকরা তাদের অধিকার ও কর্তব্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ থাকবে, এমনটি আশা করা যায় না। রাষ্ট্র এখন আর নতুন কোন অধিকার সৃষ্টি করে না, বরং অধিকারের প্রতি তার স্বীকৃতি ও সম্মতি জানায়। প্রকৃতিক রাজ্যে অধিকার হয়তো আপন গতিতেই চলত, রাষ্ট্রের বা আইনের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন পড়তো না। কিন্তু আধুনিক যুগে রাষ্ট্র, আইন ও নাগরিকরা মিলে অধিকারের বিভিন্ন দিক নির্ধারণ ও সংরক্ষণ করে। আইন তাদের কোন অধিকার দেয় বা কীভাবে কর্তব্য পালনের নির্দেশ দেয়-নাগরিকরা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার বিশ্লেষণ করার সুযোগ পায়। নাগরিকগণ এখানে অধিকারের ব্যাপারে সক্রিয় পক্ষ। তাই অধিকারের সংজ্ঞাটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণতঃ ইচ্ছা পূরণ করার ক্ষমতাকেই অধিকার বলা যায়। হব্‌স অধিকারের এমনি এক পরিচয় দেয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অধিকারের এরূপ পরিচয় আজ অচল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে কাজ করলে রাষ্ট্র, সমাজ ও আইন অচল হয়ে পড়বে। একজনের ইচ্ছা হলো সে আর একজনকে হত্যা করবে এবং হত্যা করার ক্ষমতা ও কৌশল তার রয়েছে। হবসের অধিকারের ধারণানুসারে এখানে প্রথম ব্যক্তির অধিকার আছে দ্বিতীয় ব্যাক্তিকে হত্যা করার। আর এমনই যদি হয়, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির জীবন রক্ষার কোন অধিকারই স্বীকৃত হলো না। অথচ জীবন রক্ষার অধিকারের চাইতে বড় কোন অধিকার হতেই পারে না। যে পিতা-মাতার মাধ্যমে মানুষের

www.pathagar.com

আগমন এ ধরায়, তাদেরও কোন অধিকার নেই নিজ সন্তানদের হত্যা করার। আইন হয়ত অধিকারের ধরণ পাল্টে দিতে পারে বা অধিকার যে সব প্রক্রিয়ায় সংরক্ষিত হবে তাতে পরিবর্তন ঘটাতে পারে। তাই বলে আইন মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহকে অস্বীকার করতে পারে না।

বিকল্প অবস্থা মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা নয়। কিন্তু সে অবস্থাতেও একজন মানুষের সকল অধিকার স্বীকৃত। কিন্তু কোন মানুষ তার স্বীকৃত সকল অধিকার ভোগ করতে পারবে কিনা, তা ভিন্ন ব্যাপার। খাওয়া-পরার অধিকারসহ একজন অন্ধ, বোবা বা খোঁড়ার সকল অধিকারই স্বীকৃত। এ ব্যাপারে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সবাই সমান অধিকারী। এ কথার আইনগত অবস্থা কী? একজন অন্ধ বা খোঁড়া মেয়ে যদি কাউকে বিয়ে করতে চায়, তবে দেশের প্রচলিত আইন তার ধর্ম মতে তাকে বিয়ে করতে দিতে বাধ্য। এতে কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না। কিন্তু সে যদি তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে অসমর্থ হয়, তাহলে আইন কাউকে জোর করে তার স্বামী হতে বাধ্য করতে পারে না। তাই আইনের দৃষ্টিতে অধিকার স্বীকৃত হওয়া এক কথা, আর সে অধিকার লাভ করা ভিন্ন কথা। সকল ছাত্রের উচ্চ শিক্ষা অর্জনের অধিকার আছে। কিন্তু ছাত্র মাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার অধিকার নেই। এজন্য তাকে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করতে হয়। লাস্কির ভাষায় ঃ **(Rights in fact, are those conditions of social life without which no man can seek in general to be himself at his best)**

সময় ও সমাজ ভেদে রাষ্ট্রের পরিবেশ-পরিস্থিতি ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই বাহ্যিক আইনের বচন যতই অভিন্ন হোক না কেন, মানুষের লুকায়িত সম্ভাবনার স্ফুরণের সহায়ক পরিস্থিতির ধরণ সকল রাষ্ট্রে এক নয়। রাষ্ট্রের সার্বিক অবস্থা তথা সামাজিক ও রাজনৈতিক অবকাঠামো, বন্টন-ব্যবস্থা ও মানুষের নৈতিক অবস্থার উপর প্রকৃত পক্ষে নির্ভর করে মানুষের কোন অধিকার চূড়ান্ত পর্যায়ে কীভাবে সংরক্ষিত হবে। পূর্বে একজন অন্ধ বা বোবার পক্ষে শিক্ষিত হওয়া ছিল খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু এখন নব নব কৌশল ও যন্ত্র ব্যবহারের ফলে তাদের পক্ষে উচ্চ শিক্ষা লাভ আগের মতো অচিন্তনীয় ব্যাপার নয়। তবুও আইন কীভাবে কোন অধিকারের প্রতি তার স্বীকৃতি জানায়, তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে ও পরে ইউরোপে একজন মানুষের অধিকার যেভাবে স্বীকৃত হয়েছিল, তার মাঝে বেশ বড় ধরণের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাই আইনগত অধিকারের ব্যাপারটিকে প্রাকৃতিক অধিকারের মতো দেখলে ভুল হবে।। প্রাকৃতিক অধিকার সকল সময়ই এরূপ থাকতে বাধ্য, কিন্তু আইনগত অধিকার সদা পরিবর্তিত। দৃষ্টিভঙ্গি ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে কার্যক্ষেত্রেও মানুষের অধিকারের পরিধি পরিবর্তন হয়। রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত অধিকারের পরিধি আর রাষ্ট্রের কাছে দাবীকৃত অধিকারের পরিধি কিন্তু এক নয়। তাছাড়া রাষ্ট্র যন্ত্র সকল অধিকারকে একইভাবে স্বীকৃতি দিতেও পারে না। রাষ্ট্র সে সব অধিকারকে সর্বাগ্রে স্বীকৃতি দেয়, যা দিয়ে তার উদ্দেশ্য সাধন করা সহজ হয়। তাই রাষ্ট্রের আদর্শিক ও অর্থনৈতিক ভিন্নতা তার সংরক্ষিত অধিকারের রূপ

www.pathagar.com

ভিন্ন করে তোলে। সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে খাওয়া–পরার অধিকারের প্রকৃতি এক নয়। ইসলামী ধ্যান–ধারণা এই ব্যাপারে আরো বেশী ভিন্ন প্রকৃতির।

অধিকারের প্রকৃতিতে এবং তার সংরক্ষণের প্রক্রিয়ায় সাম্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সকলেরই কথা বলার বা মত প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে তার নাগরিকদের কথা বলার অধিকারেরও একটা পরিধি নির্ধারণ করে দেয়। রাষ্ট্রীয় ও জাতীয়, আদর্শিক বা ধর্মীয় এমন কিছু বিষয় আছে যা সকল বিতর্কের উর্ধ্বে। কিন্তু সে সব ব্যাপারে সকলেরই মত প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে, সেখানেও সাম্যের নীতি খুব কম ক্ষেত্রেই পালিত হয়। যাদের হাতে ক্ষমতা বা যারা ধনী ও প্রভাবশালী, তারা যেভাবে মত প্রকাশের অধিকার ভোগ করে, একজন নিরীহ ও দরিদ্র নাগরিকের পক্ষে এ অধিকার একইভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই রাষ্ট্রের উচিত অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা, যাতে করে সবাই ঐ অধিকার ভোগ করতে পারে। নাগরিকদের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিরাট বাধা–বিপত্তির সৃষ্টি করে। লাস্কি বলেনঃ (For in any adequate view of citizenship a State which refuses to me the thing it declares essntial to the well-being of another is making me less than a citizen) রাষ্ট্রের এরূপ আচরণ নাগরিকদের কাছ থেকে আনুগত্য লাভের জন্য বিরাট অন্তরায়। এই ধরনের অন্তরায় সৃষ্টি হলে মানুষ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যকে নিছক আনুষ্ঠানিকতায় রূপ দেবে, একে তার পবিত্র দায়িত্ব মনে করবে না।

রাষ্ট্র চাইবে তার প্রতিটি নাগরিকই তার ক্ষমতানুসারে সবচাইতে ভাল অবস্থায় থাকুক। কিন্তু তাই বলে রাষ্ট্র বা আইন সকলের জন্য ভালো অবস্থা তার ঘরে পৌঁছে দেবে না। আইন শুধু নেতিবাচক দিকগুলো অপসারণ করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। নাগরিকদের কাজ হবে ইতিবাচক দিকগুলো ব্যবহার করে নিজের অবস্থার উন্নতি ঘটানো। সকলেরই সম্পদ আহরণের অধিকার আছে। তবে সকলেই নিজ ক্ষমতা অনুসারে আইনসম্মতভাবে সম্পদের অধিকারী হবে, এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না। বরং যোগ্যতার তারতম্য অনুসারে বৈষম্য এখানে স্বাভাবিক অবস্থা। সে কারণেই 'অধিকার থাকা'কে (Possession of rights) 'দাবী থাকা' (Possession of claims) থেকে আলাদা করে দেখতে হয়

মানুষের অধিকারকে সামাজিক ও নাগরিক জীবনের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটেই দেখতে হয়। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নানা ধরণের পরস্পর বিরোধী শক্তি বিদ্যমান। সমাজের সদস্য ও রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে এ সব শক্তির বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না। কোন নাগরিক অধিকারই সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিজ অধিকার সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে। আইন আমাকে অন্যের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে চায় বলেই এ ব্যাপারে আমার কোন করণীয় নেই, তা কিন্তু মনে করার অবকাশ নেই; বরং আমাকেও সর্বদা সচেতন থাকতে হয়, যাতে করে আমি কারো সহজ আক্রমণের শিকারে পরিণত না হই। সম্মানের হানি

www.pathagar.com

ঘটলে বা সম্পদ চুরি'গেলে আইন সাহায্য করবে, এ কথা জেনে যদি কেউ তার নিজ সম্মান ও সম্পদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে, তবে আইনও তার অপারগতার কথা ঘোষণা করবে। কোন মূল্যবান বস্তু অবহেলা করে রাখার দরুণ চুরি গেছে, সেক্ষেত্রেও হয়তো আইন কিছু চেষ্টা করবে তা উদ্ধার করতে; কিন্তু আইনের কাছে সেক্ষেত্রে জোর বা নৈতিকতার দাবী খাটানো যাবে না। এখানে মনে রাখতে হবে; " আমি একাই শুধু রাষ্ট্রের জন্য নই, আবার রাষ্ট্রও শুধু আমার একার জন্য নয়" **(I do not exist solely for the State, but neither does the state exist solely for me)**

কাজেই দেখা যাচ্ছে, অধিকারের প্রশ্নটি শুধু অন্যের প্রতি কর্তব্যের সাথেই জড়িত নয়, নিজের প্রতি কর্তব্যের ব্যাপাারটিও এর সাথে সম্পৃক্ত। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাই, এর দু'টি দিক আছে; প্রথমতঃ অন্য কাউকেই আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে বাধা দিতে পারি না। দ্বিতিয়তঃ ভর্তির জন্য সকল শর্ত আমাকে পূরণ করতে হবে। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেয়ার অধিকারের সাথে আবার তা ফেরত দেয়ার ব্যাপারটি সর্ম্পৃক্ত। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে কাজ করার সাথে শুধু ঋণগ্রহীতারই উপকার নিহিত রয়েছে এমন নয়। ধরেই রাখা হয় এ ঋণ থেকে ঋণ গ্রহীতা ছাড়াও সমাজের অন্যান্য লোক এবং সামাগ্রিকভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র উপকৃত হবে। একজন ছাত্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সাথে এবং তার বিদ্যা চর্চার সাথে তার গোটা পরিবার, এলাকা ও জাতীয় স্বার্থ জড়িত আছে। কিন্তু ছাত্র বা তার পরিবার যখন এ উচ্চশিক্ষা গ্রহণের অধিকার বলতে সার্টিফিকেট অর্জন করে টাকা রোজগার বুঝে, তখন তার অধিকারের সাথে তার কর্তব্যের কথা সে বেমালুম ভুলে যায়। এ দায়িত্বহীন অধিকার ভোগের চেষ্টা সকলের জন্য অমঙ্গল ও অকল্যাণ ডেকে আনে। কর্তব্যহীন এ অধিকার ভোগ অধিকার আদায়ের মাধ্যম বা উপাদানটিকে দুর্বল, এমনকি ধ্বংসও করে দিতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আইন যে সব অধিকার নাগরিককে দেয়, তার পেছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের ও সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের ব্যাপারটি নিহিত থাকে।

যেহেতু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহৃত হয় মানুষের হাত দিয়েই, আর রাষ্ট্র যে সব অধিকার সংরক্ষণ করে, তাতেও রক্ত-মাংসের মানুষের ভূমিকাই মুখ্য, তাই অধিকারের ধরণ সব সময়ই এক হতে পারে না। রাষ্ট্র কর্তব্য ও অধিকারের ব্যাপ্তি সম্প্রসারিত বা সঙ্কোচিত করতে পারে। তাই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমি যেমন তার কাছ থেকে অধিকার দাবী করতে পারি, তেমনি রাষ্ট্রও আমার কাছ থেকে কর্তব্য পালন দাবী করতে পারে। এ দ্বিপাক্ষিক অধিকার ও কর্তব্য পালনের প্রক্রিয়ায় সংঘাত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। রাষ্ট্র শক্তি কর্তৃক ক্যাথলিক বিশ্বাস লালিত হয় বলেই গ্যালিলি স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারবে না এবং এজন্য তাকে দণ্ড দেয়া যাবে, একথা আজ আর খৃস্টীয় বিশ্বেও স্বীকৃতি নয়। গ্যালিলির প্রতি রাষ্ট্র ও ধর্মের নামে অন্যায় অবিচার করা হয়েছে-এ কথাই আজ সকল সভ্য মানুষ দ্বিধাহীন কন্ঠে উচ্চারণ করে। কাজেই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ও রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারটি একটি গতিশীল প্রবহমান প্রক্রিয়া। রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করার কারণেই যখন তখন কাউকে সাজা দেয়া যাবে না। আঁন্দ্রে সাখারভের কমিউনিস্ট বিরোধী চিন্তা-ভাবনার জন্য তার উপর যে অন্যায়-অবিচার করা হয়েছে, তা সমগ্র বিশ্ব ধিক্কারের সাথে স্মরণ করে। সাখারভরা যখন চরম সর্বাত্মকবাদী সোভিয়েত রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ না করে এর বিরোধিতা শুরু করে, তখন ক্রেমলিন যদি হুশিয়ার হতো বা ঐসব সমালোচনার আলোকে নতুন করে নাগরিকদের অধিকার নির্ধারণ করতো, তবে হয়তো সোভিয়েত রাশিয়ার এ বিরাট বিপর্যয় ঘটতো না।

রাষ্ট্র ও নাগরিক অধিকারের মাঝে পারস্পরিক লেন-দেনের ব্যাপারিটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, এর হের-ফের ঘটলে সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রই ভেঙ্গে পড়তে পারে। জোর করে সবাইকে সমান অধিকার দেয়া যেমন রাষ্ট্রের উচিত না, তেমনি আইননুগভাবে সৃষ্ট বৈষম্য যেন মানুষের জন্য অসহনীয় হয়ে না উঠে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। সম্পদ ও জ্ঞান মানুষের অনেক বেড়েছে, কিন্তু তা এখনও খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের কাছেই সীমাবদ্ধ। এ ব্যাপারে অধিকার সংক্রান্ত আইন গুলো যদি যথাযথ পালিত হয়েও থাকে, তবু জ্ঞান ও সহায়-সম্পদ বিতরণের জন্য নব নব কৌশলের উদ্ভাবন করতে হয়।। তা না হলে সামগ্রিকভাবেই সমাজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই অধিকার সমান। একথাটি নিরর্থক হয়ে পড়ে, যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ধনিক-বণিক শ্রেণীর হাতে কুক্ষীগত হয়ে পড়ে। দেশের বাঘা বাঘা ধনীদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনা করার অধিকার ছেড়ে দিলে দরিদ্রের স্বার্থ সংরক্ষিত হবার সম্ভাবনা থাকবে না। কারণ ধনীর ধর্ম হলো ধন কুক্ষীগত করা। এটাই তার প্রধান ধর্ম, তার অন্য সব পরিচয় তার নিজের কাছেও গৌণ। লাস্কি বলেন, "The rule of the rich, whether of land men or of those who owned industrial capital, has been devoted firstly to the accumulation of wealth, and secondly to prevention its diffusion."

এ যুক্তিতেই হয়তো মার্গারেট থ্যাচারের পতনের পর মাইকেল হেজেলটাইনের মত শিল্পপতিকে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর পদে বসতে না দিয়ে এক কালের বাস কণ্ডাক্টর জন মেজরকেই রক্ষণশীল দল প্রধানমন্ত্রী করলো। এখানে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অধিকারটি আইন দ্বারা নির্ধারিত হলেও, মূলতঃ অলক্ষ্যে নৈতিকতা দ্বারাই এটি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ধন ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আইন কখনো এক শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার স্বীকার করে না সত্য, কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জটিলতার সুযোগে ধনীরাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উপর বেশী প্রভাব ফেলতে সমর্থ হয়। আর বিত্তহীন শ্রেণী দরিদ্রতার কশাঘাতে জর্জরিত থাকে বিধায় সরকার যন্ত্রের উপর তাদের তেমন কোন প্রভাবই থাকে না।

রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতার ক্ষেত্রে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতিও মূলতঃ নাগরিক অধিকারকে সর্বস্তরে পৌঁছে দেয়ার একটি প্রয়াস মাত্র। কিন্তু ক্ষমতাকে যতই বিকেন্দ্রীকরণ করা হোক না কেন, যদি উৎপাদন ব্যবস্থাকে পর্যপ্ত পরিমাণ উন্নত করা না যায়, তবে নাগরিকদের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরী করা সম্ভব হবে না। সবচাইতে সুন্দর হত, যদি দেশের সকল বয়স্ক নাগরিককেই

www.pathagar.com

উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত কর্মকাণ্ডে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু কোন রাষ্ট্রের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত বিরাট এক কর্মী বাহিনীর উৎপাদনের সাথে কোনই সম্পর্ক থাকে না। তাছাড়া প্রতিযোগিতার এ যুগে বিরাট সংখ্যক কর্মক্ষম মানুষকে কর্মহীন অবস্থায়ও দিনাতিপাত করতে হয়। সকলেরই কাজ পাবার অধিকার আছে, কিন্তু সবাইকে কাজ দেয়া যায় না। মজুরি নির্ধারণ করেন তিনি, যিনি কাজে নিয়োগ দান করেন। কি সরকারী, কি বেসরকারী সকল কাজেই সঠিক মজুরী পাবার অধিকার আইন স্বীকার করে। কিন্তু সঠিক মজুরির পরিমাপ কি রূপ হবে, তা নিয়ে বিরোধ দেখা দেবেই। কোন পেশাজীবী শ্রেণীই স্বীকার করবে না যে, তারা রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে তাদের শ্রমের বিনিময় ঠিক মতো পাচ্ছে। সকলেরই দাবী আরো বেশি পাবার। এই বেশি পাবার ইচ্ছা অনেক সময় শুধু জীবন-মান উন্নত করার জন্যই নয়, বরং মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্যও জরুরী হয়ে পড়ে। অথচ মানুষ শুধু তার প্রবৃত্তির প্রয়োজন মিটিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চায় না, সে মানুষ হিসেবে চায় স্বস্তি ও শান্তি।

(He needs the little comforts that make of life something more than a mean satisfaction of ugly wants.)

কিন্তু যে মানুষ তার দৈনন্দিন নূন্যতম প্রয়োজন মেটানোর বাস্তব অধিকার থেকে বঞ্চিত, তার কাছে প্রবৃত্তির তাড়না মোটেই কদর্য মনে হয় না। বরং তার জন্য জঠর জ্বালা সহ সকল জৈবিক প্রয়োজনই জীবনের সবচাইতে সঠিক বাস্তবতা হিসেবে ধরা যায়। এ সমস্যা সমাধানের জন্য রাস্কির প্রস্তাবিত সমাধান বড়ই চমৎকার মনে হয়।

(We must year by year abstain from consuming some due proportion of what we produce, that, in the lean years , those who, either temporarily or permanently, are deprived of the opportunity to labour may not, also be deprived of the means of life)

কিন্তু ভোগ এমনই এক ব্যাপার, যা থেকে সম্পদের ভোক্তাদের এভাবে দূরে রাখা সম্ভব নয়। বরং উৎপাদিত দ্রব্য যখন এতো বেশি পরিমাণ হয়ে দাঁড়ায়, যা যখন হ্রাসকৃত মূল্যেও বিক্রি করা সম্ভব নয়, তখনই হয়তো ভাগ্যহত মানুষের পক্ষে ঐসব দ্রব্য ভোগ করা সম্ভব হয়। তবে পুঁজিপতিরা সে সব দ্রব্য নষ্ট করে ফেলতে পারে, তাদের বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণ করার সুবিধার্থে। আইনকে এখানে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হয়। উৎপাদিত ভোগ্য পন্য যাতে দুনিয়ার কোথাও কেউ ইচ্ছা করে নষ্ট না করতে পারে, সে ব্যাপারে আইনকে সোচ্চার হতে হয়। **(From the mere competition of private and self interests we cannot secure a well ordered society)**

কোন পুঁজিপতি বা বিনিয়োগকারী তার উৎপাদিত দ্রব্যের মালিক। কিন্তু তার এ মালিকানার পেছনে রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সংস্থা ও নাগরিকদের বহু অবদান রয়েছে। কাজেই সে যদি কোনভাবেই তার উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করতে না পারে, সেজন্য সে নিজেই দোষী। কিন্তু

www.pathagar.com

উৎপাদনের পেছনে যে কাঁচামাল ও জনশক্তি ব্যবহৃত হয়েছে, তা তো জাতীয় সম্পদ। কাজেই কোন উৎপাদিত দ্রব্যই এ যুক্তিতে ধ্বংস করা যাবে না যে, মালিক তা বিনা কারণেই নষ্ট করে দেয়ার অধিকারী। এ ব্যাপারে প্রতি রাষ্ট্রেরই উচিত এমনভাবে আইন সাজানো যেন সরকারী ও বেসরকারী সকল সম্পত্তিই যথেচ্ছ অপব্যবহারের হাত থেকে রেহাই পায়। জনশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এ নীতি সমভাবে প্রযোজ্য।

এ সব কারণেই রাষ্ট্রকে আইনের সাহায্যে অধিকার সংরক্ষণের বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।। কাজের অধিকার প্রয়োজন শ্রমিকের মজুরী পাবার লক্ষ্যে, শ্রমিক নিয়োগ করার অধিকার প্রয়োজন পুঁজিপতির কল-কারখানা চালু রেখে লাভ করার জন্য। পুঁজিপতি চাইবে শ্রমিককে যত বেশি খাটানো যায়, আর শ্রমিক চাইবে যত কম কাজ করে বেশি মজুরি পাওয়া যায়। তাই আইন ঠিক করবে, কোন পক্ষ কীভাবে অধিকার ভোগ করবে। আট ঘন্টার বেশি খাটানো যাবে না, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের কাজে নিয়োগ করা যাবে না, এমন সব বহু আইনের বাঁধন কিন্তু একদিনে সৃষ্টি হয়নি বা এখনও তা ঠিকমতো কার্যকর করা যায়নি। আর তাই জনকল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন ও কার্যকারিকতার জন্য গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগোষ্ঠীর শক্তিশালী কোন অংশ নিজ খুশি মতো রাষ্ট্র ব্যবস্থাসহ কোন ব্যবস্থাই একতরফাভাবে নির্ধারণ বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারার কথা নয়। কারণ সাধারণ জনগণের ইচ্ছা অভিরুচির প্রতিফলন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জণ্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ।

ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসকরা ক্ষমতা অর্জন করে। আর এ ভোটাধিকার নাগরিকগণ ভোগ করে থাকে ধর্ম, বর্ণ, জাত, লিঙ্গ ও ধনী-গরিব নির্বিশেষে। কিন্তু ভোটাধিকার প্রয়োগ নাগরিকরা ঠিকভাবে নাও করতে পারে। শাসক নির্বাচনে ভুল হওয়াটাও মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এ ভুল হওয়ার সম্ভাবনা যাতে কমে আসে বা মারাত্মক ভুল যাতে এড়ানো যায়, সেজন্য নাগরিকদের জ্ঞান অর্জন বা শিক্ষা লাভ করার অধিকার স্বীকৃত।

সুশিক্ষিত নাগরিকরাই গুজব ও সাময়িক আবেগ-উত্তেজনা থেকে নিজেদেরকে সংযত রেখে দেশ ও দশের স্বার্থে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে সমর্থ। তাই রাষ্ট্রের দায়িত্ব শিক্ষাকে যতবেশি পারা যায় সার্বজনীন রূপ দেয়া। শুধু নিরক্ষরতা দূরীকরণ নয়, বরং সকলকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। এ অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে কাউকে বাধা দেয়া যাবে না। বরং সকলের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে এবং শিক্ষা পদ্ধতি ও উপকরণ সাধারণ মানুষের আর্থিক সংগতির মধ্যে রাখা রাষ্ট্রের একটি গুরু দায়িত্ব। আর নাগরিকদের উচিত তাদের এ অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে উদ্যমী ও আত্মত্যাগী হওয়া।

নাগরিকরা যতই শিক্ষিত হোক না কেন এবং যত ভালো ভাবেই তারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করুক না কেন, শাসক ও শাসিতের সম্পর্ককে জনকল্যানমুখী করে তোলার জন্য নাগরিকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা থাকা জরুরী। মতামত প্রকাশের অধিকারটিও একটি

www.pathagar.com

সার্বজনীন অধিকার। কিন্তু মতামত প্রকাশ করার মাধ্যমসমূহকে সহজেই সবাই ব্যবহার করতে পারে না। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি, জননেতা, ধর্মনেতা, কোন সংগঠনের নেতা বা পত্র-পত্রিকার মালিক ও কর্তৃপক্ষ যত সহজে নিজেদের মত প্রকাশ করতে পারে, একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে তা কল্পনা করাও দুষ্কর । ধনী ও পুঁজিপতিদের পক্ষে মতামত প্রকাশ ও প্রচার করা সহজ হয়। জীবনের তাগিদে যে মানুষ দিন রাত ব্যস্ত, তার পক্ষে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করতে যাওয়া বিলাসিতা তূল্য। তবুও তার অধিকারটি স্বীকৃত হওয়া দরকার। কারণ যখনই সম্ভব হবে, তখনই সে যেন তার মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পায় এবং এই অধিকার প্রয়োগের পথে যেন কোন আইনগত বাধা না থাকে। কিন্তু রাষ্ট্র কি যুদ্ধাবস্থায় বা বিভিন্ন জাতীয় দুর্যোগ ও জরুরী অবস্থাতেও মতামত প্রকাশ করার সার্বজনীন অধিকার সবাইকে দিতে পারে?

সত্যিকার অর্থে বিভিন্ন ধরণের জরুরী পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র নাগরিকদের মতামত প্রকাশ করার অধিকারের উপর নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা আরোপ করতে পারে। কিন্তু তা কোন অবস্থাতেই যেন স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করতে না পারে। মতামত প্রকাশ করার অধিকারের সাথে আর একটি প্রশ্ন নিবিড়ভাবে জড়িত। নাগরিকগণ কি যা খুশি তাই বলতে পারে? গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধেও কি তারা স্বশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দিতে পারে?

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মানুষের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকার বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সে তার সকল মতামত প্রকাশ করার জন্য বক্তৃতা, সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক সবই প্রকাশও ব্যবহার করতে পারে। এ কথাও বলতে পারে যে দেশে সশস্ত্র বিপ্লব হওয়া উচিত। কিন্তু এ জন্য কোন হিংসাত্মক কাজ বা অস্ত্র সংগ্রহ অভিযান শুরু করতে পারে না। শুধু সশস্ত্র বিপ্লবের পক্ষে মত প্রকাশের ক্ষেত্রেই নয়, বরং রাষ্ট্রীয় দর্শন বিরোধী কোন মতাদর্শের ক্ষেত্রেও মতামত প্রকাশের অধিকার স্বীকৃত হওয়া উচিত। কোন আদর্শের পক্ষে মত প্রকাশের অধিকার না থাকলে, সে আদর্শের জন্য জন মনে মিথ্যা মায়ার ও আকর্ষণের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক।

জারের রাশিয়া যদি লেনিনকে নির্বাসন না দিত, তবে হয়তো সমাজতন্ত্র সে দেশে এতো দ্রুত প্রসার লাভ করতো না। ভলতেয়ার ফ্রান্সে থাকাকালীন যত শক্তিশালী ও প্রভাবশালী ছিল, তার চাইতে অনেক বেশি আকর্ষনীয় হয়ে ছিল নির্বাসিত হয়ে। সাম্প্রতি ইতিহাসে দেখা যায় ইরানের শক্তিশালী শাহের বিরুদ্ধে ইমাম খোমেনীর বিপ্লবী মতাদর্শ ইরানীদের কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল তার চৌদ্দ বছরের নির্বাসিত জীবনে। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় পুঁজিবাদের পক্ষে মত প্রকাশের কোন অধিকার না থাকা সত্ত্বেও সেখানেই পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণা মানুষকে পাগলপারা করে তুলেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রীয় আদর্শকে শক্তিশালী রাখার উপায় তার বিরুদ্ধবাদীদের উপর নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা নয়, বরং তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে নিজ আদর্শকে শক্তিশালী ও সুসংহত করা। কথা বলার অধিকার সবাইকে দেয়া হলেই মানুষ সহজে বুঝতে পারে, কারা দেশ ও জনগণের প্রকৃত বন্ধু ও প্রকৃত শত্রু। এ বুঝার ভুলও হতে পারে, কিন্তু

www.pathagar.com

সে ভুল দীর্ঘস্থায়ী হয় না; কারণ সাধারণ মানুষ সব সময় স্বস্তি ও শান্তি চায়, কামনা করে আইনের শাসন। সন্ত্রাসীরা হয় পরিত্যাজ্য এবং ইতিহাসের আস্তাকুঁড়েই হয় তাদের চিরস্থায়ী স্থান। মত প্রকাশের উপর সরকারী বেশী নিয়ন্ত্রণ কখনোই মঙ্গলজনক হয় না। কিন্তু সাধারণ মানুষের কিছু ধর্মীয় ও প্রথাগত ব্যপারে তারা নিজেরাই সমালোচনা সহ্য করতে রাজি থাকে না। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা সরকারের কী করণীয় থাকতে পারে?

একজনের জন্য মত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করতে গিয়ে সরকার সকলের বিরাগভাজন হতে চাইবে না, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখানেও সরকারকে মাত্রারিক্ত দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হয়। সর্বসাধারণের কোন ধর্মীয় বা প্রথাগত বিশ্বাসে যাতে কেউ আঘাত হানতে না পারে, সেজন্য সাধারণ মতামতের শক্তি দিয়েই তাকে মোকাবিলা করতে চেষ্টা করা হয়। আইনের ব্যবহার এখানে বেশী কঠোর হলেও জনসাধারণের অনুকম্পা আবার বিরুদ্ধবাদীর পক্ষে চলে যেতে পারে। এখানে ব্যাপারটি অনেকটা মৃত্যুদন্ড প্রপ্ত কোন খুনীর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার মতো। মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত একজন ব্যক্তি যখন খুন করেছে, তখন তার অপরাধের নিষ্ঠুরতা সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ করেনি বা এ ব্যাপারে খবরও রাখেনি। কিন্তু সুস্থ সবল মানুষটিকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানোর খবর অনেককেই পীড়া দেয়। আইনকে তখন খুব নিষ্ঠুর মনে হয়। কোন ব্যক্তি তার মত প্রকাশের অধিকার ভোগ করতে গিয়ে যখন জনগোষ্ঠির কোন বরাট অংশের মানুষকে আঘাত দেয়, তখন তা ভিন্নধর্মীদের জন্য তেমন কোন মর্মপীড়া বহন নাও করতে পারে। কিন্তু ঐ ব্যক্তির মতটিকে যখন আইন করে পরিত্যাগ করা হয় তখন তাদের মন সহজেই আহত হয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া নিষিদ্ধ এ মতের অনুসারীদের চিহ্নিত করাও কঠিন হয়ে পড়ে। লাস্কি বলেন, "Legally to prevent men from associating, it serves only to make the forms of communist activity more difficult to discover. "

সকল ধরণের ভিন্নমতালম্বীদের সভা-সমিতি করার আইনানুগ স্বীকৃতি থাকা প্রয়োজন। সংঘ সৃষ্টি করে বা সভা-সমিতির মধ্যেমে বেআইনী কাজে লিপ্ত হওয়ার আগ মূহুর্ত পর্যন্তই যে কোন মতালম্বীদেরই অধিকার থাকে তাদের কার্যাবলী পরিচালনা করার । কিন্তু বেআইনী বা রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকান্ডে লিপ্ত হবার সাথে সাথেই তারা এ ধরনের অধিকার হারায়। আদর্শিক দিক থেকে কোন দল বা সংঘ যতই ঠিক হোক না কেন, তাদের কার্যকলাপ যদি আইন বিরুদ্ধ হয়, তবে প্রথমে আইন তার উপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। কিন্তু কোন সংঘ যদি উপর্যুপরী বেআইনী কাজে লিপ্ত হয়, তবে তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হতেও পারে। তবে কোন দল নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পূর্বে, তার ক্ষতিকারক দিক খুব সুস্পষ্ট হতে হবে। এবং জনগনের রায়ের প্রতিফলন ঘটবে আইন দ্বারা গৃহীত এমন ব্যবস্থাতে এ ব্যাপারে অধিকতর মঙ্গলজনক ব্যবস্থাই আইনকে গ্রহণ করতে হয়। এমনকি জরুরী ব্যবস্থা বা যুদ্ধকালীন সময়েও প্রশাসনিক পদক্ষেপ মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। একথা ঠিক যে, ঐ ধরণের পরিস্থিতিতে প্রশাসনকে খুব দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হয়।

www.pathagar.com

তা না হলে রাষ্ট্র বা জাতি কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়তে পারে। যুদ্ধ কালীন পরিস্থিতিতে কোন শক্তি বা দল স্বৈরাচারী রূপ যাতে পরিগ্রহ্ করতে না পারে যেদিকেও আইনকে যত্নবান হতে হয়।

"An executive that has a free hand will commit all the natural follies of dictatorship. It will assume the semi-divine character of its acts. It will deprive the people of information upon which it can be judged " (Ibid. p. 126)

মূলতঃ বিভিন্ন ধরণের অস্বাভাবিক অবস্থায় কোন রাষ্ট্রের সরকার ও জনগণের নৈতিক মানের উপর নির্ভর করে সেখানে আইনের শাসন কতখানি বলবৎ থাকবে এবং জনগণের অধিকার কতদূর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অস্বাভাবিক পরিবেশ পরিস্থিতিতে মতভেদ তীব্র আকার ধারণ করতে পারে। একই সমস্যার মোকাবিলায় চরমপন্থীরা সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে। শুধুমাত্র প্রশাসনিক কাঠোরতা বা বিচার বিভাগের বলিষ্টতা দিয়ে মানুষের সার্বিক অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। জনগণ ও রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তি যদি শক্তিশালী হয়, তবেই ঐসব ব্যবস্থা কাংখিত শুভ ফল বহন করতে সমর্থ হয়।

অধিকার স্বীকৃত হওয়ার চাইতেও মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, কী পন্থায় ঐ অধিকার প্রতিষ্ঠিত। বেকার মানুষের জন্য কোন রাষ্ট্র তার আর্থিক অসংগতির কারণে বেকার ভাতা পাবার অধিকার স্বীকৃত নাও পারে। কিন্তু তার বেঁচে থাকার অধিকার অস্বীকার করা যায় না। আর কোন সমাজের বেকার মানুষগুলো কিভাবে বেঁচে থাকবে, তা অনেকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ভর করে বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেনীর কাজে ও বেতনের সঠিক সমন্বয় সাধনের উপর। পেশাজীবী মানুষেরা যখন তাদের পেশাকে শুধুমাত্র বেতন ও ভাতাদি পাবার মাধ্যম মনে করে এবং অন্যের অধিকার মিটানোর মাধ্যম মনে করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন বৃহত্তর জনগোষ্ঠি অনেক অধিকার থেকেই বঞ্চিত হয়ে পড়ে। এতো গেলো কর্মনিষ্ঠ ও সততার ব্যাপার। তাছাড়া তাদের কাজ কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে, তাদের বেতন ও ভাতাদি বীভাবে বাড়ানো বা কমানো হবে, এর উপরও নির্ভর করে পেশাজীবি শ্রেণীসহ্ সকল মনুষের অধিকার বাস্তবে কিরূপ পরিগ্রহ্ করবে। কোন রাষ্ট্রের নাগরিকরা বাস্তবে কীভাবে অধিকার ভোগ করবে, তা একদিকে যেমন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে, অন্যদিকে বুদ্ধিজীবি শ্রেণী কীভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে, তা প্রতিফলিত হয় ঐ সমস্ত অধিকার বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার গতি–প্রকৃতির উপর।

অধিকারের শ্রেণীবিভাগ

(CLASSIFICATION OF RIGHTS)

অধিকারকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথাঃ প্রাকৃতিক অধিকার (Natural rights) : নৈতিক অধিকার (Moral rights) : আইনগত অধিকার (Legal rights) : আইনগত অধিকার আবার তিনভাগে বিভক্ত। যথা ঃ পৌর অধিকার (Civil Rights);

www.pathagar.com

রাজনৈতিক অধিকার (Political rights); অর্থনৈতিক অধিকার (Economic rights); অনেকে আবার আইনগত অধিকারকে শুধুমাত্র দুইভাগে ভাগ করে থাকেন। তারা পৌর অধিকার ও অর্থনৈতিক অধিকারকে আলাদা আলাদা করে না দেখে দুটিকে এক সঙ্গে সামাজিক অধিকার নামে আখ্যায়িত করেন।

প্রাকৃতিক অধিকারঃ এ অধিকারের কোন সার্বজনীন সজ্ঞা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। আদিকালে ধর্মগ্রাহ্য ও যুক্তি নির্ভর সকল অধিকারকেই প্রাকৃতিক অধিকার বলা হত। হবৃস ও লকের মতে প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষ যে সব অধিকার ভোগ করত, তাই প্রাকৃতিক অধিকার। অবশ্য মানুষ কী সব অধিকার ভোগ করত, তা নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। রুশোর মতে রাষ্ট্র সৃষ্টির আগে ও পরে মানুষ প্রকৃতিকভাবেই বেশ কিছু সার্বজনীন আদর্শ ও সুন্দর অধিকার ভোগ করত। প্রাকৃতিক অধিকার সম্বন্ধে আজকাল আর মানুষ পূর্বের ধারণায় বিশ্বাস করে না। বর্তমানে প্রাকৃতিক অধিকার বলতে সে সব অধিকারকে বুঝায়, যা কোন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির উপর নির্ভর করে না। এ সব অধিকার এমনিতেই সর্বত্র স্বীকৃত। সকল ব্যাক্তিরই ঐ সব অধিকার ভোগ করার নিশ্চয়তা থাকতে হয়। যদি কোন রাষ্ট্র এসব অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে ব্যর্থ হয়, তবে সে রাষ্ট্রটি নিজেকে সভ্য বলে দাবী করতে পারে না। একদিকে মানুষের শারীরিক ও আত্মিক বিকাশের জন্য এ সব অধিকার থাকা দরকার। অন্যদিকে রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে এ সব অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। এক কথায় বলতে গেলে, রাষ্ট্রের আদর্শই হচ্ছে, এ সব অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা। কিন্তু প্রাকৃতিক অধিকার যেহেতু পরোক্ষভাবেই শুধু রাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ত, তাই এ অধিকারের ক্ষেত্রে সমাজ ও মানুষের প্রত্যক্ষ সম্পর্কই মূখ্য। সমাজের অলিখিত কিছু প্রচলিত স্বীকৃতিই এজন্য যথেষ্ট। অন্যদিকে মানুষের সচেতনতা ও নৈতিক উন্নতির ব্যপারটিই প্রাকৃতিক অধিকারের মৌলিক বিবেচ্য বিষয়। মানুষ হিসেবে মানুষের সচেতনতার ফল ও মর্যাদার সঙ্গে তার বেঁচে থাকার অধিকার, যা সঠিকভাবে সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত তাহাই প্রাকৃতিক আইন।

নৈতিক অধিকারঃ নৈতক অধিকারের পেছনে রাষ্ট্রের কোনই স্বীকৃতি বা নিয়ন্ত্রন থাকে না। মানুষের নৈতিক অবস্থা এই নৈতিক অধিকারের মানদন্ড ও স্বীকৃতি। প্রথা, লোকাচার ও জনমতই নৈতিক অধিকারের উপস্থিতি ও প্রতিষ্ঠার সাক্ষ্য বহন করে। আইনের কোন শক্তি একে নিয়ন্ত্রণ করে না। কিন্তু যে শক্তি এ অধিকার নিয়ন্ত্রণ করে, তার প্রায়োগিক ক্ষমতার উপস্থিতি ও প্রতিষ্ঠা মোটেই তুচ্ছ নয়। পুত্র, পিতার সন্তান হিসেবে বা পিতা তার সন্তানদের বাবা হিসেবে আইনের আওতার বাইরে যে সব পারস্পরিক অধিকার ভোগ করে, তার নৈতিক ভিত্তি যথেষ্ট দুর্বল ও সবল হতে পারে। পিতা তার সন্তানের প্রতি বা ছেলেমেয়েরা তাদের পিতার প্রতি যে ভালোবাসা, আদর যত্ন ও সেবা-শুশ্রূষা করে, আইন তা সামান্যই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। নৈতিকতার দাবী মিটানোর খাতিরেই এ অধিকারের জন্ম ও তার সযত্ন লালন-পালন। পিতা-পুত্র, মা-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-পড়শীর মাঝে স্নেহ ও মায়া-মমতার কমতি ঘটলে বা ঘাটতি দেখা গেলে আইন দ্বারা তার সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু মল্যবোধের সঠিক লালন-পালন ও মায়া-মমতার সযত্ন চর্চার

www.pathagar.com

ব্যাপারে আইন কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। জনমতই নৈতিক অধিকারের রক্ষা কবচ।

আইনগত অধিকারঃ আইনগত অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত। রাষ্ট্রের পুলিশ ও আদালত এই সব অধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর । আইন নিজেই ঠিক করে দেয় এ অধিকারের প্রকৃতি কেমন হবে এবং তা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। সব ধরণের আইনগত অধিকার মিলে রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকদের সম্পর্ক নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। সামাজিক বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একজন নাগরিক তার পৌর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্রের উচিত নাগরিকদের সব পৌর অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা। রাজনৈতিক অধিকার রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে নাগরিকদের অংশীদারিত্ব পাবার সুযোগ করে দেয়। রাজনৈতিক অধিকারের মাধ্যমে পৌর অধিকার স্বীকৃতি লাভ করে। আবার পৌর অধিকার ছাড়া রাজনৈতিক অধিকার অর্থহীন। অন্যদিকে অর্থনেতিক অধিকার ছাড়া পৌর অধিকার বা রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করা সম্ভব নয়।

পৌর অধিকার ঃ যেহেতু জীবন আছে বলে অধিকার আছে, তাই আমরা জীবন রক্ষার অধিকারকেই সবচাইতে মূখ্য অধিকার বলতে পারি। মৃত্যুর পর মানুষের অইনগত অধিকার ভোগ করার সীমা খুব সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে। লাশের সৎকার ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক অধিকার ভোগের ব্যাপারটিও মানুষের জীবনের মুল্যের সাথেই জড়িত। মানুষের জীবন রক্ষার ব্যাপারটিও তাই গুরুত্বপূর্ণ। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পূর্ব থেকেই এ অধিকার পেয়ে থাকে। মা-বাবা তো দূরে থাকে, মানুষ নিজেও নিজের জীবন হরণ করতে পারে না। আত্মহত্যার প্রচেষ্টাকারীকেও আইন শক্তভাবে বাধা দিতে উদ্যত হয়। আন্যের জীবন হরণ কালেও তো আইন হত্যাকারীর জীবনাবসানই দাবী করে বসতে পারে।

আত্মহত্যা রোধ করতে হয়ত আইন অনেক সময় ব্যর্থ হয়। কিন্তু তাই বলে আত্মহত্যাকে যে কোন ব্যক্তির আইনগত অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। আইন আত্মহত্যাকে পরিবার,সমাজ, রাষ্ট্র ও সৃষ্টিকর্তার প্রতি অন্যায় হিসেবে চিহ্নিত করে। অবশ্য আত্মহত্যা করার পর আইন তার প্রতি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সমর্থ হয় না। এ নিয়ে আইন আর অগ্রসর হতে চায় না, যদি না এর পিছনে অন্য কেউ দায়ী থাকে।

হত্যাকারীর বিরুদ্ধে আইন সব যুগেই খুব কঠোর ছিল। ইদানিং অবশ্য বেশ কিছু দেশে হত্যাকারীর রিরুদ্ধে আইন বেশ নমনীয় ভাব প্রদর্শন করছে। ডেনমার্ক, হল্যান্ড বেলজিয়াম, নরওয়ে, ইসরাইল ও সুইডেনের মত দেশে বেশ কিছুকাল ধরেই শাস্তি হিসেবে মৃত্যাদন্ড দেবার বিধান রহিত হয়ে আছে। আইন এ ক্ষেত্রেও হত্যাকারীকে জীবন রক্ষার অধিকার দিচ্ছে। কিন্তু যাকে হত্যা করা হয়েছে, তার ব্যাপারে এ ব্যবস্থা কেন! বলা হচ্ছে কোন ব্যবস্থাই তো তার জীবন পুনরায় দিতে পারছে না আইন। শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ড রহিত করার পেছনে কেন্দ্রীয় যুক্তি হচ্ছে, একজন হত্যাকারী তার কর্মটির পরিনতির কথা না ভেবেই এ কাজটি করে। অর্থাৎ

www.pathagar.com

পরিবেশ–পরিস্থিতির চাপে পড়েই একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের জীবন. হরণ করে। কিন্তু আজকের দুনিয়ায় ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিত উপায়ে অনেক হত্যাকান্ড সংঘটিত হচ্ছে। মৃত্যুদন্ড দেয়ার সঠিক ব্যবস্থা রাখতে পারলেও বহু নিরাপরাধ মানুষকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করা যেত না, এমনটি জোর দিয়ে বলা যায় না। নরহত্যা যতবেশী বিচিত্র রুপ ধারণ করছে এবং এর সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, তাতে এর শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ডকে ঘিরে বিতর্কের ঝড় আরো বহুদিন অবাহত থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

জীবন বাঁচানোর আধিকার (Right to Life) থেকে শুরু করে আত্মক্ষার অধিকার (Right to Self defence) কথাটি এসে যায়। যদি কোন মানুষের জীবন আসন্ন হুমকীর সম্মুখীন হয় তবে সে নিজেকে রক্ষা করার জন্য আক্রমনকারীর মৃত্যু ঘটালেও তা তার আইনগত অধিকারের আওতায় থাকবে। তবে এখানে শর্ত থাকে যে, তার এ ভীতি অমূলক হবে না। আক্রমনকারী একজনকে খালি হাতে আক্রমন করেছে, আর অন্যজন আত্মরক্ষার অজুহাতে তাকে পিটিয়ে বা গুলি করে হত্যা করেছে, এ ক্ষেত্রে অবশ্যই সে হত্যার জন্য দায়ী হবে।

জীবন রক্ষার ও আত্মরক্ষার অধিকারের পরই ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার অধিকার (Right to personal Safety and Liberty) গুরুত্বের দাবী রাখে। মানুষ তার নিজের জীবন, শরীর, অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ ও স্বাস্থ্য সমানভাবে ব্যবহার ও ভোগ করার অধিকারী। আইনানুগ উপায় ছাড়া তাকে অন্য কোনভাবে বন্দী রাখা যাবে না। তার শরীর স্বাস্থ্য ও অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের কোন ক্ষতিসাধন করা আইনতঃ নিষিদ্ধ। একজনের রক্ষিত বা প্রতিপালিত কোন বস্তু দ্বারা অন্যের ক্ষতি করার কোন আইনগত অধিকার নেই। একজনের পালিত কুকুর বা গরুও যদি অন্যের ক্ষতি সাধন করে, তবে তা আইনতঃ দন্ডনীয় অপরাধ। সরকার যদি অন্যায়ভাবে কাউকে জেলে ঢুকায় তবে তার বিরুদ্ধে আদালতে Writ Of HABAES CORPUS আনা চলে। আইন তার গন্ডীর বাইরে গিয়ে করো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার দিতে চায় না। এ ধরণের আইন বহির্ভূত ব্যবস্থার জন্য ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারে।

ব্যক্তি–মানুষের এ সব অধিকারের পর এসে যায় তার পারিবারিক জীবনের অধিকার (Right to Family Life) একজন মানুষ জীবন সঙ্গী বা ধর্মসঙ্গী কীভাবে বেছে নেবে বা কীভাবে পারিবারিক জীবন যাপন করবে, এ ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কাউকে জোর করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা বা তাকে এ বন্ধন থেকে মুক্ত করার কোন অধিকার অন্য কারো নেই। পারিবারিকভাবে নিজ গুনাবলীর সৎব্যবহার করার ব্যাপারেও সে স্বাধীন। পারিবারিক জীবন যাপন করতে অস্বীকার করলেও আইন তাকে এজন্য শাস্তি বিধান করতে পারে না। কারো স্বামী বা স্ত্রী নেই, এমনকি কেউ জীবনে কোনদিনই বিবাহ করেনি, এজন্য আইনের কিছু বলার নেই।

এ সব অধিকারের পরেই রয়েছে কথা বলা ও মতপ্রকাশের অধিকার (Right to Freedom of Speech and Expression) এ অধিকার শুধু গনতান্ত্রিক কোন ব্যবস্থা চালু রাখার

www.pathagar.com

জন্যই জরুরী নয়, বরং সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের যথেষ্ট পরিমান অবদান লাভের জন্যও এ অধিকারের প্রয়োজন রয়েছে। অন্যদিকে ব্যক্তিগত সকল সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের জন্যও এটি প্রয়োজন। নাগরিকদের এ অধিকার নানাভাবে সরকারী কর্মকান্ডের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে (Freedom of the Press) আমরা এ অধিকারের অর্ন্তভূক্ত বলে ধরে নিতে পারি। কারণ কথা বলা বা স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করার অধিকার ভোগ করতে গেলেই সংবাদ পত্রের স্বাধীন প্রকাশ ও বিকাশ অপরিহার্য। সংবাদপত্র কতবেশী সুষ্ঠভাবে তার স্বাধীনতা অধিকার ভোগ করে, তার উপর একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সফলতা নির্ভর করে।

সংবাদপত্র প্রকাশ বা মতামত প্রকাশ করার ক্ষেত্রে নাগরিকদের দুটি জিনিষের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হয়। প্রথমতঃ তাদের এ অধিকার ভোগ যেন রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপে রূপান্তরিত না হয়। দ্বিতীয়তঃ বিচারাধীন কোন মামলা বা ঘটনা যদি Sub Judice হয় তবে তার উপর কোন মন্তব্য বা বিবৃতি প্রদান করে বিচার বিভাগের স্বাধীন কর্মকান্ডে বিঘ্ন সৃষ্টিমূলক না হয়।

সভা-সমিতি, সংঘ করার অধিকার (Right to Freedom of public Meeting and Assocation) আজ সব রাষ্ট্রেই স্বীকৃত। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের এ অধিকার থাকা খুবই বাঞ্ছনীয়। জীবনকে আনন্দ ঘন করার জন্য ও রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি আনয়নের লক্ষ্যে সভা-সমিতি ও সংঘের কোন বিকল্প নেই। কারণ রাষ্ট্রের সকল মানুষ কোন একটি সংঘের সদস্য হয়ে থাকতে পারে না। সকলের জন্য এমনকি নিজ অবস্থানে থেকে ঐক্যবদ্ধ হবার সুযোগ সৃষ্টির জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। তবে কোন সংঘ যাতে বেআইনী কার্যাবলীতে লিপ্ত না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব শুধু রাষ্ট্রের বা জনগোষ্ঠির নয়; বরং প্রতিটি সংঘের সদস্যদের এ ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হয়। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে নাগরিকদের সুশৃঙ্খল আচরণ এ অধিকারের সুফল ভোগ করার পুর্বশর্ত। কোন অধিকারই মানুষ সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারে না, যদি সে সুশিক্ষিত না হয়।।

শিক্ষার অীধকার (Right to Education) একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। এখন আর অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন মানুষকেই শিক্ষিত বলা যায় না, জীবনের আধুনিক জটিলতার মাঝে সত্য-মিথ্যা ও ভালো-মন্দ চিনতে পারার মত শিক্ষার অধিকার সবারই থাকা উচিত। প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা হয়ত সবার না হলেও চলে। কিন্তু ন্যায়-অন্যায়, জানা ও বুঝার ক্ষমতা দেশের সব নাগরিকের থাকা দরকার। লেখাপড়া জানা লোককে কোন কিছু বুঝানো সহজ হয়, শিক্ষিত মানুষের পক্ষে নিজের ও জাতির ভালো-মন্দ বুঝা এবং সে অনুসারে কাজ করা সহজ হয়। তাই অনেক দেশেই প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ধারণা করা হয়, একটি মানুষ যখন অক্ষর জ্ঞান লাভ করে নিজেই সরাসরি বিভিন্ন মাধ্যম পড়ে ও বুঝে, তখন তথ্য ও তত্ত্বের সাথে পরিচিত হতে পারে, এর

www.pathagar.com

ফলে দৈনন্দিন জীবনের সব কাজেই বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়। সে কারণেই অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা শিক্ষার অধিকারকেই মানুষের এক নম্বর অধিকার বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ধারণা মতে মূর্খ মানুষকে কোন অধিকার ভোগ করতে দেওয়াও বিপদজনক। শিক্ষার অধিকারই মানুষকে যথার্থ অর্থে মানুষ করে তোলে। শিক্ষিত শত্রুকে তাই মূর্খ মিত্রের চাইতেও ভাল বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। কোন জাতি বা রাষ্ট্রের উন্নতি বা অবনতির পেছনে শিক্ষার অবদান অপরিসীম। তাই শিক্ষাকে জাতির মেরুদন্ড বলা হয়। এ অধিকার ভোগ করার অধিকার যেমন সবার রয়েছে, এ অধিকারের সুষ্ঠ ব্যবহারের জন্য সব সুনাগরিকের নিষ্ঠাবান কর্তব্য পালনও তেমনি অনস্বীকার্য।

www.pathagar.com

আইনের সার কথার স্ববিরোধিতা

আইন সম্পর্কে যতই বিস্তারিত আলোচনা করা যাক না কেন, একটি প্রধান প্রশ্ন যেন সর্বদাই সঠিক জবাবের দাবী নিয়ে হাজির হয়। আইনের সবচাইতে মূখ্য কাজটি কি? এক কথায় হয়ত বলা চলে, সুবিচার প্রতিষ্ঠাই আইনের কাজ। কিন্তু আইনের এ দৌরাত্নপূর্ণ পৃথিবীতে এত অবিচার অনাচার কেন? হয়ত উত্তরে বলা যায়, আইনের শাসন নেই বলে। তা হলে আইনের শাসন ও সুবিচার কি এক জিনিস? বাহ্যতঃ এ দু'টিকে হয়ত একই রূপ মনে হতে পারে। কিন্তু দু'টো ধারনাই আপেক্ষিক, আর এ দু'য়ের মাঝে সম্পর্ক নির্ধারণ করা প্রায়ই কষ্টকর।

Legal phenomenon ও Phenomenon of Law এক জিনিস নয়। সাধারণতঃ Lgal phenomenon বলতে আইনের উপরি-কাঠামোর কোন একটি বিষয়কে বুঝায় মাত্র। কিন্তু phenomenon of Law ধারণাটির অনেক বেশী ব্যাপক এবং এটি আইনের সার কথার (The essenec of Law) ধরনাটির সাথে সম্পৃক্ত। THE ESSENCE OF LAW, HOWEVER, MUST OF COURSE BE CORRELETED ONLY SUPER STRUCTURE. (P.76/ অর্থাৎ আইনকে যদি আমরা ন্যায়-অন্যায়ের রাষ্ট্রীয় মানদন্ড বলি, তাহলে এ মানদন্ডটি সবার জন্য তৈরী, অথচ এর গতিপ্রকৃতি দ্রুত পরিবর্তনশীল। তাহলে দেখা যাচ্ছে আইনের সারকথা ও যদণতমবণতমত মত ীটষ এক জিনিস নয়। তবে আইনের সার কথার দার্শনিক ভিত্তি যদি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করা যায়, তাহলে এর বহিঃপ্রকাশ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ সর্বত্রই প্রতিফলিত হচ্ছে বলে ধরে নেয়া যায়। তবুও আইনের Direct manifestation ও phenomenon of Law সব সময়ই যে একই গতি ও তালে চলবে এমন কোন কথা নেই। এদের মাঝে বৈপরীত্য ঘটাও মোটেই অসম্ভব কিছু নয়।

আচার-আচরণের একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল মানদন্ড দিয়ে কি সার্বজনীন সুবিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব ? আইন আজকে যে কাজটিকে বৈধ বলছে, আগামীকাল তাকে অবৈধ ঘোষণা করছে। তাহলে কোনটিকে সুবিচার বলব ? সে কারণেই আইনের সার কথার আলোকে বিচার করলে দেখা যায় শাস্তি দেয়া আইনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নয়।

আইন প্রথমেই রাষ্ট্রীয় সীমানার ভিতরে সকল ক্ষমতা, সহায়-সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার মালিকত্ব ও ভোগসত্ত্বের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজটির প্রতি নজর দেয়। আইন কোন ব্যক্তি বা সংঘকে কোন কিছুর মালিক বা অধিকারী করার পরই বলে দিতে চায়, ঐ মালিকানা বা ভোগসত্ত্ব দিয়ে কোনটি করা যাবে, আর কোনটি করা যাবে না। সে কারণেই বাস্তবে আইন বলে দেয় কোনটি বৈধ, কোনটি অবৈধ, কিসে আইনের স্বীকৃতি রয়েছে, কিসে নেই, আইনের বিধি বিধান সমূহ কি কি, আইনানুগ সম্পর্কের পরিধি কতদূর বিস্তৃত, বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কি কি অধিকার ও কর্তব্য

www.pathagar.com

রয়েছে। সর্বোপরি সে বলে দেয় তার শাসনের স্বরূপ কি? কাজেই সাধারণভাবে বলা যা, আইন সবার কাঁধেই কিছু না কিছু অধিকার ও কর্তব্য দিয়ে তার যথাযথ পালন নিশ্চিত করতে চায়। যদি সবাই ঠিক ঠিক ভাবে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে, তাহলেই শুধু বুঝা সম্ভব যে, কোন বিশেষ আইনের শাসনে কত দূর পর্যন্ত সকলের ন্যায্য পাওনা মিটে। কিন্তু আইনের শাসন (The rule of law) ধারনাটি বড়ই অসম্পূর্ণ ও অলীক। কোন সমাজে আইন লংঙ্গিত হলেই বলা যাবে না যে, সেখানে আইনের শাসন নেই। অথচ আইন অমান্যকারী বা অপরাধির বিরূদ্ধে আইন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সমর্থ হলেই আমরা বলি, দেশে আইনের শাসন আছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কোন তত্ত্বে বা মতবাদে সুবিচার, সাম্য ও আইনের স্বরূপ এবং ঐ মতবাদ অনুসৃত রাষ্ট্রে প্রচলিত আইন ও শাসনের মাঝে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকতে বাধ্য। আইনের সার কথা সরকার যে আর্থে বুঝে, জনগণ বা জনগণের কোন অংশ সে অর্থে নাও বুঝতে পারে। তত্ত্বে ও বাস্তবতায় আইন যারা প্রণয়ন করে এবং যাদের জন্য প্রণীত, যারা প্রয়োগ করে এবং যাদের জন্য প্রয়োগ করা হয়, এসব বিবেচনায় আইনের সার কথা দারুনভাবে বদলে যায়। স্থান, কাল-পাত্র ভেদে আইন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে আর্বিভূত হয়। এটি একাধারে শাসন ও শোষন, সুবিচার ও অবিচার, প্রগতিবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করতে পারে। একই আইন স্থান, কাল, পাত্র ভেদে সম্পূর্ণ বিপরীত মূখী ভূমিকাও পালন করে থাকে। কোন বৃটিশ আইন তার জন্মভূমিতে যে ধরণের ভূমিকা পালন করে, তা বৃটিশ-ভারতে ও পরবর্তীতে এক কালীন বৃটিশ উপনিবেশের কোথাও কখনই সে ধরণের ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হয়নি। যে আইন একজন ইংরেজের জন্য বয়ে আনে সুখ ও সমৃদ্ধি, ঠিক সে আইনটিই একজন ভারতীয়ের গলায় পরিয়ে দেয় পরাধীনতা ও বঞ্চনার জিঞ্জির । লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতার কথা বাদ দিলেও সাধারণভাবেই এক দেশের বা এক আদর্শের আইন অন্য দেশে গিয়ে অনুরূপ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। কোন দেশের ভাল ও গণমূখী আইন অন্য দেশে মন্দ ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রমাণিত হয়। আদর্শগত, জাতিগত, সংস্কৃতিগত পার্থক্য এর পেছনে বিরাট ভূমিকা পালন করে। তবে সরকার ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে জনগণের যে দূরত্ব তার ভূমিকাও এখানে মোটেই তুচ্ছ নয়। সরকার ও তার প্রতিষ্ঠান সমুহ যে সব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সাধারণ জনগণের এতে থাকে বিভিন্ন ধরণের স্বার্থ। আর তাই আইনের প্রতিপক্ষ তৈরী হয়ে যায় আইন তৈরীর সাথে সাথে। আইন জন্মলগ্ন থেকেই তার প্রতিপক্ষের প্রতি কঠোর। আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে সে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সচেষ্ট, ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষকে পুষিয়ে দিতেও সে তৎপর।

আইন কাউকে পুরস্কৃত করে, আর কাউকে বঞ্চিত করে। মূলতঃ আইন তার নিজের হাতকেই শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে চায়। আদালতে সে নিজকে ব্যবহৃত হতে দিয়ে নিজ বংশবিস্তারেও বাধা দেয় না। আইন তার প্রাথমিক উৎস সমূহ থেকে আত্মপ্রকাশ করে নিজকে সদা সচল রাখার স্বার্থেই আদালতের কার্যাবলীকে বিশেষ গুরূত্বের সাথে দেখে। নিজদেরকে যুগোপযোগী ও সমাজ

www.pathagar.com

উপযোগী করে রাখার স্বার্থেই আইন ও আদালতের মাঝে এহেন সখ্যতা। কিন্তু আইন কিছুতেই তার বংশ বিস্তারে আদালতকে ফ্রী লাইসেন্স দেয় না। তাই আইনের যে অংশ মানুষের অধিকার নির্ধারণ সম্পর্কিত, সে অংশ সম্পর্কে সে অন্যের হস্তক্ষেপ সাবধানতার সাথে এড়িয়ে চলে। আইনের এ অংশ SUBSTANTIVE LAW নামে পরিচিত। কিন্তু ঐ সব আইনকে সবল, সজীব ও বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহার করতে গেলে বেশকিছু কার্যবিধি আইনের প্রয়োজন পড়ে । এ কার্যবিধি আইনই হচ্ছে procedural law. আইন প্রণয়নকারী সংস্থার পক্ষে হয়ত SUBSTANTIVE LAW -এর প্রায় সবটুকুই প্রণয়ন করা সম্ভব। কিন্তু কার্যবিধি আইনের সব খুঁটিনাটি ঠিক করে দিলেও বাস্তবে সমস্যা প্রতিনিয়তই আইনের কাছে আরো নতুন নতুন প্রশ্নের উত্তর দাবী করে। তাই আইন তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির স্বার্থে আদালতকে কিছু অংশীদারিত্ব দিতে সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু বিভিন্ন প্রদ্ধতিতে এ অংশীদারিত্বের হার ভিন্ন। আইন সৃষ্টিতে আইন প্রণয়নকারী সংস্থা ও আদালতের ভাগাভাগির সূত্রের বৈশিষ্টের কারণে সমগ্র আইন ব্যবস্থার স্বরূপ পাল্টে যেতে পারে। কমন ল এবং সিভিল ল প্রদ্ধতির পার্থক্য সমূহ এ ব্যপারে প্রাণিধানযোগ্য। আইন যদিও বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্যই সৃষ্ট এবং সে দিক থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের বাস্তবতা বিবর্জিত আইন বেশীদিন নিজ মর্যদায় অধিষ্টিত থাকার কথা নয়। কিন্তু বহু আইন থেকে যায়, যার বাস্তব কার্যকারিতা বড়ই যৎসামান্য। কোন আইন হয়ত বহুলাংশে তার যুগোপযোগিতা হারিয়েছে, কিন্তু ভবিষ্যতে ঐ আইনটির আবারও প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, তাই আইনটি রদ না করে বরং তাকে রেখে দেয়াই শ্রেয় মনে করা হয়। অন্যদিকে বাস্তবতার দাবী মেটানোর সাথে যতই সংগতিপূর্ণ আইন তৈরী করা যায় না কেন, প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যায়, আইনটি তার বাহ্যিক সকল স্বরূপে প্রথম থেকেই অকেজো (obsolete) হয়ে পড়তে পারে। যেমন ৮০-র দশকে ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে বিরাট সংখ্যক আইন তার বাস্তব কার্যকরিতা হারিয়ে ফেলে, অন্যদিকে পূঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বিনির্মানে সৃষ্ট নতুন আইন সমূহ বাস্তবে তেমন একটা ফলদায়ক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠত করতে পারে নি।

কোন সমাজে আইনের সংখ্যা কত হওয়া উচিৎ বা আইনের ক্ষমতা কতদূর বিস্তৃত হওয়া উচিৎ -এটি একটি বিতর্কিত ব্যাপার। আইনের সংখ্যা তার কার্যকারিতার উপর কিরূপ প্রভাব ফেলে? অর্থাৎ সংখ্যা বেশী হওয়া ভাল না কম হওয়া ভাল? এসব প্রশ্নের একার্থবোধক উত্তর দেয়া কঠিন। কোন দেশের জন্য সঠিক আইন সংখ্যা নির্ধারণ করা কঠিন। কখন বলা যাবে, আইন সংখ্যা বেশী বা কম হয়েছে? মূলতঃ অকেজো বা অবাঞ্ছি ত আইনের সংখ্যা যত বেশী হবে, ততই কোন দেশের প্রচলিত আইনব্যবস্থা দূর্বল হয়ে পড়বে। আইন হারাবে তার কার্যকারিতা। অর্থাৎ আইনের সংখ্যা কোন মৌলিক ব্যাপার নয়। মৌলিক ব্যাপার হচ্ছে বাস্তবে তার প্রয়োগ। আইন যখন নিছক কাগজী ব্যবপার হয়ে দাঁড়ায়, তখন আইন মূলতঃ নৈতিক বাঁধনের চাইতেও দূর্বল হয়ে পড়ে। অবশ্য আইন ব্যবস্থাকে যদি সমাজের নৈতিক অবস্থার প্রতিবিম্ব ধরা যায়, তবে আইনের দূর্বলতা সমাজের নৈতিক অবস্থার দূর্বলতার নামান্তর মাত্র। কিন্তু কোন আইনের দূর্বলতার জন্য সে নিজেও দায়ী।

www.pathagar.com

আইনের সারকথার আলোকে আইন হচ্ছে এমন একটি আয়না, যেখানে ঐ সমাজের সঠিক চিত্র ফুটে উঠে। অর্থাৎ সমাজ হচ্ছে কায়া, আর আইন হচ্ছে তার ছায়া। ভাল সমাজেই শুধু ভাল আইনের জন্ম ও লালন-পালন সম্ভব। কিন্তু ভাল আইনের প্রতিপালনও ধীরে ধীরে একটি সমাজকে উন্নতি ও প্রগতির দিকে ঠেলে দিতে পারে। আইন যেহেতু একটি নিরপেক্ষ রূপ নিয়ে বিরাজ করে, তাই আইন ভাল বা মন্দ হবার ব্যাপরটিও বড়ই আপেক্ষিক। নৈতিক বাঁধনের স্বরূপ প্রায়ই সুন্দর ও মানবিক বলে অনুভূত হয়। অথচ আইনের কড়াকড়ি অনেক সময়ই আইনকে বাহ্যতঃ কঠোর, নির্দয়, এমনকি অমানবিক বলে চিহ্নিত করে। আইনের এ বাস্তব দিক কোন সমাজ কত সঠিকভাবে উপলব্ধী করতে পেরেছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সঠিক পদক্ষেপ নিতে পেরেছে, তার উপর নির্ভর করে ঐ সমাজ কতখানি মানবিক হতে পেরেছে।

www.pathagar.com

ইসলাম এবং ধর্মনিরপেক্ষতাঃ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে সাংবিধানিক আইন

১৯৪৫ সনের ৮ই মে মানব ইতহাসের নিষ্ঠুরতম যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং বিশ্বব্যপী জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে জোয়ার এসেছে । অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এশিয়া এবং আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তি ভেঙ্গে পড়েছিল এবং উভয় মহাদেশেই বেশ কিছু স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছে অর্ধ শতাব্দী আগে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং পুঁজিবাদী শোষণ ও নব্য-উপনিবেশবাদ হতে মুক্তির একটি ক্রান্তিকালীন অবস্থার মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছে। নতুন রাষ্ট্রগুলোর বিকাশের এই পর্যায় কালটিতে বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক টানাপোড়ণে (Political upheavals) একটি বিক্ষুব্ধ অবস্থা পরিদৃশ্যমান। পাশাপাশি নতুন রাষ্ট্র গুলো তাদের প্রনীত আইন নিজস্ব সামাজিক জীবনের মৌলিক নিয়ম ও নীতি বিধিবদ্ধ করার এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার পথ ও পন্থার রূপরেখা প্রায়নের চেষ্টা করছে।

অতীতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের প্রেক্ষিতে স্বম্প্রতি স্বাধীন দেশগুলোর বর্তমান আদর্শিক অবস্থা মিশ্র প্রকৃতির এবং প্রতিটি দেশের রাজনৈতিক চিন্তাধারা শ্রেণীশক্তি সমূহের বন্টন এবং ঐতিহ্যের উপর নির্ভরশীল। এই অবস্থা শ্রেণীস্বার্থ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির সামাজিক নীতির প্রতিফলনকারী বিবিধ আদর্শিক প্রবণতার উপস্থিতি ব্যাখ্যা করে। ধর্মনিরপেক্ষতার ধারাসমূহ এ সব দেশগুলোতে একটি দৃঢ় ভিত্তি অর্জন করেছে এবং কর্মজীবি জনসাধারণ এবং পাশ্চাত্যপন্থী বুদ্ধিজীবিরা নিজেদের মধ্যে শতাব্দী প্রাচীন পশ্চাদপদতা এবং সামাজিক অবিচার (social injustice) অতিক্রমণের একটি শক্তি অনুভব করছেন। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার একটি সার্বজনীন গৃহীত সংজ্ঞা খুঁজে পাচ্ছে না। যেমন আরবদেশগুলোতে ধর্মনিরপেক্ষতা " ঈশ্বরহীনতা" ("Godlessness") হিসেবে অনুধাবিত, অথচ পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর সমর্থিত এবং নির্ভরশীল। যদিও আদর্শিক দৃষ্টিকোন থেকে সমাধানের ক্ষেত্রে এটি একটি কঠিন সমস্যা, তথাপি আচরণবাদী মতবাদ (behavioural school) এবং সক্রিয়তবাদমূলক গতিবাদ (dynamics of operationalism) এই উভয় সংকটপূর্ণ জটিলতাটি (dilemma) এড়ানোর চেষ্টা করেছে।

সার্বিকভাবে অবশ্য আরব দেশগুলোতে আমরা সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে ইসলামের ক্রমবর্ধমান প্রভাব পর্যবেক্ষণ করি, ধর্মীয় পতাকাতলে রাজনৈতিক প্রতিবাদ সব জনগোষ্ঠীর বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের সহজাত রূপকথা, একথা অনেক গবেষক দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে স্বীকার করেন।

www.pathagar.com

ইসলামের প্রতি ঝোঁক একাধিকভাবে ষাটের দশকের জাতীয় উন্নয়নের পথ ও পন্থা নির্বাচনে এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামের পটভূমিতে পর্যাপ্ত সাংবিধানিক আইনের রূপরেখা অনুসন্ধানের সাথে সম্পৃক্ত। এসব পরিস্থিতির অধীনে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে আদর্শিক কর্মপন্থা (ideological platforms) এবং সাংবিধানিক ব্যবস্থা বিনির্মাণের ক্ষেত্রে ইসলাম এবং শরীয়ার প্রতি ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এটি একটি বাস্তবতা যে, মুসলিম দেশগুলো প্রগতির এবং প্রতিক্রিয়ার শক্তিসমূহের মধ্যেকার তীব্র একটি শ্রেণী এবং আদর্শিক সংঘর্ষের মধ্যে অবস্থান করছে। বেশ কিছুসংখ্যক দেশের সামাজিক জীবনে বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে।

একই সময়ে সামাজিক এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার ইসলামীকরণের (Islamization) ব্যাপারে আবেদন সৃষ্টি হচ্ছে এবং একটি ইসলামী পদ্ধতি (Islamic order) বিনির্মাণের ক্ষেত্রে বাস্তব পদক্ষেপসমূহ গৃহীত হচ্ছে। ইরান, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, সুদান, মালয়েশিয়া, মিশর ও তুরস্ক সহ বেশী কিছু দেশেই এই প্রবণতা স্পষ্ট।

এরূপ পরিস্থিতিতে ইসলাম আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি ক্রমবর্ধমান ভূমিকা পালন করছে, যা (আইন প্রণয়ন) পরিকল্পিত অথবা সংশ্লিষ্ট সরকারসমূহ কর্তৃক সম্পাদিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরণের বিচারিক অভিব্যক্তি (juridical expression) সরবরাহ করে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পন্থা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। এটি ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারার দেশগুলোর আইন প্রণয়ন, সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ইসলামের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে।

শরীয়া এবং সাংবিধানিকতাবাদঃ একটি অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে রাষ্ট্র এবং সাংবিধানিক বিকাশের রূপরেখা নির্ধারণে ইসলাম এবং শরীয়ার ক্রমবর্ধমান প্রভাব ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ অনেক পাশ্চাত্য-প্রাচ্যবিদ, মুসলিম পণ্ডিত ও গবেষকদের মনযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

বিষয়টি সম্পর্কে অনেক প্রকাশনা নির্দেশ করে যে, স্বাধীনতা অর্জনের পর মতাদর্শ হিসাবে ইসলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানরূপে বিদ্যমান, যা মুসলিম দেশগুলোর সামাজিক-রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করেছে। মুসলিম সাংবিধানিক আইনের মৌলিক নীতিমালার মধ্যে ইসলামের রাষ্ট্রীয় অবস্থান, স্বীকৃতি এবং এর লালন-পালন একটি সার্বজনীন মতবাদ।

তবে এ কথা অবশ্যই উল্লেখিত হওয়া প্রয়োজন যে, সামাজিক জীবনে এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাংবিধানিক বিকাশ নিরূপণের ক্ষেত্রে ইসলামের ভূমিকা এবং স্থান সংক্রান্ত গবেষণাসমূহ কেবলমাত্র তাদের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। বিশেষতঃ অঞ্চলটির দেশগুলোর সাংবিধানিক বিকাশ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এখনো অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে ব্যক্তিগত অনুসন্ধাসমূহ প্রায়ই অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং সামগ্রিকভাবে এই অঞ্চলের মুসলিম দেশগুলোর সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের সাংবিধানিকীকরণের (constitutionalization) অনেক মাত্রা এখনও উপেক্ষিত।

www.pathagar.com

অনেক গবেষক মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে সাংবিধানিক নীতিমালার বিকাশ অনুসন্ধান করেছেন। সত্য; কিন্তু গবেষকরা খুব কম ক্ষেত্রেই ইসলাম ও আধুনিক আইন ব্যবস্থার বহুবিধ সম্পর্ক পরিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন। অনেকে আবার বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এই কর্মে হাত দিয়েছেন। তাই সামগ্রিকভাবে ব্যাপারটি উপেক্ষিত হয়েছে। এ সমস্যাটি অনুসন্ধানের কেবলমাত্র সামাজিক তাৎপর্যই বড় নয়; বরং এর ব্যবহারিক গুরুত্বও অপরিসীম। সমস্যাটির অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বিকাশের প্রকৃত অবস্থাকে বিকৃতকারী পাশ্চাত্য রাজনীতিশাস্ত্রজ্ঞদের (politologists) বিরুদ্ধে এর সংঘর্ষের পরিধিতে বিচারিক বিজ্ঞানের (juridical science) একটি জরুরী দায়িত্ব রয়েছে। ই, এম, প্রিমাকভ ন্যায়সঙ্গতভাবে মন্তব্য করেছেন " সত্তর দশকের শেষাংশে এবং আশির দশকের শুরুতে ইসলামী বিস্ফোরণ বুর্জোয়া রাজনীতিশাস্ত্রজ্ঞদের অসতর্কতাকে আক্রান্ত করেছে।"

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর রাষ্ট্র এবং আইন প্রণয়ন কাঠামোর মধ্যে ইসলামের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে হলে শরীয়ার বিধিমালা নিরীক্ষা করা এবং অঞ্চলটির প্রতিটি দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশে নির্দিষ্ট প্রবণতাসমূহ চিহ্নিত করা প্রয়োজন। অতএব প্রথমেই যা করা দরকারঃ

১। ভূতাপেক্ষভাবে (in retrospect) মুসলিম দেশগুলোর সামাজিক বিকাশে শরীয়ার ভূমিকা পরীক্ষা করা।

২। বর্তমান পর্যায়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে রাষ্ট্র এবং আইন প্রণয়নের বিকাশের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলো অনুসন্ধান করা এবং এই প্রক্রিয়ার ইসলামের ভূমিকা চিহ্নিত করা।

৩। এ সব দেশগুলোর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা এবং প্রণীত আইনে তাদের বিচারিক অভিব্যক্তি (juridical expression) বিশদীকৃত করা।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাংবিধানিক বিকাশে ইসলামের ভূমিকাঃ

ক) রাজতন্ত্র ও ইসলামঃ এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, ইসলাম এবং শরীয়া সামগ্রিকভাবে মুসলিম দেশগুলোকে পরিচালনাকারী সামাজিক জীবনের আইনগত, নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক নিয়ম ও নিয়ন্ত্রন মালারূপে একটি সম্বদ্ধ প্রণালী (unified system) হিসাবে বিকশিত হয়েছে। যাদিও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে আইনগত এবং অ-আইনগত (non-legal) সম্পর্কগুলোর মধ্যে কোন বুনিয়াদী পার্থক্য নেই, তথাপি ইসলামী আইনগত মতবাদ এবং ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজে মানবীয় কর্মবিধির নীতিমালা হতে ধর্মীয় কর্তব্যসমূহকে পৃথক করে একটি সুস্পষ্ট রেখা চিহ্নিত করে। এটি শরীয়ার বিধিমালাকে (precepts) দু'টি শ্রেণী তথা উপাশনার নিয়মাবলী এবং বিচারিক (Julidical) নিয়ন্ত্রণমালাতে বিভক্ত করার ভিত্তি প্রদান করে।

ইসলামের আইনগত মতবাদ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহকে সরকার বা রাষ্ট্র হতে পৃথক করার (disestablishing the church) সাংবিধানিক নীতিমালাকে স্বীকৃতি দেয় না। অতএব যে কোন মুসলিম রাষ্ট্রে রাষ্ট্র ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে ইসলামী প্রতিষ্ঠানাদি প্রবর্তন করা এবং

www.pathagar.com

শরীয়াকে রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে ঘোষণা করাকে একটি অবশ্য করণীয়রূপে বিবেচনা করা হয়। এমন কি কার্ল মার্কসও তাঁর সময়ে এ বিষয়টি নির্দেশ করেছেনঃ "তুর্কী সাম্রাজ্য এবং এর শাসকদের জন্য কোরআন যুগপৎভাবে বিশ্বাস এবং আইনের উৎস।"

শরীয়া আইন অনুসন্ধানকারী পন্ডিতেরা বিশ্বাস করেন যে, কোনআন, সুন্নাহ্ (নবীর কর্মকান্ড, রীতিনীতি এবং বক্তব্য, যেগুলোতে আইনের শক্তি রয়েছে) ইজমা (ঐকমত্য) এবং কিয়াস (শরীয়ার ব্যাখ্যা, অনুরূপতার মাধ্যমে অবরোহন, ইজতিহাদের ভিত্তিতে অবধারণ) শরীয়ার মূল উৎস। উল্লেখ্য, এগুলোই ইসলামের বুনিয়াদ গড়ে তুলেছে। যখন তিনটি মৌলিক উৎসে কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া না যায়, তখন কিয়াসের আশ্রয় নেয়া হয়। শরীয়ার চতুর্থ উৎস হিসাবে কিয়াস এবং মুবাহ্‌র (অনুমোদিত ক্রিয়াকলাপ) ভিত্তিতে মুসলিম দেশগুলোর শাসনকর্তা, ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ এবং উলেমা কোরআন এবং সুন্নাহ্‌র সমস্ত বিধিমালা সুনির্দিষ্ট যুক্তি, অভীষ্ট মঙ্গল এবং অর্থের ভিত্তিতে সংস্থাপিত এরূপ একটি ধারণা হতে অগ্রসর হন। কিন্তু তথাপি এ ধরণের একটি যুক্তি রয়েছে যে, ইসলাম গণতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্যহীন, কেননা এতে চূড়ান্ত সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌তে অর্পিত (কোরআন ৩ ঃ ১৮৯, ৭ ঃ ৫৪,১২ ঃ ৪০ ৫ঃ ৪৭, ৪৩ঃ৮৫, ১৮ঃ ২৬) তবে বর্তমানে ইসলামী চিন্তাবিদগণ আল্লাহ্‌র নিকট সব মানুষের সমতা সংক্রান্ত কোরআন এবং সুন্নাহর বিধিমালা ব্যবহার করেন (কোরআন ৪৯ঃ ১০, ২ঃ ২১৩)। তাঁরা ইজমার ভিত্তিতে ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে খলিফার নির্বাচন যোগ্যতার নীতি (principle of electivity of the caliph) এবং শুরা বা পরামর্শের নীতির (the principle of deliberation) প্রতি নির্দেশ করেন (কোরআন ৪২ ঃ ৩৮)। এ সব চিন্তাবিদগণ ঘোষণা করেণ যে, ইসলাম কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক উদ্দীপনায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিতই নয়, বরং এটি সমকালীন অন্য যে কোন মতবাদ অপেক্ষা এ সব ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টতর। আল-আজারের শেখ মাহমুদ শালতুত উল্লেখ করেছেন, " সংসদীয় গণতন্ত্র হচ্ছে ইসলামী সমাজের বুনিয়াদী শাসন ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার অধীনে জনসাধারণের অধিকার এবং কর্তব্য উভয়ই রয়েছে। তাদের অধিকার রয়েছে নিজেদের স্বার্থ ও সম্পত্তি সংরক্ষণের। কিন্তু তারা সমাজকে রক্ষা করতেও বাধ্য।"

ইসলামী আইন নিয়ন্ত্রণ মূলক নীতিমালার (regulative code) উৎস হিসাবে এবং উপাসনা ও বিশ্বাসীদের ব্যক্তিগত জীবনের নিয়মতন্ত্র হিসাবে মুসলিম আইন-এর অস্তিত্ব চৌদ্দ শতাব্দী জুড়ে বিবর্তন ও রূপান্তরণ প্রত্যক্ষ করেছে। এটি খিলাফতের বিবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদানের সাথে নিজেকে উপযোগী করে নিয়েছে, যা (খিলাফত) ইসলামী আইনে নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিমালার (regulative code) এবং নিয়মতন্ত্র হিসাবে মুসলিম আইন-এর কলেবর ও গভীরতার দৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করেছে। ইসলামী খিলাফত ও মুসলিম রাজশক্তি

শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্য, প্রথা এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ অনুসারী মিশ্র জনগোষ্ঠী সমন্বিত বিশাল একটি ভুখন্ডকে শাসন করেছিল। অতএব এটা অনুধাবনযোগ্য যে, একটি নির্দিষ্ট দেশের ঐতিহাসিক অবস্থাদির ওপর নির্ভরশীল মুসলিম আইনের ভূমিকা কোন সরল সোজা বিষয় ছিল না। একথা বুঝা যেতে পারে সপ্তম শতাব্দী মুসলিম শাসন হতে এই শতাব্দীর প্রারম্ভে অটোম্যান সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত সময়কালে মুসলিম আইনের বিবর্তন সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান দ্বারা।

www.pathagar.com

মুসলিম দেশগুলোর আইন প্রণয়নে ইউরোপীয় আইনের প্রভাব, যা উনিশ শতকে অধিকতর রূপে অনুধাবনক্ষম একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই সত্য উপলব্ধির জন্য কঠিন গবেষণা ও নিরীক্ষণ ধর্মী মন ও মেধার প্রয়োজন অপরিহার্য। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ মুসলিম আইনের বিভিন্নক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ বিধিবদ্ধ আইনসমূহের (codified acts) বিকাশ প্রত্যক্ষ করেছে, যেমন; মিজেলী (the mejelle) (১৮৬৯-১৮৭৬) যা বিভিন্ন মুসলিম দেশসমূহে দীর্ঘ সময়ের জন্য কার্যকর ছিল।

১৯১৭ সালে মুসলিম পারিবারিক আইনের ইতিহাসে প্রথমবারের মত মুসলিম দেশগুলো শরীয়ার হানাফী ও অন্যান্য সুন্নী মতবাদের নীতিমালা অটোম্যান পারিবারিক আইন (Ottoman Family Law) অবলম্বন করেছিল। এই আইন মধ্যপ্রাচ্যের বিদ্যমান এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে দৈনন্দিন পরিবারিক সম্পর্কসমূহ পরিচালিত করেছে। মুসলিম জনসাধারণের জন্য মৌলিক আচরণীয় নীতি (behavioural criterion) হিসাবেও এটি বিদ্যমান। ঐশ্বরিক আইন হিসাবে শরীয়া বিভিন্নদেশে বিভিন্নভাবে অনুশীলিত। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কালে শরীয়ার বিধিমালা রাজনৈতিক মতাদর্শসমূহকে বিকশিত করেছে। উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে, সামাজিক দায়িত্বহীনতা এবং অসাম্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেছে মুসলমানদের। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন উত্তরকালে ইসলামের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করে। অন্যথায় ইসলামের দেশী-বিদেশী শত্রুতারাই জয়ী হতো।

মধ্যপ্রাচ্যের সব ক'টি রাজতন্ত্রকেই ধারনাগত সাংগঠনিক পুঁজিবাদী এবং মোটামুটিভাবে এদেরকে সামন্ত-বুর্জোয়া অথবা বুর্জোয়া-সামন্ত রাষ্ট্রগুলোর সাথে ক্রমবিন্যস্ত করা যেতে পারে। পাশ্চাত্যের গবেষকবৃন্দ সাধারণতঃ আরবীয় উপদ্বীপের দেশগুলোর সামাজিক এবং শ্রেণী চরিত্রের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন না। তাঁরা এসব দেশগুরোর রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে আধুনিকীকরণ (modernization) সংক্রান্ত শক্তিসমূহ এবং ঐতিহ্যবাদের (traditionalism) মধ্যে একটি মিশ্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করেন, অথবা ধারণা করেন তেলের সাথে আগত প্রযুক্তি এবং বিদেশী উপস্থিতিই সামাজিক পরিবর্তনের প্রধান উপাদান। এসব ধারণা হয়ত আংশিকভাবে সত্য। কিন্তু এগুলো বর্তমানে আরব শাসনব্যবস্থার সামাজিক এবং শ্রেণী চরিত্র প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়। কাজেই এই সব গবেষণায় ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা থাকে না।

এ সব দেশের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক প্রকাশনা সমূহের কলেবর বৃদ্ধি কারে যাচ্ছে। গবেষক জে, ব্লনডেল সমস্ত পারস্য উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোকে দল এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন বিবর্জিত পরিপূর্ণ ঐতিহ্যগত রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করেন। জে, ডি, এন্থনি কাতারকে ঐতিহ্যগতভাবে ইসলামী রাজতন্ত্র (traditionally Islamic monarchy) হিসাবে বর্ণনা করেন। একজন মিশরীয় গবেষকের মতে সম্মিলিত আরব আমিরাত এখন একটি রাষ্ট্র, যা ক্ষমতার বিভাজন এবং সহযোগিতার নীতিভিত্তিক একটি সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা বিকশিত করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে আমরা একমত হতে পারি না এজন্যে যে, সুপ্রীম কাউন্সিল এবং ইউ, এ, ই ফেডারেশনেরে প্রধান বাস্তবে সকল আইন প্রণয়ন ও নির্বাহী ক্ষমতা ধারণ

www.pathagar.com

করেন। তাকে বর্ণনা করা যেতে পারে সুস্পষ্টরূপে সীমিত সাংবিধানিক রাজতন্ত্র হিসেবে, যা সার্বভৌম শাসণ প্রাণালীর (absolute form of rule) কাছাকাছি এবং যা শাসক কর্তৃক নিযুক্ত একটি উপদেষ্টা অঙ্গ (advisory body) সমন্বিত।" কাতারের ক্ষেত্রেও এ সংজ্ঞাটি পরিপূর্ণভাবে প্রযোজ্য।

ধর্মনিরপেক্ষ গবেষকবৃন্দ রাজতান্ত্রিক শাসণপ্রণালীর শ্রেণী নির্যাস (class essence) উদঘাটন করেছেন এবং সামন্ত-যাজকীয় (feudo-clerical) এবং সামন্ত-বুর্জোয়া শাসকচক্রের সাথে তাদের সম্পর্ক নির্দেশ করেছেন। রাজতান্ত্রিক শিবিরসমূহ সামন্ত উপাদান এবং বুর্জোয়া উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে। এ কারণে ঐ সব পুঁজিবাদী সম্পর্কসমূহের নিয়মিত বিকাশ সার্বভৌম রাজতান্ত্রিক শক্তির (absoute monarchic Power) প্রতি কোনরূপ হুমকি নয়। অপরদিকে পেশাজীবি ও কর্মজীবি শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান শক্তিও জাতীয় বুর্জোয়াদের রাজতন্ত্রের সাথে সহযোগিতা করতে বাধ্য করে। সামন্ত ও বুর্জোয়াদের এই সঙ্গবদ্ধতার ভিত্তি ইসলামের মতাদর্শিক প্ল্যাটফর্ম। এ বিষয়টি নির্দিষ্ট দেশগুলোর রাষ্ট্র ক্ষমতা সংগঠনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুধাবনে সহায়ক।

রাজতান্ত্রিক শিবিরসমূহ এবং সরকারী ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ (clergy) দীর্ঘদিন থেকে কোরআনকে রাষ্ট্রীয় সংবিধান হিসেবে চিহ্নিত করে এমন ধারণা ব্যক্ত করেছে যে, কোন ইসলামী বা মুসলিম রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কোন সংবিধানের প্রয়োজন নেই। সৌদী আরবের আমলাতান্ত্রিক শিবিরসমূহ বিষয়টির নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেনঃ "মুসলিম আইনগত মতবাদ আইনকে সাধারণ নীতিমালা এবং সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলীতে বিভক্ত করেছে। কোরআন বিশদভাবে সাধারণ নীতিমালার রূপরেখা প্রদান করে। এ কারণে কোরআন আমাদের সংবিধান এবং আইনব্যবস্থার উৎস। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান দুইশত বছর পূর্বে গৃহীত হয়েছিল এবং তখন থেকে পরিবর্তন ব্যতিরেকে কার্যকর রয়েছে, সেখানে ইসলামের সংবিধান কোরআন সব মুসলমানের জন্য চিরস্থায়ীভাবে আইনগত ভিত্তি হিসাবে কাজ করতে পারে।" উপরন্তু আরো বলা হচ্ছে; "মুসলমানরা সমস্ত আইনগত সমস্যার সমাধান কোরআনে অনুসন্ধানের চেষ্টা করে বিধায় আশ্চান্বিত হওয়া উচিত নয়, কেননা কোরআনই হচ্ছে সমস্ত মুসলিম আইনের নীতিমালার উৎস।"

অতএব এ কথা প্রতীয়মান হয় যে ,শরীয়ার উৎসই আইন প্রণয়নের তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অবশ্য শরীয়ার প্রয়োগ এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে একে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে সৌদী রাজারা জনসাধারণের আচরিত ঐতিহ্য ও প্রথার বহুল ব্যবহার ঘটান। সৌদী আরবে রাজকীয় ডিক্রী সমূহই মূলতঃ সংবিধান হিসাবে কাজ করে।

সর্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও আরবদেশ সমূহে এখনও ইসলামের প্রভাব অত্যন্ত গভীর এবং সর্বব্যাপী। এটিকে ব্যাখ্যা করা যায় প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ জনসাধারণের অভাবিতরূপে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের (প্রায় ৯৯ শতাংশ) মুসলমান হওয়ার বাস্তবতাটির মাধ্যমে, যারা গভীরভাবে ইসলামের প্রতি অনুরক্ত এবং ধর্মীয় মতাদর্শ প্রবর্তনের জন্য একটি অনুকূল পটভূমি সৃষ্টি করে

www.pathagar.com

আসছে। রাষ্ট্রীয় আইনের মর্যাদা অর্জনের পর বর্তমান শরীয়া আইনও কখনও কখনও রাজা ও রাজপরিবারের ক্ষমতাকে সংহত করে। অন্যদিকে গুরুতর অপরাধের জন্য দন্ডাদি ভিন্নমতাবলম্বীদের দমনের ক্ষেত্রে শক্তিশালী অস্ত্র। কর্তৃপক্ষ যে কোন পাশ্চাত্য মনস্ক ব্যক্তি বা রাজতন্ত্র বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে শরীয়ার অবমাননার অভিযোগ উথাপন করে দন্ড প্রদান করতে পারে সহজেই। সরকার বিরোধী শ্লোগান নিষিদ্ধ, এমন কি যদি তা ইসলামের ভিত্তিতেও করা হয়। কেননা যে কোন সরকার বিরোধী কর্মকান্ড ইসলাম বিরোধী হিসাবে বিবেচিত। কঠোর পৌর আইনের বিপরীতে রাজপরিবার এবং জনসাধারণের ধনিক শ্রেণীর সদস্যবর্গ তাদের ক্রমবর্ধমান পার্থিব চাহিদাসমূহ পরিপূরণের উপায় ও পদ্ধতি খুঁজে নিয়েছে। এ উদ্দেশ্যে তারা আমেরিকা অথবা ইউরোপ গমন করে, সেখানে শরীয়ার আইন আর তাদের জন্য কোন বাধা হয় না। দেশটিতে বিদ্যমান বিরোধীদের দু'টো দলে বিভক্ত করা যেতে পারে; মতাদর্শগতভাবে বিপ্লবী এবং মৌলবাদী। সৌদী আরবের প্রগতিশীল বিপ্লবী শক্তিগুলো চূড়ান্তভাবে বিরুপ পরিস্থিতিতে কাজ করে। কারণ এদেরকে গোপনে কাজ করতে হয় এবং এসব শক্তির ক্রিয়াকলাপ শাসন-যন্ত্র কর্তৃক নির্মম হয়রানির শিকার। এ প্রসংগে একথা উল্লেখিত হওয়া প্রয়োজন যে, দেশটিতে সরকারীভাবে সব ধরণের বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রিত।

দেশটির মৌলবাদ বিরোধীরা অত্যন্ত শক্তিশালী। ৫০০০ সদস্য বিশিষ্ট শক্তিশালী রাজ পরিবার এবং উচ্চতর যাজকমন্ডলীর (clergy) সদস্যরাও এই দলভুক্ত রয়েছে। তবে সরকারী ভাবে স্বীকৃত বিরোধীরা (official opposition) সরকারী সিদ্ধান্ত এবং আধুনিকীকরণ (modernization) সংক্রান্ত পরিকল্পনা সমূহের ব্যাপারে মৃদু সমালোচনামূলক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে। ইসলামের উদ্দেশ্য সাধন করে না বলে প্রমাণিত হয়ে যে কোন আধুনিকীকরণ পরিকল্পনা উলেমা কর্তৃক সমালোচনার সম্মুখীন হয়।

সৌদী আরবের পররাষ্ট্র নীতিতেও ইসলাম এক ধরনের মূখ্য ভূমিকা পালন করে। সামগ্রিকভাবে ১৯৪৭ সালের পর ইহুদী-রাষ্ট্র, ইসরাইলের, আত্নপ্রকাশের পর মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর পররাষ্ট্র নীতিতে ইসলামী ধ্যান-ধারণা তীব্রভাবে এর প্রভাব বৃদ্ধি করেছে। ইসলাম মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিরাপত্তা সংহত করার একটি শক্তিশালী উপাদান।

ওমান, ইউ এ ই (UAE) এবং কাতার রাজতন্ত্রসমূহের সাংবিধানিক বিকাশে ইসলামের প্রভাব কম-বেশী সৌদী আরবের সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ।

সার্বভৌম রাজারা নির্বাহী ও আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা ব্যতীত বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতাও সংরক্ষণ করেন। সাধারণতঃ সৌদী আরবের রাজা একই সাথে সর্ব্বোচ্চ বিচারসংক্রান্ত অধিকর্তা, যার কাছে কেবলমাত্র স্থানীয় নাগরিক বৃন্দই নয় বরং বিদেশীরাও যে কোন দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী মামলায় আপীল করতে পারেন। ওমানের সুলতান মাসকাট সুপ্রীম কোর্টের রুলীংয়ের বিরুদ্ধে আপীল সমূহ পরীক্ষা করেন। নিরংকুশ রাজতন্ত্রগুলোতে (absolute monarchies) বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা প্রধানতঃ কোরআন ও সুন্নাহ্‌র নিয়মাবলী অনুসারে শরীয়া আদালত সমূহ (Shariah courts) কর্তৃক প্রযুক্ত হয়।

www.pathagar.com

রাজতন্ত্রগুলোতে এ কথা দাবী করা হয় যে, ইসলাম যেহেতু ধর্মনিরপেক্ষ এবং আধ্যাত্মিক ক্ষমতার মধ্যে বিভাজন অনুমোদন করে না, সেহেতু রাজতন্ত্রই একমাত্র সঠিক শাসন প্রণালী। কোরআনের উদ্ধৃত্তির মাধ্যমে এটিকে সমর্থন করা হয় (কোরআন ২ঃ২৪৭, ৩ঃ২৫) মুহম্মদ হামিদুল্লাহ্ বিষয়টির উপর আলোকপত করে বলেন যে, কোরআন ভাল এবং খারাপ রাজাদের কথা বর্ণনা করে, কিন্তু অন্য কোন ধরণের শাসন প্রণালীর যেমন প্রজাতান্ত্রিক শাসন প্রণালীর উল্লেখ করে না। একটি একটি রক্ষণশীল মতবাদ।

কুয়েত, বাহরাইন এবং জর্ডানকে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র (constitutional monarchies) বলা যায়। কারণ সংবিধানের অধীনে কুয়েত এবং বাহরাইনের সরকার সমূহ রাজা এবং পার্লামেন্ট উভয়ের নিকট দায়বদ্ধ এবং জর্ডানের সরকার কেবলমাত্র পার্লামেন্টের নিকট দায়বদ্ধ (জর্ডানের সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদ)। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জর্ডানীয় সরকারও রাজার নিকট দায়বদ্ধ। নিরংকুশ রাজতন্ত্রগুলোর সাথে বৈসাদৃশ্য পূর্ণভাবে উপরোল্লিখিত রাষ্ট্রগুলোর সংবিধান রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সংস্থাসমূহের আইন প্রণয়ণের বিধান দেয়।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর বিবেচনায় এগুলো ধনতান্ত্রিক সামন্ত–রাষ্ট্র, কারণ যেখানে পুঁজি সম্পর্কসমূহ অর্থনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে। (জর্ডানে লাভজনকভাবে নিযুক্ত জনসাধারণের ৫৫ শতাংশ ভাড়াটে শ্রমে, hired labour, জড়িত এবং কুয়েতে ৬০ শতাংশ)

খ) **সমাজতান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক পরীক্ষাঃ শরীয়া আইন** ইরাক, সিরিয়া, ইয়েমেন এবং মিশরের মত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনেও ইসলামের সুদৃঢ় ভিত্তি রয়েছে। এইসব দেশগুলোতেও রাষ্ট্র ক্ষমতার আঙ্গিঁকে এবং বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রিয়াকলাপে ইসলামের গভীর প্রভাব রয়েছে।

মিশরে আনোয়ার সাদাতের ক্ষমতায় আবির্ভাব রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নে (state legislation) ইসলামের একটি বৃহত্তর প্রভাবের প্রতি এবং রাষ্ট্রক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে ইসলামী প্রতিষ্ঠানাদির প্রবর্তনের প্রতি একটি বাস্তব ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়েছিল। মিশরে আনোয়ার সাদাতের নেতৃত্বে জি এ নাসের কর্তৃক গ্রহীত সমাজতান্ত্রিক নীতিমালার প্রতি বিরূপভাবাপন্ন ধণিকশ্রেণী (rich-wing bourgeois) এবং ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোকে উদ্দীপিত করেছে।

১৯৭১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট সাদাত ইসলামী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি নতুন সংবিধান গ্রহণ করেন। নতুন সংবিধানের ২ অনুচ্ছেদ কেবলমাত্র ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসাবেই ঘোষণা করে নি, বরং আইন প্রণয়নের ভিত্তি হিসাবে শরীয়ার নীতিমালাকে নির্দিষ্ট করেছে। সংবিধানটি নির্দেশ করে যে, পারিবারিক সম্পর্কসমূহ শরীয়ার নিয়মাবলী (norms) মোতাবেক পরিচালিত হবে (১১ অনুচ্ছেদ) এবং ১৯ অনুচ্ছেদ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য পাঠ্যক্রমের মধ্যে ইসলামের বুনিয়াদী দিকগুলোর উপর একটি কোর্স অন্তর্ভুক্ত করাকে বাধ্যতামূলক করেছে। মিশরীয় সংবিধানের ৩৪ অনুচ্ছেদ শরীয়ার ভিত্তিতেই উত্তরাধিকার আইন রচনা এবং ৪৪ অনুচ্ছেদ ধর্মচর্চার স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করা হয়।

www.pathagar.com

বাস্তবতার আলোকে এবং পুঁজিবাদী মতাদর্শের প্রভাব বলয়ের দেশগুলোর রাষ্ট্রীয় এবং সাংবিধানিক কাঠামোতে ইসলামের ভূমিকা বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে কেউ শাসকবর্গ কর্তৃক প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ব্যবস্থাসমূহ সংহত করতে ইসলামের ব্যবহার পর্যবেক্ষন করতে পারেন। শাসকবর্গ কর্তৃক আরোপিত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের ইসলামীকরণের মাধ্যমে ইসলামের পূর্ণজাগরণ ঠেকানোর চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীলরা এই প্রক্রিয়ায় তাদের স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা চালায়। ইসলামের নামে শাসকশ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতিমালার মতাদর্শিক বৈধতাদান প্রক্রিয়া বাহ্যত ইসলামী শক্তিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের আন্দোলন থেকে স্তিমিত করতে সমর্থ হলেও, ইসলামের বিধিমালার প্রতি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আবেদন মূলত ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাহ্যিকভাবে একটি ইসলামী রাষ্ট্রীয় সংবিধান গ্রহণ সত্ত্বেও বাস্তবতা এই যে, নিরংকুশ রাজতন্ত্র অথবা সাংবিধানিক রাজতন্ত্র কোনটিতেই "সরকারী ইসলাম" জনসাধারণের আধ্যত্মিক এবং বস্তুগত চাহিদা পূরণে সক্ষম নয়। অপরদিকে বিরোধী শক্তিগুলোর হাতে ইসলাম রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এ কারণে এসব দেশগুলোতে রাজতন্ত্রের বিনাশ কেবলমাত্র ইসলামের শ্লোগান সমূহের মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। ১৯৭৯ সালের ইরানী বিপ্লবের পর মধ্যপ্রাচ্যের সবগুলো দেশেই সরকার বিরোধীরা তাদের রাজতন্ত্র বিরোধী প্রচারণায় ইসলামের বিস্তৃত ব্যবহার ঘটায়। এরূপ একটি প্রচেষ্টার পরিণতি স্বরূপ সরকার বিরোধীরা সফল হতে পারত এবং রাজতন্ত্রের ক্ষমতা সমগ্র অঞ্চলে অনেকাংশে দূর্বল হয়ে পড়ত, যদি ইরানীরা শিয়া না হত।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ সব দেশগুলোর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ ছিল অনেকাংশে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলাফল। বৃটিশ এবং ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসন থেকে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে মিশর, ইয়েমেন, সিরিয়া এবং ইরাকের অ-পুঁজিবাদী (non-capitalist) উন্নয়ন পদ্ধতি নির্বাচনে প্ররোচিত করেছিল। সমাজতন্ত্রের দিকে এদের ঝোঁক রাষ্ট্র জীবনে অনেক সংঘাত ও সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। এ সব দেশগুলোতে স্বাধীনতার আদর্শিক ভিত্তি ছিল জাতীয়তাবাদ, যা জনসাধারণের মধ্যে গভীর আবেদন সৃষ্টি করেছিল।

বাথ পার্টির কর্মকান্ডের সম্পর্কের ভিত্তিতে সিরিয়া এবং ইরাকের সামাজিক জীবনে সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষার আদর্শিক এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া প্রায় এক। এদিক থেকে উভয় দেশ একটি সাধারণ আদর্শিক ভিত্তির অধিকারী এবং এদের রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যেও অনেক সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। বাথ মতাদর্শ ভিত্তিক সাংবিধানিক বিকাশ এবং এই মতাদর্শের মৌলিক নীতিমালাঃ "একতা, স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্রের" আলোকে আন্দোলটির প্রতিষ্ঠাতা মাইকেল এফলিয়াক সমাজতন্ত্রের ধারণা বিশদীকৃত করেছিলেন এই বলে যে আরব সমাজতন্ত্র কমিউনিজম হতে দুই দিক দিয়ে স্বতন্ত্র ছিল (ক) কমিউনিজমের সাথে বিরোধপূর্ণভাবে এটি জাতীয়তাবাদকে একটি চিরস্থায়ী উপাদানরূপে সনাক্ত করেছিল (খ) এটি সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকারকে প্রতিটি ব্যক্তির দু'টি অলংঘনীয় (inviolable) অধিকার হিসেবে ধারণা করেছিল। উল্লেখ, কমিউনিজম ও সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে এই সবের স্বীকৃতি আসে অনেক পরে।

www.pathagar.com

এসব নীতিমালা বাথ সংবিধানে প্রতিফলিত (৩৪ অনুচ্ছেদ) এবং ইসলামেও সর্বতোভাবে অনস্বীকার্য (কোরাআন ৪ ঃ ১১-১৩)। এ কথা উল্লেখিত হওয়ার দাবী রাখে যে, বাথ পার্টির কর্মসূচী ইসলামের প্রতি নিরপেক্ষ থাকতে আগ্রহী ছিল। এটাকে প্রথমতঃ এবং প্রধাণতঃ যে অবস্থাটি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় তা হল মাইকেল এফলিয়াক এবং জাকি আরসুজি উভয়ে ক্রিসটিয়্যান।

সামগ্রিকভাবে যেহেতু আরবীয় মানসিক ও আধ্যাত্মিক ইতিহাস গভীরভাবে ইসলামের সাথে সম্পর্কিত, সেহেতু এটি ধারণা করা যেতে পারে যে, বাথইজমের জাতীয় "চরিত্র" ইসলাম বিরোধী নয়। অবশ্য একথাও সত্য যে, মুসলিম ভাতৃসঙ্গ, মিশরীয় জামায়াতে ইসলামী এবং অন্যান্য ইসলামী দলগুলো যে কোন ধরণের জাতীয়তাবাদকে ইসলাম বিরুদ্ধ বলে বিশ্বাস করে। কেননা " সব মুসলমান আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত এবং আমাদের ভ্রাতাস্বরূপ" এই নীতিতে তারা বিশ্বাসী।

অনেক গবেষক বিশ্বাস করেন, বাথ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতাগণ তাঁদের ভাবধারা বিকশিত করতে ইসলামী রাজনৈতিক এবং আদর্শিক উপাদানটি অত্যন্ত সুদৃঢ়ভিত্তিক প্রভাবশালী একটি উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেন। আরবদের আমরা বর্তমানে যেরূপ দেখি তাতেও ইসলামের যথেষ্ট প্রভাব অনস্বীকার্য। আরবীয় জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্রের আদর্শের জনপ্রিয়তার মাধ্যমে বাথ মতাদর্শ সহজে ইরাক এবং সিরিয়ার সাধারণ জনগণের হৃদয় জয় করেছিল সত্য, কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি।

সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের আরব দেশগুলোর সাংবিধানিক এবং রাষ্ট্রীয় গঠনশৈলীর প্রথমে ইসলামকে গৌন করার প্রয়াস চলে। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। এসব দেশগুলোতে আজ সংবিধানের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং শোষণ বিরোধী নীতিসমূহ শরীয়ার বিধিমালা অনুসারে প্রবর্তণ করার প্রয়াস চলছে।

সিরিয়া এবং ইরাকে শরীয়া আইনের কার্যকরিতা সীমিত থাকলেও কোন দেশই পরিপূর্ণভাবে শরীয়ার বিধিমালার ব্যবহারিক প্রয়োগ পরিত্যাগ করতে পারেনি। সিরিয়ার ১৯৭৩ সালের সংবিধানের প্রাথমিক খসড়া ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসাবে ঘোষণা করেনি এবং রাষ্ট্র প্রধাণের জন্য কোন ধর্মীয় যোগ্যতা দাবী করেনি। কিন্তু সিরীয়ার ধর্মীয় নেতৃত্ব জনসাধারণকে খসড়া সংবিধানের ওপর গণভোট বয়কটের আহবান জানিয়ে একটি যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেন। ফলে বেশ কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয় এবং সিরীয় সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদ ফিক্হকে আইনপ্রণয়নের মৌলিক ভিত্তি হিসাবে ঘোষণা করে এবং কেবলমাত্র একজন মুসলমানই রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবে এ মর্মে বিধান দেয়।

ইরাকের ১৯৭০ সালের সংবিধান এবং গণপ্রজাতন্ত্রী ইয়েমেনের ১৯৭৮ সালের সংবিধান শরীয়াকে আইন প্রণয়নের মৌলিক উৎস হিসাবে চিহ্নিতকারী কোন ধারা বহণ করে না, তবে উভয় সংবিধান ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করে (ইরাকী সংবিধানের ৪ অনুচ্ছেদ, পিডি আর ইয়েমেনের সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ)। ইরাক এবং সিরিয়া দু'টি দেশই প্রণীত আইন

www.pathagar.com

(legislation) ক্রিমিনাল কোড সংক্রান্ত শরীয়ার নীতিমালায় বিচারিক কার্যকারিতা (juridical force) সরকারীভাবে আরোপ করে না এবং উভয় দেশ ক্রিমানাল কোড সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য কোডসমূহ, বিশেষত ফরাসী কোড ভিত্তিক। অবশ্য দু'টি দেশের ক্রিমিনাল কোডেই শরীয়া নির্ভর আইনগত নিয়মাবলীর দৃষ্টান্ত রয়েছে।

১৯৭৩ সালের সিরীয় সংবিধান শরীয়াকে আইন প্রণয়নের মৌলিক ভিত্তি হিসাবে নির্দেশ করলেও (৩ অনুচ্ছেদ) ইরাকী সংবিধান এরূপ কোন শর্ত সৃষ্টি করে না। প্রকৃত প্রস্তাবে সিরিয়া এবং ইরাক উভয় দেশেই ইসলাম সরাসরি আইন প্রণয়নে প্রধান্য বিস্তার করে না এবং আইন প্রণয়নের সময় লক্ষ্য রাখা হয়, যাতে কোন আইন ইসলামের কোন নীতিমালার সাথে সংঘর্ষ না বাধায়। মুসলিম দেশগুলোর সংবিধান এবং প্রণীত আইনে ইসলামী স্বতঃসিদ্ধ (postulates), প্রথা, ঐতিহ্য, নীতিমালা, নিয়ম এবং আদর্শের বিভিন্ন ধরণ ও প্রকৃতির শর্তাবদ্ধকরণ (stipulation) এদের আচরিক অভিব্যক্তিতে (behavioural manifestation) চূড়ান্ত বিশ্লেষণে খুব কমই পার্থক্য সৃষ্টি করে। কমিউনিষ্ট ব্যবস্থার উৎপত্তিস্থলে এর পতন এবং মুসলিম দেশগুলোর ওপর ক্রেমলীনের প্রভাবের পরিপূর্ণ বিলুপ্তির পর সমাজতান্ত্রিক ধারণাসমূহ এখন পুঁজিবাদ বিরোধী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ভিত্তি হিসাবে কাজ করতে পারছে না। ইরাকের বাথ নেতৃত্ব এবং সমাজতন্ত্রপন্থী (pro-socialist) শাসনব্যবস্থা মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মুসলিম জনসাধারণের হৃদয় জয় করতে দ্রুত ইসলামী ভাবদর্শের শরণাপন্ন হয়েছে। ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন এবং ইউরোপীয় আগ্রাসনের মোকাবিলায় সাদ্দাম হোসেন শেষ পর্যন্ত তার সাবেক বন্ধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পাশ্চাত্যের মিত্রদের বিরুদ্ধে চড়া বক্তব্য দানের মাধ্যমে ক্ষমতা সংরক্ষণ করতে সমর্থ হচ্ছে। এক কালের মার্কিনপন্থী (Americanised) ইরান এবং সমাজতন্ত্রপন্থী (Socialised) ইরাক কীভাবে এত দ্রুত তাদের পূর্বতন ধর্মনিরপেক্ষ সাংবিধানিক বিকাশ প্রক্রিয়া পরিত্যাগ করে ইসলামী ভাবাদর্শের ভিত্তিতে মুসলিম পদ্ধতি ও ব্যবস্থা পূর্ণগঠনের চেষ্টা করছে, তা অনুধাবণ করা পাশ্চত্য রাজনীতিবিদ ও পন্ডিতদের কাছে দুরূহ মনে হচ্ছে। মার্কিন এবং ইউরোপীয় ইহুদী ,ক্রিস্টিয়্যান অথবা ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী প্রবনতাসমূহ ইসলামের প্রকৃতিগত দৃষ্টান্ত (Paradigms) এবং মুসলিম আইন, রাজনৈতিক সংগঠন ও সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যগুলো অনুধাবণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অতি সম্প্রতি পাশ্চাত্য পন্ডিতদের লেখায় উপলব্ধির অনুভূতি ক্রমবর্ধমানভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে। অধ্যাপক থিওডোর পি রাইট যথার্থভাবে বিষয়টি নির্দেশ করেছেন " এমনকি উদারপন্থী গণতান্ত্রিক এবং মার্কসবাদী লেনিনবাদী শাখায় পূনর্বিভাজিত হলেও এদেরকে বিশ্লেষণ করার জন্য ব্যবহৃত, ধারণা সমূহ (categories) এবং নমুনাসমূহ (typologies) উৎপত্তিগতভাবে সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয়ই ছিল।" এসমস্যাটির একটি যথার্থ উত্তর কেবলমাত্র মুসলিম সমাজের গতিশীলতার একটি পক্ষপাতহীন এবং অভিজ্ঞতাবাদী অনুসন্ধানে পাওয়া যেতে পারে। নিকট ভবিষ্যতে মুসলিম শাসকবর্গ তাদের পর্বতপ্রমাণ অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চাপের মুখে নিপতিত হলে আশচান্বিত হওয়ার কিছু থাকবে না। সেক্ষেত্রে মুসলিম রাষ্ট্র নায়কদেরকে মার্কিন এবং ইউরোপীয় মিত্রতের নিকট থেকে পশ্চাদপসরণ করতে হবে এবং ফলে লক্ষ লক্ষ বঞ্চিত মুসলিম জনসাধারণের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, চেচনিয়া এবং বসনিয়া হারজেগোভিনার লক্ষ্য সমূহের প্রাত তাঁদের আন্তরিক সংহতি প্রকাশ করবে।

উপসংহার

এটি একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা যে, প্রতিটি মুসলিম দেশ এবং সমগ্র মধ্য প্রাচ্যের সাংবিধানিক বিকাশ এবং রাজনৈতিক জীবনে মুসলমানরা একটি পরস্পরবিরোধী ভূমিকা পালন করেছে। কি ধরণের শক্তি একে অবলম্বন করে তার উপর ভিত্তি করে আমাদের সময়ের একটি রাজনৈতিক ও আদর্শিক প্রসঙ্গ হিসাবে ইসলাম একটি নেতিবাচক অথবা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। রাজতান্ত্রিক শিবিরগুলো তাদের স্বার্থ সংবক্ষনের উদ্দেশ্যে রক্ষণশীল শাসনপ্রণালী ও প্রতিষ্ঠানাদি সুদৃঢ় করতে ইসলামকে ব্যবহার করে। আরব ঐক্য বিনষ্ট করা এবং মধ্যপ্রাচ্যে প্রগতিশীল ও বিপ্লবী প্রক্রিয়া প্রতিহত করার লক্ষ্যে সামাজ্যবাদ ও শক্তি কাজ করে যাচ্ছে। অপর দিকে বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো প্রগতিশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে বৈধতা দান ও প্রতিরোধ করা এবং জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে আন্তর্জাতিক ঐক্য সংহত করার উদ্দেশ্য নিয়ে ইসলামের শারাপন্ন হয়। এখানে ইসলামী উপাদানের দ্বান্দ্বিক প্রকৃতি নিহিত এবং ইসলামী রাজনৈতিক মতবাদ এ দিক থেকে অদ্বিতীয়। যেখানে অনেক শক্তিশালী মতাদর্শ এক শতাব্দীর সীমানা পেরুতে পারে না, সেখানে ইসলাম জাতীয় উথান এবং মানব ইতিহাসের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের সকল টানাপোড়নের মধ্যেও টিকে থাকতে পেরেছে এবং তবিষ্যতে আরো দৃঢ়ভিত্তিক ও উন্নততর অবস্থিতির লক্ষ্যে জীবনীশক্তি অর্জন করছে। মধ্যপ্রাচ্য সহ অনেক মুসরিম দেশই আজ এর সাক্ষ্য বহন করছে প্রতিনিয়ত।

www.pathagar.com

পৈত্রিক সম্পত্তিতে সমানাধিকার ও মানবাধিকার

পৃথিবীতে যা কিছু মহান ও শ্রেষ্ঠ তার গৌরবের অধিকারী নারী-পুরুষ উভয়ই। আর দুর্ভাগ্য এবং অনাসৃষ্টির জন্যও দায়ী উভয়েই, কথাটি আধুনিক যুগের যে কোন যুক্তিবাদী মানুষই মেনে নেবেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তারা সমানভাবেই কি এই গৌরব ও দুর্নামের অংশীদার? দায়িত্ব ও গৌররের প্রশ্নে সমান অধিকার মানলেও সম্পত্তিতে মালিকানার অধিকারের প্রশ্নে বেশ জটিলতা দেখা যায়। বিংশ শতাব্দির এই অন্তিম লগ্নে এসে নারীর অধিকারের প্রশ্নে, নারী আন্দোলন যখন বেশ গতি পাচ্ছে, তখন আমাদেরকে নুতন করে ভাবতেই হচ্ছে, পিতার সম্পত্তিতে পুত্র-কন্যার সমান অধিকারের কথা। মানুষের প্রয়োজনে সারা বিশ্বে যখন আইনের সংস্কার এবং নুতন আইন প্রণীত হচ্ছে, আমরা তখন শত-শতাব্দী প্রাচীন আইনের যাঁতাকলে পিষ্ট হব কিনা সেটিই নুতন করে ভেবে দেখতে হবে। বিশেষ করে, বিশ্বের উন্নত মানুষের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও যখন প্রগতির কথা বলি, মানবতার কথা বলি, আইনের শাসনের কথা বলি, সর্বোপরি মানবমুক্তির কথা বলি, তখন কি আমাদের সে লক্ষ্যে কাজ করা উচিত নয়?

সমানাধিকারের প্রশ্নটি মানুষকে সেই প্রচীনকাল থেকেই আলোড়িত করে আসছে। জন্মগতভাবেই মানুষ যেন একই সত্তার অধিকারী, এ কথা যেমন ঠিক, তেমন প্রতিটি মানুষেরই রয়েছে আলাদা জগৎ। চিন্তা-চেতনা, আশা ও আকাঙ্খায় প্রতিটি মানুষই যেমন ভিন্ন চরিত্রের, একইভাবে মানুষ হিসেবে প্রত্যেকেরই রয়েছে একটি সাধারণ পরিচয়। মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু আবার মাপকাঠির ব্যবধানে উভয়ের মাঝে বিরাট পার্থক্য দেখানোর চেষ্টা করা হয়। কোন ছেলে বা মেয়ে যদি একই মা-বাবার সন্তান হয়, তাহলে তো তাদের মাঝে পার্থক্যের মাত্রা খুবই ছোট হবার কথা। নিম্নশ্রেণীর শোষিত বস্তিবাসী মা-বাবার সন্তান এবং ক্ষমতাধর শোষক রাজা-বাদশার সন্তানের মাঝে জন্মলগ্ন থেকেই সুচিত হয় এক বিরাট ব্যবধান। কিন্তু একই মা-বাবার ঘরে জন্ম নেয়া ছেলে বা মেয়ে সন্তানের মাঝে এ ধরণের পার্থ্যক্য চিন্তা করা যায় না। আসলে অবস্থা কি তাই? মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে, মা-বাবারা কি ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে তাদের সন্তান-সন্ততির জন্য সমানাধিকার নিশ্চিত করে যেতে চান?

সমানাধিকারের আক্ষরিক যুক্তি-তর্ক ও মনস্তাত্বিক দিক সমূহের কথা বাদ দিলেও বাহ্যতঃ মা বাবার আচরণে কি পরিলক্ষিত হয়? তারা তাদের জীবদ্দশা ও মৃত্যুর আগে ভাগে নিজ সন্তানদের মাঝে সম্পত্তি বন্টন করে যান। নারী প্রগতির এ যুগের সবারই প্রত্যাশা, বাবা-মা যেন নিজ ছেলে-মেয়ের প্রতি সুবিচারের স্বার্থে সহায়-সম্পত্তির সমবন্টন নিশ্চিত করেন। কিন্তু এমনটি কি আমরা প্রত্যক্ষ করছি বাস্তব জীবনে?

এমন এক সময় ছিল যখন এ সমাজে নারীরা বলতে গেলে পৈত্রিক সম্পত্তির মালিকই হতো না। যুগ, ধর্ম ও সমাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে সত্য, কিন্তু এখনও

www.pathagar.com

মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটছে কিনা, এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। অনেকেই এই জন্য ধর্মকে দোষারোপ করছে। আবার কেউবা আইন ব্যবস্থাকেই ত্রুটিযুক্ত বলে অভিযোগ করছে। তাহলে দেখা যাক, মূলতঃ কোন কারণটি নারীদেরকে তাদের পৈত্রিক সম্পত্তিতে পুরুষের সমান অধিকার লাভে কতখানি বাঁধার সৃষ্টি করছে, তা আমরা ঠিকমত জানি না।

আমাদের সমাজ সম্পর্কে সবচেয়ে প্রচলিত ও সর্বজনবিদিত ধারণা হচ্ছে, এটি একটি পুরুষ শাসিত সমাজ। আসলে, কোন সমাজ পুরুষ শাসিত কিনা, তা নির্নয় করার মাপকাঠি কি? রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কিংবা সরকারী প্রশাসনে মেয়েদের কম অংশিদারীত্ব রয়েছে; এটিই যদি মাপকাঠি হয় তাহলে আধুনিক পৃথিবীর সকল সমাজকেই কমবেশী পুরুষ শাসিত বলা যায়। গোটা পৃথিবী জুড়ে রাষ্ট্র প্রধান ও সরকার প্রধানের পদসহ রাষ্ট্র ও সমাজের উচ্চপদস্থ আসনগুলোতে মেয়েদের হার এখনো নগন্য। এখন আর এ ব্যাপারে মুসলিম-অমুসলিম, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী দেশসমূহের মাঝে তেমন মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে, উল্লিখিত কারণটি কখনো মাপকাঠি হতে পারে না। বর্তমানে আমাদের দেশেও সরকার প্রধান ও বিরোধীদলের নেতার আসনটি মেয়েরাই অলঙ্কৃত করছেন। কিন্তু এতে কি নারী-পুরুষের সমানাধিকারের প্রশ্নটির সাথে জড়িত সমস্যাসমূহের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে? এ প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। অথচ উন্নত বিশ্বের অনেক দেশেই নারী-পুরুষের সমানাধিকার অনেকটা নিশ্চিত হয়েছে। বলেই ধারণা করা হচ্ছে। " আন্তর্জাতিক মাববাধিকার সনদ" এর ঘোষণা পত্রেও অধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে কোন পার্থ্যক্য করা হয়নি।

নারী-পুরুষের সমানাধিকারের উপর ইতিমধ্যে বহু লেখালেখি হয়েছে। অনেক সেমিনার-সিম্পোজিয়াম তথা সভা-সমিতির আয়োজন করা হয়েছে। বহু সংঘ ও প্রতিষ্ঠান এজন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সমগ্র সমাজের বাস্তব চেহারায় কি এর কোন প্রতিফলন ঘটেছে? মূলতঃ আমরা কোন সমাজে বসবাস করছি? আমাদের সমাজের ৮০% ভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে। অর্থাৎ, এ হিসেবেই ৮০% ভাগ নারীও অসহায় জীবন যাপন করছে। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, নারী-পুরুষের সমানাধিকারের যে সমস্ত প্রগতিশীল কথা-বার্তা বলা হচ্ছে, এদের জন্য এ সমস্ত প্রচারণা ও দাবী দাওয়ার আইনগত 'ধর্মীয়' সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্য কতটুকু? একদিকে আমরা পুরুষের সাথে নারীদের সমানাধিকারের কথা বলব, অথচ ৮০% জনেরও বেশী মহিলা জানবেই না তাদের অধিকার নিয়ে আমরা কি ধরণের কথাবার্তা বা দীবা-দাওয়া করছি। তাহলে এ ধরণের বুর্জোয়া ও ব্যবসায়ী আনুষ্ঠানিকতার কোন মানেই হয় না।

এমন এক সময় ছিল, যখন এ অঞ্চলে কেন, পৃথিবীর বহু জায়গাতেই মেয়েদেরকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছিল। ইসলামের আগমনের পর এ অঞ্চলের মুসলমানরা সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার তাত্ত্বিক ও আইনগত ভিত্তি লাভ করল। পৈত্রিক ও বৈবাহিক সুত্রে নানাভাবে সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার পাবার কথা স্বীকৃত হলো। কিন্তু এ স্বীকৃতিতেও যেন

www.pathagar.com

মেয়েদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করা হলো। অনেকেরই প্রশ্ন একই মা- বাবার সন্তান হয়েও কেন মেয়েরা ছেলেদের অর্ধেক সম্পত্তি পাবে?

এমতাবস্থায়, আমাদের সমাজের বর্তমান প্রেক্ষাপট আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। এ অঞ্চলে মুসলিমদের আগমনের হাজার বছর পরেও আমরা আজ এ ব্যাপারে কি চিত্র দেখতে পাই? মেয়ে সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পরই বাবা-মা কি তার প্রতি একটি ছেলে সন্তানের সমতূল্য দৃষ্টি দেন? ছোট্ট মেয়ে শিশুটির বাহ্যিক পরিচর্যার ক্ষেত্রে হয়তো তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে গোড়াতেই বড় ধরণের পার্থ্যক্য সূচিত হয়। মেয়ে সন্তান লাভের আনন্দ ছেলে সন্তান লাভের তৃপ্তির সমতুল্য বলে প্রমাণিত হয়, এমন বাবা মার সংখ্যা এখনও হাতে গোনা। দৃষ্টিভঙ্গীটিই হচ্ছে এমন যে, মেয়েটিকে মানুষ করে দিতে হবে অন্যের হাতে তুলে, আর ছেলেটি থাকবে তাদের একান্ত নিজস্ব। হয়তো সে কারণেই, কি লেখা-পড়ার ক্ষেত্রে, কি আদরে ও শাসনে বাবা-মাই সর্বপ্রথম মেয়েদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরন করেন। এর যে ব্যতিক্রম ঘটে না এমন নয়। তবে ব্যতিক্রমের কারণগুলোও অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়। যেমনঃ-

১। যদি অনেকগুলো ছেলে সন্তানের পর একটি কন্যা সন্তান জন্ম নিলে।

২। ছেলেগুলো যদি সবই উচ্ছন্নে যায়, আর মেয়েটি যদি বস্তুগত বিচারে কোন বড় ধরণের সাফল্য বয়ে আনে।

৩। মেয়েটিকে পাত্রস্থ করার পর যদি মেয়ে জামাই কর্তৃক বাবা-মা আর্থিক কিংবা সামাজিক ভাবে লাভবান হয়, ইত্যাদি।

এ থেকে একটি জিনিস অত্যন্ত পরিষ্কার যে, মা-বাবা মেয়ে সন্তানের কাছ থেকে সমূহ কোন লাভের সম্ভাবনা দেখে না, অথচ ছেলে সন্তান দিয়ে তাদের নানা ধরণের বৈষয়িক স্বপ্নের অন্ত নেই। এ নির্জলা সত্যটি হয়তো অধিকাংশ বাবা-মা মৌখিকভাবে অস্বীকার করবেন না। কিন্তু বাস্তবে তাদের দীর্ঘদিনের আচরণ তাদের এই অস্বীকৃতির পেছনে সত্য সাক্ষ্য দেবে না। বলা মুশকিল, এ ধরণের বৈষম্যমূলক আচরণের পেছনে বাবা-মার উপর কোন কারণটি সবচেয়ে বেশী ক্রিয়াশীল। ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে, মূলতঃ আমাদের সমাজ সে অধিকার দিতে কুন্ঠিত। ধর্মের প্রতি এক সহজাত আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, মৃত্যুর আগেই বাবা-মা মেয়েদেরকে হয় সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা করে, নতুবা নাম মাত্র আংশিক অধিকারের উপর আইনগত স্বীকৃতি লাভের বন্দোবস্ত করে সিংহ ভাগটি ছেলেদের মালিকত্বে অর্পন করে যায়। এ ঘটনারও যে ব্যতিক্রম নেই এমন নয়। তবে তা নিতান্তই ব্যতিক্রম।

মেয়েদের পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার জন্য শুধুমাত্র পিতাকে দায়ী করলে চলবে না। কেননা বৃদ্ধ বয়সে পিতা নিজেই তার ছেলে ও ছেলে-বউদের উপর অনেকটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। আর সহজাত কারণেই ছেলেও ছেলে-বউরা সম্পত্তি পাবার ব্যাপারে বৃদ্ধের উপর কঠিন

www.pathagar.com

মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। তাদের মন–মানসিকতাই এমন যে বৃদ্ধ তাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ (রেখে যাওয়া সম্পত্তির পরিমান যত বেশীই হোক না কেন) রেখে যাচ্ছেন না। তার উপরে মেয়েরা ও বোনেরা যদি ভাগ বসায় তাহলে তাদের জন্য আর রইল কি? অনেক সময় ঐ বৃদ্ধের স্ত্রীও তাদের সাথে একমত হয়। কেননা ঐ বৃদ্ধাও তাদের উপর নির্ভরশীলতার কারণে সবসময় এক ধরণের মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন। আর এই মানসিক চাপের মোকাবেলা করতে বাবা–মা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হন। পিতার মৃত্যু না হলে ছেলে –ময়ে কেউই পিতার সম্পত্তির মালিক নয়, এটিই হচ্ছে ইসলামী আইনে সম্পত্তি বন্টনের মৌলিক নীতি। কিন্তু এ নীতিটিও আজ দারুণভাবে মার খাচ্ছে। পিতা একটু বৃদ্ধ হলেই ছেলেদের হাতে তার সম্পত্তি এমনভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে যেন মূল মালিক তারাই। আর এ সুযোগে তারা শুধু তাদের আপন বোনদেরই পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে না বরং ছোট ভাইদেরকেও দারুণভাবে ঠকানোর বন্দোবস্ত করে ফেলে। এটি আজ আমাদের সমাজের একটি অতি সাধারণ দৃশ্য। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও হতো সামান্য ব্যতিক্রম রয়েছে।

বঞ্চনার এই যে নিষ্ঠুর চিত্র, এটি এখন আর সাধারণ অর্থে একজন গৃহকর্তার মন–মানসিকতার উপর নির্ভর করে না। এখন তাই প্রয়োজন সামগ্রিক দৃষ্টি নিক্ষেপ। সমাধানের যদি আশু কোন পদক্ষেপ নেয়া না হয়, তবে সমস্যাটির প্রকটতা দিন দিন বাড়তে থাকবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাঝে। দারিদ্রক্লিষ্ট একজন ভাই তার বোনের অধিকার হরণ করে নিজে বাঁচতে চাইবে এটিই হয়তো একদিক থেকে স্বাভাবিক। কারণ বোনকে বঞ্চিত করাই তার জন্য সবচেয়ে সহজ। তার এই অবস্থার উন্নতির জন্য প্রয়োজন গোটা সমাজের আমূল পরিবর্তন। আর সেটি যে খুবই কঠিন কাজ, তা বলাই বাহুল্য। অতএব, অধিকতর দুর্বলের উপর আরো অত্যাচার সামাজিক নিয়মেই ঘটে। পিতা যদি ছেলে–মেয়ে কাউকেই তার সম্পত্তির গোটা অংশই লিখে দিয়ে না যান তাহলেও তার মৃত্যুর পর একজন মেয়ে–সন্তানের পক্ষে পৈত্রিক সম্পত্তিতে তার আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করা কষ্টকর হয় অবস্থানগত ও সামাজিক কারণে। সে যদি পিতার সম্পত্তিতে দাবী তোলে তাহলে অনেক ক্ষেত্রে সমাজের সবাই তাকে প্রশ্ন করে ভাইরা তোমাকে খাইয়েছে, পড়িয়েছে, আবার বিয়েও দিয়েছে, এখন তুমি আবার পিতার সম্পত্তিতে কিসের দাবী কর? আর যদি আইনের জোরে মেয়েরা পৈত্রিক সম্পত্তিতে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তবে সামাজিক চাপের মুখে অনেক ক্ষেত্রেই ভাইদের সঙ্গে তাদেরকে আপোষরফা করতে হয়। আর আপোষের সময় ভাইরা নামমাত্র মূল্য দিয়ে বোনদের সম্পত্তি আইগতভাবে অর্জন করার ব্যবস্থা করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কি পিতার জীবদ্দশায়, কি মৃত্যুর পরে উভয় অবস্থাতেই এখন পর্যন্ত পৈত্রিক সম্পত্তিতে মেয়েদেরকে আমরা নামমাত্রই অংশীদার করে থাকি। ৯০% জন মেয়ের ক্ষেত্রেই আবার তা শুধু সান্ত্বনাবাক্য বা ভবিষ্যতে তাদের আদর–আপ্যায়ন করা হবে এ ধরণের প্রতিজ্ঞার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

এ পরিস্থিতিতে যদি প্রতিটি মেয়েকেই সত্যিকার অর্থে তার পিতার সম্পত্তি তার ভাইয়ের অর্ধেক বস্তুগতভাবে তার হাতে পৌছানো যায়, তবে তা আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটা বিপ্লবিক

www.pathagar.com

পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে। আর এ জন্য প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা। তৃণমূল পর্যায়ে সমাজের সর্বস্তরে মানুষকে আইন, নৈতিকতা ও মানবতার মূল্যবোধের প্রতি সহজাত শ্রদ্ধা জাগ্রত করতে হবে। ভিন্নমত পোষণ করে যদি বলা হয় এই মুহূর্ত থেকেই পিতা-মাতার সম্পত্তিতে আক্ষরিক অর্থে ছেলে-মেয়ের সমানাধিকার আইন সৃষ্টি করতে হবে, তাহলে এদেশের অধিকাংশ মানুষ নৈতিকতা, আইন ও মানবতার মূল্যবোধের প্রতি সহজাত অভাবের কারণেই এটিকে সরাসরি ধর্মের বিধান লঙ্ঘনকারী আইন বলে অভিহিত করবে। এতে লোকসান হবার সম্ভাবনা দু'টিক থেকে। প্রমতঃ আইনটি বাস্তবে জনসমর্থন হারিয়ে নিষ্ক্রিয় থাকার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ ব্যবসায়ী, ধোঁকাবাজ ও টাউট বাটপারদের কবলে পড়ে ঐ আইনটির ব্যাপক অপব্যাখ্যা ও ব্যবহার সমাজ জীবনকে আরও কলূষিত করার সম্ভাবনা। ব্যাপারটি একটু খোলাসা করে বলা দরকার। ধরা যাক, আজ একটি নুতন আইন করা হলো। আইনটির ভাষ্য মতে, ছেলে-মেয়ে উভয়ই পিতার সম্পত্তিতে সমান মালিক। অর্থাৎ যদি পিতামাতার দুটি সন্তানের মাঝে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হয়, তবে তারা সম্পত্তি সমানভাবে ভাগ করে নেবে। আর যদি কোন বাবা - মায়ের মেযের সংখ্য বেশী হয় তবে এক ছেলের পক্ষে পৈত্রিক সম্পত্তিতে বসবাস করাই কষ্টকর হবে। এমন কি অসম্ভব হয়ে পড়বে। কুরআন পৈত্রিক সম্পত্তিতে এক ছেলেকে দুই মেয়ের সমান অংশীদারিত্ব দিয়ে বেশ কটি দিকের নির্দেশ করেছে। তন্মধ্যে বিশেষভাবে কয়েকটি উল্লেখযেগ্য ঃ

১। সংসার পরিচালনা ও সন্তান-সন্তাতির ভরণ-পোষণের সকল দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে পুরুষদের উপর।

২। মেয়েদেরকে একই সাথে পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার দেয়া হয়েছে।

৩। পিতার মৃত্যুর আগে ও পরে ভাইয়েরা সম্পত্তি দখল ও ভোগ করা সত্ত্বেও যে কোন সময় একজন মহিলা তার পৈত্রিক সম্পত্তিতে তার অংশ দাবী ও আদায় করতে পারবে।

৪। স্বামীর মৃত্যু বা স্বামীর সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলেও একজন স্ত্রী তার স্বামীর সম্পত্তিতে নিজ অংশ দাবী ও আদায় করতে পারবে, এমন কি বিয়ের সময় মোহরানা নির্দিষ্ট না হয়ে থাকলেও।

৫। কুরআর সম্পত্তি বন্টন ব্যবস্থা এমন করেছে যাতে সম্পত্তি মুষ্টিমেয় হাতেই ঘুরতে না থাকে। অন্যদিকে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি যেন এতবেশী ক্ষুদ ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত না হয়, যাতে তার ছেলেরা উদবাস্তুতে পরিণত হয়।

এইসব লক্ষ্য হাসিলের জন্য মূলতঃ সমগ্র বন্টন ব্যবস্থাই পুর্ণবিন্যস্ত হওয়া দরকার। উল্লেখ্য, আমাদের সমাজের জন্য নুতন আইন সৃষ্টি করা এখন আর কোন মৌলিক সমস্যা নয়। মৌলিক সমস্যা হচ্ছে, সমাজের প্রতিটি স্তরে আইনের সঠিক প্রয়োগ। এই মৌলিক সমস্যাটি নিয়েই আমাদেরকে ভাবতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে এর সঠিক ও সার্বজনীন সমাধান। আমাদেরকে ভুলে গেলে চলবে না যে, অধিকার শুধুমাত্র সমাজের গুটিকতক মানুষের জন্য নয়, ববং সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণের জন্য। এককভাবে এ সমস্যার সমাধান করা কারো পক্ষে সম্ভব

www.pathagar.com

বলে মনে হয় না। তাই এর সমাধানের জন্য সর্বপ্রথম এগিয়ে আসতে হবে সমাজপতি ও বুদ্ধিজীবীদের। তাঁরা সমস্যার ঐতিহাসিক, সামাজিক, দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক ইত্যাদি প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করে সমাধানের একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি স্থাপন করতে সক্ষম হবেন। এরপর সেটির বাস্তবায়নের জন্য এগিয়ে আসতে হবে রাজনীতিবিদদের। সাথে সাথে এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষক, ছাত্র, যুব ও নারী সংগঠনসহ প্রতিটি প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান তথা সমাজের অগ্রগামী, সুশিক্ষিত ও সচেতন প্রতিটি নাগরিককে। আর এভাবেই হয়তো আমরা সুস্থ নৈতিকতা ভিত্তিক আইন ও মানবতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারব সমাজের প্রতিটি স্তরে। ধাপে ধাপে আমরা এগিয়ে যাব আমাদের সার্বিক মুক্তির পথে। আর এজন্য সরকারকে একটি গঠনমূলক মূখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। অথচ বাস্তবে এমন সব বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে, যা শুধু মানুষের ধর্মানুভূতিতেই আঘাত হানছে না; সাধারণ মানুষকে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে বিপদগামী করছে। সকল ধর্মের মানুষের জন্য একই পদ্ধতির বিয়ে ও সম্পত্তি বন্টন ব্যবস্থার প্রবক্তরা অগ্রগতি ও শান্তির বিপক্ষ শক্তি। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে স্থিতির জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী পারিবারিক ব্যবস্থা। আর শক্তিশালী পারিবারিক ব্যবস্থার ভিত্তি মজবুতীর ক্ষেত্রে পৈত্রিক সম্পত্তিতে ভাগাভাগির ক্ষেত্রে কোরআনী আইন সর্বদিক থেকেই শ্রেষ্ঠ বরে প্রমাণিত। প্রতিষ্ঠিত পরিবারগুলোকে রক্ষা করেই কোরআন নতুন নতুন পরিবার গঠনে উৎসাহ প্রদানকারী আইন উপহার দিয়েছে মানব সভ্যতাকে। সভ্যতার একটি বিশেষ পর্যায়ে পৌছানো না গেলে কোরআরী আইন বুঝা যায় না। কোরআনের সম্পত্তি বন্টন ব্যবস্থার সুফল পেতে হলেও মানুষের একটি সামাজিক ও আইনগত মান অর্জন করতে হয়।

www.pathagar.com

মানবাধিকার ঃ সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ

প্রারম্ভিকঃ

মানব সভ্যতার প্রতিটি পর্যায়ে 'মানবাধিকার' শব্দটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং তাৎপর্য রয়েছে। প্রতিটি মতবাদ ও সামাজিক-রাজনৈতিক পদ্ধতি তাদের স্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মানবাধিকারকে বিচার করে এবং নিজস্ব পদ্ধতিতে তাত্ত্বিক ধারণাকে বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করে। উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন আধুনিক বিশ্বে যেখানে প্রতিটি পরস্পর বিরোধী আদর্শ তাদের গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত, সেখানে প্রতিটি মতবাদ মানবাধিকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক যুক্ত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরা কতটুকু সফল কিংবা ব্যর্থ অথবা সংশ্লিষ্ট দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এদের কতটুকু প্রয়োগ ঘটেছে এ সম্পর্কিত একটি সঠিক চিত্র সকল গবেষক বা চিন্তাবিদদের জন্য সহায়ক হবে। তাছাড়া আধুনিক রাষ্ট্রের প্রতিটি সচেতন নাগরিকের জন্য এ রকম একটি উপস্থাপনার আদর্শিক গুরুত্ব রয়েছে বৈাক।

যদিও আজ সমাজতন্ত্র তার ইতিহাসে অভূতপূর্ব এক কঠিন সময় অতিক্রম করছে, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট মানবাধিকারের প্রতি তাত্ত্বিক অবদানের ক্ষেত্রে এই মতবাদ শক্তিশালী এবং সেই কাঙ্খিত মানবাধিকারের প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে মানবাধিকারের সামাজিক বাস্তবতা উপলব্ধির জন্য 'সমাজতান্ত্রিক মানবাধিকার' ধারণাটির সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু বিষয় এবং মানবাধিকার রক্ষায় সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগ সংক্রান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার প্রয়োজন। এ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট কিছু প্রশ্ন হচ্ছেঃ মানবাধিকারের সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী কি? মানবাধিকারের বিষয়টি পূঁজিবাদী ধারণার সাথে সমাজতান্ত্রিক ধারণার মৌলিক পার্থক্য কি? মানবাধিকার রক্ষায় সোভিয়েত সমাজতন্ত্র কতটুকু সফলকাম হয়েছিল? বাস্তব জীবনে মানবাধিকারের ক্ষেত্রে গর্বাচেভবাদের কোন সুদৃঢ় প্রভাব আছে কি? মানবাধিকার বিষয়ে পুঁজিবাদী এবং সমাজবাদী অবস্থানের পার্থক্যগুলি কি হ্রাস পাচ্ছে? সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে উদীয়মান বাজার অর্থনীতিতে মানবাধিকারের ভবিষ্যত কী? নিম্নোক্ত আলোচনায় প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদঃ

পুঁজিবাদী উদারবাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ আদি পাপবোধ ও স্বর্গচ্যুতির ধারণা বিশিষ্ট খ্রীষ্টিয় মতবাদ মানুষকে একটি নীচ এবং ভর্ৎসনাযোগ্য প্রাণীতে পরিণত করেছে। মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টিয় মতবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব তথা রেনেঁসা মানুষের মর্যাদা ও অফুরন্ত সম্ভাবনার মহৎ দিকগুলো তুলে ধরবার চেষ্টা করেছে। যেখানে প্রায় হাজার বছর ধরে মানুষ সম্পর্কে মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টিয় মতবাদ ইউরোপকে করে রেখেছিল জড় ও স্থবির, সেখানে পূর্ণজাগরণ (রেনেঁসা) আন্দোলন মানবিক

www.pathagar.com

গুণাবলীর প্রস্ফুটন, সৃজনশীল শক্তি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিষয়গুলো উন্মোচন করেছে। মানবিক সক্ষমতার এই উন্মোচন আধুনিক পুঁজিবাদে তার সর্বোচ্চ স্তরে পৌছেছে। আবার মানবিক স্বাধীনতার নামে মানুষের উদ্যমকে নিষ্ঠুরভাবে শোষণের মাধ্যমে মানুষকে দাসের স্তরে নামিয়েছে যে পুঁজিবাদ তার বিরুদ্ধেও বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। ইউরোপীয় সমাজতন্ত্র মানব জীবন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মর্যাদাকে বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করেছে।

মানবতাবাদের মার্কসীয় তত্ত্ব হার্বার্ট স্পেন্সারের 'যোগ্যতমরাই বেঁচে থাকবে' নীতিটিকে অমানবিক বলে বিবেচনা করে। মানব সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে দারিদ্র পীড়িত করবার পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি তার নিপীড়নমূলক নীতি ও নিষ্ঠুর ফলাফলের জন্য সমালোচিত হয়েছে। উৎপাদনে ব্যক্তি মালিকানার নামে শ্রমকে অভিশাপ এবং শ্রমিককে দাসে পরিণত করার কারণে সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদকে অভিযুক্ত করেছে। এর প্রতিকার হিসাবে নতুন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছে মার্কসীয় তত্ত্ব। সমাজতান্ত্রিক শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা বিলোপ এবং একটি সর্বাত্মক কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে সম্পত্তির রাষ্ট্রীয় বা সামষ্টিক মালিকানায় গুরুত্ব সর্বাধিক। তাত্ত্বিক এবং বাস্তব বিশ্বমতের প্রেক্ষাপটে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদের এই চ্যালেঞ্জকে অবশ্যই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। একটি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও আদর্শ হিসাবে সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদী সাংবিধানিক পদ্ধতিকে গুরুত্বহীন সংখ্যা লঘিষ্ঠের গণতন্ত্র, ধনীক শ্রেণী তথা পুঁজিবাদী সমাজের গণতন্ত্র রুপে অভিহিত করেছে। একজন সমাজতান্ত্রিক মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র হচ্ছে অতীতে ব্যাপক নীপিড়নমূলক প্রক্রিয়ার বিপরীতে দাসত্বের সূক্ষ্ণ, প্রতিষ্ঠানিক রুপ। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের সারবত্তাকে ব্যাখ্যা করতে যেয়ে মার্কস বলেছেন যে. "সংসদে এবং সরকারী অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহে সমাজের নিপীড়নকারী অংশের প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণের জন্য প্রতি কয়েক বছর পর সমাজের সর্ববৃহৎ নিপীড়িত অংশকে একবার করে নামমাত্র সুযোগ দেয়া হয়"। এই কারণে একজন সমাজতান্ত্রিকের দৃষ্টিতে সবচেয়ে ভাল পুঁজিবাদী ধরণের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিও শোষণের একটি মাধ্যম বলে পরিগণিত হয়। সেখানে পুঁজিবাদী শ্রেণী অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক এবং সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মীশ্রেণী গভীর দরিদ্রতায় নিমর্জিত, সেখানে পুঁজিবাদী সামাজের সকল রাজনৈতিক স্বাধীনতা একেবারেই অর্থহীন। যেখানে সমাজের বৃহৎতর জনগোষ্ঠী বসবাসের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা পায় না, সেখানে বসবাসের স্বাধীনতা তাদের জন্য নিরর্থক। একইভাবে পুঁজিবাদী শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যয় বহনে অক্ষমদের কাছে শিক্ষার স্বাধীনতার কোন তাৎপর্য নেই।

সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিতে সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রই দায়ী। সমাজতন্ত্র এমন এক পদ্ধতির কথা বলে, যা প্রচলিত সরকার পদ্ধতিতে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কিন্তু বাস্তবে সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও প্রশাসন যন্ত্রকে এড়িয়ে যেতে পারে না। কম্যুনিজমের পথে উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে রাষ্ট্রের গুরুত্বকে ব্যাখ্যা করতে যেয়ে এঞ্জেলস বলেন, " শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রের

www.pathagar.com

প্রয়োজন স্বাধীনতার জন্য নয়, বরং এর বিরুদ্ধে প্রতিকূলতাকে দমনের জন্য এবং স্বাধীনতার কথা বলা সম্ভব হয়, তখনই এরূপ রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়।" কিন্তু পশ্চিমা উদারতাবাদের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে পুঁজিবাদ, রাষ্ট্র এবং সরকার যন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য মানবাধিকারকে অত্যাবশ্যকীয় বলে মনে করে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং উদারতাবাদকে আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের আর্দশিক ভিত্তি বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র পশ্চিমা উদারতাবাদের মূল্যবোধ এবং নীতিমালার লালন ক্ষেত্র। একজন সভ্য মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকারে আধুনিক রাষ্ট্র কেন হস্তক্ষেপ করবে, তার কারণ নির্ণয়ে পশ্চিমা উদারতাবাদ অক্ষম। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ সকলের স্বাধীনতা ও অধিকারের নিশ্চয়তা দান করে।

একটি পুঁজিবাদী সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সমাজের অবশিষ্ট বৃহত্তর অংশকে ব্যাপক মূল্য দিতে হয়। কিন্তু একটি উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তার সমগ্র জনগোষ্ঠীর দরিদ্র বা কর্মহীন অংশের জন্য বিবিধ উপায়ে বাস্তব সহায়তার ব্যবস্থা করে। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোন থেকে এই ধরণের উদ্যোগ মানুষের ন্যূনতম বাস্তব কল্যাণের জন্য শুধুমাত্র অপর্যাপ্তই নয়, তা মনুষত্বের সার্বিক মর্যাদার প্রতি অসম্মানজনক। সমগ্র মানব সমাজের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে যেয়ে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস বলেন, "সভ্যতার প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত নির্ভেজাল লোভই ছিল সভ্যতার চালিকা শক্তি, যার সারবত্তা–সম্পদ, আরো সম্পদ এবং অধিকতর সম্পদ। সভ্যতার একমাত্র এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র সমাজের জন্য নয়, প্রতিটি হীন চরিত্রের ব্যক্তির জন্য সম্পদের ব্যবস্থা করা।"

সমাজতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা ও সাম্যের নিজস্ব ব্যাখ্যা রয়েছে। সমাজতন্ত্র শুধুমাত্র প্রতিটি নাগরিকের আনুষ্ঠানিক সাংবিধানিক সাম্যতার স্বীকৃতি দেয় না, বরং মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। প্রতিদানে রাষ্ট্র প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকের কাছ থেকে রাষ্ট্রের প্রতি বাস্তব ভূমিকা এবং সামষ্টিক উৎপাদনে উদ্যোগ দাবী করে। এর অর্থ কি এই নয় যে, সমাজতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটে মানবাধিকারের বিশ্লেষণাত্মক ধারণা মানবাধিকারের পুঁজিবাদী মতাদর্শ অপেক্ষা ব্যাপক?

সামাজিক জীবন ও উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যকার ঘনিষ্ঠতার অনুপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত গণতান্ত্রিক আদর্শ ও পূঁজিবাদী মানবাধিকারের কোন মূল্যই সমাজতান্ত্রীদের কাছে নেই। সমাজতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটে বলতে হয়, "বাস্তবে এ টুকুই পরিবর্তন হয়েছে যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী তথা বুর্জোয়া রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে 'সাম্য' ও 'স্বাধীনতা'র মূল নীতিগুলি ঘোষণা করেছে, এমনকি সর্বাধিক গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রও বাস্তবে বুর্জোয়াদের একনায়কতন্ত্র"। এভাবেই বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানবিক সম্পর্কের গতিশীলতা পরিবর্তিত হয়েছে শ্রমিক শ্রেণী তথা প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রে। শ্রমশক্তি ও কর্মের মজুরীর মাঝে গুণগতভাবে ভিন্ন এক সম্পর্ক খুঁজতে চেয়েছে সমাজতন্ত্র। এই তত্ত্বানুযায়ী প্রতিটি শ্রমিকের উৎপাদন, উদ্যোগ ও তার মজুরীর

www.pathagar.com

মাঝে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকা উচিৎ নয়। এই তত্ত্ব থেকেই কম্যুনিষ্ট মূলনীতির উদ্ভব। যার বক্তব্য হচ্ছেঃ প্রত্যেকের সক্ষমতা অনুসারে কাজ, প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে প্রাপ্তি। এই নীতিকে বিশ্লেষণ করতে যেয়ে লেলিন বলেছেন, "কম্যুনিষ্ট শ্রম যা, হচ্ছে সমাজের কল্যাণের জন্য বিনা মূল্যে সম্পাদিত শ্রম কোন নির্দিষ্ট দায়িত্ব হিসাবে সম্পাদিত হয় না, নির্দিষ্ট দ্রব্য পারার জন্য বা পূর্বে আইনগতভাবে নির্ধারিত কোটার জন্য নয়, বরং যা কোটা বর্হিভূত স্বেচ্ছাশ্রম। কোন মজুরীর আশায় কিংবা শর্তে এই শ্রম দেয়া হয় না। সাধারণ মানুষের কল্যাণ ও সেই জন্য কাজের প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত সচেতন উপলব্ধি থেকে নিয়মিত কাজের অভ্যাসরূপে এই শ্রম সম্পাদিত হয়- যেখানে সুষ্ঠ সংগঠনের জন্য শ্রম অত্যাবশ্যকীয়"। এই তত্ত্ব অনুসারে মানুষকে "জীবন্ত উৎপাদক শক্তি" রূপে অভিহিত করায় এবং ব্যক্তি–মানুষকে কোন মানবিক মূল্য না দেয়ার জন্য মার্ক্সইজমকে দায়ী করা অনুচিত।

কম্যুনিষ্ট শাসন প্রণালী তাত্ত্বিকভাবে বেশ দক্ষ এবং পুঁজিবাদী মূলনীতি 'কর্ম ও মজুরী' অপেক্ষা অধিকতর মানবিক। তবে 'বুর্জোয়া একনায়কতন্ত্রের দেউলিয়াত্বের পর কম্যুনিষ্ট শাসন প্রণালী এমন কি সমাজতন্ত্রীদের কাছেও বেশী মাত্রায় তাত্ত্বিক রূপে প্রতীয়মান হয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ এবং প্রলেতারিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠার পর মানুষ স্বাভাবিকভাবেই কাজের প্রতি আগ্রহী ও উদ্যোগী হয়ে উঠবে, এ ধারণা পরবর্তীতে বিভ্রান্তিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রশাসন যন্ত্রের সমাজতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন ঘনিষ্ঠ নিয়ামকসমূহের উপর ব্যাপক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ শ্রমিক শ্রেণীর সততা ও নিষ্ঠাকে করবে প্রশ্নাতীত–এ রকম ধারণা করা হয়েছিল। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ প্রতিষ্ঠার পর কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠায় ক্ষমতাকে করা হয়েছিল পরম ও সর্বব্যাপ্ত এবং কাঙ্খিত কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার এই ভূমিকা ও কার্যাবলী ছিল একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। মানুষের চরিত্রকে ব্যাখ্যা করতে যেয়ে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে যে মূল গলদ ছিল, তা হচ্ছে ব্যক্তি এবং তার অর্থনৈতিক স্বার্থের মাঝে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নির্ণয়ে ব্যর্থতা।

ক্ষমতা অধিগ্রহণের অব্যবহিত পরেই সমাজতান্ত্রিক শাসকবর্গ, আদর্শবাদ ও বাস্তবতা দ্বৈত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিলেন। চাকুরীর নিশ্চয়তা এবং স্বাচ্ছন্দ্য একজন ব্যক্তিকে নিষ্ঠাবান, সৎ এবং মানবতার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ করে তোলার কথা। সমাজকে অধিকতর উৎপাদনশীল এবং সমৃদ্ধ করতে শ্রম শক্তির সুদৃঢ় সংগঠন ও সঠিক অর্থনৈতিক তৎপরতা অত্যাবশ্যকীয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। দেখা গেছে যে, মানুষের অন্তর্নিহিত মুল প্রবনতা হচ্ছে তার প্রতিটি কর্মদ্যোগকে বাস্তব লাভালাভ দ্বারা প্রতিদানের দৃষ্টিতে দেখা। সে কারণেই "প্রত্যেকের সক্ষমতা অনুসারে কাজ, প্রত্যেকের সক্ষমতা অনুসারে প্রাপ্তি" প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশে কার্যকরী নীতি হিসাবে গ্রহীত হয়। শুধুমাত্র তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই নীতিটি পুঁজিবাদী শাসন প্রণালীর নিকটবর্তী বলে দেখা যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ জাতীয়করণ এবং নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি ভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এই নীতিটি মৌলিকভাবে পুঁজিবাদী নীতি অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং সমান সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবলীর সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির সাথে এই নীতির প্রয়োগ মানবাধিকারের সম্পূর্ণ চিত্রটিকে ভিন্ন

www.pathagar.com

ব্যাঞ্জনা দিয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নসহ কিছু সমাজতান্ত্রিক দেশ মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণা গ্রহণের সময় ভোট প্রদানে বিরত থাকে। এর পেছনে তাদের যুক্তি ছিল যে, মানবাধিকার রক্ষায় বাস্তব সমর্থনের অনুপস্থিতিতে এটি ছিল এক নিছক অপপ্রচার, যা তাদের বিবেচনায় আধুনিক একজন মানুষের জন্য অপর্যাপ্ত।

সমাজতান্ত্রিক মানবাধিকারের সাফল্য ও ব্যার্থতাঃ

পুঁজিবাদের সাথে সূক্ষ্ম পার্থক্যে দেখা যায় যে, সামগ্রিকভাবে সমাজতন্ত্র বেশ সফলতার সাথে সমাজের প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। সবার জন্য নিশ্চিত কর্মসংস্থান শুধুমাত্র সাংবিধানিক মূলনীতিই ছিল না, এটি ছিল কাজ সংক্রান্ত সমাজতান্ত্রিক মূলনীতির সফল বাস্তবায়ন। নিশ্চিত কর্মসংস্থান এবং রাষ্ট্র প্রবর্তিত ন্যূনতম মজুরীর সাথে সাথে প্রতিটি মানুষের স্বাস্থ্য, আবাস, শিক্ষা, অবসর, বিশ্রাম, বৃদ্ধ বয়সের লালন-পালন, রোগীর সেবা এবং আংশিক বা সম্পূর্ণ অক্ষমদের জীবিকার সমান অধিকারে স্বীকৃতি দিয়েছে সমাজতন্ত্র। প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক প্রশাসনে এই অধিকারগুলো শুধুমাত্র মৌলিক আইন দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতই নয়, সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সকল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি তাদের আর্থ-সামাজিক স্তর এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্বিশেষে এই অধিকারগুলো বাস্তবায়নের আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। এক্ষেত্রে ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে এই অধিকারগুলো প্রয়োগের চেষ্টা করছে।

সামাজতান্ত্রিক মানবাধিকারের বৃহত্তর স্পষ্ট ধারণাগত প্রেক্ষাপট থাকা সত্বেও সর্বাত্মকবাদী সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা এবং সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি বাস্তবে মানবাধিকারের বাস্তবায়নের পথে বেশ কিছু গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করেছে এইসব সমস্যা মানুষের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকার, বাক্ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্রী ভিন্ন অন্যান্য সংগঠন করবার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত। মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণার ২নং অনুচ্ছেদে ধর্ম, বর্ণ, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং সম্পর্ক নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার কথা বলা আছে। সম্পদের মালিকানা অথবা কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়া মৌলিক মানবাধিকার ভোগের পথে বাধা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু ধর্মীয় অনুভূতি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিলোপের মাধ্যমে পুঁজিবাদ ও ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে যেয়ে সমাজতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে মানবাধিকারের একটি বৃহত্তর দিককে এড়িয়ে গেছে। এভাবে ন্যূনতম রাষ্ট্রীয় মজুরীসহ নিশ্চিত কর্মসংস্থানের সুযোগের কারণে কিছু কিছু মানবাধিকারকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। এ কথা আজ গোপনীয় কিছু নয় যে, সমাজতান্ত্রিক শাসকবর্গের নির্দেশনায় বিভিন্ন দেশে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, প্রকাশনার স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের অন্যান্য স্বাধীনতার জন্য লড়াই রত বিভিন্ন সংঘ এবং ধর্মীয় সংগঠনসমূহের উপর বিবিধ অত্যাচার ও নিপীড়ন চালানো হয়েছে। সোভিয়েত বাস্তবতাই সম্ভবত একটি সমাজের প্রত্যক্ষ জীবনে সমাজতান্ত্রিক মানবাধিকারের সাফল্য ও ব্যার্থতার সবচেয়ে দীর্ঘ ইতিহাস।

www.pathagar.com

সমাজতান্ত্রিক প্রশাসন ও উদারতাবাদঃ সোভিয়েত বাস্তবতা

(ক) কর্মপ্রণালী ও মানবাধিকারঃ

সোভিয়েত ইউনিয়ন আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর পক্ষে মূখ্য ভূমিকা পালনকারী শুধুমাত্র প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশই নয়, এর সমাজতন্ত্রের ধরণও অবশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে এক অনুকরণযোগ্য আদর্শ হিসাবে কাজ করেছে। পরবর্তীতে সুনির্দিষ্ট সমাজতান্ত্রিক নীতি ও সমগ্র রাষ্ট ব্যবস্থাকে উদারকরণ করা সহ প্রশাসনিক পদ্ধতির ব্যপক অভিজ্ঞতায় এই রাষ্ট্রটি ছিল অগ্রবর্তী। বিভিন্ন মানবাধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ সমূহের বিশ্লেষণ সমগ্র মানবাধিকার আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই কারণেই সমাজতান্ত্রিক মানবাধিকারের প্রকৃত সারবত্তা ব্যক্ত করতে যেয়ে আমরা সোভিয়েত অভিজ্ঞতাকে আলোচনার একটি দিক নির্দেশনা হিসাবে গ্রহণ করতে পারি।

১৯১৭ সালে বলশোভিক বিপ্লবের পর সফলভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আরোহন করে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রীরা পুরোদমে জাতীয়করণকৃত নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি চালু করেছিলেন। কিন্তু তারা অত্যন্ত নৈরাশ্যের সাথে লক্ষ্য করেন যে, এর ফলে কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদন অত্যন্ত আশংকাজনক হারে হ্রাস পায়। প্রথমে ভাবা হয়েছিল যে, বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতাই এ জন্য দায়ী। কিন্তু ব্যাপকহারে শারীরিক নির্যাতন, কারাবরণ ও দশান্তরিতকরণ করার পরও সামগ্রিক পরিস্থিতির কোন ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেনি। ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত বলশেভিক শাসকদের দমন নীতি সরাসরি ব্যক্তির জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার অধিকারকে লঙ্ঘন করেছে। এ ধরণের নীতি উৎপাদন বাড়াতে কিংবা সোভিয়েত রাষ্ট্রের বৃহত্তর অংশের জন্য কোন বাস্তব শুভ ফলাফল আনতে ব্যর্থ হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই ব্যর্থতা এবং একই সাথে সমগ্র দেশ জুড়ে মহামারী ও দুর্ভিক্ষের ব্যাপক প্রাদূর্ভাবের কারণে ভি, আই, লেলিন তার অতীতে গৃহীত সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী বাতিল করেন এবং তৎপরিবর্তে একটি নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহণ করেন, যা মিশ্র অর্থনীতির আধুনিক ধারণার সমতুল্য।

নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রচলনের সাথে সাথে ভুমি, পুঁজি এবং ক্ষুদ্র দোকান বা কারখানার ন্যায় সম্পত্তির মালিকানা ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘন কিছুটা কমে যায়, একই সাথে ধর্মীয় ক্ষেত্রে নিপিড়ণও তলনামূলকভাবে হ্রাস পায়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের কার্যাবলী পরিচালনা করতে ও পূর্বে বাজেয়াপ্তকৃত তাদের সম্পত্তি ব্যবহার করতে দেয়া হয়। সামগ্রীকভাবে নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালা মহামারী দূরীকরণ ও দুর্ভিক্ষপীড়িত অর্থনীতি পুর্নবাসনে কিছুটা সফলতা লাভ করে। বাস্তব সাফল্যের কারণেই এ রকম পূর্ব ব্যবস্থাপনা উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের কাজে অধিকতর উৎসাহিত করে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক প্রশাসনের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি, এ ধারণার বশবর্তী হয়ে স্টালিন ও তার সরকার "নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালা" প্রয়োগ করতে না চাওয়ায় এ অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। "নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালা" কতৃক স্বীকৃত সম্পত্তির অধিকার ত্যাগ করতে না

www.pathagar.com

চাওয়া বা কোন নির্দিষ্ট ধর্মীয় সংগঠন তথা আদর্শের প্রতি আনুগত্য দেখানো বন্ধ করতে না চাওয়ার মত তুচ্ছ কারণে ১৯৩০এর দশকে স্টালিন প্রশাসন নিষ্ঠুরভাবে লাখ লাখ লোককে হত্যা করেছিল। সোভিয়েত স্টালিনিষ্ট বাস্তবতায় সমাজতান্ত্রিক ভিন্ন অন্য কোন নির্দিষ্ট দল বা গ্রুপের প্রতি আনুগত্য ছিল একেবারেই কল্পনাতীত। সমাজতন্ত্র বিরোধী সকল দলের উপর পূর্ণ দমননীতি চালানোর পর ১৯৩৬ সালে পূর্ণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এক সংবিধান প্রণয়ন করে। সেই সংবিধানে বহু মানবাধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু লিখিত ও অলিখিত এইসব সমাজতান্ত্রিক মানবাধিকারকে স্টালিণীয় বাস্তবতায় টিকে থাকতে হয়েছিল। তাই মানবাধিকারের করুণ দশা হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত স্টালিনীয় দমন নীতির কোন উন্নতি হয়নি। হিটলারের আগ্রাসনের মুখে স্টালিন তার নীতি কিছুটা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই নমনীয় ভাব পরবর্তিতে কিছু ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, জাতিগত ও আধ্যাত্মিক অধিকার আদায়ে প্রভাব ফেলেছিল। ধর্মীয় ও জাতীয় উৎসবগুলো প্রকাশ্যে পালনের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে সীমিত পর্যায়ে কার্যকলাপ পরিচালনার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে মূলতঃ দুইটি লক্ষ্য অর্জনে এ রকম তুলনামূলক উদার দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রথমতঃ ক্রেমলিনের বিরুদ্ধবাদিতা এবং বিভিন্ন সোভিয়েত জাতিগুলোর ভেতর উত্তেজনা হ্রাস দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের প্রতি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা আনুগত্য নির্বিশেষে সোভিয়েত জনগণের বৃহত্তর অংশের সর্বাত্মক সমর্থন অর্জন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্রই স্টালিন তার ঐতিহ্যবাহী 'রক্ত ও লৌহ' নীতিতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। পরবর্তীতে স্টালিন প্রশাসন বার্হিবিশ্বে তার মানবিক চেহারা প্রদর্শন করবার কোন দায়িত্ব বোধ করেনি, কিংবা তার প্রশাসনের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায় এ রকম কোন শক্তির অস্তিত্ব নিজ দেশে রাখে নি।

যুদ্ধ পরবর্তী সমস্যা ছিল জনগণের খাদ্য এবং দেশের পুনর্গঠন কর্মসূচীতে জনগণকে সংশ্লিষ্ট করা। স্টালিনের চূড়ান্ত কর্তৃত্ববাদী পদ্ধতি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় বেশ সহায়ক বলে প্রমাণিত হয়। বিশ ও ত্রিশের দশকে বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত মহামারীর জন্য স্টালিন প্রশাসনকে সহজেই দায়ী করা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ১৯৫৩ সালে স্টালিনের মৃত্যু পর্যন্ত বর্ধিত শিল্প ও কৃষি উৎপাদন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সোভিয়েত জনগণের মাঝে তা বন্টনের জন্য তার প্রশাসন অবশ্যই কৃতিত্বের দাবিদার।

পঞ্চাশের দশক শেষ হবার পূর্ব পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে সেভিয়েত নেতৃত্বের স্থান ছিল প্রশ্নাতীত এবং সমাজতন্ত্রের আদর্শকে তুলে ধরতে ক্রেমালিন সাফল্য জনকভাবে দেশ, দল, ও গ্রুপ সমূহকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছিল। কিন্তু স্টালিনের মৃত্যুর পর স্টালিনের চলমান লৌহ-হস্ত নীতির উৎস অনুসন্ধান শুরু হয়, যা সমাজতন্ত্রের আদর্শিক বিস্তারকে প্রতিকুলভাবে প্রভাবিত করতে পারত। এ ভাবে সোভিয়েত রাষ্ট্র ও কম্যুনিষ্ট পার্টির অংগ সংগঠন সমূহকে স্টালিনবাদ ও মানবাধিকারের

www.pathagar.com

সমাজতান্ত্রিক ধারণা সমূহের পুণঃনিরীক্ষা করতে হয়েছিল। এ ধরণের সিদ্ধান্ত ষাট দশকের পূর্ব পর্যন্ত অচিন্তনীয় ছিল। পরবর্তীতে স্টালিনবাদ তার নিষ্ঠুর দমন ও পীড়ন নীতি এবং মানবাধিকারের ব্যাপক লংঘনের জন্য প্রকাশ্যে সমালোচিত হয়েছে। কম্যুনিষ্ট পার্টি ও ক্রেমলিনের এই ধারণা জন্মেছিল যে, বহির্বিশ্বে একটা খারাপ ইমেজ সৃষ্টিকারী ও সমাজতন্ত্রের বিস্তারকে প্রভাবিতকারী স্টালিনবাদকে তাদের অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। ক্রুশ্চেভ যুগে বহির্বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক মানবাধিকারের ব্যাপক প্রচার সত্বেও বাস্তবে দেশের অভ্যন্তরে খুব কমই পরিবর্তন হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ষাটের দশকের মধ্য পর্যন্ত স্টালিনবাদ ও সমাজতন্ত্র প্রায় সমার্থক ছিল।

ব্রেজনেভ যুগে মানবাধিকারের ক্ষত্রে অপেক্ষাকৃত উন্নত পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। ষাট দশকের মধ্যভাগে সোভিয়েত অর্থনীতি উন্নয়নের এমন এক স্তরে পৌছেছিল, যা শুধুমাত্র স্টালিন টাইপের প্রশাসনের পক্ষে টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বাস্তব ভূমিকা কিংবা উন্নততর উদ্যোগ থাকা সত্বেও এর সাথে প্রায় অসামঞ্জস্যপূর্ণ অথচ দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত মজুরীর কারণে শিল্প এবং কৃষি–উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমিকেরা ছিল অসন্তুষ্ট। সোভিয়েত অর্থনীতিকে একটি স্থায়ী তথা দৃঢ় অবস্থান দেবার জন্য সমগ্র দেশে একটি নতুন পদ্ধতির 'খজরাজ্সত' চালু করা হয়েছিল। কর্ম ও মজুরীর মাঝে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনকারী এই নব্য প্রবর্তিত পদ্ধতিতে ১৯৬৮ সাল থেকে প্রতিটি শ্রমিক তার অধিকতর নিষ্ঠা ও কঠোর শ্রমের জন্য বাড়তি পারিশ্রমিক পাবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। কিন্তু সম্পদ বন্টনের এই নতুন পদ্ধতি বিভিন্ন বাধার সম্মুখী হল। প্রথমতঃ এই নতুন পদ্ধতি সমগ্র সোভিয়েত অর্থনীতিতে কার্যকরী হতে ব্যর্থ হয়। শুধুমাত্র কিছু কিছু শিল্পখাতকে এই পদ্ধতি প্রচলনের জন্য বেছে নেয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তি –উদ্যোগ, বেসরকারী খাত ও প্রতিযোগিতার অভাব এবং সাধারণ শ্রমিক শ্রেণীর জন্য অর্থনৈতিক সুবিধা আনয়নকারী এই নতুন পদ্ধতি প্রবর্তনে সুবিধাভোগী কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও আমলাদের উদাসীনতা। তৃতীয়তঃ একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বাড়তি মজুরী সদ্ব্যবহারের সীমিত সুযোগ। চতুর্থতঃ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি শ্রমিকের বাস্তব ভূমিকার প্রতিদান নির্ণয়ের দায়িত্ব দূর্নীতি ও অনিয়মের কারণে অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।

সত্তরের দশকে কমুনিজমের প্রতি অধিকতর নিঃস্বার্থভাবে নিবেদিত একটি নতুন কম্যুনিষ্ট প্রজন্ম গড়ে তোলাই ছিল কম্যুনিজম গঠন প্রক্রিয়ার প্রধান কাজ। এ কথা সত্য যে ব্রেজনেভ যুগ সমাজতান্ত্রিক প্রশাসনকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উদারনৈতিক করেছিল এবং মানবাধিকারের ক্ষেত্রে ভাল পদক্ষেপ নেবার পথ প্রশস্ত করেছিল। কিন্তু ব্রেজনেভের উদারনৈতিক নীতিগুলো একটি আপাতঃ বিপরীত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। কর্মক্ষত্রে সমাজতান্ত্রিক প্রশাসনে অভ্যস্ত সোভিয়েত জনগণ নতুন উদারনীতিগুলোকে দায়িত্ব এড়াবার কাজে ব্যবহার করলো এবং অনেক অপরাধের জন্য তারা আইনের ধরা–ছোঁয়ার বাইরে রইল। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় রাষ্ট্র ও পার্টির বিভিন্ন অংগসমূহের কার্যকলাপের আনুষ্ঠানিক সমালোচনাও অকার্যকর হয়ে পড়েছিল। নিশ্চিত কর্মসংস্থান এবং প্রায় বিনামূল্যে আবাস, শিক্ষা এবং চিকিৎসার সুবিধা জনগণের সংখ্যাগরিষ্ট অংশকে তাদের

www.pathagar.com

পেশাগত জীবনে পশ্চাৎপদতার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। অধিকন্তু নব্য–স্বাধীন পরিস্থিতিতে শ্রমিকেরা সাফল্যের সাথে তাদের কর্মচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারত এবং প্রশাসনিক সকল শাস্তি এড়িয়ে চলতে পারত।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বৃহত্তর পরিধিতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানবাধিকারকে ছাড় দিতে ব্রেজনেভ বেশ ছিলেন। শিক্ষার ধরণ, কাজের প্রকৃতি এবং বসবাসের স্থান নির্ধারণে জনগণকে ব্যাপক স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত সীমা যাতে কেউ অতিক্রম করতে না পারে সে দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছিল। রাষ্ট্র তথা সামষ্টিক সম্পত্তির প্রতি জনগণের দৃষ্টিভংগী সবচেয়ে মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় সম্পদ ও জ্বালানীর অপব্যবহার বা অপচয় এড়ানোর জন্য সমগ্র দেশে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। উৎপাদনের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় শ্রমিক ও কর্মচারীদের অভিন্ন মনোভাব চূড়ান্তভাবে উৎপাদিত পণ্য ও তার গুণগত মানকে খারাপভাবে প্রভাবিত করতে পারত। সত্তরের দশকের শেষ বৎসরগুলোতে এবং আশির দশকের প্রথমার্ধে পণ্য ও কাজের গুণগত মানই ছিল ক্রেমলিনের উদ্বেগের মূল কারণ। কিন্তু কোন পদক্ষেপই সোভিয়েত অর্থনীতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেনি। কার্ল মার্কস এবং এঙ্গেলস উভয়ই উৎপাদনের সমাজতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার এই সমস্যা সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত ছিলেন। কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে এই বলে অনেকে সমালোচনা করেছিলেন যে, " ব্যক্তিগত সম্পদ বিলোপের উদ্দেশ্যই ছিল সব কর্ম প্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে বিশ্বজনীন আলস্যকে প্রধান্য দেয়া"। লেলিন থেকে শুরু করে ব্রেজনেভ পর্যন্ত প্রতিটি সোভিয়েত সরকারই এই মন্তব্যকে নিছক পুঁজিবাদী প্রচারণা বলে প্রমাণের চেষ্টা করেছেন।

১৯৭৭ সাল থেকে আশি'র দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ক্রেমলিন সমাজতান্ত্রিক ধরণের উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থাতেই স্থির থাকার চেষ্টা করেছে এবং এর মাধ্যমেই সোভিয়েতরা তাদের নিজস্ব ধ্যান–ধারণার মানবাধিকার আদায় করতে চেয়েছে। একটি "উন্নত সমাজতন্ত্র ভিত্তিক গণতান্ত্রিক ধরণের শাসন ব্যবস্থায় সব ধরণের মানবাধিকারকেই বাস্তব প্রয়োগের জন্য বিবেচনায় আনা হয়। একটি বাস্তব সমাজতান্ত্রিক মডেল হিসাবে ব্রেজনেভ যুগকেই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বড় দৃষ্টান্ত হিসাবে বিবেচনা করা যায় বলে সোভিয়েতরা একে অভিহিত করেছেন 'রাজবিতই সমাজতন্ত্র' হিসাবে। লেলিন নিজেই বলেছেন, "উৎপাদন পদ্ধতিতে মালিকানার সাথে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সমাজের সকল সদস্যের সামতা তথা শ্রম ও মজুরীর সম অধিকার অর্জিত হওয়া মাত্র মানবতা অনিবার্যভাবেই সম্মুখে অগ্রসর হবার বিষয়ে দ্বন্দ্বের সম্মুখিন হবে, এই দ্বন্দ্ব নাম মাত্র সাম্যতা থেকে প্রকৃত সাম্যতায় উর্ত্তীর্ণ হবার দ্বন্দ্ব"। সমগ্র সোভিয়েত জনগণের জন্য না হলেও, অন্তত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জন্য কতটুকু প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল এটিই ছিল ব্রেজনেভ প্রশাসনের অগ্নিপরীক্ষা। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সকল স্তরে না হলেও অন্তঃত একজন মানুষের শারীরিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য সকল প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদা পূরণের মানবাধিকার সমূহ রক্ষায় সোভিয়েত জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ছিল সমান মর্যাদার অধিকারী।

www.pathagar.com

প্রযুক্তি ও মানবাধিকারঃ

বিশ্ববাজারে পুঁজিবাদী দেশসমূহের সাথে প্রতিযোগিতা এবং উন্নত প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন করাই ছিল ব্রেজনেভ শাসনামলে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের মূল সমস্যা। কম্যুনিজমকে বাস্তবে রুপদান করতে সাফল্যজনকভাবে 'নব সোভিয়েত মানুষ' অর্থাৎ উন্নত মাবন গোষ্ঠী সৃষ্টি করার সমস্যার সম্মুখিন হওয়াও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এই উদ্দেশ্যেই লেনিন সমগ্র সোভিয়েত সমাজ ও জনগণকে একই জাতিগত সম্পর্কে গ্রথিত করবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। লেনিন বলেন, "সমগ্র সমাজ সমান শ্রম ও মজুরীর এক দপ্তর ও কারখানায় পরিনত হবে।" শ্রম ও মজুরীর সাম্যতা বিশিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা সোভিয়েত জনগণের বিভিন্ন অংশের জন্য এক কলংকরুপে উপস্থিত হয়। প্রাযুক্তিক উন্নয়ন ও নব উদ্ভাবিত প্রযুক্তিকে বাস্তব জীবনে প্রচলনের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি বেশ ক্ষতিকর প্রমানিত হয়। সমাজতন্ত্র শ্রমকে মানবিক করতে চেয়েছে।

কিন্তু পুঁজিবাদের মতই সে এই ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। তবুও মানবিক শ্রমের বিরুদ্ধে অবস্থানকারী পুঁজিবাদী প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে সমাজতন্ত্র বরাবরই অমানবিক বলে বিবেচনা করেছে। এর পক্ষে মূল যুক্তি ছিল যে, পুঁজিবাদীরা প্রযুক্তির সাহায্যে স্বাভাবিক উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্ট করেছে। কনস্তানিনভ বলেন, "আধুনিক কৌশলগত উন্নয়ন যেখানে বর্ধিত আকারে ব্যাপক সামাজিক বিরুদ্ধাচারিতার জন্ম দিচ্ছে পুঁজিবাদের এমন পর্যায়ে আমরা এমন বিভিন্ন ধরনের প্রাযুক্তিক রুপকথার কথা শুনতে পাই যা প্রযুক্তির ভূমিকাকে একচ্ছত্র করে মানুষের বিরুদ্ধে প্রযুক্তিকে নিষ্ঠুর শক্তি হিসাবে দাঁড় করাচ্ছে।" এমতাবস্থায় ধারণা করা হয়েছিল যে, সমাজতান্ত্রিক উন্নয়ন সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকের জন্য এবং উৎপাদন প্রক্রিয়াকে শুধুমাত্র সহজতর ও আরামপ্রদই করবে না, সাথে সাথে দক্ষতা ও শারীরিক উপযুক্ততা নির্বিশেষে সকলের জন্য কাজের নিশ্চয়তা দান করবে। প্রকৃতপক্ষে গতিশীল প্রাযুক্তিক বাস্তব উদ্যোগের অনুপস্থিতিতে সমাজতন্ত্র এই লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। এই কারণে সমাজতান্ত্রিক ব্লকের নেতৃস্থানীয় দেশ হয়েও সোভিয়েত ইউনিয়ন আধুনিক জীবনমান উন্নয়নের সকল মাপকাঠিতে অনেক পেছনে পড়ে যায়।

সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদের সংকটঃ

সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সকল পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি ও প্রশাসনের প্রায় আকস্মিক পতন সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদকে গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন করেছে। কোন ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশ বা সরকার এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারছে না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক শাসকবর্গ তাদের অভ্যন্তরীণ চাপ ও সংকটের কাছে নতি স্বীকার করছে। সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার এইভাবে সম্পূর্ণভাবে ভেংগে পড়ার কারণ হিসাবে কোন বহিঃশক্তিকে সরাসরি দায়ী করা বেশ কঠিন। কম্যুনিষ্টরা এখন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে যে, তারা তাদের বহুল প্রচারিত 'প্রত্যেকের সক্ষমতা অনুসারে কাজ, প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে প্রাপ্তি, মার্কসের এই তত্ত্ব কোন দিনও বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে না। প্রকৃতপক্ষে মার্কসিষ্টরা

www.pathagar.com

মানব প্রকৃতি ও তার সারবত্তাকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। একজন মানুষের শারীরিক ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত হতে পারে। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাসমূহ ও চাহিদা সবসময় সম্প্রসারণশীল। মার্কসীয় তত্ত্ব এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, মানুষ শুধুমাত্র একটি বস্তুগত ও প্রাকৃতিক জীব, অন্যান্য প্রাণীর সাথে তার প্রভেদ এইটুকুই যে, সে উন্নততর অনুধাবন ক্ষমতা ও ধীশক্তির অধিকারী। এ ভাবে তারা মানুষের আত্মিক, আবেগিক ও মনোবৈজ্ঞানিক জটিলতা সমূহকে উপেক্ষা করে গেছে। মানব প্রকৃতিকে সামগ্রিকভাবে অনুধাবন করতে ব্যর্থ একটি আদর্শ মানবাধিকারকে যথাযথ মর্যাদা দান করতে পারে না। মানবতার প্রতি মার্কসিষ্টদের অন্তঃসারশূন্য দৃষ্টিভংগীর সাথে তাদের কল্পিত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাদৃশ্য আনতে গিয়ে পরবর্তীতে ব্যাপক বিস্তৃত সন্ত্রাস ও নিপীড়নের জন্ম হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তারা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষের মৌলিক চাহিদাপূরণে তরা সাফল্য লাভ করলেও ভোগ্যপন্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে জনগণের ক্রমবর্ধনশীল চাহিদা মেটাতে তারা ব্যর্থ হয়েছিল। পুঁজিবাদের তুলনায় উন্নততর বাস্তব সুবিধা সহ দক্ষ ও মানবিক উৎপাদন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার যে প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছিল, তা পরবর্তীতে জনগণের কাছে অলীক ও কাল্পনিক বলে প্রমাণিত হয়। বর্তমানে সমগ্র সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব এই সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার জন্য এক গোলকধাঁধাঁয় হাতড়িয়ে চলছে।

সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের পক্ষে আর পুঁজিবাদকে প্রত্যাখান করা সম্ভব নয়। আবার পুঁজিবাদও ঐ সব দেশসমূহের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় ঠেকাতে সমর্থ হচ্ছে না। কমিউনিষ্ট শাসন ব্যবস্থায় পুনরায় ফিরে যাওয়াও সম্ভব নয়।

গর্বাচেভবাদের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে সকল পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো এক দলীয় একনায়কতন্ত্র বিলোপ করে রাষ্ট্রের সকল অংগ সমূহের উপর একদলীয় সাংবিধানিক প্রাধান্য এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার একচ্ছত্র সমাজতান্ত্রিক মালিকানা পরিত্যাগ করেছে। এর পেছনে তাদের যুক্তি ছিল সমাজতন্ত্রের এই দোষগুলো দূর করার মাধ্যমে তারা সমাজতান্ত্রিক বিশ্বকে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া রোধ করতে পারবে।

সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনুষত্বের মর্যাদাকে অবমাননা করার মূল কারণ। বর্তমান যুগে সমাজতন্ত্রের পক্ষবলম্বনকারীরা ঠিক বিপরীত সুরে কথা বলছেন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উপযোগিতাকে পুনরুদ্ধার করবার জন্য ব্যক্তিগত মালিকানার আশ্রয় নিচ্ছেন। বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া কাঙ্খিত ফল লাভে কতটুকু সফল হবে, তা পরীক্ষার দাবী রাখে। প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পূর্ণ বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে যে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে উঠছে, তা যে কেউ লক্ষ্য করে থাকবেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে এই ব্যবস্থা অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক সমাজেই ভ্রমাত্মক। আমলাতন্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুবিধাভোগী শ্রেণী সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখিন হচ্ছে। বেসরকারী

www.pathagar.com

করণের শুভ ফলাফল খুব স্বল্প সময়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌছাতে পারেনি। বেসরকারীকরণ কর্মসূচীকে টিকিয়ে রাখতে হলে সমাজতান্ত্রিক শাসকবর্গকে অধিক হারে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে অথবা তাদের নিজস্ব নতুন পুঁজিবাদী শ্রেণী সৃষ্টি করতে হবে এবং সেই সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন ও কার্যাবলী থেকে উল্লেখযোগ্য মুনাফা লাভ করবার সুযোগ করে দিতে হবে। ঠিক এখানেই সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদ বর্তমানে তার নিজস্ব চরম সীমা ও পুঁজিবাদের চরম সীমার মাঝামাঝি এক আড়াআড়ি অবস্থানে আটকে গেছে। সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদ তার বর্তমান সংকট থেকে কতখানি সফলতার সাথে বেরিয়ে আসতে পারবে তা এখনও ভবিষ্যতের বিষয়।

রাষ্ট্র ও সামাজের সম্পদে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা এক পর্যায়ে বেওয়ারিশ মালিকানায় পরিবর্তিত হয়, যা অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমগ্র সমাজতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে হতাশাগ্রস্ত করে। অপরদিকে পুঁজিবাদী সংখ্যালঘুদের শাসনের পরিবর্তে কম্যুনিষ্ট ও সামরিক নেতাদের একটি ক্ষুদ্র শ্রেণী এককভাবে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ দখল করে। বাস্তবে সুদীর্ঘ সময়ের কম্যুনিষ্ট শাসন ব্যাপক গণমানুষের মাঝে ঘৃণা, নির্বিকারত্ব ও অবিবেচনাবোধের সৃষ্টি করে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সম্পদ, পারিশ্রমিক ও দন্ড ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের ফলে সরকারী ও দলীয় গুরুত্বপুর্ণ পদগুলোতে নিয়োগের জন্য পার্টি অনুমোদিত প্রার্থীরা সাধারণ মানুষের তুলনায় অকল্পনীয় এক বিলাসবহুল জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাশীল দল ও গোষ্ঠী রাতারাতি এক বিশেষ শ্রেণীতে পরিণত হয় এবং ধীরে ধীরে সমগ্র দেশকে নিজেদের মালিকানায় নিয়ে আসে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতার বাস্তবতা সত্ত্বেও এবং ক্ষমতা সংগঠনের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক উন্নয়ন স্তরে ভিন্নতা থাকলে সাবেক সকল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই একটি শোষণ শ্রেণী গড়ে উঠে। আকারে ও প্রকৃতিতে এরা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শোষণ শ্রেণী থেকে আলাদা। কিন্তু দলীয় ও সরকারী পর্যায়েই সর্বত্রই এই সব সমাজতন্ত্রী শোষকরা বিরাজ করত। অবশ্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মত এদের উপস্থিতি ততটা দৃশ্যমান ছিল না। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বেকারত্ব যেমন সুপ্ত ছিল, তেমনি শোষণের ধরণও ছিল বলতে গেলে একেবারেই গোপন। আস্তে আস্তে সুপ্ত বেকারত্ব ও গোপন শোষণ যখন স্পষ্ট হতে লাগল, তখন জনগণের মাঝে চাপা ক্ষোভ প্রকাশ পেতে লাগল।

সমাজতান্ত্রিক জনগণের চাপের মুখে সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদ তার রুপ পরিবর্তন করছে। এই কারণেই এখনও সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রতি নিবেদিত প্রাণ বিভিন্ন মহল সমাজতন্ত্রকে দায়ী করতে চান না, বরং তারা একজন আধুনিক মানুষকে তার স্বার্থপরতা ও সহ-নাগরিকদের প্রতি অমানবিক ব্যবহারের জন্য দোষারোপ করতে চান। ইতিহাস বলে একজন মানুষের অন্তর্নিহিত গুনাবলী ও প্রবণতা সমুহ সব সময় একই রকম থাকে না। একজন মানুষের সৎগুনাবলীর ব্যবহার ও অসৎগুণাবলী থেকে দুরে রাখার কার্যকারিতাই কোন নির্দিষ্ট মতবাদ বা সভ্যতার সার্থকতা। মানবাধিকারের বাস্তব রুপদানের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর এত ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জনের

www.pathagar.com

পর সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদকে গ্রহণের ক্ষেত্রে মানব সভ্যতা কতটুকু পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত হয়েছে সে সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে আসার সম্ভবত এটাই উপযুক্ত সময়।

উপসংহারঃ

সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদের ইতিহাস গ্রীক রাজনৈতিক চিন্তাধারার সাথে সহজেই সংযুক্ত করা যায়। সম্পদের অধিকতর সুষম বন্টনের মাধ্যমে মৌলিক সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদের কথা প্রচার করেছিলেন প্লেটো। তার মতে একটি সঠিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি কখনও 'অভিভাবক' নামক কোন শাসক শ্রেণীকে ব্যক্তিগত মালিকানার সুযোগ দিতে পারে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং উদারতাবাদ নামে পুঁজিবাদী মানবতাবাদের চরম ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে আধুনিক সমাজতন্ত্র টিকে আছে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পুর্ণ বিলোপের দাবি জানিয়ে আসিলে। মানবাধিকারের সমাজতান্ত্রিক ধারণা মানবিক কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রণকেই প্রাধান্য দিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পুর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে সমাজতান্ত্রিক শাসকবর্গ অর্থনৈতিক সুযোগ–সুবিধার সুষম বন্টনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সাফল্য লাভ করেছিল। এ ধরণের সাফল্য হাজার হাজার নিপীড়িত জনগণকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু 'সমাজতান্ত্রিক দেবতা'র পদতলে অনেক মানবাধিকারকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো গভীর হতবিহ্বলতার হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য পুঁজিবাদের কাছে জরুরী আশ্রয় চাইছে।

মার্কসিজমের মৌলিক সমস্যা হচ্ছে, মানব প্রকৃতি সম্পর্কে এই তত্ত্বের ভুল দৃষ্টিভংগী। এই তত্ত্ব মানুষের আধ্যাত্মিক মাত্রাকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র তার বস্তুতান্ত্রিক পরিচয়কে প্রাধান্য দিয়েছে। অপর পক্ষে কম্যুনিষ্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার নীতি অনুসৃত হয়েছে। এভাবে মার্কসিজমের ভেতরে এক বৈপরিত্য স্থান করে নিয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক শাসকেরা এই গোলকধাঁধাঁ থেকে বের হতে ব্যর্থ হয়েছে। মানব প্রকৃতিতে চরম বস্তুতান্ত্রিক আবেগ প্রয়োগ করায় সমাজতান্ত্রিক জীবন অসন্তোষজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে। পশ্চিমা আকর্ষনীয় ভোগবাদী জীবনের প্রলোভন সমাজতান্ত্রিক জনগণকে বিক্ষুদ্ধ করেছে। জনগণের নৈতিক অবক্ষয় রোধকল্পে বা তাদের প্রাত্যহিক চাহিদা পূরণের বিড়ম্বনা কমানোর লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক শাসকবর্গ কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থাই নিতে পারেন নাই। তবে চীনের সংস্কার ব্যতিক্রমধর্মী ইতিহাস সৃষ্টি করেছে

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বলা যায় যে, সাধারণভাবে পুঁজিবাদের মত সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদের সাফল্যও শুধুমাত্র রাষ্ট্র ও সমাজে বস্তুগত সফলতার মাপকাঠিতে বিচার করা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে মানব জাতি পুঁজিবাদী মানবতাবাদের সাথে সুক্ষ্ম বিভেদকারী কোন ভিন্ন সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদকে খুজে পাবে না।

সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদের অভিজ্ঞতা এবং তার সাম্প্রতিক গভীর সংকট এ কথাই প্রমাণ করে যে, দৃঢ় আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সমর্থন ছাড়া মানবাধিকারের কোন তত্ত্বই বেশী দিন টিকে থাকতে

www.pathagar.com

পারে না। মানুষ শুধু ক্ষুণ্নিবৃত্তি ও যৌনক্ষুদা নিবারণের মাঝেই জীবনের স্বার্থকতা তালাশে ব্যস্ত থাকতে পারে না আজীবন। নিছক বস্তুগত ভোগ-বিলাশের মাত্রা বৃদ্ধিতে মানুষ দ্রুত পশুর স্তরে নেমে আসতে পারে। শাসকশ্রেণীর মাঝে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে কোন দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাই সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের আজকের দূর্গতি ও বিপর্যয় কোন ব্যতিক্রমধর্মী আকস্মিক ঘটনা নয়। আর সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদ আবার জোরদার হবে, এমন আশা শুধুই আকাশ-কুশুম কল্পনা মাত্র। অন্যদিকে পুঁজিবাদী শোষনের করাল গ্রাস থেকে মুক্তির জন্য মানব সভ্যতা কোনই চেষ্টা করবে না, এমন ধারনা পোষণ করারও যুক্তিযুক্ত কোন কারণ নেই।

www.pathagar.com

মানবাধিকার ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ

ভূমিকা ঃ সামগ্রিক ভাবে সম্পূর্ণ মানবাধিকার বিষয়টিকে তিনটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন, আদর্শিক দৃষ্টিকোন এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোন। মানবাধিকারের সমাজতান্ত্রিক ধারণা মৌলিক ভাবেই পুঁজিবাদী ধারণার চাইতে আলাদা। সমাজতান্ত্রিক ধারনায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার বিলোপ সাধনকে মানবাধিকারের সার্থক প্রতিষ্ঠার অবশ্য পালনীয় পূর্বশর্ত রূপে গণ্য করা হয়, অথচ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে দখলীস্বত্বকে এবং মালিকানার অধিকারকে প্রায় ধর্মানুরূপ পবিত্র বলে মনে করে। অধিকন্তু, বিভিন্ন ইস্যুতে যেমন জাতীয়, সাংস্কৃতিক, ভাবাদর্শগত ও ধর্মীয় ব্যাপরে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের স্বতন্ত্র বিশ্বাস ও আচরণ বিধি রয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিংশ শতাব্দীর এই দুই প্রধান সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিপরীতমুখী অবস্থান গ্রহণ করে। তথাপি দৃশ্যত উন্নতির মানদন্ডে মানবাধিকারের প্রতি সচেতনতা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উভয় ব্যবস্থার ও সাফল্য ব্যর্থতা সহজেই তুলনা করা যেতে পারে।

মানবাধিকারের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ধারণার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইসলাম সাম্য ও স্বাধীনতার নৈতিক, আদর্শিক ও আত্মিক মাত্রার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে। ইসলামে জাগতিক কার্যাবলী একটি বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম। আর তা হচ্ছে অনন্ত আত্মিক শান্তির অন্বেষণ। প্রকৃতপক্ষে জাগতিক লাভ-ক্ষতির বিশ্লেষণই মানুষের প্রচেষ্টাকে বিচারের একমাত্র মানদন্ড হতে পারে না। মানুষের কিছু কিছু কাজ বস্তুগত উদ্দেশ্য সাধনে অত্যবশ্যকীয় না হলেও সভ্য সমাজ ব্যবস্থা পরিচালনায় তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। অর্থাৎ ব্যক্তির ও সমাজের বহু কার্যাবলীকে মানুষের মনন এবং আত্মার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করতে হয়। শুধুমাত্র জাগতিক প্রাপ্তির অণ্বেষণ মানব সভ্যতার মানের চির সমৃদ্ধির পথে ছেদ টানতে পারে। আবার মানবাধিকারের অনেক বিষয়েই ইসলামেও ভিন্নমত বা মতপার্থক্য বিদ্যমান। মাজহাবী বা সম্প্রদায় ভিত্তিক পার্থক্যগুলোকে বাদ দিয়েও মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ, উদারনৈতিক আধ্যাত্মিকতা এবং অদৃষ্টবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামী ব্যবহার শাস্ত্রের সাথে সুফীদের পরিস্কার ভিন্নমত রয়েছে। ইসলামী শরীয়া অবশ্যই মানব জীবনের কিছু নেতিবাচক বা তুলনামূলক খারাপ সম্ভাবনাকে অপসারণের জন্যে মানুষের স্বাধীনতার উপর সীমা আরোপ করে। তবে শরীয়ার কিছু কিছু কঠোর ও অলংঘনীয় নিষেধাজ্ঞা ব্যতীত মানুষের কার্যাবলীতে যে সকল সীমাবদ্ধতা আরোপিত হয়েছে সেগুলো সর্বদাই অলংঘনীয় নয়।

মৌলিক দার্শনিক দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামী ধারণা অন্যান্য জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এ রণেই মানবাধিকার ও

www.pathagar.com

ব্যক্তি স্বাধীনতার ইসলামী ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে পুজিবাদী বা ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে অধ্যয়ন প্রায় অসম্ভব। আবার এটি লক্ষ্যনীয় যে, মানব সভ্যতার উন্নয়নের বর্তমান পর্যায়ে মানবাধিকারের ধারণা অন্তত পক্ষে এর মূল চেতনা ও বিন্যাসের দিক থেকে একটি সার্বজনীন রুপ পরিগ্রহ করছে। তদুপরি সমাজতন্ত্রও পুজিবাদের বিরুদ্ধে এর জন্মগত প্রচন্ড সংগ্রামকে পরিহার করেছে এবং পুজিবাদের সঙ্গে একটি সুদৃঢ় যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করছে। এমতাবস্থায় মানবাধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার ইসলামী ধারণা এবং আজকের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এর অবদানের বিশ্লেষণ তাত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্ব লাভ করেছে। এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলো হচ্ছেঃ ইসলামী মানবতাবোধ কি প্রধানত সাধারণ ধর্মীয় বা অধিবিদ্যামূলক চরিত্র এবং অর্থ প্রকাশের বিষয়বস্তু ? আধুনিক মানব স্বাধীনতা বিষয়ে ইসলামী আধ্যাত্মবাদের করণীয় কিছু আছে কি ? ইসলাম কি একটি সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণবাদী (Totalitarian voluntarism) ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায় ? মানবাধিকারের অনুধাবনে মানুষের প্রচেষ্টা ও ঐশ্বরিক ইচ্ছার অর্থ এবং এর শাখাগুলো কি কি ? মানব স্বাধীনতার স্বাস্থ্যকর ব্যবহারে ইসলাম কি কোন বলিষ্ঠ অবদান রাখতে সক্ষম? নিম্নের আলোচনায় সেই সব মূল প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন সম্পর্কেই আলোকপাত করা হয়েছে।

ইসলামে মানবতাবাদ ও স্বাধীনতার ধারণা ঃ

অন্যান্য পার্থিব ধর্মগুলোর মতই ইসলামও সৃষ্টিকর্তাকে অসীম ও চুড়ান্ত সার্বভৌমত্বের একক সত্তা বলে মনে করে। বস্তুত সসীম মানুষের কাছে অসীম ও চরম স্বাধীনতার সন্ধান করা ভয়ঙ্কর ভুল এবং কিছুটা আত্মঘাতীমূলকও বটে; কেননা মানুষ প্রকৃতিগত ভাবেই দৈহিক ও পারিপার্শ্বিকতার দ্বারা পরিবেষ্টিত। কিন্তু যেহেতু মানুষ এক অর্থে সৃষ্টিকর্তারই প্রতিবিম্ব এবং প্রতিনিধি স্বরুপ, তাই সে পৃথিবীতেই স্বর্গীয় কিছু গুণাবলীর অধিকারী হয়। স্বর্গীয় সুষমায় মানব জীবন প্রণালীকে অলঙ্কৃত করতে গিয়ে মানুষের কর্মের স্বাধীনতা স্পষ্টতই কিছুটা সীমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশে পরিচালিত একজন মুসলমানের জীবন প্রণালী তাকে এই মনোজাগতিক শৃঙ্খল ও সকল বাহ্যিক শর্তাবলী থেকে মুক্তি প্রদান করে এবং তাকে আরও ব্যাপকতর স্বাধীনতা ভোগে সহায়তা করে। এই ব্যাপকতর স্বাধীনতার ধারণা অবশ্যই সৃষ্টিকর্তার আদেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে এবং তাকে অবশ্যই মানব জীবন ও সমাজের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। শরীয়া অনুযায়ী তাই প্রত্যেকেরই সৃষ্টিকর্তা, প্রকৃতি ও অন্যান্যদের প্রতি নির্দিষ্ট কিছু দায়বদ্ধতা রয়েছে। ইসলাম মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সহজাত ব্যক্তি অধিকারের চাইতে ঐশ্বরিক আদেশের কাছে ব্যক্তিগত সমর্পনের ফলাফল বলে বিবেচনা করে। মানবাধিকারের প্রশ্নে ইসলাম প্রত্যেকের দায়িত্বানুভূতি ও তার শর্ত পূরণের রাস্তা থেকে শুরু করে। অর্থাৎ অধিকারের জন্য চিৎকার দেয়ার পূর্বে কর্তব্য পালনের ব্যাপারটি পরখ করে নিতে চায়।

সৃষ্টিকর্তার আদেশের কাছে সমর্পন এবং স্বাধীনতা উপভোগের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কটি রাষ্ট্রে ব্যক্তি-নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যকার সম্পর্কের সাথে অনেকটা সঙ্গতিপূর্ণ। তাই ইসলাম যৌক্তিকতার সাথেই সৃষ্টিকর্তা, পারিপার্শ্বিকতা, সমাজ ও নাগরিকদের প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতার

www.pathagar.com

কথা প্রচার করে এবং এ বিষয়ে ইসলাম কদাচিৎ অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। কিন্তু একজন মুসলমানের আইনগত ও নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে কিছু অঙ্গাআঙ্গি সম্পর্ক থাকায় আল্লাহ ও তার সৃষ্টির প্রতি তার কর্তব্যের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি প্রায়শঃই কঠিন হয়ে পড়ে। সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির প্রতি কর্তব্যের এই জটিল পৃথকীকরণ মানুষের স্বাধীনতার ধারণাকে বিপথগামী করতে পারে। ইসলাম ঐশ্বরিক ধর্ম হিসাবে নিজের পূর্ণাঙ্গতা দাবী করলেও মানুষ তার কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমেই শুধু নিজের পূর্ণতা দাবী করতে পারে। মূলত সময়ের চাহিদা এবং একটি নির্দিষ্ট মানব সভ্যতার ধারণ ক্ষমতানুসারেই একটি ঐশ্বরিক ব্যবস্থার জাগতিক উপাদানগুলোর সমৃদ্ধি ঘটা উচিৎ। সম্পূর্নরূপে অনুসরণ যোগ্য একটি সর্বোৎকৃষ্ট মানের মানবতা বোধের চর্চা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) করে গেছেন। তাঁর গৌরবময় উপস্থিতি প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রকে একটি আদর্শ ব্যবস্থায় পরিণত করেছে। চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ এবং পরোক্ষ শাসন কর্তারূপে আল্লাহ্র অস্তিত্বকে সর্বদা উপলব্ধি করার পরও আল্লাহ্র আদেশ ও নির্দেশ প্রয়োগে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) সর্বোচ্চ স্বাধীনতা ভোগ করেছেন। এবং আল্লাহ্র প্রতি অতুলনীয় আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁর এই স্বাধীনতার প্রতি তিনি সত্যিই সুবিচার করেছেন। ইসলামের প্রথম যুগের খলিফা ও ইমামদের প্রতিও ধর্মসম্মত নিজেদের মাত্রানুযায়ী আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে একই কথা প্রমাণ করতে হয়েছিল।

পরবর্তীকালে খেয়ালী ও অত্যাচারী মুসলিম রাজা ও শাসকদের আমলে মানবাধিকারের প্রতি তাদের অবৈধ দমন নীতির ফলে প্রচন্ড সমস্যার সৃষ্টি হয়। পশ্চিমা লেখকগণ অতি ক্ষিপ্রতার সাথে প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রে স্বাধীনতার এই অভাবকে খুঁজে বের করেন এবং একে 'প্রাচ্যের স্বৈরতন্ত্র' বলে (Oriental Dispotism) আখ্যা দেন। কিন্তু খুব কম পশ্চিমা গবেষণাতেই ইসলাম প্রদর্শিত সাম্য ও স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামরত মুসলমানদের আত্মত্যাগের কথা উল্লেখিত হয়েছে। মনীষী আবু হানিফা এবং আহ্মদ ইবনে হাম্বল, সুফী আল হাল্লাজ, সুহ্রাওয়ার্দী এবং আরও অসংখ্য মুসলমান আল্লাহ প্রদত্ত মানবতাবাদী পবিত্র স্বাধীনতাকে সংরক্ষণের জন্যে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। আসলে যে কেউ সহজেই মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের সাথে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের আবহমান দ্বন্দ্বের ধারাকে খুজে বের করতে পারবেন। ইসলামী আইনজ্ঞ, ঈশ্বরতাত্ত্বিকগণ এবং সুফীগণ মানুষের স্বাধীনতার বিভিন্ন দিক, মানবতা, ও মানবাধিকার বিষয়ে তাদের ভিন্নমত থাকা সত্ত্বেও সর্বদা বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্যে মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জিত না হলেও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে তারা সংগ্রামের দীর্ঘ ঐতিহ্য রেখে গেছেন। সেই গৌরবময় অতীত এখনও লক্ষ লক্ষ মুসলমানের জন্যে প্রেরণার উৎস হয়ে আছে।

ইসলামে মানবাধিকারের আধ্যাত্মিক মাত্রা ঃ

দূর অতীত কাল থেকেই মানব সভ্যতা 'প্রাকৃতিক অধিকার' শব্দটি বা মানুষের অধিকারের একটি অসম্পূর্ণ ধারণার সাথে পরিচিত ছিল। আধুনিক প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার এই প্রাচীন প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণার প্রায় সমরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। এর মূল যুক্তিটি হচ্ছে, প্রতিটি মানুষই

www.pathagar.com

দৈহিক ও আত্মিক সত্তার দিক থেকে সমান ও স্বাধীন এবং মানবীয় গুনাবলীর বিকাশের পথে যে কোন কৃত্রিম বাধা সৃষ্টিকেই এখানে মানবাধিকারের লঙ্ঘন বলে বিবেচনা করা হয়। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার প্রথম অনুচ্ছেদ স্পষ্টতই ঘোষণা করেছে যে, "প্রতিটি মানুষই সম্মান ও অধিকারের ক্ষেত্রে জন্মগতভাবেই সমান ও স্বাধীন।"। কিন্তু এই আধুনিক মানবাধিকার ধারণার ইতিহাস ইসলামের মৌলিক ভিত্তিগুলোর তুলনায় অনেক বেশী নবীন।

মানবাধিকারের আধুনিক ধারণার উৎপত্তি মাত্র ষোড়শ শতকে এবং বিংশ শতাব্দীতে এসে এই ধারণা একটি "সুশৃঙ্খল সার্বজনীন মানবাধিকার"-এর রূপ লাভ করেছে। মানবাধিকারের ইসলামী চেতনার চৌদ্দশত বছরের ঐতিহ্যময় প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে, যদিও দশম শতাব্দীর আগে এই চেতনা কোন শাস্ত্রীয় ধারাবাহিক নিয়মতান্ত্রিকতা লাভ করেনি। মূলত সকল সমধর্মী মুসলিম দার্শনিক গোষ্ঠি মানবাধিকার-এর মৌলিক নীতিগুলোর ব্যাপারে মতৈক্যে উপনীত হন।

উপরের বক্তব্য মানবাধিকারের ইসলামী নীতিগুলোর একটি পুংখানুপুংখ সমীক্ষা দাবী করে। সেগুলো কি আধুনিক মানবাধিকার ধারণার চাইতে ভিন্ন ধর্মী? আধুনিক সার্বজনীন সাম্যবাদের উপর ইসলাম কতটা গুরুত্বারোপ করে? সাম্য ও স্বাধীনতাকে মানবাধিকারের যুগল স্তম্ভ বলা যেতে পারে এবং দাসত্ব এ ধারণার সম্পূর্ন বিপরীত। দাসত্বের প্রশ্ন সম্পর্কিত ইস্যুগুলোতে ইসলামী মানবাধিকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন ভাল ব্যাখ্যা দিতে পারে।

ইসলামী মানবাধিকারের অনেক সমালোচক এই যুক্তি প্রদর্শণ করেন যে, যেহেতু ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাবে দাস প্রথাকে বিলুপ্ত করেনি, তাই ইসলামে প্রকৃত সাম্যের প্রশ্ন অবান্তর। মনে রাখতে হবে যে, কেবলমাত্র অতি সাম্প্রতিক মানব সভ্যতাই দাস প্রথার আইনগত পূর্ণাঙ্গ বিলোপ সাধনের ঘোষণার কৃতিত্ব দাবী করতে পারে। সুতরাং বাস্তব এবং মনস্তাত্ত্বিক পূর্বশর্ত পালন ছাড়াই একটি ভাবাদর্শকে চৌদ্দশত বছর আগে দাস প্রথার সম্পূর্ন বিলোপ সাধনের কথা বলাটা অপ্রাসঙ্গিক ও অযৌক্তিক হয়ে যায়। একটি ঐশ্বরিক ধর্ম হিসেবে ইসলাম এর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আরব উপদ্বীপে এক অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু দাস প্রথা বিলোপের ক্ষেত্রে কেন বৈপ্লবিক হতে পারেনি? যদি মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায় বলা সম্ভব হয় যে, সকল প্রকারের দাসত্ব ও দাস ব্যবসা সম্পূর্ন নিষিদ্ধ, তবে ইসলামের মৌলিক উৎসগুলো কেন অনুরূপ ঘোষণা দিতে ব্যর্থ হল?

ইসলাম স্পষ্টতই কুরআনের সামান্য একটি ঘোষণার মাধ্যমে দাস প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করতে পারতো। কিন্তু এমনকি এরিষ্টটলীয় যুক্তিও দাবী করে যে, কোন মতবাদ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা এমন কোন নাটকীয় পরিবর্তন আনতে পারে না, যা কিনা সংশ্লিষ্ট সমাজ বা সভ্যতা ধারণ করতে অক্ষম। এমতাবস্থায় দাস প্রথার বিলোপ এক বিপুল জনশক্তির আধারকে অবমুক্ত করতে পারতো, যাকে আয়ত্বে রাখা তৎকালীন সমাজের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর জন্যে অত্যন্ত কঠিন ও অসম্ভব হয়ে দেখা দিত। সমাজ শুধু অসংখ্য মুক্ত দাসের প্রত্যাশিত আতঙ্কেরই শিকার হতো না,

www.pathagar.com

বরং এই সব দাসেরাও অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান সহ জীবনের অপরাপর মৌলিক উপকরণ থেকে বঞ্চিত হতো। এরিষ্টটল সেজন্যেই মানব সভ্যতার দ্রুত বিকাশের লক্ষ্যে দাস প্রথার পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। আধুনিক আমেরিকান সভ্যতায় দাসদের অবদান এত ব্যাপক যে, আমেরিকানরা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে সমাজ গড়ার কাজে আফ্রিকা থেকে দাস আমদানী শুরু করেছিলেন এবং দাসপ্রথার কোন বিকল্পও তাঁরা খুঁজে পায়নি। কিন্তু ইসলাম দাস নির্মিত বা দাস বাহিত কোন সভ্যতায় বিশ্বাস করে না। ইসলাম তাই অধিক হারে দাস মুক্তি এবং তাদেরকে সম্মান ও মর্যাদার সাথে সমাজের মূলধারায় প্রতিষ্ঠার এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ইসলামের নবী তাঁর অনুসারীদের শুধুমাত্র দাসদের মুক্তি দিতেই উদ্বুদ্ধ করেন নি, মুক্তি প্রাপ্ত দাসদের ভাইয়ের মত গ্রহণ করতেও উৎসাহিত করেছিলেন।

প্রাক ইসলামী আরব সমাজে এক ধরণের জটিল দাস প্রথা প্রচলিত ছিল। আরব সমাজের প্রতি তাদের অবদান থাকা সত্ত্বেও অন্য সকল সমাজের মত সেখানেও দাসদের জন্যে কোনরূপ মানবীয় অধিকার লাভ সম্ভব ছিল না। ইসলামে প্রভু ও দাসের সমান স্বাধীনতার সুযোগ একটি আত্মিক চাহিদা। এই চাহিদা পূরণ করতে হলে আত্মায় এমন আবেদন সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে, যাতে করে প্রভু এবং দাস উভয়েই বুঝতে পারে যে, তাদের সম্পর্ক সম্পূর্ণই মানবিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন উপলব্ধিই দাস প্রথার ভিত্তিমূলে আঘাত হানবে। দাস প্রথা সম্পর্কিত সমস্যার ব্যাপারে ইসলামের মৌলিক যুক্তিগুলোকে বুঝতে হলে এ বিষয়ে ইসলামের আত্মিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ ও অধ্যয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে মানবাধিকার বাস্তবায়নের জন্যে এ সংক্রান্ত প্রতিটি ঘটনায় ইসলাম আধ্যাত্মিক বাস্তবতা এবং যুক্তির মাধ্যমে অগ্রসর হয়। প্রথমতঃ ইসলাম প্রতিটি মানুষকে ঐশ্বরিক সত্তা বলে মেনে নেয়। এই বিবেচনায় প্রভু ও দাস উভয়ই সমান আসনে প্রতিষ্ঠিত । এই কারণেই ইসলাম তার আবির্ভাবের সময় থেকেই কোন বিশেষ শ্রেণীকে ধর্মোপদেশ দিয়ে ঘৃনিত হবার পরিবর্তে প্রভু ও দাস উভয় শ্রেণীকেই আত্মিক নির্বাণ লাভের পথে আহবান জানাতে পেরেছিল। মহানবী-(সঃ)-এর অনেক দাস বংশীয় প্রভাবশালী সহযোগী থাকার ঘটনা এ কথাই প্রমাণ করে যে, ইসলামে নির্বাণ অর্জনের আত্মিক আবেদন কত সুদৃঢ়, কতটা শক্তিশালী। দাসেরা জাগতিক লাভের আশায় নয়, বরং আত্মার সম্ভাবনাকে খুঁজে বের করার জন্যেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আবার প্রভুরও বাধ্য হয়ে নয়, বরং আল্লাহ্, মহানবী (সাঃ) এবং মানুষের প্রতি তাদের ভালবাসার নিদর্শণ স্বরূপ দাসদের মুক্তি দিতেন। প্রাথমিক পর্যায়ে বৈষয়িক বা আইনগত বিবেচনা অপ্রাসঙ্গিক ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র আত্মিক বা মনোজাগতিক প্রচেষ্টা দাস প্রথার মত একটি বহুল প্রচলিত প্রথা বন্ধের জন্যে যথেষ্ট ছিল না। আত্মিক মুক্তি অবশ্যই দৈহিক স্বাধীনতা ও সামাজিক সাম্য দাবী করে।

ইসলামের আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই সমগ্র আরব উপদ্বীপে দাস প্রথা একটি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি রূপে পরিচালিত ছিল এবং দাস কর্তৃক প্রভুর মনোরঞ্জনের মত পদ্ধতিও সেখানে বিরাজমান

www.pathagar.com

ছিল। এই বাস্তবতাকে মোকাবেলা করার জন্যে ইসলাম অনেকগুলো কৌশল ও পদ্ধতি আবিষ্কার করে; যাতে প্রভুদের বন্ধন থেকে দাসদের মুক্ত করা সম্ভব হয়। অনেক অন্যায় কাজের প্রতিবিধান ছিল দাসদের নিঃশর্ত মুক্তিদান। উপরন্ত অন্যের দ্বারা দাসের বাজার মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে দাস মুক্তির সুযোগও সেখানে সৃষ্টি করা হয়েছিল ব্যাপকভাবে।

দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভই একজন দাসের কাছে সবচাইতে জরুরী প্রয়োজন, কিন্তু একজন মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে তার পুনর্বাসন। এ ক্ষেত্রে ইসলামের আত্মিক ও জাগতিক প্রচেষ্টা পরস্পর সমান্তরাল হয়ে চলে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে অবস্থানরত দাস জায়েদ বিন উসামা, এমনকি জানতেন না কখন তিনি মুক্তি লাভ করেছেন। জায়েদের পিতা যখন তাকে ফিরিয়ে নিতে এলেন, তখন পিতা ও পুত্র উভয়ই জানতে পারলেন যে, তার দাসত্বের শৃঙ্খল অনেক আগেই খুলে দেয়া হয়েছে। এরপরও জায়েদ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন এবং হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর এক ফুফাতো বোনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। পরবর্তীকালে জায়েদ মুসলিম সেনাবাহিনীর একজন সেনাপতি নিযুক্ত হন। এ ভাবে জায়েদের পুনর্বাসন একটি দৃষ্টান্তমূলক পরিসমাপ্তি লাভ করে। এমন আরও অসংখ্য উদাহরণ ইসলামে রয়েছে। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) বেলাল নামের একজন কৃষ্ণাঙ্গ দাসকে মুক্তি দেবার জন্যেই কিনেছিলেন। কিন্তু বেলাল (রাঃ) নিঃস্ব ছিলেন না। তিনি ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জীন হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এটি ছিল মদীনায় প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের সবচাইতে সম্মানজনক কাজগুলোর একটি । এভাবে দেখা যায় যে, দাস মুক্তির ক্ষেত্রে ইসলাম কোন আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং একটি বাস্তব ধারণা প্রদান করে। আইন এখানে নিছক নিমিত্ত মাত্র।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সামান্তবাদ কৃষি জমি আবাদের কাজে তাদের শ্রমকে কিনে নেবার জন্যেই বিপুল সংখ্যক দাসকে মুক্তি দিয়েছিল। পুজিবাদও একইভাবে কারখানা ও খামারের কাজে লাগাবার জন্যে সকল দাসকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই অধিকাংশ মুক্ত দাস বেকার রয়ে যায়। পুঁজিবাদ ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য পৃথিবীর জনসংখ্যার অধিকাংশকে দারিদ্রের দিকে ঠেলে দেয়। সমাজতন্ত্র এই দারিদ্র ও বেকারত্ব জনিত সমস্যার সমাধান দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সমাজতন্ত্রও দাসপ্রথা বিলোপে তার সুতীব্র আখাঙ্খা সত্ত্বেও এ সমস্যার ব্যাপকভিত্তিক সমাধানে সামন্ততন্ত্র এবং পুঁজিবাদের মতই ব্যর্থ হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে দাসপ্রথাকে নির্মূল করা হলেও সভ্যতার ছদ্মাবরণে বিভিন্ন প্রকার দাসত্ব এখনও রয়েই গেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় একজন দরিদ্র বা অসহায় ব্যক্তি একজন দাসের চাইতে বেশী কিছু নয়; সেখানে তার দৈহিক অস্তিত্বই হুমকীর সম্মুখীণ এবং বিপন্ন। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা মানুষকে রাষ্ট্র ও দল-যন্ত্রের দাসে পরিণত করে। এই ব্যবস্থাগুলোর আত্মিক ও নৈতিক মাত্রার অভাবই এই ব্যর্থতার কারণ। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিবেচনাই দ্বন্দ্বরত পক্ষসমূহকে জন্মগত শ্রেণী সংগ্রাম হতে রক্ষা করতে পারে না, অথচ ইসলাম নবতর শ্রেণী সংগ্রামের অভিশাপের বিনিময়ে দাসহীন সমাজ

www.pathagar.com

স্মরনাতীত কাল থেকেই 'কি হচ্ছে' আর কি হওয়া উচিৎ এ দু'য়ের দ্বন্দ্ব মানুষের বিবেককে নাড়া দিচ্ছে। এক প্রকার দাসত্ব যে সহজেই অন্য প্রকার দাসত্বের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে, সে বিষয়ে ইসলাম সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। শুরুতে এটি বুঝা নাও যেতে পারে যে, ছদ্মবেশী এই নতুন দাসত্বের উদ্ভব পূর্বের চাইতেও খারাপ হয়ে দেখা দিতে পারে। পুঁজিবাদ কর্তৃক সামন্তবাদ এবং সমাজতন্ত্র কর্তৃক পুঁজিবাদের প্রতিস্থাপন এ কথাই প্রমাণ করে যে, প্রতিটি সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাই তার বিকাশের চূড়ান্ত অবস্থায় মানুষের সাম্য ও স্বাধীনতার জন্য সবচাইতে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। কোন গতানুগতিক আর্থ–রাজনৈতিক ব্যবস্থাই মানবাধিকারের ব্যাপক লঙ্ঘন ছাড়া টিকে থাকতে পারে না; কেননা নিয়ন্ত্রনবাদী স্বেচ্ছাচার কখনই মানবাধিকারের সঙ্গে সুসঙ্গত নয়। মানুষ শুধুমাত্র বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন জীবই নয়, সে সংগ্রামীও বটে। তাই মানুষ কখনই একটি গতানুগতিক সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দীর্ঘকালের জন্যে মেনে নিতে পারে না।

একথা সত্য যে, ভাল/মন্দ, সদগুন/বদভ্যাস, স্বাধীনতা/দাসত্ব, নিয়ম/অনিয়ম, যুদ্ধ/শান্তি, দ্বন্দ্ব/ঐক্যমত, আইনানুগ/বেআইনী ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা আধুনিক ইউরোপীয় বা আমেরিকান ঐতিহ্যগত ধারনা থেকে স্বতন্ত্র। সুনির্দিষ্ট আইনগত, ধর্মীয় ও নৈতিক ব্যবহার সম্বলিত এই ভিন্নতা অত্যন্ত ব্যাপক। সামাজিক ও পারিবারিক জীবন, যৌনতা, নৈতিকতা, জীবনাচরণ, ব্যবহার কাঠামো ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। আর সে কারনেই রাষ্ট্রের অঙ্গসমূহের এবং সামাজিক ও আইনগত নিয়মগুলোও ভিন্ন হতে বাধ্য। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসলাম ও পার্থিব আদর্শ সমূহের মধ্যে এই পরিষ্কার ভিন্নতা বলতে গেলে প্রায় সংযোগের অযোগ্য। কোন কোন গবেষক কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত সমূহ এবং হাদীসকে ইসলামের সার্বিক বিবেচনার বাইরে রেখে শুধুমাত্র এদের গুরুত্বকেই ধ্বংস করেন না, বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি করেন। অনেক কৌশলগত অবস্থানকেও তারা ইসলামের আদর্শের ভিত্তিরূপে গন্য করে ফেলেন।

ইসলামী আদর্শের অবশ্যই একটি নিজস্ব পার্থিব আর্থ–সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। একটি সমাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম কখনই পশ্চিমা উদারনৈতিকতা বা ধর্মহীন সর্বাত্মকবাদী শাসনব্যবস্থার মত নয়। একটি ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামের নিজস্ব নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধ রয়েছে। সেজন্যই ইসলাম মতাদর্শ হিসেবে কোন রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ বা সম্পূর্ণ বর্জনে ইচ্ছুক নয়। এই কৌশলগত অবস্থান কখনই ইসলামী ভাবাদর্শের ভিত্তি হতে পারে না। আবার বাস্তব প্রয়োগ ব্যতীত ইসলামী শাসন প্রক্রিয়াও অর্থহীন হয়ে পড়ে।

মানবাধিকার বিষয়ে ইসলাম কর্তৃত্বের সাথেই আত্মিক লক্ষ্য ও মাধ্যমে বিশ্বাসী; অবশ্যই জাগতিক প্রেক্ষাপটকে উপেক্ষা না করে। ইসলাম মনে করে শুধুমাত্র জাগতিক পদ্ধতি ও মাধ্যমগুলোর কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। কিন্তু মানবাধিকারের ক্ষেত্রে ইসলামের আত্মিক ও জাগতিক প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সামগ্রীক ,ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের উপর। বস্তুত, আত্মিক ও আনুষ্ঠানিক বা জাগতিক বিষয়ে অগ্রাধিকারের এই প্রশ্ন ইসলামের ধর্মীয় পরিমন্ডলকে দু'টি ব্যপক ভিত্তিক সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছে; সুফী সম্প্রদায় এবং আইনজ্ঞ সম্প্রদায়। আইন শাস্ত্রবিদগণ মনে করেন যে, বাহ্যিক ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমকে গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমেই শরীয়াকে অনুধাবন সম্ভব। কিন্তু সুফীগন মনে করেন যে, এই ব্যাহ্যিক বিন্যাস অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়তে পারে। তাঁদের মতে আত্মিক ও নৈতিক সুপ্ত সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এ থেকে যে কেউ সহজেই সুফীদের সঙ্গে আইন শাস্ত্রজ্ঞদের সুস্পষ্ট দ্বন্দ্বক উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু প্রতিটি আদর্শভিত্তিক মতবাদেই বাস্তবতা ও কল্পনার মধ্যকার এই ব্যবধান বিদ্যমান। আত্মিক অনুধাবন এবং তার বাহ্যিক বাস্তবায়নের মধ্যে সবসময়ই একটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। সেজন্যই সুফীগন আত্মাকে আঁকড়ে ধরে বাহ্যিক ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হন। অথচ আইনশাস্ত্রবিদরা বাহ্যিক আচরন থেকে শুরু করে আত্মার অন্তঃস্থলে পৌছানোর আশা পোষণ করেন। তাঁদের মতে কোন সাধারণ মানুষের জন্য নিজের ভেতর থেকে শুরু করা অত্যন্ত কঠিন। প্রকৃতপক্ষে তারা বাহ্যিক ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতাকে গন্তব্য নয়, বরং গন্তব্যে পৌছানোর মাধ্যম বলে মনে করেন।

সুফীদের সাথে আইন শাস্ত্রবিদদের এই ধারণাগত ব্যবধান খুব কঠিন প্রতিবন্ধকতা নয়, যদি তারা একেশ্বরবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজকর্মী হিসেবেও তাদের দৃঢ় প্রত্যয়কে বাস্তবায়নে একই সাথে কাজ করে যান। মানবাধিকারের বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের এই মতভেদ তুচ্ছ হয়ে যাবে, যদি মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ও তাদের সরকারগণ তা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেন। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যকার সম্পর্কের ভিতর দিয়েই বিবেচনা, পছন্দের স্বাধীনতা ও দায়িত্বের মত মানবাধিকার ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ও বর্তমান চিন্তাধারাকে প্রতিফলিত করা সম্ভব।

মুসলিম রাজনৈতিক কতৃপক্ষ এবং অমুসলিম সম্প্রদায় ঃ আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ইসলামী আদর্শের উপর ভিত্তি করে মানবাধিকার রক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর এখনও দিতে পারেনি। সামগ্রিকভাবে অমুসলমানদের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দুরকম সহঅবস্থানেরই গৌরবময় ইতিহাস মুসলমানদের আছে। এ প্রসঙ্গে ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নেতৃত্বাধীন নগর-রাষ্ট্র, মদীনার শাসন ব্যবস্থার সূক্ষ্ম নিরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত, মদীনা সনদ সেখানে বসবাসরত অমুসলমানদের অধিকার সম্পূর্ণরুপে নিশ্চিত করেছিল। এটি মুসলমান ও অমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জন্যেই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই অভিজ্ঞতাকে তারা সমগ্র ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যে ইসলামের আদর্শরূপে গ্রহণ করতে পারে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ ঘোষণা করেন যে, "আমি তাকে (মুহাম্মদ সাঃ) তোমাদের রহমতের জন্যই পাঠিয়েছি।" একটি মুসলিম রাষ্ট্রের শাসক হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে এই আয়াতের সত্যতা প্রমাণ করতে হয়েছিল। ইসলামের নবী এবং মদীনার শাসক হিসেবে তাঁকে তাঁর ইসলাম প্রচার পদ্ধতি এবং ধর্ম-গোত্র নির্বিশেষে মুসলমান ও অমুসলমানদের জন্য তার শাসন ব্যবস্থার মধ্যে ভারসাম্য আনতে হয়েছিল। কুরআন

www.pathagar.com

নিজেই ঘোষণা করেছে যে, ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি করা চলবে না। একটি পরাক্রমশালী কতৃপক্ষের মালিক হয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থেকেও অমুসলমানদের জন্যে একটি নিরাপদ ও আরামপ্রদ আবাস তৈরি করা খুব সহজ কাজ ছিল না। এই ক্ষেত্রে মদীনা সনদ মদীনাবাসীদের জন্য মৌলিক আইন এবং নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে। মদীনা সনদের এই চেতনা যুদ্ধকালীন এবং শান্তি উভয় সময়েই রক্ষিত হয়েছিল।

মদীনার গোত্রগুলোর মধ্যে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও সম্প্রীতি এবং বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা সংক্রান্ত একটি চুক্তি হয়েছিল। ইহুদী গোত্রগুলোও এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। কিন্তু শীঘ্রই তারা মুসলমানদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ন হয়ে ওঠে। মুসলিম রাজনৈতিক শক্তির দ্রুত উত্থানকে তারা সহ্য করতে পারলো না এবং বাইরের অমুসলমানদের সাথে নিয়ে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, যার ফলে মদীনা সনদ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। মহানবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে ইহুদী গোত্রসমুহের কিছু অংশের এই অব্যাহত ষড়যন্ত্র স্বাভাবিকভাবেই ইহুদী রাজনৈতিক ও সমরশক্তির ধ্বংসের কারণ হয়। তা সত্ত্বেও অনেক ইহুদীই সেখানে শান্তিতে নাগরিক হিসেবে বসবাসের অনুমতি লাভ করে। তাদেরকে সমান মেনে নেয়া হয়েছিল এবং কখনই ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়নি। তাদেরকে সম্মান করা হতো এবং তাদেরকে যথেষ্ট সামাজিক, নৈতিকতা ও মানবীয় দায়িত্ব বোধ সম্পন্ন এবং সুনিয়ন্ত্রিত মানবীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অধিকারী বলে মনে করা হতো। খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের উপর মুসলমানদের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটতো না। কারণ তাদের আহ্‌লে কিতাব (পবিত্র গ্রন্থসমূহের অনুসারী) বলে মনে করা হতো। অগ্নিউপাসক (ম্যাগিয়ানস) এবং আল-সুবিয়ানরাও তাদের মতই সমান ব্যবহার পেত।

অনেক সমালোচকই 'আল-জিম্মাহ' আল-জিজিয়াহ্‌, মুশরিকুন, শিরক, জিহাদ, দলত্যাগী, বা মুরতাদ, দার উল ইসলাম' কিংবা দার উল হারাব' -এর মত ইসলামী পরিভাষাগুলো ব্যাখ্যা করে বুঝাতে চান যে, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে মানবাধিকারের পরিধি এতই সীমিত যে, সেখানে এর লঙ্ঘন একটি সাধারণ ঘটনা হতে বাধ্য। কিন্তু তারা ভুলে যান ইসলাম শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ধর্মই নয়, মানব স্বভাবের ভাল-মন্দ বিচারের ধর্মও বটে। ইসলাম আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আনুগত্যের আহবান জানায়। জোর পূর্বক আনুগত্য এখানে অনুমোদিতও নয়, কাম্যও নয়। এই স্বেচ্ছা সমর্পন শুধুমাত্র উন্নত সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবিক সাম্য এবং একটি সাম্যবাদী ব্যবস্থার প্রতিফলনের মাধ্যমেই সম্ভব; সেখানে দম্ভ বা আত্মকেন্দ্রিকতার কোন স্থান থাকতে পারে না । নিজের লালিত সভ্যতা ও মূল্যবোধকে ধরে রাখতে গভীর ও তীক্ষ্ণ দায়িত্ববোধের পরিচয় দেয়া মুসলমানদের কর্তব্য।

কর্তব্যনিষ্ঠা, সৃষ্টিকর্তার নির্দেশের প্রতি অঙ্গিকার এবং সর্বোপরি কর্তৃত্বাধীন জনগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ সাধারণ মানই মুসলমানদের কর্তব্য ও অধিকার অনুশীলনের পূর্বশর্ত। অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান ছাড়া মুসলমানরা তাদের চিন্তা ও কাজে নিজস্ব বলিষ্ঠ ও দীর্ঘস্থায়ী এবং

www.pathagar.com

প্রগতিশীলতার প্রতিফলন আশা করতে পারে না। রাজনীতি ছাড়াও ইসলাম থেকে আরও অনেক কিছুই শেখার আছে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অনুপস্থিতিতে ইসলামের আত্মিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলো অমুসলমানদের কাছে তীব্র আবেদন সৃষ্টি করতে পারে। সকল মুসলমানদের বিশেষত বুদ্ধিজীবিদের এদিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বিভিন্ন অংশে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বিষয়ে ইসলামের মনোভাব 'ভালবাসা' (তাওয়াদ্দুহুম),'সাহায্য' (তাহ্‌সিনীম), 'ভদ্রতা' (আল্লাতি হাইয়া আহসান), 'সংরক্ষন' (আতিমাই), প্রভৃতি পরিভাষার মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। সেজন্যেই সহজে যে কেউ উপলব্ধি করতে পারবেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কখনই মদিনার ইহুদী গোত্রগুলোকে বা নজরাহ্‌র খ্রীষ্টানদের বল প্রয়োগে ইসলামে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেননি। তিনি নজরাহর খ্রীষ্টানদের তাদের নিজস্ব নীতি অনুযায়ী সরকার গঠনে কার্যকর ভূখন্ডগত স্বায়ত্ত্বশাসনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

যদিও সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, ইসলামী আইন একটি ব্যক্তিগত আইন, রাষ্টীয় নয়, তথাপি এ কথা সহজেই অনুধাবনীয় যে বাস্তবে ইসলাম এমনকি তার অধিনস্ত অমুসলমানদের আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন পর্যন্ত প্রদান করেছে। এমনকি তারা মুসলিম রাজ্যে অমুসলমানদের শুকুর পালন এবং তার মাংস ভক্ষণেও বাধা দেয়নি। কিন্তু তারা সুদ ব্যবসাকে (Riba-business) মেনে নেয়নি, যা ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক নিশ্চিতকৃত আর্থ–সামাজিক ন্যায় বিচার ব্যবস্থাকে সহজেই ধ্বংস করে দিতে পারতো। এক কথায় বলতে গেলে রাষ্ট্রীয় বা ব্যক্তিগত আইন উভয় অর্থেই মুসলিম রাষ্টের অমুসলমান নাগরিকদেরকে তাদের ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত কার্যক্রম চলিয়ে যাবার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগে সমঅধিকার প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু সমস্যা উদ্ভব হল তাদের নিয়ে, যাদের কোন ধর্ম বা নীতি ছিল না। যেমন, বেদুইনদের কোন ধর্ম ছিল না, ছিল না সামাজিক নীতি কিংবা নৈতিক মূল্যবোধ। কোন ন্যায্য শর্তে তাদের সঙ্গে লেনদেন অসম্ভব ছিল। প্রকৃত অর্থেই বেদুইন নেতৃত্বধীন ঐ সব হিংস্র বর্বরেরা ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গীন যুদ্ধ ঘোষণা করল। যেহেতু ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্ম ছিল না, ছিল একটি সভ্যতা, যা সর্বক্ষেত্রেই সঠিক প্রতিক্রিয়া দেখাতে বাধ্য। তাই এ সব বর্বরদের সভ্যতার আলোয় নিয়ে আসাও অবশ্যই ইসলামের একটি পবিত্র দায়িত্ব ছিল, যাতে একটি নিয়মতান্ত্রিক মানবীয় আন্তঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতিটি সভ্যতারই চরম বিবেচনায় জ্ঞানহীন নাগরিকদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের একটি নিজস্ব পদ্ধতি ও মাধ্যম আছে। মদাসক্ত ও অন্যান্য বিকৃতমনস্ক লোকদের তাদের মঙ্গলের জন্যই জোরপূর্বক চিকিৎসার জন্যে নেয়া যেতে পারে। এটি মানবাধিকারের লঙ্ঘন নয়, বরং সুস্থ সামাজিক পরিবেশে মানবাধিকার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করণে একটি অতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। সভ্যতার সুস্থ বিকাশে শক্তি প্রয়োগ ইসলামে অনুমোদিত, বিশেষতঃ যেখানে অন্য কোনই বিকল্প নেই।কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, শক্তির ব্যবহার হচ্ছে ইসলামের সর্বশেষ পন্থা। আরব উপদ্বীপ পরিপূর্ণভাবে দখলের পর ইসলাম সেখানে প্রকৃত মৌলিক মানবাধিকারের প্রচলনের মাধ্যমে

www.pathagar.com

মানবিক পরিবর্তন আনে এবং ইসলামী আদর্শ ও প্রেরণা নিয়ে সভ্যতার দিকে তার ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করে। কিন্তু ইসলামী সভ্যতার বিস্তারের স্বর্ণযুগ শেষ হবার পর মুসলমান রাজনৈতিক শক্তিগুলো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মীয় কার্যাবলী এবং তুলনামূলক কম সভ্য জনগোষ্ঠী বা গোত্রগুলোকে ইসলামী সভ্যতার আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যে শক্তি প্রয়োগের মধ্যে কখনও কখনও ভারসাম্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়।

মুসলমান আইনজ্ঞ, চিন্তাবিদ এবং ধর্ম প্রচারকগণ মুসলমান শাসকদের অমুসলমানদের প্রতি এই ভারসাম্যহীন আচরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে খাঁটি ইসলামী মূল্যবোধ ধারণকারী সুফীবাদ এবং অন্যাণ্য অরাজনৈতিক ইসলামী ধারা বহু অমুসলিমকে ইসলামের পথে নিয়ে আসে। অনেক অমুসলমানই হয় ইসলাম গ্রহণ করেন তাদের গোঁড়া ইসলাম বিরোধী মনোভাব ও অবস্থান পরিহার করেন। মুসলমানদের সঙ্গে অমুসলমানদের অবিরাম শত্রুতা সহজেই ইসলাম প্রচারে শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ার জন্যে হুমকী হয়ে দেখা দিতে পারতো। কিন্তু সুফীদের ইসলাম প্রচারে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি বিপথগামী জনগণকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। সে কারণেই বর্তমান বিশ্বের অনেক স্থানে বিশেষতঃ আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা প্রচারে সুফীদের সাফল্য প্রত্যক্ষ এবং মুসলিম বনিকগণ সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে সফলতার সাথে অন্যান্য ধর্মবিশ্বাস এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তাদের অতুলনীয় সহনশীলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ এবং মানবাধিকার ঃ

পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে খুব কমই মুসলিম রাষ্ট্র পাওয়া যাবে, যেখানে মানবাধিকারের আজকের মান সংরক্ষিত হচ্ছে। এ জন্য কাকে দায়ী করা যায়? সাধারণ মুসলমানদের, মুসলমান শাসকদের অথবা পশ্চিমা উপনিবেশ ব্যবস্থা এবং ঔপনিবেশিকদের? ইসলামী সভ্যতার উন্মেষকারী মুসলামানেরা প্রাথমিকভাবে বহিঃবিশ্বে নয়, বরং স্বভূমিতেই তাদের ভিত্তি হারিয়ে ফেলেছিল। মুসলিম শাসকরা মুসলমানদের উপরই অমানবিক হয়ে পড়েন এবং প্রারম্ভিক ইসলামী সমাজে বিরাজমান গতিময়তাকে ধ্বংস করেন। যার ফলে ইসলামী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ন ভেঙে পড়ে এবং মুসলিম রাষ্ট্রগুলো অমুসলিমদের তুলনায় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির উন্নয়নে অনেকদূর পিছিয়ে পড়ে। ফলে পশ্চিমাদের শক্তিশালী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা মুসলমানদের উপর তাদের আধিপত্য কায়েমের পথ সুগম করে। উপনিবেশ বিস্তারের এই প্রক্রিয়া এত শক্তিশালী, সুদৃঢ় এবং ব্যাপক ছিল যে, উনিশ শতকে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ পশ্চিমাদের মারাত্মক সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক আধিপত্যের মধ্যে চলে আসে।

পশ্চিমা রাজনৈতিক, সামরিক এবং সাংস্কৃতিক আক্রমনের প্রতি মুসলমানদের প্রতিক্রিয়ায় একটি প্রভেদ দৃশ্যমান ছিল। বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠী তাদের অতীত গৌরবের সান্তনা নিয়ে

www.pathagar.com

পশ্চিমাদের সঙ্গে সম্পর্ক এড়িয়ে চলতে থাকে এবং মরিয়া হয়ে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার অনুসরণ করতে শুরু করে। অন্যদিকে মুসলিম শাসকরা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষার জন্যে পশ্চিমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। যতই তারা পশ্চিমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়, ততই তারা বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রাজা–বাদশা শেখ বা আমীরগণ পশ্চিমা শাসক শ্রেণীর সহযোগিতায় নিজেদের ক্ষমতা ধরে রেখে ধর্মীয় প্রতীক ও বাগ্মীতা নিয়ে বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীকে প্রতারণা করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়।

মুসলমানেরা এ কথা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে, ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো শুধুমাত্র মুসলিম দেশগুলোকে নিজেদের মধ্যে বিভক্ত করাতেই উৎসাহী ছিল। ১৯১৬ সালের সাইকেস পাইকট (sykes-picot) চুক্তি এ প্রক্রিয়ারই একটি জলন্ত উদাহরণ। এভাবে উনিশ শতকের শুরু থেকেই মুসলমানরা তাদের নিজস্ব সভ্যতা ও মানবাধিকারের ধারণাকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে মুসলমানদের ইউরোপীয় চিন্তাধারা ও পদ্ধতি গ্রহণ না করে উপায় ছিল না; বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে ভিনদেশী ব্যবস্থা না ছিল মানান সই, না গ্রহণযোগ্য। এই ইউরোপীয় পদ্ধতি বা সংস্কৃতির গ্রাস থেকে মুক্তির লক্ষ্যে মুসলিম উলামাগণ জনগোষ্ঠীর কিছু অংশকে সঙ্গে নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে একটি বৃহত্তর ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা চালান। কিন্তু ঐক্য সন্ধানী প্রতিটি দলই কৌশলগত অবস্থানগুলোকে ইসলামের মৌলিক ইস্যুতে পরিণত করে। রাজনৈতিকভাবে বিপ্লবীরা তাদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বস্ততা পরিত্যাগ করে সহজেই কোন নির্দিষ্ট আদর্শের ভিত্তিতে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারতো। একটি নির্দিষ্ট আদর্শের ভিত্তিতে অনেকগুলো রাজনৈতিক দল ও মতবাদ থাকতে পারে এবং ইসলামও এই সাধারণ ঘটনার ব্যতিক্রম ছিল না। বস্তুত প্রতিটি রাজনৈতিক সংঘের উত্থান বিরাজমান রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং পরিবেশের সাথে একটি মতবাদের অন্তদ্বন্দ্বেরই পরিণতি ছিল। কিন্তু আধুনিক মুসলিম বিশ্বে মুসলিম রাজনৈতিক বিপ্লবীরা একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুসরণে একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অন্যসব দল ও মতাদর্শকে অনুপযুক্ত এবং সর্বতোভাবে অগ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণ করতে চায় এবং তাদের স্বপক্ষে ও অন্যের বিপক্ষে সুনিদিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তারা প্রয়শঃই আঞ্চলিক ইস্যুগুলোকে কেন্দ্রীয় ইস্যু হিসেবে ব্যবহার করে। এর ফলে আদর্শ হিসেবে ইসলাম একটি বিধ্বস্ত পদ্ধতিতে উপস্থাপিত হয়েছে এবং রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে তার নিজস্ব উত্তাপ সহ একটি ব্যাপক আদর্শ হিসেবে তার ভিত্তি হারিয়ে ফেলেছে। মুসলমানরা সমগ্র মুসলিম বিশ্বে নিজেদের মধ্যে ভয়াবহ সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে এবং আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেই একটি কার্যকর গতিশীল ও সহযোগীতামূলক সংঘ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে।

১৯৫০ সালের পর থেকে নব্য স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রগুলো প্রধানতঃ গতানুগতিক পুঁজিবাদী অথবা সমাজতান্ত্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি গ্রহণ করেছে। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতির নির্মম চরিত্র প্র্যাচীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চাইতে অনেক ভয়াবহ। মুসলিম বুর্জোয়া জাতীয়তাবদী শ্রেণী বহিঃশক্তির

www.pathagar.com

সহায়তায় দীর্ঘদিন ধরেই মুসলিম দেশগুলোর জনগণকে নির্দয়ভাবে শোষণ করেছে। যার ফলে কিছু মুসলিম সরকার এবং ইসলামী চিন্তাবিদদের একটি অংশ সমাজতন্ত্রকে তাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু মুসলিম দেশগুলোতে সমাজতন্ত্র একদলীয় শাসন ব্যবস্থার আদলে থেকে বিরাজমান অত্যাচার ও মানবাধিকার হরণকেই পুনঃপ্রয়োগ করে। তারা শুধু সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাতেই ব্যর্থ হয়নি, জাতীয় অর্থনীতিকেও তারা পঙ্গু করে ফেলে। স্বাধীনতা উত্তর অনেক মুসলিম এদেশেই এই সর্বনাশ ঘটিয়েছে অতি উৎসাহী সমাজতন্ত্রী দল কিছু চক্র।

সকল প্রকারের পশ্চিমা অনুকরণ ও আধুনিকায়ন ইসলামী নীতিমালার ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। মুসলিম দেশগুলোতে প্রবর্তিত এইসব নতুন ব্যবস্থা কেবলমাত্র জনগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্র অংশের জন্যে সুফল বয়ে আনতে সক্ষম হয় এবং বৃহত্তর অংশকে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ফলে পূর্বের চাইতে অধিকতর বিচ্ছিন্ন আদর্শ ও শক্তির ধাক্কায় মুসলিম রাষ্ট্রগুলো বিশৃঙ্খলা ও স্থিতিহীনতার ফাঁদে পড়ে যায়। বিভিন্ন মুসলিম উপদলগুলো বিশৃঙ্খলা ও স্তিতিহীনতার ফাঁদে পড়ে যায়। এই সব দল এবং উপদলগুলো একে অপরের সঙ্গে ভীষণ দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক উভয় ব্যবস্থাই এটি প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে যে, ইসলামী ব্যবস্থার চাইতে উন্নততর একটি ব্যবস্থা তাদের রয়েছে। ইসলাম শুধুমাত্র ধর্ম, এই যুক্তি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বুঝাতে এবং তদনুযায়ী অনুশীলন করাতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। ইসলাম ক্রমশঃই সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। ইসলামের পুনরুজ্জীবনের এই প্রেক্ষাপটে মুসলিম সরকার ও রাজনৈতিক দলসমূহ ক্রমশই (যদিও অনেকটা সংশয়ের সাথে) রাষ্ট্রযন্ত্রের পুনর্গঠণে মুসলমানদের আশা ও আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করছেন। মুসলমানরাও বাইরে থেকে ধার করার চাইতে সমাজে নিজস্ব মানবাধিকার চেতনা বাস্তবায়নে উৎসাহী হয়ে পড়েছে।

ইসলামী সাংবিধানিকতাবাদ এবং মানবাধিকার ঃ

ইসলামের কি আলাদা নিজস্ব সাংবিধানিকতাবাদ রয়েছে? ইসলামী সাংবিধানিকতাবাদ কি কার্যকরভাবে মানবাধিকারের রক্ষক হতে পারে?

একই সাথে মানবাধিকার ও ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠায় প্রধান অন্তরায়গুলো কি কি? সাধারণভাবে বলা যায়, মুসলিম দেশগুলো নিজস্ব দৃঢ়মূল সাংবিধানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। যদি আমরা মুসলিম দেশগুলোকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, সামাজিক সুসংগতি এবং উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার ভিত্তিতে বিভক্ত করে। তাহালে একটি সাত্যিকার অথচ স্ববিরোধী পরিস্থিতি আবিষ্কৃত হয়। তুলনামূলকভাবে রাজনৈতিক স্থিতিশীল এবং অর্থনীতির দিক থেকে স্বনির্ভর মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর দৃঢ় রাজনৈতিক বৈধতা সামান্যই। অন্যদিকে সামান্য মাত্রায় রাজনৈতিক বৈধতার অধিকারী রাষ্ট্রে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার প্রচন্ড অভাব দৃশ্যমান।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও বৈধতা নির্বিশেষে অধিকাংশ মুসলিম দেশই ইসলামী নিয়ম–নীতি, আচার–অনুষ্ঠান এবং ঐতিহ্যের নামে তাদের গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্যক্রমের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে উদগ্রীব।

কোন সংবিধান গ্রহণ করেনি এমন মুসলিম সরকারগুলো ইসলামী মতবাদ ও যুক্তির মাধ্যমে তাদের কার্যক্রমকে যৌক্তিক প্রমাণের চেষ্টা করছে। "আমি জ্ঞানীদের জন্যে সবিস্তারে আয়াত বর্ণনা করি" (সূরা ৯ঃ আয়াত ১২) "এভাবেই আমি (আল্লাহ্) বিবেক সম্পন্ন মানুষের কাছে বাণী প্রদর্শন করি (সূরা ৩০ঃ আয়াত ২৮)" " এভাবেই আমি নিদর্শণ গুলো সবিস্তারে গবেষকদের জন্যে বিবৃত করি (সুরা ১০ঃ আয়াত ২৪)" কুরআনের এ সকল আয়াত প্রায়শঃই এই যুক্তির স্বপক্ষে ব্যবহৃত হয় যে, মুসলিম সরকারগুলোর কোন মনুষ্য প্রণীত সংবিধানের প্রয়োজন নেই।

এই যুক্তিও দেখানো হয় যে, কুরআনে শুধুমাত্র সাধারণ সাংবিধানিক নীতিগুলোই পাওয়া যায় না, আইনের অন্যান্য শাখাগুলোও কুরআনের নীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে। কুরআন সহজেই একটি আধুনিক সংবিধানের ভূমিকা পালন করতে পারে, এই যুক্তি আমাদেরকে মুসলিম শাসকদের হাতে সবসময় ক্ষমতার পূর্নবহালের দিকেই নিয়ে যায়। সৌদি আরব ও কাতারের মত দেশের কোন সংবিধান নেই, রয়েছে ইসলামের নামে একতরফা শাসন নীতি। অন্ধের মত তারা কুরআনের ভূমিকার উচ্চপ্রশংসা করতে চায়, কিন্তু আধুনিক জাতি রাষ্ট্রের সংবিধানের সঙ্গে কুরআনকে সামিলের মাধ্যমে বাস্তবে তারা কুরআনের আল্লাহ্র বিধানকে চরমভাবে অসম্মান করছে।

পবিত্র কুরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এটি সকল মানুষের মাঝে একই বানী প্রচার করে, সাম্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এবং বিকৃতি ও শঠতার বিরুদ্ধে সবাইকে সতর্ক করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে, এতে কোন সন্দেহ নেই যে কুরআনের বার্তা মূলত সম্পূর্ণ মানবতাকে বুঝানোর জন্যই নাজিল হয়েছে এবং কুরআনে অবশ্যই মুসলানদের কাছে মানবতার প্রতি পরিপূর্ণ দায়িত্ব পালন আশা করে। মানবতার প্রতি এই উচ্চতর দায়িত্ব পালনের জন্য মুসলমানদের একটি একক রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিৎ ছিল। কুরআন এবং মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে একটি সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপদেশ দেয়া হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কুরআনকে বিশ্বব্যাপী মুসলিম কনফেডারেশনের সংবিধান হিসাবে মনে করা যেতে পারে। যাকে খেলাফতের শাসনতন্ত্র হিসেবেও অভিহিত করা যায়। এমন কি আধুনিক সংবিধানের গুণাগুণ বিচারে কুরআন সহজেই সমগ্র মানবজাতির জন্যে বিশেষত মুসলামানদের জন্যে উথান এবং উচ্চাকাংখার সবচাইতে শক্তিশালী উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। কিন্তু একে কখনই সাধারণ আধুনিক ধারণার রাষ্ট্রীয় সংবিধান হিসেবে অভিহিত করা ঠিক নয়।

আধুনিক রাষ্ট্রের সংবিধান সম্পূর্ণভাবেই রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম ও স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। রাষ্ট্রীয় সংবিধান হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যকার ক্ষমতার দ্বন্দ্বের ফলাফল এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের শাসক ও

www.pathagar.com

শাসিতের মধ্যে একটি বৈধ সম্পর্কের প্রতিবিম্ব। সমাজের দুর্বল অংশের সুরক্ষায় কার্যকারিতাই একটি সংবিধানের মূল পরীক্ষা। একটি সাংবিধানিক সমাজের মূল পরিচয় নানাবিধ দৃষ্টিভঙ্গির অবাধ ও মুক্ত বহিঃপ্রকাশ এবং ভিন্নমতের প্রতি সহিষ্ণুতায়। এদিক থেকে দেখলে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সংবিধানিক ভূমিকা এখনও হতাশাজনক।

বস্তুত, আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলো, যারা কিনা নিজস্ব একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থার জন্যে গর্ব করতে পারতো, তারাই তাদের দর্শন ও আদর্শের ভিত্তিতে একটি সংবিধান রচনায় ব্যর্থ হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা পশ্চিমা ধাঁচের বাক সর্বস্বতাকেও ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছে। পাকিস্তানের ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের সংবিধানে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের উপর সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র স্বার্বভৌমত্বের এবং আর্থ-সামাজিক ন্যায় বিচারে ইসলামী নীতির প্রতি গুরুত্বারোপের ঘোষণা ছিল। কিন্তু বাস্তবে সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকারের ব্যাপারে ইসলামের সমস্ত শিক্ষাকে সেখানে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হল এবং শাসক ও কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণীর স্বার্থ সুরক্ষায় ইসলামী নীতির অপব্যবহার করা হল।

সাধারণভাবে মুসলমানরা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে যে, পশ্চিমা সাংবিধানিক ক্রমবিকাশ গত কয়েক শতাব্দীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে সংঘটিত ঐতিহাসিক বিবর্তনেরই ফসল।

মুসলিম দেশগুলোর অধিকাংশেরই সংবিধান স্বার্থান্বেষী বিদেশী এবং দেশী চক্রের চাপের মুখে গৃহিত হয়েছিল। একটি মুসলিম রাষ্ট্রে তাই সংবিধানের সঙ্গে তার দেশের মানুষ ও সমাজের তৃণমূল পর্যায়ের যোগাযোগ অতি সামান্যই। সত্যিকারের সংবিধানকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট জনগণের মধ্যে প্রচলিত প্রথা, মূল্যবোধ, আবেগ-অনুভূতি এবং আশা-আকাঙ্খা থেকে উদ্ভুত এবং বিকাশ লাভ করতে হবে। এবং এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হতে হবে। মুসলিম সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলো এই মৌলিক উপাদানকেই অস্বীকার করে চলেছে। যার ফলে মুসলিম দেশসমূহ সামগ্রিক ভাবে কার্যকর সাংবিধানিক শাসনহীন ব্যবস্থার মাঝে পড়ে রয়েছে এবং ক্ষমতার জন্যে বিভিন্ন গ্রুপের নিজেদের মধ্যে মারাত্মক সংঘর্ষের ফলে আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতার সম্মুখীন হচ্ছে।

ধর্মীয় বা ধর্ম নিরপেক্ষ যাই হোক না কেন, মানবাধিকারের সংরক্ষণই হচ্ছে, কোন সংবিধানের উৎকর্ষের নির্দেশক। কিন্তু মানবাধিকারের সংরক্ষণ তখনই সম্ভব, যখন মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে শাসক ও শাসিতের সচেতনতা সমকেন্দ্রীয় হয়। মুসলমানদের জন্যে সবচাইতে দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, শাসিত মুসলমানদের সচেতনতার অভাব, অন্যদিকে শাসকরাও মৌলিক মানবাধিকার প্রশ্নে সম্পূর্ণ উদাসীন। এর পরিণতি যে কত ভয়াবহ ও করুণ তা শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে মুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই স্পষ্ট। সকল মুসলমান মনীষীই স্বীকার করেন যে, ইসলাম সকল মুসলমানের জন্য শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে এবং এক্ষেত্রে অমুসলমানদের সমান অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলেছে।

www.pathagar.com

অন্যদিকে দেখা যায় মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা অনুযায়ী "সকলেরই শিক্ষার অধিকার রয়েছে এবং তার সন্তান কি ধরণের শিক্ষালাভ করবে তা নির্বাচনের পূর্ণ অধিকার পিতামাতার রয়েছে।" (মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা অনুচ্ছেদ ২৬ (১)) শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে কয়েক জন মুসলিম মনীষী একে একটি সাধারণ সুপারিশ, বাধ্যতামূলকভাবে বলবৎকৃত নয় বলে অভিহিত করেন। অথচ ইসলাম সকল মুসলিম রাষ্ট্র এবং প্রত্যেকের জন্য শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে। কিন্তু আজও অধিকাংশ মুসলমানই নিরক্ষর রয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে তেলসমৃদ্ধ আরব দেশগুলোর অবস্থা অনারব দরিদ্র মুসলিম দেশগুলোর চাইতেও শোচনীয়।

এতদসত্ত্বেও রাজতান্ত্রিক সৌদি আরব "গর্ব বোধ করে, কেননা সেখানে সকল স্তরের শিক্ষা অবৈতনিক ------পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যেই -------- এবং পর্যাপ্ত অনুদানের মাধ্যমে প্রায়শই একে উৎসাহিত করা হয়-----------এটি আপনাকে আমাদের রাষ্ট্রের মানবাধিকারের প্রতি প্রাথমিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে এবং আপনি সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন যে মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ অনুযাযী যদি দেশটির সাংস্কৃতিক অধিকারকে সীমিত করা হয় এবং বাধ্যতামূলক না করে সুপারিশ আকারে রাখা হয় তাহলে কতটা ক্ষতি হবে।" কিন্তু রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র কিংবা সাংবিধানিক শাসন পদ্ধতি নির্বিশেষে শিক্ষার অধিকার এখনও মুসলিম সরকারগুলো কর্তৃক উপেক্ষিত এবং অবাস্তবায়িত রয়ে গেছে।

শ্রমিকদের অধিকারের ক্ষেত্রেও একই বিবর্ন চিত্র পরিলক্ষিত হবে। শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন এবং তাদের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার কমবেশী সব রাষ্ট্রেই স্বীকৃত। কিছু মৌলিক মানবাধিকারের জন্যে সংঘবদ্ধ ধর্মঘটে যাবার অধিকারও সার্বজনীন ভাবে স্বীকৃত। মুসলমানরা সাধারণত বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনের স্বপক্ষে সকল মার্ক্সীয় এবং সমাজতান্ত্রিক মতবাদকে প্রচন্ডভাবে সমালোচনা করে থাকে। অনেক মুসলমান, শ্রমজীবি মানুষের বিভিন্ন অধিকার প্রশ্নে পশ্চিমা পুঁজিবাদী নীতিরও সমালোচনা করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে গুরুত্বের সাথে এসব ইস্যু নিয়ে কার্জ করার মত আইনগত ব্যবস্থার অস্তিত্ব মুসলিম বিশ্বে প্রায় নেই বললেই চলে।

বিদেশী শ্রমিকরা এবং আবর শ্রমিকদের দরিদ্র অংশ অনেক ক্ষেত্রেই মারাত্মক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। অথচ সরকারীভাবে এ কথা স্বীকৃত যে, ইসলাম মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার বিভিন্ন বিষয়ে যেমন– জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, আদর্শ, জাতীয় বা সামাজিক পূর্ব ইতিহাস, সম্পদ বা দেশ ইত্যাদির ভিত্তিতে মানুষে মানুষে প্রভেদ করে না এবং একে অনুমোদনও করে না। নারীর বিভিন্ন অধিকার বিশেষতঃ বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, সাক্ষ্য ব্যবস্থা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইসলামের নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে। কিন্তু সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এ সকল ব্যবস্থা ও অন্যান্য ইসলামী নীতিমালা অপব্যাখ্যা অথবা অপপ্রয়োগ লক্ষনীয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আবর দেশগুলোতে কর্মরত অনারব শ্রমিকদের সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোন বিধান ইসলামে নেই। কিন্তু

www.pathagar.com

বাস্তবে তেল সমৃদ্ধ আরব দেশগুলোতে কর্মরত বিদেশী মুসলমান বা অমুসলমান কোন সম্প্রদায়েরই এরূপ মানবাধিকার সংরক্ষিত নেই। যে কোন বিরোধ বা অসংগতির ক্ষেত্রে প্রায় সবসময়ই আরব আইন বিদশী শ্রমিকদের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। সুতারাং দেখা যাচ্ছে যে, সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত বিভিন্ন অধিকারের ঘোষণা দৃঢ় ও বাস্তব আইনগত কার্যকরিতা অভাবে সমান্য ফাঁকা আওয়াজে পরিণত হয়েছে। সকল সাংবিধানিক অধিকার আইনের অন্যান্য শাখা কর্তৃক অবশ্যই বলবৎ হতে হবে এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং জনমত দ্বারা দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হতে হবে, অন্যথায় এসব অধিকারের বাস্তবায়ন অসম্ভব।

মুসলিম দেশগুলোর প্রধান সমস্যা হচ্ছে, কোন কার্যকর সংবিধান সম্মত ব্যবস্থার অনুপস্থিতি। তাত্ত্বিক ভাবে কিছু দেশ আজকের মান অনুযায়ী মানবাধিকার সংরক্ষণে একটি সুষম ভাবাদর্শ এবং সাংবিধানিকতাবাদের অধিকারী হিসেবে গর্ববোধ করতে পারে। কিন্তু সবার আগে তাদেরকে নিজেদের জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক একটি সরকার যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং একমাত্র তখনই মানবাধিকারের মৌলিক দাবীগুলো পূরনে তাঁদের যথাযোগ্য ব্যবহার আশা করা যেতে পারে।

উপসংহারঃ এটি একটি অনস্বীকার্য সত্য যে, মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পশ্চিমা বা ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি হতে স্বতন্ত্র। বাহ্যিক বস্তুগত অর্জনই যেখানে পশ্চিমা বা ধর্মনিরপেক্ষ ধারণার সাফল্য বা ব্যর্থতার প্রধান নির্দেশক, সেখানে আত্মিক মুক্তিই ইসলামী মানবাধিকার ধারণার মূল লক্ষ্য। আত্মিক লক্ষ্য অর্জনের পথে এই বৈষয়িক অর্জন কোনভাবেই পুঁজিবাদী সমাজ বা অন্য কোন উন্নয়ন প্রক্রিয়ার পার্থিব অর্জনের চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বৈষয়িক অর্থে একটি দেশ বা সমাজ সম্পদশালী হলেও আদর্শ, নৈতিকতা এবং আত্মিক ভিত্তির অভাবের কারণে তার মনুষ্যচিত চরিত্র হয়ে পড়তে পারে অত্যন্ত দরিদ্র। সমাজের উন্নত মানবীয় চরিত্র এবং সুদৃঢ় নৈতিক ভিত্তি তৈরিকে ইসলামী মানবাধিকারের লক্ষ্য বলে গণ্য করা যেতে পারে; বৈষয়িক প্রগতি এখানে সেই লক্ষ্য অর্জনেরই একটি মাধ্যম। কিন্তু ইসলামী মানবাধিকার ধারণার এই বিস্তৃত পরিমন্ডলে মৌলিক মানবাধিকারের প্রাধান্য এবং এর প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যায় মতবাদ ভিত্তিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও সুস্পষ্ট মত পার্থক্য বিদ্যমান। মানবাধিকার সম্পর্কে সুফী সমাজের ব্যাখ্যা মুসলিম আইন বিশারদদের চাইতে স্বতন্ত্র। মাজহাবী এবং সম্প্রদায়গত মতপার্থক্যকেও এখানে উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু এতসব ভিন্নতা সত্ত্বেও মানবাধিকার প্রশ্নে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক মানবাধিকারের বাস্তবায়নে একটি মূলধারার সন্ধান পাওয়া যায়। ইসলামী মানবাধিকার এর ভিত্তি অত্যন্ত ব্যাপক এবং সকল মতবাদভিত্তিক গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সমান সঙ্গতিপূর্ণ; কেননা ইসলাম সমগ্র মানবজাতিকে প্রথম যুগল আদম এবং ইভ (হাওয়া) এরই বংশধর মনে করে।

সকল মুসলিম মতবাদ ভিত্তিক গোষ্ঠীগুলো এই মর্মে ঐক্যমত পোষণ করে যে, প্রকৃত আত্মিক মুক্তি লাভের জন্যে প্রতিটি মানুষকে অবশ্যই দৈহিক ও মানসিক মুক্তি উপভোগ করতে হবে। কিন্তু

www.pathagar.com

এই লক্ষ্য অর্জনের পন্থা বা মাধ্যমের ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। সুফীতাত্ত্বিক পদ্ধতি, আদর্শ, নৈতিক ও আত্মিক ভিত্তির উপর অধিক গুরুত্বারোপ করে, আবার একজন আইনজ্ঞ কিছু কিছু আদর্শিক বা মানবীয় দিককে এমনকি উপেক্ষাও করে থাকেন। বৈষয়িক সুযোগ–সুবিধার ক্ষেত্রে মানুষের সমর্যাদার ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। বৈষয়িক আরাম–আয়েশ অর্জনে সমান সুযোগের ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি দেশ বা মতাদর্শ তার মনুষ্যোচিত চেহারাকে ফুটিয়ে তুলতে চায়। কিন্তু একটি রাষ্ট্র ৱা সমাজের উচ্চতর বৈষয়িক অর্জনই তাকে অবধারিতভাবে সম্পদের সুষম বন্টনের পথে নিয়ে যায় না। সেজন্যেই প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে নৈতিক ভিত্তি তৈরি এবং উন্নততর আত্মিক মুক্তি লাভকেই ইসলামে মানবাধিকারের সফল বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত বলে গণ্য করা হয়, কেননা তা সহজেই সমাজকে বৈষয়িক সম্পদের সাম্যবাদী বন্টন ব্যবস্থার পথে পরিচালিত করে।

মদীনা সনদ গ্রহণ এবং নগর–রাষ্ট্র মদীনার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মুসলিম সভ্যতা সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজগুলোতে সে সকল অধিকার বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার নিজস্ব ধাঁচের মানবাধিকার চেতনাকে প্রতিফলিত করতে শুরু করে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মানবাধিকারের এই তাত্ত্বিক ধারণা বাস্তব প্রয়োগের সর্বোচ্চ মান অর্জন করে। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের নেতৃত্ব এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের তারতম্যের কারণে ইসলামী মানবাধিকার বাস্তবায়নের এই মানের ভিন্নতা দেখা যায়। অর্থাৎ মুসলিম জনগোষ্ঠী বিশেষতঃ মুসলিম শাসকেরা মানবাধিকার সুরক্ষায় তাদের ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হন। মুসলিম শাসকগণ ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা এই মানবাধিকার লঙ্ঘন কোন বিরল ঘটনা ছিল না, কিন্তু বিরোধী মুসলমানদের আপোষহীন সংগ্রামের তুলনা মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিরল। বস্তুত মুসলিম রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষগুলো নয়, বরং মুজতাহিদ বা আউলিয়াদের নেতৃত্বাধীন বিরোধী মুসলমানরাই কখনও সশস্ত্র কিংবা কখনো শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের মাধ্যমে ইসলামী মানবাধিকারের ন্যূনতম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেছিলেন। আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্র সমূহে মৌলিক মানবাধিকার সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম সময়ের দাবী অনুযায়ী যথার্থ নয়। সমাজে এর বাস্তবায়নে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ব্যর্থতার সঙ্গে ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার এবং পশ্চিমাকরণ প্রক্রিয়ার আঙ্গিক যোগসূত্র রয়েছে। মুসলিম সমাজে সকল পশ্চিমাকরণ এবং ধর্ম নিরপেক্ষকরণ শুধুমাত্র উন্নত মৌলিক মানবাধিকার বাস্তবায়নে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন আনতেই ব্যর্থ হয়নি এবং এগুলো প্রকৃত অর্থেই মুসলিম সমাজসমূহ বা রাষ্ট্র কর্তৃক অর্জিত মানবাধিকারের ক্ষেত্রে বিভ্রাট সৃষ্টি করেছে। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে আজ নিজস্ব ধর্মীয় ও নৈতিক ভিত্তি অর্জনের চেতনা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ইসলামের রীতি নীতি, মূল্যবোধ এবং ইসলামী ঐতিহ্য বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে মৌলিক অধিকার সুরক্ষায় অধিকতর কার্যকর হয়ে দেখা দিচ্ছে। জনমতের দৃঢ় সমর্থন ছাড়া মানবাধিকারের বাস্তবায়ন যে সম্ভব নয় এবং বিচ্ছিন্ন ধারণা নিয়ে কখনো জনমত গঠন সম্ভব নয়, এটি এতদিন মুসলিম জনগোষ্ঠীর কছে অজানা ছিল।

অনিশ্চয়তা, অস্থিতিশীলতা এবং সমাজের তৃনমূল পর্যায়ের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ হীনতা

www.pathagar.com

মুসলিম সরকারগুলোকে নাগরিকাধিকার সমূহ বাস্তবায়নে বাধা দেয়। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ব্যর্থতার সঙ্গে ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার এবং পশ্চিমাকরণ প্রক্রিয়ার আঙ্গিকে যোগসূত্র রয়েছে। মুসলিম সমাজের সকল পশ্চিমাকরণ এবং ধর্ম নিরপেক্ষকরণ শুধুমাত্র উন্নত মৌলিক মানবাধিকার বাস্তবায়নে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন আনতেই ব্যর্থ হয়নি, বরং এগুলো প্রকৃত অর্থেই মুসলিম সমাজসমূহ বা রাষ্ট্র কর্তৃক অর্জিত মানবাধিকারের মান এবং সাধারণের কল্যাণ প্রক্রিয়ার ক্ষতিসাধন করেছে। বর্তমানে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে নিজস্ব ধর্মীয় ও নৈতিক ভিত্তি অর্জনের চেতনা উল্লেখযোগ্য হারে রেড়েছে। ইসলামের রীতি-নীতি, মূল্যবোধ এবং ইসলামী ঐতিহ্য বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে মৌলিক অধিকার সুরক্ষায় অধিকতর কার্যকর হয়ে দেখা দিচ্ছে।

অনিশ্চয়তা, অস্থিতিশীলতা এবং সমাজের তৃনমূল পর্যায়ের সঙ্গে তাদের যোগাযোগহীনতা মুসলিম সরকারগুলোকে অধিকার সমূহ বাস্তবায়নে অকার্যকর করে ফেলেছে। উপরন্তু তারা নিজেরাই রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিরোধীদল বা গণবিদ্রোহের হাত থেকে নিজেদের শাসন সুরক্ষিত করতে গিয়ে মানবাধিকার লংঘণ করছে। সার্বক্ষণিক ভাবে বিদ্রোহ ভীতির শিকার এবং প্রকৃত রাজনৈতিক বৈধতাহীন সরকারগুলো কখনই মানবাধিকারের রক্ষক হতে পারে না। অন্যদিকে দৃঢ় বৈধ সরকারহীন রাষ্ট্রগুলোতে আন্তর্জাতিক আইন ও সংগঠন মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়।

ব্যাপক জনমসর্থন এবং জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলোই মানবাধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে। কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রগুলো নিজস্ব গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা নিজস্ব ধর্মীয় রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্যের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্রকে অনুকরণের চেষ্টা করেছিল। তাত্ত্বিক ভাবে মুসলমানরা একটি দৃঢ় নিজস্ব সাংবিধানিক ধারা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিল। কিন্তু আধুনিক মুসলিম জাতিগুলোর জন্যে তা অতীত গৌরবেরই ছিঁটেফোটা মাত্র।

মুসলিম জাতি-রাষ্ট্রগুলো না পেরেছে সফলভাবে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক কাঠামো প্রবর্তণ করতে, না পেরেছে কার্যকরভাবে ইসলামী সংগঠনগুলোর বিকাশ সাধন করতে। তাত্ত্বিক বিবেচনায় তাদেরকে ইসলামী সংঘঠনগুলোর বিকাশ সাধন ঘটাতে হবে। তাত্ত্বিক বিবেচনায় ইসলামের নির্দেশ গুলোর উপর বিশ্বাস রেখে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে পশ্চিমা এবং ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে। এরূপ ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রচেষ্টার মাধ্যমেই একটি মুসলিম রাষ্ট্র জনগণের কাছে আশানুরূপ জবাবদিহিমূলক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং মানবাধিকার বাস্তবায়নে আন্তরিক অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। যা হোক, কোন একটি মুসলিম রাষ্ট্র স্বতন্ত্রভাবে সম্ভবত উল্লেখিত ব্যাখ্যাকৃত মানবাধিকারের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তবায়নে সাফল্য লাভ করতে পারবে না। তাই পরস্পর অত্যন্ত নিবিড় আত্মনির্ভর এই বিশ্বে যদি মুসলিম রাষ্ট্রগুলো এই ইস্যুটিকে ব্যাপক ও সম্মিলিত ভাবে গ্রহণ না করতে পারে, তবে ইসলামী মানবাধিকার ধারণার এবং চেতনার বাস্তবায়ন একটি শুভ-অভিপ্রায় এবং দূর-স্বপ্নেরই থেকে যাবে। তবে ধীরে ধীরে মুসলিম জনতার চাপে পড়ে শাসকবর্গ দিন দিন ইসলাম ও নিজ সমাজ মুখী হতে বাধ্য হচ্ছে।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব ও অর্থনৈতিক মুক্তিঃ উপমহাদেশ প্রসংগ ও বাংলাদেশ

রাজনৈতিকভাবে একটি দেশ স্বাধীন, এ কথার অর্থ হচ্ছে দেশটি সর্ব ক্ষেত্রেই নিজ ইচ্ছামত আইন কানুন তৈরী করতে সমর্থ। দেশের ভিতর থেকে বা বাহির থেকে কেউ তাকে বাঁধা দিতে পারে না রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের প্রশ্নে। উপনিবেশিক শাসনামলে তাই মানুষ জীবন পণ করেই দেশের পর দেশ স্বাধীন করেছে। সূর্যের মতই অবারিত কিরণ আশা করছে স্বাধীনতা সংগ্রাম ফসল থেকে। তাই তো বিজয়কে বলা হয়েছে স্বাধীনতা–সূর্য। প্রকৃতির সুর্যের মতই স্বাধীনতা সূর্যও হবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। এটিই ছিল সব দেশের আপামর জনতার ইচ্ছা ও পরিকল্পনা।

কোন দেশ বা জাতি স্বাধীন হওয়ার পর বড়ই প্রয়োজন দেখা দেয় কোন রাজনৈতিক আদর্শের। রাজনৈতিক ভাবে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী শক্তি যদি কোন রাষ্ট্র দর্শন দিতে না পারে, তবে ঐ শক্তির দ্বারা রক্ষিত বা নির্মিত আইনগত সার্বভৌমত্বের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যায়। রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের রক্ষাকল্পে কোন জাতির লোকদেরকে নিজেদের কর্মকান্ড আইনানুগ রাখতে হয়। কোন রাষ্ট্রের নাগরিকগণ স্বেচ্ছায় তাদের রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলতে অংগীকারাবদ্ধ। আর রাষ্ট্র শক্তি আইনকে নিজ জনগনের চিন্তা–ভাবনা ও আশা আকাংখার সাথে সংগতিপূর্ণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে বাধ্য। যে রাষ্ট্র শক্তি তা করতে ব্যর্থ হয়, তাকে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে এ অন্যায়ের খেসারত দিতে হয়।

কোন রাষ্ট্র শক্তি জনগণের স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি কি–না, তার প্রধান ও সর্বশেষ পরীক্ষা হয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। কম ক্ষেত্রেই সরাসরি অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলে দেশ স্বাধীন করা হয়। সাধারণত সংগ্রাম চলে কোন ধর্ম বা জাতির স্বার্থের কথা বলে। মানুষ যেন সংকোচ বোধ করে সরাসরি অর্থনৈতিক স্বার্থের কথা বলতে। বিশেষ করে ব্যাপারটি যখন রাষ্ট্রীয় বা সামষ্টিক পর্যায়ের হয়। সামষ্টিক ভাবে মানুষ যেন বলতে চায় না যে, তারা স্বার্থপর। প্রত্যেকেই যেন রাষ্ট্রীয় জীবনে উদারতার ও মহত্বের পরিচয় দেওয়ার সুযোগ খুঁজে।

পাকিস্তানকে স্বাধীন করার সংগ্রামে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, তারা সবাই যেন ছিলেন এক একজন নিবেদিত প্রাণ ইসলামী মহাপুরুষ। তারা যেন সকল স্বার্থের উর্ধে উঠে ইসলাম ও মুসলিম জাতি সমূহের জন্য নিজ জীবন বিসর্জন দিতে সদা প্রস্তুত। তাই তারা নিজ জনগণের কাছেও অনুরূপ আত্মত্যাগের আশা ও দাবী করেছিলেন। জনগণও তাদের কথায় বিশ্বাস করেছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই আত্মত্যাগের মহীমায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যখনই প্রমাণিত হলো জনগণের আত্মত্যাগে গড়ে উঠেছে এক শোষক শ্রেণী, তখন বিদ্রোহ ঘটল আপন গতিতে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন প্রক্রিয়াটা ছিল এক অসাধারণ অকৃত্রিম ও ঐকান্তিক গণসচেতনতার ফসল। পাকিস্তান অর্জন প্রক্রিয়ায় বাঙালী মুসলমানরা তাদের ধর্ম বোধকে সর্বাগ্রে জাগরত রেখেছে। ধর্মের স্বার্থে নিজেদেরকে বলি দিয়েছে। মানুষের মুক্তি চাওয়া হয়েছে ধর্মীয় মহিমার ভিতর দিয়ে। ধর্মের মহিমায় জাতির অর্থনৈতিক স্বার্থও সবচাইতে ভাল ভাবে রক্ষিত হবে, এ ব্যাপারে জনগণের ছিল গভীর বিশ্বাস। অথচ শাসকগোষ্ঠী ধর্মকে পরিণত করতে চাইল মার্কসীয় আফিমে। এ আফিম দিয়ে জনগণকে বুদ বানিয়ে রেখে চালিয়ে যেতে চাইল সকল ইসলাম ও মানবতা বিরোধী কর্মকান্ড।

বংগীয় জীবন ধারায় এর কালো ছাপ স্পষ্ট থেকে স্বষ্টতর হলো। মানুষ বিদ্রোহ করলো শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের স্বাধীকার আন্দোলন ছিল একান্তভাবেই অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনা থেকে পরিত্রাণের সংগ্রাম।

বিদেশী উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে যে সব নেতৃবৃন্দ তারা ইংরেজদের সাথে আর ক্ষমতার ভাগাভাগিতে সন্তুষ্ট ছিল না। তাই ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর এসব ইংরেজী শিক্ষিত মুসলমান অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ক্ষমতা ও অর্থবিত্ত ভাগাভাগি করছে দেশীয় ধর্মীয় নেতা ও উঠতি নব্য পুঁজিপতিদের সাথে। ক্ষমতা ও ধন–দৌলতের ভাগাভাগি প্রক্রিয়া সবচাইতে বঞ্চিত বোধ করল পূর্ব পাকিস্তানী রাজনীতিবিদরা। অন্যদিকে পাকিস্তানী শোষণের সবচাইতে নিষ্ঠুর শিকার হলো পূর্ব বংগীয় তথা পূর্ব পাকিস্তানী সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণার রোষাণলে পড়ল পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী। রাজনীতিবিদদের উপর দায়িত্ব বর্তালো দেশকে স্বাধীন করার।

জনগণ পরিস্কার ভাষায় জানালো যে, এবার তারা স্বাধীনতার জন্য স্বাধীণতা চায় না। অর্থাৎ নিছক রাজনৈতিক স্বাধীনতা তাদের কাম্য নয়। শুধুমাত্র রাজনৈতিক সর্বভৌমত্ব রাজনীতিবিদদের স্বেচ্ছাচারী করে তোলে। চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে জাতির পক্ষ থেকে গুটি কতক মানুষ যা খুশী করে বেড়ায়। ইসলামের নামে অর্জিত পাকিস্তান বহু ইসলাম বিরোধী আইন ও কর্মকান্ডের অস্তানাতে রূপান্তরিত হয়েছিল এ কারণেই।

উল্লেখ্য, পাকিস্তান সরাসরি কোরআন ও সুন্নাহ বিরোধী যত আইন প্রণয়ন করেছে এবং যত বেশী নির্লজ্জভাবে ইসলাম বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত সমগ্র মানব ইতিহাসেই বিরল। আজকের পকিস্তানে যে সব সহিংস কার্যকলাপ চলছে, এর মূল ভিত্তি কিন্তু রচিত হয়েছিল অখন্ড পাকিস্তানে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এই কথাটি কিছুটা প্রযোজ্য।

তবে বাংলাদেশে এমনটি হবার কথা ছিল না। প্রতিনিয়ত আমাদের সকল কর্মকান্ড আবর্তিত হওয়ার কথা ছিল জাতির অর্থনৈতিক মুক্তিকে কেন্দ্র করে। কারণ এ দাবীতেই আমরা স্বাধীনতার জন্য এত বিসর্জন দিয়েছি। স্বাধীনতা বলতে আমরা বুঝতেই চেয়েছি আমরা জাতি হিসেবে সাবলম্বী হব অর্থনৈতিক ভাবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিমিত্ত মাত্র। উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক মুক্তি।

www.pathagar.com

পাকিস্তান বা ভারত কেউ আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি ও সমৃদ্ধির পথে বাঁধা দিতে পারার কথা নয়। ইংজেরাও নতুন করে তাদের শোষণের জাল বিস্তার করতে পারবে না। সম্পূর্ণ স্বাধীন জাতি সত্তার সৃষ্টির জন্য আমরা আত্মনির্ভরশীল হওয়ার অংগীকারে ব্যবহার করব আমাদের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব। এ সব ব্যাপারে কোন বিতর্কই থাকল না। শোষণ মুক্ত অর্থনীতি গড়ার জন্য রাষ্ট্রীয় ভাবে ঘোষিত হলো সমাজতান্ত্রিক নীতিমালা। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ঠিক একই ভাবে ঘোষিত হয়েছিল ইসলামী নীতিমালা। অবশ্য ঐসব নীতিমালায় শোষণ মুক্ত সমাজ গড়ার প্রত্যক্ষ অংগীকারের অভাব ছিল। সে অভাব এবার পূরণ হলো। জাতি যথেষ্ট সহিষ্ণুতার সাথে ধৈর্য ধারণ করল। অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক নীতির অর্থ শাসকগোষ্ঠী কি ভাবল, জনগণ তা স্পষ্ট ভাবে বুঝার আগেই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব সর্বত্র তীব্র ভাবে অনুভূত হলো। দেশে দুর্ভিক্ষে সকল পূর্বাভাষ দেখা গেল। কিন্তু তাও প্রতিরোধ করা গেল।

দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা বেড়ে গেল বহু গুণে। স্বাধীন দেশের আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি তৈরীর জন্য আইনগত কোন ভিত্তি রচিত হলো না। মানুষ বুঝতেই পারল না, কোন আইন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে তাদের দেশ। আস্তে আস্তে আবিষ্কৃত হলো দেশের নাম ও পতাকা বদল হয়েছে দেশের আইন বদলায়নি। আইন সবই ধার করা হয়েছে ইংরেজ বা পাকিস্তানীদের কাছ থেকে নিজেরা যা কিছু করার চেষ্টা করেছে, তাতেও যেন পাকিস্তানী সুরই ধ্বনিত হয়েছে। জুলফিকার আলী ভুট্টোর সমাজতান্ত্রিক নীতিমালার সাথে বাংলাদেশে অনুসৃত সমাজতান্ত্রিক নীতিমালার তফাৎ বড়ই সামান্য। পাকিস্তানী সমাজতন্ত্রকে একটা ইসলামী লেবাশ পরানোর চেষ্টা করা হয়েছে আর এ ভূ-খন্ড ধর্ম নিরপেক্ষতার খাপে সমাজতন্ত্রকে আবদ্ধ করার প্রয়াস চলেছে। কি দু'জায়গাতেই জনগণকে সামগ্রিক প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেয়া হয়েছে সুকৌশলে। কার শাসকগোষ্ঠী ও উঠতি ধনকুবের সন্তানদের জন্য প্রয়োজন ছিল অনেক টাকা পয়সার। এরা আবার আদতে ইসলামী বা সমাজতন্ত্রী কোনটাই হতে চায়নি। প্রয়োজনে শুধু বোল পালটিয়েছে।

জনগণ যখন বুঝল যে, এত কষ্টের এ স্বাধীনতা, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং আইন ব্যবস্থা তাদের নয়। তখন তারা বেঁকে বসল। আইনকে মানতে হবে, এর পেছনে যুক্তি জোগান দেয়া কষ্টক হয়ে পড়ল। সম্ভব হলে আইনকে বাদ দিয়েই চলতে হবে, এই যুক্তিই শক্তি পেয়েছে। তবে যেখানে যেখানে আইন বেশী ঝামেলা করে সেখানে আইন মানা হয়েছে। ধর্মের ব্যাপারেও প্র অনুরূপ নীতি অনুসৃত হলো। মানুষ ও সমাজ বুঝতে পারলেই হলো তুমি আল্লাহ খোদা মান, ধ তোমার অগাধ বিশ্বাস রয়েছে। কার্যত ধর্ম দ্রোহিতা করতেও অসুবিধে নেই।

পাকিস্তানী পঁচিশ বছরের রাজত্ব পাকিস্তানকে ধ্বংশ করেছে প্রতিনিয়ত। আমাদের স্বাধীনতা পঁচি বছরে আমাদেকে এখন কোথায় পৌছে দিয়েছে! গত পঁচিশ বছরে এশিয়ার দেশ সমূহে বি করে দূর প্রাচ্যের দেশ সমূহে আত্মনির্ভরশীলতা ও দেশ মাতৃকার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার এ জোয়ার বইছে। জোয়ারের ফসল আজ ফলতে শুরু করেছে। দেশ প্রেম ও অর্থনৈতিক স

www.pathagar.com

ছাড়া জাতিগত স্বাধীকার আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য। আর এ সফলতাই স্বাধীনতার লক্ষ্য । বুলি কপচানোর রাজনীতি দিয়ে এটি অর্জিত হবার নয়। ধার করা আইন দিয়ে স্বাধীন জাতি সত্ত্বা গড়ে উঠতে পারে না। আবার আইন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেবার মত কোন জিনিসও নয়। প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি বিধি–বিধানকেই আইন করতে হয়। ধর্ম ভেদ–জাতি ভেদ এতে বাঁধা হয় না। মালয়শিয়ার গত পঁচিশ বছরের উন্নতি আমাদেরকে আজ হতবাক করে। অথচ যেখানে ধর্ম ভেদ ও জাতি ভেদের অস্তিত্ব স্পষ্ট। শতকরা পঞ্চান্ন (৫৫%) জন মুসলিম হওয়ার সুবাদে মালয়েশিয়া মুসলিম দেশ। অথচ ধর্মীয় কোন দাংগা হাংগামার খবর শুনা যায় না। সবাই ব্যস্ত প্রতিযোগিতায়। সকলের রুটী রোজীর প্রতিযোগিতার যোগফলই হচ্ছে জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি। ইংরেজরা মালয়েশিয়ার মত দেশকে সমীহ করে এবং রীতিমত ভয় পায়। কারণ দিন–রাত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে জাতির স্বার্থে মালয়েশিয়ানরা ইংরেজদের জানিয়ে দেয় ইংরেজদের কারণেই বহু বছর দেশটির অর্থনৈতিক মুক্তি ত্বরান্বিত হয়নি; বাঁধা গ্রস্থ হয়েছে নিজস্ব আইন ব্যবস্থার উত্থান।

এ উপমহাদেশে কিছু কিছু মনীষী দেশবাসীকে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন, সঠিক অর্থনৈতিক মুক্তি ও সমৃদ্ধি ইংরেজদের অনুসৃত পথে আসতে পারে না। ইংরেজদের নিজস্ব একটি দেশের গুটি কয়েক মানুষের সমৃদ্ধির স্বার্থে বিশাল বৃটিশ ভারতের সর্বস্ব লুট করা সম্পদও কিঞ্চিত বা অপর্যাপ্ত মনে হয়েছে। তাহলে সমগ্র ভারতবাসীর অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কত বড় বিশাল পৃথিবীর লোক ও সম্পদের যথেচ্ছে ব্যবহার করতে হবে। মহাত্মা গান্ধীর দর্শন বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল ভারতবাসী। তাকে হত্যা করেছে হিন্দু উগ্রপন্থীরা। মাওলানা আবুল কালাম আজাদকে ভারত বর্ষের মুসলমানরা শারীরিকভাবে হত্যা করেনি, তবে তার দর্শন পড়ে আছে মুসলমানদের চিন্তা ভাবনার গন্ডীর বাইরে। ইকবালকে রাজনৈতিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে। এ এক দারুন মিথ্যাচার। ইকবাল স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি স্বাধীন মুসলিম জাতি সত্ত্বার পরিপূর্ণ জাগরণ, যেখানে থাকবে মানবতার জয়গাণ। যে জয়গাণ ধ্বনীত হয়েছে অনেক জোরালো ভাবে কাজী নজরুল ইসলামের লেখনীতে। কাজী নজরুলকে আমরা জাতীয় কবি বলি, বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রাষ্টা বলি না। কবি বা দার্শনিকরা সব ভাল কিছুর দ্রষ্টা হতে চান। তাদের ভাষা বুঝতে সময় লাগে বেশী। তাই মৃত্যুর অনেক পরেই ইতিহাস তাদের সঠিক মূল্যায়ন করতে সমর্থ হয়।। বড় মাপের রাজনীতিবিদদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য।

মহাত্মা গান্ধীর দর্শন ও মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর অর্থনৈতিক মুক্তির দিক দর্শনের সার সংক্ষেপ প্রায় একই রূপ। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী ইচ্ছা করেই ভূল বুঝাতে চায় জনগণকে। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন শাসকগোষ্ঠীর অন্য কোন উপায় জানা থাকে না।

" নিষ্কৃতি চাই এ যুগের ধ্বংশকারিতা থেকে, কেননা রাষ্ট্র শাসনের নামে সে চালিয়েছে শয়তানী রীতি" পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা বলে কথিত কবির সূত্র কেন শুধু বৃটিশ শাসনামলে সীমাবদ্ধ থাকবে। বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের শাসনামলে যদি কোন গুণগত পরিবর্তন না হয় এবং যদি তা আরও

www.pathagar.com

ক্ষতিকারক হয় আপামর জনসাধারণের জন্য, তবে নিশ্চয়ই কবির এ বানী তাদের জন্য আরো স্পষ্ট ভাবে খাঁটি। তাই হয়তঃ তিনি বলেছেনঃ একদা যা মন্দ ছিল ধীরে ধীরে তাই হলো ভালো, কেননা গোলামীতে পরিবর্তিত হয় জাতির বিবেক।,

জাতির বিবেক যদি বন্দী না হবে, তবে স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পর বাংলাদেশের এ অবস্থা হবে কেন? কোন মাপকাঠিতে আমরা আজ চলব আমাদের জাতির অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব অর্জনের পথে। জাতির অর্থনৈতিক মুক্তির সঠিক অবস্থা হয়তঃ পরিসংখ্যানের গুঁটিতে আবদ্ধ করে আরো কিছুকাল বিভ্রান্ত করা যাবে। কিন্তু একদিকে শতকরা অশিজনকে দারিদ্র সীমানার নীচে বসবাস করতে বাধ্য করে গুঁটিকয়েক লোকের হাতে জাতির ভাগ্য এমন ভাবে বিড়ম্বিত হতে দিলে শীঘ্রই বিরাট কোন দুর্ভোগ পোহাতে হবে সবাইকে।

অপরিকল্পিত ও আনাড়ী চাষাবাদ ব্যবস্থার কারণে সমগ্র দেশের কৃষিযোগ্য ভূমি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দোষ চাপানো হচ্ছে অশিক্ষিত কৃষকের ঘাঁড়ে। একদিকে কৃষক যখন যা উপায় - উপকরণ পাচ্ছে তাই দিয়ে ফসল ফলাচ্ছে, আর অন্যদিকে তাদের ফসল খেয়ে শিক্ষিতরা তাদের সকল অধিকারকে ঘুষের লাল ফিতায় বন্দী করছে। অথচ যত গুণগাণ চলছে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবির, আর অপবাদ দেয়া হচ্ছে অশিক্ষিত খেটে খাওয়া মানুষদের। শিক্ষিত মানুষরা বুঝতেই চাইছে না যে, তারাই ঘুষের টাকার লেনদেনে ডুবিয়ে দিচ্ছে দেশের অর্থনীতি। রাজনীতিবিদরা স্বীকার করতে চইছে না যে, তারাই গণতন্ত্রের সবচাইতে বড় শত্রু। ইসলামপন্থীরা শুনতেও রাজী নয় যে, তাদের কারণেই ইসলামের সোনালী সূর্য ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন মেঘে ঢাকা। সকল ক্ষেত্রেই একই সূত্র। জাতি–দেশ দিয়ে কি হবে, যদি আমি নিজে ভাগ্যবান না হলাম।

ডিম ভাজতে আগুণ লাগে। সমস্ত ঘর পুড়িয়ে দিয়েও হয়ত ডিম ভাজী করে খাওয়া যায়। কিন্তু বুদ্ধিমান লোক ঘর রক্ষা করেই ডিম ভেজে খায়। প্রতিদিন একজন সুস্থ মানুষের চার লিটার পানি ও ২৪ কেজি বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করতে হয়। অথচ শক্ত খাবার এক কেজির বেশী লাগে না। এখন আমরা যদি সবাই এক কেজি খাবারের জন্য দেশের সব পানি ও বায়ু নষ্ট করতে থাকি, আর ভাবি আমার এতে ক্ষতি নেই, তবে কি বিরাট মুর্খের স্বর্গে বাস করা হবে না! পাশ্ববর্তী দেশের সরকার যদি ভাবে আমাদের জন্য পানি আটকে রেখে বা বর্জ্য আমাদের দিকে ঠেলে দিয়ে তারা স্বর্গ রাজ্য তৈরী করবে, তাহলে খুব শীঘ্রই তাদের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে নিজেদের জন্যও মহাবিপদ বয়ে আনবে।

আজকের দিনে অর্থনৈতিক স্বার্বভৌমত্ব কোন একক রাষ্ট্রীয় ব্যাপার নয়। তবে রাষ্ট্রের ভিতরকার রাজনৈতিক ও আইনগত সর্বভৌমত্বের সঠিক লালন–পালনের অভাবে পূর্বের যে কোন সময়ের তূলনায় এখন একটি ছোট দেশ আর একটি বড় দেশের দ্বারা দারুণ ভাবে ভোগান্তির শিকার হতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র একটি দেশ বিশাল কোন দেশের জন্যও অভাবনীয় হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

www.pathagar.com

মানবাধিকার ঃ বসনিয়া ও চেচনিয়া প্রসংগ।

আধুনিক মানবাধিকার সৃষ্টির বয়স কয়েক শতক হলেও এর বিশ্বজোড়া প্রয়োগের উদ্যোগ খুবই সাম্প্রতিক। মধ্যযুগীয় স্থবিরতা ও নিষ্ঠুরতা অবসান কল্লেই মূলতঃ আধুনিক মানবাধিকারের জন্ম। এর সফলতা ও ব্যর্থতার হিসেব নিকেস হওয়ার পূর্বেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আধুনিক মানবতাবাদের জন্য বয়ে আনলো এক বিরাট হুমকি। লীগ অব নেশন (জাতিপুঞ্জ) কিছুটা হলেও এ হুমকী দূর করার চেষ্টা করে। তেমন বড় ধরণের সফলতা ছাড়াই জাতিপুঞ্জ ভেংগে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুধু আধুনিক মানবতাবাদকেই দারুণ ভাবে বিপন্ন করেনি, কয়েক শতক ধরে গড়ে উঠা ইউরোপীয় সভ্যতাকেই টুটি চেপে ধরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব মানব সভ্যতাকে রক্ষা করার তাগিদ অনুভব করে দারুণভাবে। বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্বত্রই অনুভূত হয়। শান্তিকালীন সময়ে মানবাধিকার রক্ষার দুটি ধারা জন্ম লাভ করে। সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক ধারায় মানবাধিকার ধারণাগত ও আচরণগত উভয় দিক থেকে একে অপর থেকে আলাদা। তাত্ত্বিক ও বাস্তব বিচারে এই দুই ধারার মাঝে সমন্বয় সাধন অসম্ভব। কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ে এ দু'টি ব্যবস্থাতেই প্রায় একই ধরণের মানবাধিকার স্বীকৃত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে সত্যটি প্রমান করেছে, তাহলো সামরিক ভাবে আর রাজ্য জয় করা যাবে না বা গেলেও তাতে লাভ হবে না। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধের বিস্তৃতি ঘটল দ্রুত গতিতে। তৃতীয় বিশ্বের বহুদেশকেই ব্যবহার করা হলো আদর্শিক ও সামরিক জয়-বিজয়ের গবেষণাগার হিসেবে।

পৃথিবী দুই বিবদমান শিবিরে বিভক্ত হলো। দুই পরাশক্তির আবির্ভাব এরই জের। মানবতাবাদের বুলি পৃথিবী ব্যাপী তীব্রতর হলো। একে ঘিরেই রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা চলল। কিন্তু এ দ্বন্দ্বে কারোই যেন জীত হচ্ছিল না। আফগানিস্তানের মত ক্ষুদ্র ও দুর্বল দেশটি সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার মত পরাশক্তির মানবাধিকার নীতির ছিটে ফোঁটাও গ্রহণ করছিল না। অন্যদিকে মুসলিম বিশ্বের সবচাইতে বেশী পাশ্চত্যবাদী দেশ শাহের ইরান হঠাৎ করেই যেন অপর পরাশক্তি ও সমগ্র পশ্চিমা বিশ্বের মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শণ করে বসল। ঘটনা দুটিই আবার ঘটল ১৯৭৯-তে।

মস্কোর দৃষ্টিতে আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান ছিল মানবতাবাদ বিস্তারের এক ঐকান্তিক ও নিস্বার্থ প্রচেষ্টা। কিন্তু বাস্তবে তা সমগ্র আফগানবাসীর সকল অধিকার ভূলুণ্ঠিত হওয়ার সামিল হলো। পশ্চিমা মানবতাবাদ সক্রিয় হয়েই আফগানদের পক্ষ নিল। আফগানিস্তানের মাটিতে রুশ পরাজয় সুচনা করল ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রী মানবতাবাদের বিপর্যয়। সে বিপর্যয়ে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া প্রথমে পূর্ব ইউরোপের মিত্রদের সবাইকে একে একে হারালো। অবশেষে এক সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় জন্ম নিল পনেরটি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র। একই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকল পূর্ব ইউরেপীয় দেশ সমূহে। মিলন ও ভাংগণের প্রক্রিয়ায় দুই জার্মানী একীভূত হলো, যুগোশ্লাভিয়া ভেংগে গেল। জাতিসত্ত্বার সাধারণ ভিত্তিতে সৃষ্টি হলো বসনিয়া হারজেগভিনার মত নতুন রাষ্ট্র।

www.pathagar.com

৯৫-টি রাষ্ট্র স্বীকৃতি জানালো এ নতুন রাষ্ট্রটিকে। বসনিয়া লাভ করল জাতিসংঘের সদস্যপদ। হঠাৎ করেই যেন আবিষ্কৃত হলো এটি ইউরোপের মাটিতে একমাত্র মুসলিম রাষ্ট্র। অথচ আলবেনিয়ার মত ইউরোপীয় দেশটির শতকরা আশিজন মুসলমান। মানব সভ্যতা যেন বেমালুম ভুলে গেল যে, ইসলামের আবির্ভাবের প্রথম শতকেই ইসলাম ইউরোপে প্রবেশ করে এবং সামরিক বাঁধা না থাকলে তখনই ইসলাম ইউরোপের আরো গভীরে প্রবেশ করতে পারত।

" By the time of his (the Prophet's of Islam) death in AD 632 he had already unified almost all the tribes of the Arabian Peninsula. Almost eighty years later, the Umayyad generals crossed the straits of Gibraltar and pushed the Islamic Empire into the heart of the Frankish domains, where their march into Northern Europe. was halted by Charles Martell in AD 732. As Islam is not only a religion but also a secular ideology and power, it was possible for both a world religion and political world power to come into being within a mere century." Vol. 48 pp.89-90

সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া তার মানবতাবাদ দিয়ে পৃথিবীর সকল আদি সভ্যতাকে অস্বীকার করল। সমাজতান্ত্রিক মানবাধিকার থেকে সকল ধর্মীয় অধিকার ছেটে বাদ দিল। পশ্চিম ইউরোপ খৃষ্টীয় ধর্মীয় অধিকারকে গুরুত্ব দিলেও অন্য সব ধর্মীয় অধিকার চর্চাকে অযৌক্তিক বা বাড়াবাড়ি মনে করে। তার সবচাইতে বড় প্রমান বসনিয়া মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি ইউরোপীদের আচরণ। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর থেকে শুরু করে বহু ইউরোপীয় নেতা প্রকাশ্যে ঘোষনা দিয়েছিলেন যে, ইউরোপে তারা কোন মুসলিম রাষ্ট্র দেখতে চায় না। আর তাই সার্বরা নির্বিচারে মুসলমানদের হত্যা করেছে। গণ ধর্ষণের যে নজীর সার্বরা সৃষ্টি করেছে, তা মধ্যযুগীয় যে কোন মাত্রাকে ছাড়িয়ে গেছে। পরিকল্পিত ভাবে বেশ কিছু শহরের প্রায় সকল মুসলিম নারীই ধর্ষিতা হয়েছেন। বর্বরতার এক জঘন্যতম পর্যায়ে পশ্চিম ইউরোপীয় নেতারা বিশ্ববাসীকে জানালো যে, মস্কোকে তারা রাজি করাতে পারছে না বলেই সার্বদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না।

বসনিয়ায় মানবাধিকারের চরম লংঘনের বয়স যখন এক হাজার দিন পূর্ণ হলো সে সময়ে ১৯৯৪ সালের শেষের দিনগুলোতে মস্কো অভিযান চালালো চেচনিয়ায়। লক্ষ্য ছিল ১৯৯৫ সালের নব বর্ষ রুশ সৈন্যরা উদযাপন করবে গ্রর্জনীতে। গণ ধর্ষণ করার সুযোগ রুশ সৈন্যরা চেচনিয়াতে পায়নি। কারণ বসনিয়া থেকে মানবতাবাদীরা শিক্ষা না নিলেও চেচনিয়ার মুসলমানরা শিক্ষা নিয়েছিল। শুধু তাই নয় চেচনিয়ার নেতৃবৃন্দ আজারবাইজানী ও দাগিস্তানী মুসলিম নেতাদের উপদেশ দিয়েছিলেন বাইরের মানবতাবাদীদের সাহায্যের ভরসায় না থেকে নিজ শক্তি দিয়ে আর্মেনিয়ার কবল থেকে মুসলিম জনপদ মুক্ত করতে। উল্লেখ্য, রুশরা আর্মেনিয়ানদের সাহায্যে

www.pathagar.com

আজারাবাইজানের প্রায় ২০ (বিশ) শতাংশ ভূ-খন্ড জবর দখল করেছে এবং ঐ অঞ্চল থেকে সকল মুসলমানকে বিতাড়িত করেছে।

মানবাধিকারের মূল কথা হচ্ছে, জন্মের পর থেকে মানুষ তার জান, মাল ও ইজ্জত সহ ভু-পৃষ্টের যে কোন জায়গাতে নিরাপদে বসবাস করার অধিকারী। অথচ বসনিয়া, চেচনিয়া বা আজারবাইজানের মুসলমানদেরকে নিজ জন্মভূমতেই বসবাস করতে দেয়া হচ্ছে না। নিজ জন্মভূমীতেই নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। আধুনিক মানবাধিকার আজ এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। পরীক্ষা দিচ্ছে সর্বপ্রথম তারাই যারা নিজেরাই জন্ম দিয়েছে ১৯৪৮ সালের সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ।

সার্বজনীন মানবাধিকার অধিকতর অগ্রসর হয়ে জন্ম দিল অন্য এক নব জাতক। তার নাম দেয়া হলো Humanitarian law. স্বীকার করা হলো যুদ্ধের সময়ও মানবাধিকার সবচাইতে বেশী গুরুত্ব পাবে। জাতির মুক্তির লক্ষ্যে যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃতি লাভ করল।

" People engaged in such (liberation) war fought for self determination, which is recognized as a human right in the international conventions, and for recognition as a party to an international armed conflict to which humanitarian law is applicable. Thus " attempts at self determination trigger both human rights and humanitarian law questions" (Patwari P. 7).

সব জাতির সমান আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারের মাঝেই শুধু মানবাধিকারের সঠিক চর্চা সম্ভব, এ কথা আজ সকল আদর্শ ও ধর্ম মানে। কিন্তু কোন মুসলিম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারের প্রশ্ন উঠলেই যেন অযৌক্তিক দাবী করা হয়।

কোন সনদ সার্বজনীন হওয়ার অর্থ হচ্ছে সকলের জন্য ঐ সনদ সমান ভাবে প্রযোজ্য হওয়া। আর সনদের মৌলিক নীতিমালা রক্ষ করে এটিকে নিরপেক্ষ ভাবে প্রয়োগ করার সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখা। আফগানিস্তানে রুশ সৈন্যরা যে হারে মানবাধিকার লংঘন করেছে, তার চাইতে হাজারো-লাখো গুণ জঘন্য ও নির্লজ্জ মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটেছে বসনিয়া ও চেচনিয়ার ভু-খন্ডে। বসনিয়াতে সার্বীয়দের সহযোগী ছিল রুশ ও ইংরেজ জাতি। এ দ'ুটি জাতিই মুসলমানদের বিশাল এলাকা বহু বছর ধরে ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে রেখে মুসলমানদেরকে মানবাধিকারের ছবক দিয়ে আসছিল। ইংরেজদের মানবাধিকার জ্ঞান ও প্রয়োগ শুধুমাত্র ইংরেজী শিক্ষিত অতি ক্ষুদ্র মুসলিম বুদ্ধিজীবিদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকলেও রুশদের সমাজতান্ত্রিক মানবাধিকারের প্রভাব ছিল অনেক গভীর ও বিস্তৃত। ফলে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার কবল থেকে এক প্রকার বিনা রক্তপাতেই ছয়টি মুসলিম দেশ তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। অবশ্য মুসলিম নেতৃবৃন্দের বুদ্ধিমত্তা কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

www.pathagar.com

মানবাধিকারের জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্যই ইংরেজরা বৃটিশ ভারত থেকে বিদায় নেয়ার সময় কাশ্মীর ও বাংলাদেশের মত সমস্যা সৃষ্টি করে রেখেছিল। তাদের প্রবর্তিত মানবাধিকারের ধারক মুসলিম বুদ্ধিজীবিরা তদানিন্তন সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানে একই সাথে ইংরেজী ও ইসলামী মানবাধিকার অনুসরণের ঘোষণা দিল বার বার। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর জন্য যখন পরীক্ষা আসল, তখন তারা দারুণভাবে অকৃতকার্য হলো মানবাধিকার রক্ষা করতে। ১৯৭১ সালে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানী সৈন্যদের দ্বারা চরমভাবে পদদলিত হলো এ অঞ্চলের মুনষের সকল ন্যায়সংগত অধিকার। পূর্ব পাকিস্তান অখন্ড পাকিস্তানের ভূখন্ড ছিল রাষ্ট্রীয়ভাবে, যেমনি করে আজকের চেচনিয়া রুশ ফেডারেশনের রাষ্ট্রীয় ভূ-খন্ড। তবে এ ক্ষেত্রে একটি বড় ধরণের পার্থক্য রয়েছে। চেচনিয়া জার সাম্রাজ্যের অধীনে আসে রুশ সৈন্যদের সামরিক অভিযানের জের হিসেবে। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করে এর কর্তৃত্ব। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া থেকে বের হয়ে যে ছয়টি মুসলিম রাষ্ট্র সৃষ্ট হলো এদের উপরও রুশদের একই ধরণের উত্তরাধিকার রয়েছে। যেমনি রয়েছে ভারতে ইংরেজদের উত্তরাধিকার। সে কারণেই জন্ম নিয়েছে কমনওয়েলথ এবং সি, আই, এস।

এখানে রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার ও মানবাধিকার সরাসরি সংঘর্ষশীল অবস্থায় রয়েছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানীরা উত্তরাধিকার প্রতিষ্টার জন্য বাংলার মাটিতে মানবাধিকার লংঘন করেছে। বাংগালীরা একযোগে স্বাধিকার ও মানবাধিকার রক্ষার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। ভারত ও রাশিয়া সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। তাই বলে ভারত যখন তার নিজ মুসলিম নাগরিকদের মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত করেছে তখন বাংলাদেশ ভারতের সাথে হাত মিলায় নি। বরং নরম সুরে হলেও ভারতের মানবাধিকার লংঘনের সমালোচনা করেছে এবং এর আশু সমাধান কামনা করেছে। মানবাধিকারের দাবীই হচ্ছে শত্রু-মিত্র ও ধর্ম-বর্ণ নিবিশেষে সকলের জন্য একই আবাসযোগ্য পৃথিবী গড়া।

মস্কো প্রকাশ্যেই গ্রজনীতে পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করলো। চার লাখ লোকের আবাসভূমি গ্রজনী সম্পূর্ণরূপেই ধ্বংশ করে দেওয়া হলো। একই নীতি অনুসৃত হলো সমগ্র চেচনিয়ার জন্য। অথচ পাশ্চাত্যের রাষ্ট্র নায়করা ইয়েলৎসিনের এহেন মানবাধিকার লংঘনকে রীতিমত সমর্থন জানালো। কারণ একটাই, বর্তমানে রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক নয়। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রাশিয়ার জন্য চেচনিয়ায় মানবাধিকার লংঘন কোন বড় ব্যপার নয়।

মানবাধিকার এ ধরণের সূত্র প্রত্যাখ্যান করে জোর গলায়। কে মানবাধিকার লংঘন করলো, এর উপর নির্ভর করে না ভগ্নকারীর অপরাধ। কোন আদর্শের নাম করে মানবাধিকার লংঘন করলে তার শাস্তি থেকে মাফ পাওয়া যায় না। তবে যাদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘিত হয়, তাদের ভোগান্তির ও যন্ত্রণার মাত্রার সাথে মুক্তির একটা সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়।

কে এই দুদায়েভ? সবাই বলছে, প্রাক্তন সোভিয়েট জেনারেল ও পাইলট। এটি তার বড় পরিচয় নয়। মুসলমান হওয়ার কারণে ষ্টালিন আমলে তাঁর মাতা নির্বাসিত হয়েছিলেন কয়েক হাজার

www.pathagar.com

মাইল দূরে। নির্বাসিত জীবনে ঐ মুসলিম মহিলা পৃথিবীর কোন শক্তির কাছে তার মানবাধিকার লংঘনের প্রতিকার চাইতে পারেন নি। কোন মানুষ যখন পৃথিবীর কারো কাছেই তার মানবাধিকার লংঘনের প্রতিবাদ পর্যন্ত জানাতে পারে না, তখন সৃষ্টার কাছে তার আবেদন বড়ই মিনতি ভরা রূপ লাভ করে। এ মিনতি ভরা প্রার্থনায় দুদায়েভের মা একা ছিলেন না। লাখো-লাখো মুসলিম মহিলার সকল মানবাধিকার এক সময়ে ছিনিয়ে নিয়েছিল ষ্টালীনের সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া। পরবর্তীতে এ সব অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কথা সবাই স্বীকার করলেও এর প্রতিকার কেউ করেনি।

পাশ্চাত্য যদি মনে করে থাকে রাশিয়া ধনতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক হওয়ার সুবাদে ইতিমধ্যেই সকল মানবতা বিরোধী অপরাধের জন্য মাফ পেয়ে গেছে এবং চেচনিয়ার সংঘটিত মানবাধিকার লংঘনের জন্যও এখন আর তার কোন অপরাধ নেই, তবে এটি বিরাট ভূল হবে সমগ্র মানব সভ্যতার জন্য।

পাশ্চাত্যে মুসলমানদের সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত ধারণাই হচ্ছে মুসলমানরা বর্বর ও অশিক্ষিত। কাজেই এদের আবার মানবাধিকার কি? বসনিয়ার মুসলমানদের অশিক্ষিত বা বর্বর বললে ইউরোপীয়দের সমস্যা অনেক। প্রথম সমস্যাটি হচ্ছে, এ সূত্রটি তাদের নিজের জন্য ব্যবহৃত হয়ে যাবে।

"Although the technological and Scientific advances and economic achievements of the west were admired and are still admired to-day, from a moral point of view permissiveness of western socienties is regarded as completely decadent. --- The reawakening of Islamic values was thus to be seen as a reaction to the modernist alternatives taken over from Europe. It was in this hour that fundementalist ideology was born, a return to the original principles of Islam and a departure from western lifestyles." (page No. 89, 91).

এ অবস্থা মানবাধিকারের জন্য নানা প্রকার আশা-নিরাশার সঞ্চার করেছে। তাই আজ বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বসনিয়া ও চেচনিয়া কোন সামান্য ব্যাপার নয়। এর প্রতিক্রিয়া ঘটবে সমগ্র বিশ্বে। নতুন বিশ্ব পূর্ণগঠনে এ উপাদানের কার্যকরিতা সুদূর প্রসারী। তবে এ কথা অনস্বীকার্য, ঘৃনা-বিদ্বেষ ছাড়িয়ে কোন আদর্শই জয়ী হতে পারে না। পারে না মানবাধিকার সংরক্ষণে বড় ধরণের ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে। আবার মুধুমাত্র ভোগের অতৃপ্ত আকাংখা দিয়ে সৃষ্টিশীল কোন সমাজ গড়ে তোলা যায় না। এ সবের সব চাইতে বড় প্রমান আজকের পূঁজিবাদী রাশিয়া ।

মানুষ, প্রকৃতি, খাল-বিল, নদী-নালা, ফুল-পাখী, সবাই চায় আদর-যত্ন ও মায়া-মমতা। সবাই নিজ নিজ সংরক্ষণ ও পরিচর্যা দাবী করে নিজ সহজাত নিয়মে। আইনের অস্বাভাবিক কড়াকড়ি,

www.pathagar.com

জবরদস্তিমূলক আচরণ বা ভোগের লেলিহান শিখার দৌরাত্ম মূলতঃ প্রকৃতি বিরুদ্ধ ব্যবস্থা। এ সব ব্যবস্থা কিছুদিন দর্প দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে হতবাক বা মিথ্যা মায়ার বেড়াজালে আবদ্ধ রাখতে পারে; মানবতার জন্য সঠিক যুক্তির জয়গান গাইতে পারে না। বিশ্বনন্দিত কোন সৃজনশীল আদর্শের ধারক বা বাহক হতে পারে না।

এ নিয়ম নানা ভাবে কার্যকর আছে বলেই মানবাধিকার নিয়ে বেশীদিন মিথ্যাচার চলে না। চলে না এর অপব্যাখ্যা। সকল অপব্যাখ্যা ও মিথ্যাচার থেকে বেরিয়ে আসে সত্যের অমিয় ধারা। আর সে ধারায় মিশে থাকে কোন এক পরম সত্তার সৃষ্টির মূর্ছনা। কৃত্রিম পরাশক্তির সামরিক উন্মাদনা হয় রাহুগ্রস্থ হবে, নয়তো বিশ্ব প্রেমের অনলে পুড়ে ছারখার হবে। মানব সভ্যতা ও মানবাধিকারের জয়যাত্রায় এর কোন ব্যতিক্রম ঘটার উপায় নেই।

www.pathagar.com

এরিষ্টটল

(৩৮৪-৩২২ খ্রীষ্টপূর্ব)

মহৎ আদর্শ মানুষকে শুধু অনুপ্রাণিত করে না, মার্জিতও করে তুলে। আদর্শের প্রতি গভীর একাগ্রতার ফলে গ্রীকরা তাদের কলা, স্থাপত্যশিল্প, রাজনীতি, সাহিত্য ও নীতিশাস্ত্রকে পরিমার্জিত করে তুলেছিল। জীবন সম্পর্কে গ্রীকদের যে বিশেষ ধারণা ছিল, তা বিখ্যাত গ্রীক মনীষী এরিষ্টটলের লেখায় পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে। বহু বিশ্বনন্দিত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরাই গ্রীক সভ্যতা ও রাষ্ট্র দর্শন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভের উপায় হিসেবে চিহ্নিত করেন। এরিষ্টটলকে সঠিকভাবে জানার ও উপলব্ধির প্রচেষ্টাকে। তিনি যে গ্রীক সভ্যতার বিশ্বকোষিক ছিলেন, এ ব্যাপারে বিতর্ক বহু আগেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এরিষ্টটলের মূল্যায়নের উপায়-উপকরণ নিয়ে তর্কের পরিসমাপ্তি ঘটেনি, হয়তবা শেষও হবে না। তবে এরিষ্টটলের জীবন ও কর্মের প্রেক্ষাপটকে বাদ দিয়ে কিছুতেই এ বিশ্বকোষিককে জানার উপায় নেই। আমরা মূলতঃ তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাদর্শন সম্পর্কে মৌলিক কিছু জানার ও বুঝার চেষ্টা করব।

প্রেক্ষাপটঃ এথেন্স থেকে প্রায় দু'শত মাইল দূরে থ্রেস (Thrace)-এর উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত ষ্টাগিরা (Stagira) নামক সামুদ্রিক বন্দর নগরীর মেসিডোনিয়া নগরে খ্রীষ্টপূর্ব ৩৮৪ অব্দে প্রাচীনকালের বিশ্বকোষিক এরিষ্টটল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা নিকোমেকাস (Nicomachus) মেসিডোনিয়ার রাজা দ্বিতীয় মিনটাসের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন। তাই যে পারিবারিক পরিবেশে এরিষ্টটলের শৈশবকাল কাটে সেখানে জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পিতার মাধ্যমেই মেসিডোনিয়ার রাজদরবারের সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগসুত্র স্থাপিত হয়।

সেই সময় গ্রীসের প্লেটোর একাডেমী ছিল শ্রেষ্ঠ উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র। Dion, Syracuse সরকারের উন্নতির জন্য প্লেটোকে অনুরোধ করা হলে প্লেটো তাঁর অনুসারীদের মধ্যে "শ্রেষ্ঠ সন্তানদের" (আত্মার অনুসারী) নিজ একাডেমীতে জড় করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। খুব সম্ভবতঃ পিতার মৃত্যুর পর আঠারো বছর বয়সে এরিষ্টটল এথেন্সে আসেন এবং ৩৬৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে প্লেটোর স্থাপিত একাডেমীতে যোগদান করেন। স্বাভাবিকভাবেই এই দীর্ঘ সময়ের নিবিড় সম্পর্কের ফলে এরিষ্টটলের উপর প্লেটোর গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

www.pathagar.com

বিশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সাধনার ফল হিসেবে এরিষ্টটল প্লেটোর চিন্তাধারার সাথে নিবিড়ভাবে একাত্ম হয়ে পড়েন। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, তিনিই গুরুর মৃত্যুর পর একাডেমী পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করবেন। কিন্তু প্লেটো, যিনি রক্তের সম্পর্ক গোপন রাখার জন্য তার বিতর্কিত সন্তান ধারণ ও পালন নীতির প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন, সেই প্লেটোর মৃত্যুর পর একাডেমীর দায়িত্বভার তার ভাগিনেয় Speusippus গ্রহণ করেন। শোকে-দুঃখে খ্রীষ্টপূর্ব ৩৪৭ অব্দে এরিস্টটল একাডেমী ত্যাগ করেন। পরবর্তী ৮ বছর তিনি বিভিন্ন কাজে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু কোন কাজেই নিজেকে গভীরভাবে নিবেদিত করতে পারেননি। একাডেমী ত্যাগ করার পর এরিষ্টটল এশিয়া মাইনরে চলে আসেন এবং সেখানে এসে এককালীন ছাত্র হারমিয়াসের কাছে আশ্রয় নেন। তিন বছর পর হারমিয়াস নিহত হলে এরিষ্টটল মিথিলেনে পালিয়ে যান। এর দুই বছর পর মেসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ তার পুত্র যুবরাজ আলেকজান্ডারকে জ্ঞানী করার দায়িত্ব দেন এরিস্টটলকে। তিনি প্রায় তিন বছর আলেকজান্ডারকে জ্ঞানী করার দায়িত্ব দেন এরিষ্টটলকে। তিনি প্রায় তিন বছর আলেকজান্ডারকে দর্শনশাস্ত্রীয় বিষয়াদি শিক্ষা দেন। আলেকজান্ডার সিংহাসনে আরোহণ করলে এরিষ্টটল তার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩৪ অব্দে আলেকজান্ডার এশিয়াতে তার অভিযান পরিচালনা করতে বেরিয়ে পড়লে, এরিষ্টটল মেসিডোনিয়া ত্যাগ করে আবার এথেন্সে চলে আসেন। রাজদরবারের বা রাজপরিবারের জৌলুস বা উন্নত জীবনবোধ কোনটাই তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তির প্রতি তার আকর্ষণ ছিল বলেই মনে হয়। তার বন্ধু এশিয়া মাইনরের অন্তর্ভূক্ত এটার্নিসের (Atarnas)শাসক হারমিয়াসের (Hearmias) গৃহীতা কন্যাকে বিয়ে করে তিনি সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করেন।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩৫ অব্দে এথেন্সে ফিরে এসে এরিষ্টটল তার নিজস্ব একাডেমী বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লাইসিয়াম (the lyceum) প্রতিষ্ঠা করেন। একাডেমীর পার্শ্বে অবস্থিত মন্দির লিসিয়ামের নামানুসারে তিনি তার একাডেমীর নামকরণ করেন। লাইসিয়ামের গবেষণা পদ্ধতি ছিল প্লেটোর একাডেমীর চাইতে ভিন্নতর। প্লেটোর একাডেমী প্রধানতঃ দর্শন, কলা, সাহিত্য ও বিমূর্ত অংকশাস্ত্র নিয়ে ব্যস্ত ছিল। অথচ লাইসিয়াম মুখ্যতঃ জোর দেয় বাস্তব গবেষণার উপর। বাস্তব গবেষণার জন্য যে ধরনের কলাকৌশল, যন্ত্রপাতি, রসদ ও যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন ছিল,

www.pathagar.com

আলেকজান্ডারের আর্থিক আনুকুল্য ও রাজকীয় পৃষ্টপোষকতা না থাকলে এই বিপুল খরচের ভার বহন করে বাস্তব গবেষণা পরিচালনা করা খুবই দুরূহ ব্যাপার হতো। কথিত আছে, সম্রাট ফরমান জারি করেছিলেন যেন এরিস্টটলের গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য সামগ্রী, জীবজন্তু ও অন্যান্য রসদ সরবরাহ করা হয় এবং এ কাজে তিনি প্রায় এক হাজার লোক নিযুক্ত করেছিলেন।

উত্তরাধিকারসূত্রে এরিষ্টটল তার বাবার কাছ থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ লাভ করেছিলেন। তাই তিনি একটি বিশাল গবেষনাগার গড়ে তুলেন। কারো কারো মতে, হয়তো তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চা ও করেছিলেন। কারণ তার প্রধান গ্রন্থ 'পলিটিক্স' যে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি দিয়ে শুরু তার প্রধান কারণ হয়তো চিকিৎসাবিজ্ঞানের ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে তার ব্যবহারিক জ্ঞান। একই কারণে তার লেখায় রাষ্ট্রের সাথে মানবদেহের তুলনা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়।

এরিষ্টটলের লেখায় তার পূর্বসূরি অনেক গ্রীক মনীষীদের প্রভাব যদিও লক্ষ্য করা যায়, তবুও তাকে সর্বাধিক প্রভাবান্বিত করেছেন তাঁর গুরু প্লেটো। জীববিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ তাঁকে প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠার ভাবনা থেকে মুক্ত করতে পারেনি। তাই তিনি প্লেটোর কথোপকথন অনুসারে কিছু রচনা লেখেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত, সেসব রচনাবলীর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

প্রকৃতিবিজ্ঞানের গবেষণার সাথে সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও তাঁর গবেষণা চলে পুরোদমে। তিনি ১৫৮টি নগর -রাষ্ট্রের সংবিধান ও শাসনব্যবস্থার উপর তথ্য সংগ্রহ করে লাইসিয়ামে একটি আলাদা বিভাগ গড়ে তোলেন। কারো কারো মতে তিনি সত্তরটিরও বেশি নগর-রাষ্ট্রের মৌলিক আইন সংগ্রহ করেছিলেন। জীববিজ্ঞান বা প্রকৃতিবিজ্ঞানে নিরপেক্ষ গবেষণা যতটা সহজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা আইনশাস্ত্রে নিরপেক্ষ গবেষণা ততটা সহজ নয়। কোন বিশেষ ব্যবস্থা বা আইনের প্রতি ঝোঁক-প্রবণতা বা দুর্বলতা গবেষককে সহজেই আচ্ছন্ন বা প্রভাবিত করতে পারে। এক্ষেত্রে এরিষ্টটলের বিশেষ সুবিধা ছিল।

যদিও তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই এথেন্সে অতিবাহিত হয়, তবুও তিনি এথেন্সের নাগরিক ছিলেন না। কারণ তিনি এথেন্সে জন্মগ্রহণ করেননি। এথেন্সবাসীদের জন্য জন্মসূত্রে নাগরিক হওয়া ছাড়া কোন বিকল্প ছিল না। বহিরাগত ছিলেন বলে তিনি এথেন্সে বিদেশী বলে গণ্য হতেন। সমাজবিজ্ঞানী, পর্যবেক্ষক, গবেষক হিসেবে সবকিছু

www.pathagar.com

করার অধিকারই তিনি পূর্ণমাত্রায় ভোগ করেছিলেন। কিন্তু নগর-রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনায় তিনি কোন ভাবেই যুক্ত ছিলেন না। আপাতঃ দৃষ্টিতে এই অবস্থা তাঁর জন্য দুর্ভাগ্যজনক হলেও, বস্তুতঃ এ কারণেই তিনি নিজের পছন্দ-অপছন্দ, লাভ-লোকসানের হিসেব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে কালজয়ী নিরপেক্ষ গবেষণা কর্মের ফসল মানব সভ্যতাকে উপহার দিতে পেরেছিলেন।

আধুনিক যুগে রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং আইন-দর্শনের এত শ্রীবৃদ্ধি ও জৌলুস সাধিত হওয়া সত্ত্বেও এরিষ্টটলের রাষ্ট্র-ভাবনা ও আইন-দর্শন মানব সভ্যতার জন্য অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছে। তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও আইন-দর্শন মানব সভ্যতার জন্য অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছে। তাঁর চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারনা ও মতাদর্শ এখনও আমাদের জন্য মূল্যবান চিন্তার খোরাক। তার বহু চিন্তা আজও ভিত্তিহীন বা মূল্যহীন বলে পরিত্যক্ত হয়নি। লাইসিয়ামে তিনি বার/তের বছর ধরে অধ্যয়ন ও শিক্ষকতা করেন। এরিষ্টটলের অধিকাংশ লেখা এখানে বসে রচিত। লাইসিয়ামের সুনাম যখন তুঙ্গে, এরিষ্টটল তখন সাফল্যের শীর্ষে তখনই তাঁর গবেষণাকেন্দ্রের জন্য গভীর সংকটকাল নেমে আসে। খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর এথেন্সে মেসিডোনিয়া বিরোধী দল ক্ষমতায় আসে। ফলে এথেন্সে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে উঠে। দারুণ রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। এরিষ্টটলের বিরুদ্ধেও নাস্তিকতার অভিযোগ উপস্থাপিত হওয়ার আশু সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং ক্ষমতাসীন দল এরিষ্টটলের মৃত্যুদণ্ড দাবি করতে থাকে।

এরিষ্টটল সক্রেটিসের মতোই ভাগ্য বরণ করতে রাজি ছিলেন না। এথেন্সবাসীও যেন তাঁর বিরুদ্ধে তথা জ্ঞান ও সত্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে আর পাপ না করে, সেজন্য তিনি আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর খ্রীস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে এথেন্স ত্যাগ করেন এবং পরের বছর মৃত্যুবরণ করেন।

লাইসিয়ামে থাকাকালীন সময়ে (৩৩৫-৩৩২ খ্রীষ্টপূর্ব) তিনি যে ১৫৮টি নগরের জাতীয় দলিল গণতন্ত্রের ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা করেন। তার মধ্যে শুধু একটি গঠনতন্ত্র বর্তমানে পাওয়া যায়। ১৮৯১ সালে সুনিশ্চিত ভাবে জানা যায় যে, এটিই এরিস্টটলের সময়ের এথেন্সের গঠনতন্ত্র নামে আখ্যায়িত ছিলো।

গবেষণা পদ্ধতিঃ এরিষ্টটলের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব তাঁর জীবনীতে নয়, বরং কর্মে একমাত্র গণিতশাস্ত্র ছাড়া জ্ঞানের প্রায় সব বিষয়েই তিন পন্ডিত ছিলেন। এরিষ্টটল একই সাথে যুক্তিবিদ্যা, অধিবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপর গবেষণ

www.pathagar.com

চালান। তাঁর এসব গবেষণায় একই ধরনের পদ্ধতি অনুসৃত হয়। সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রদর্শন ও আইনশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে তিনি যে পদ্ধতির জন্ম দিয়েছিলেন তাকে "আরোহ (inductive)পদ্ধতি" বলা হয়। অনেকে আবার এই পদ্ধতিকেই একমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে অভিহিত করেন। এরিষ্টলের গবেষণা পদ্ধতির পাঁচটি স্তর রয়েছে।

১. প্রকল্প বা অনুমান (Hypothesis)
২. ব্যাপক অনুসন্ধান এবং তথ্যাবলীর সংগ্রহ (Extensive investigation and collection of information)
৩. কার্যকারণ সম্পর্ক (Cause and effect relationships)
৪. আইনকে সাধারণ সূত্রাকারে ব্যক্তকরণ ও সাধারণীকরণ (Generalisation and formulation of laws)
৫. পূর্ব সংকেত বা ভবিষ্যদ্বাণী করা (Prediction)।

যদি আমরা ধরি যে, অমনোযোগী ও বেয়াদব ছাত্ররাই পরীক্ষায় খারাপ করে, তবে এটি প্রথমে একটি অনুমান মাত্র। এ অনুমানটি সঠিক কি-না তা নির্ধারণের জন্য আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের উপর একটা সমীক্ষা চালাতে পারি। প্রথমে আমাদের আইন বিভাগের গত কয়েক বছরের বিভিন্ন বর্ষের ছাত্রের পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ করতে হবে। সেখান থেকে যারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে বা খারাপ নম্বর পেয়ে পাস করেছে, তাদের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। এ তালিকা প্রস্তুত করার সময় তাদের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল, মেধাগত যোগ্যতা, সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবর্ষ সমূহে তাদের শারীরিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, পারিবারিক অবস্থা, দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং এর সাথে ছাত্রের সম্পর্ক পরিস্কার করতে হবে। ছাত্রাবাস বা হলে অবস্থানকারী একজন ছাত্র সন্ত্রাস ও রাজনীতির কারণে যতখানি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, বাড়িতে থাকা একজন ছাত্রকে আবার এ ধরনের পরিস্থিতি ততটা ক্ষতি করে না। আবার পরিবারের সাথে থেকে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া একজন ছাত্রের জীবনে পারিবারিক অশান্তি বা গোলযোগ যতখানি প্রভাব ফেলে, হলে থাকা আরেকজন ছাত্রের তেমন প্রভাব ফেলা সম্ভব নয়। তাই বেয়াদব ও অমনোযোগী ছাত্র এবং পরীক্ষায় খারাপ করা ছাত্রদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করতে হবে। যেমনঃ আবাসিক, অনাবাসিক, আর্থিকভাবে সচ্ছল ও অসচ্ছল,

www.pathagar.com

রাজনীতির সাথে জড়িত বা জড়িত নয়, টি.এস.সি-র আড্ডার সাথে জড়িত বা জড়িত নয়। বিভিন্ন ধরনের ছাত্রের পরীক্ষার ফলাফলের উপর বিভিন্ন ঘটনার শুভ বা অশুভ, ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাবের নিরপেক্ষ তথ্য সংগ্রহের পর এসব তথ্যের শ্রেণীবিন্যাস ঠিক করে নিতে হবে।

এবার কোন ধরনের ছাত্রদের ফলাফলের জন্য কোন ধরনের কারণ বেশি দায়ী, তা নির্ণয করতে হবে। বেয়াদব বা অমনোযোগী হওযার পেছনে কোন সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক কারণ বেশি দায়ী তাও সঠিকভাবে নিরূপণ করতে হবে।

তাই অনুসন্ধানের পর তথ্য সংগ্রহকে যদি আমরা এরিস্টটলীয় গবেষণার দ্বিতীয় স্তর ধরি, তবে তৃতীয় স্তর হচ্ছে তথ্যাবলীর শ্রেণীবিন্যাস। এ শ্রেণীবিন্যাসেও সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি ব্যবহৃত হতে হবে। তথ্যাবলীর শ্রেণীবিন্যাসের সময় কার্যকলাপ সম্পর্ক নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করতে হবে।

তৃতীয় স্তরে সঠিকভাবে কারণ ও ফলাফল স্থাপিত হবার পর, চতুর্থ স্তরে এ সম্পর্ক থেকে কিছু সাধারণ নিয়ম ও সত্য উদঘাটিত হয়ে পড়বে। এসব সাধারণ সত্য বা নিয়মাবলীর বর্ণনার ভিত্তি অবশ্যই হবে Causal relationship অর্থাৎ কার্যকরণ সম্পর্ক।

সাধারণ নিয়ম তৈরির সময় হয়তো দেখা যাবে যে, কোন একজন ছাত্র বেয়াদব ও অমনোযোগী হওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষায় ভাল করছে। সেক্ষেত্রে ছাত্রটি হয়ত অসাধারণ মেধাবী বা পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভূক্ত হবে। যদি দেখা যায় ঐ ব্যতিক্রমধর্মী ছাত্রটি মেধাবীও না, আবার পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের কোন আলামত পাওয়া যাচ্ছে না; তাহলে ধরে নিতে হবে যারা পরীক্ষার খাতা দেখেছিলেন বা প্রশ্ন করেছেন বা যারা পরীক্ষায় নিয়ন্ত্রক ছিলেন তাদের কারো সাথে ছেলেটির যোগাযোগের ফলে এরূপ ভাল ফল লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

তাহলে এ গবেষণার পূর্ব সংকেত বা ভবিষৎবাণী হবে, যদি পরীক্ষা পদ্ধতিও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাকে দূর্নীতিমুক্ত রাখা যায়, তবে বেয়াদব ও অমনোযোগী ছাত্র পরীক্ষায় ভাল ফল লাভ করবে না। ব্যতিক্রম অবশ্যই থাকতে পারে।

www.pathagar.com

এরিষ্টটলের এ গবেষণা পদ্ধতিই তাকে তাঁর গুরু প্লেটো থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে তোলে। প্লেটো প্রথমেই কোন কিছুকেই চূড়ান্ত সত্য হিসেবে ধরে নিয়ে তাকেই তত্ত্ব ও তথ্যের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতেন। প্লেটো তাঁর রচনায় অবরোহ পদ্ধতি (deductive method)বা চিন্তামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করতেন।

উদাহরণঃ দার্শনিক-রাজার শাসন অবশ্যই উৎকৃষ্ট, এটি প্লেটোর একটি সার্বজনীন সত্য। যদি কোন রাষ্ট্রে এটি সঠিক বলে প্রমাণিত না হয়, তবে ঐ রাষ্ট্র, সমাজ বা জনগোষ্ঠীকেই এজন্য দায়ী করতে হবে, দার্শনিক-রাজাকে নয়।

তেমনি শাসকশ্রেণী যদি কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও স্ত্রী-পুত্রের অধিকারী না হয়, তবে সমাজে অবশ্যই সাম্য ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি তা না হয়, তবে এ সমাজের অন্য কোন নিয়মনীতি এজন্য দায়ী হবে। আর এ নীতির সার্বজনীনতা বহাল থাকবে। অর্থাৎ প্লেটো রাষ্ট্র ও আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়ম-কানুনকে অংক শাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধের মত পেতে চেয়েছেন। আর এরিষ্টটল এসব কিছুকে সমাজ, রাষ্ট্র ও মানুষের অভিজ্ঞতা, আচার-আচরণ, বিচার-বিশ্লেষণ, আলোচনা-পর্যালোচনা, সমীক্ষা ও গবেষণার নিরপেক্ষতার উপর ছেড়ে দিতে চেয়েছেন।

এরিষ্টটলের এ আরোহন পদ্ধতি (Inductive method) সরকার প্রণালীর তুলনামূলক আলোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে পুরোদমে ব্যবহৃত হয়েছিল। ইতিহাস ছিল তার গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণের সবচেয়ে বড় ভিত্তি। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর নিরপেক্ষতা অনুধাবন ও পর্যালোচনাই ছিল তাঁর গবেষণার মূল বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে ভাবাবেগ, কবিত্ব ও অলৌকিকত্বের স্থানকে এরিষ্টটল অস্বীকার করেছেন। নীতি কথার আধিক্য এবং অপ্রয়োজনীয় বাগাড়ম্বরতাকেও তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আইনশাস্ত্রের জন্য বিপজ্জনক মনে করতেন। তাই শাসন ও আইন সম্পর্কিত বিদ্যাকে তিনি বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ গবেষণার অধীন করতে প্রয়াস চালান। তিনি উপলব্ধি করেন যে, কোন এক প্রকার সরকার সকল অবস্থায় সর্বোৎকৃষ্ট হয় না। তাই সাধারণ মানুষের বিভিন্নমুখী চাহিদার সাথে সংগতি রেখেই সংবিধান প্রণয়ন করতে হয়।

এরিষ্টটলের পলিটিক্সঃ এরিষ্টটল আদৌ গ্রন্থ রচনার নিমিত্তে তার কলম ধরেছিলেন কি-না, এটি একটি বিতর্কিত বিষয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় লাইসিয়ামে তার শিষ্যদের জন্য তৈরী আলোচনা ও গবেষণা কর্মই পরবর্তীতে এরূপ একটি পুস্তকের রূপ

www.pathagar.com

ধারণ করে। পলিটিক্সও এর অন্তভূক্ত। পলিটিক্স গ্রন্থ সম্পর্কে নানা ধরনের বিতর্ক প্রচলিত রয়েছে। কেউ কেউ এমনও কথা বলেন যে, গ্রন্থটির সবটুকু এরিষ্টটলের সৃষ্টি নয়; বরং পরবর্তীতে তার শিষ্য ও ভক্তরা সংযোজন, বিয়োজন ও সম্পাদনের মাধ্যমে এটিকে বর্তমান রূপ দিয়েছেন। এসব ধারণার পেছনে মূল কারণ হচ্ছে, এরিষ্টটলের মৃত্যুর চারশত বছর পর এর পুস্তক আকারে আত্মপ্রকাশ। এর পূর্বে এটি পাণ্ডুলিপির আকারেই ছিল। তাঁর অনুসারী ও শিষ্যরা এর প্রতিলিপি রক্ষা করেছেন এবং তাদের জ্ঞানসাধনায় ও গবেষণায় এটি ব্যবহার করে আসছিলেন।

এ পুস্তকটি যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে আমরা আটটি ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ দেখতে পাই। প্রতিটি প্রস্থকে একটি আলাদা পুস্তিকা হিসেবে ধরা যেতে পারে। এই গ্রন্থ বিভাগ পুস্তিকাটির ধারাবাহিকতা বেশ খানিকটা ক্ষুণ্ন করেছে। অনেক অসংলগ্ন ও অসমাপ্ত আলোচনাও রয়েছে এতে। আবার একই কথার পুনরাবৃত্তিও রয়েছে। কোন সমালোচনা শুরু করে তার ব্যাখ্যার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা যেন রক্ষা করা হয়নি। এসব কিছুর জন্যই কেউ কেউ বলেন, মূলতঃ পুস্তক আকারে প্রকাশ করার সময় সম্পাদকদের কলমই পলিটিক্সের এই রূপ পরিগ্রহ করার কারণ। কিন্তু Werner Jaeger (ওয়ার্নার জ্যাগার) এই বিশ্বাস প্রত্যাখান করেন। তিনি মনে করেন, 'পলিটিক্স' মূলতঃ এরিষ্টটলই এভাবে সাজিয়েছিলেন এবং তার অনুসারীরা এর কোন পরিবর্তন না ঘটিয়েই একে পুস্তক আকারে প্রকাশ করেছেন।

কেবা কারা পলিটিক্সকে এভাবে আটটি ছোট ছোট পুস্তকের সংযোজন হিসেবে প্রথম ছাপিয়ে বইয়ের রূপ দিয়েছিলেন, এটি আজ কোন মৌলিক ব্যাপার নয়। মৌলিক ব্যাপার হচ্ছে এর মূল বিষয়বস্তু। পলিটিক্সে'র মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, Polis বা Political community. Polis-এর কোন সঠিক বাংলা বা ইংরেজী প্রতিশব্দ দেয়া কঠিন।

তবে 'পলিস'-এর প্রতিশব্দ 'রাষ্ট্র' হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু 'পলিস'-এর যে মহৎ ও উৎকৃষ্টতম উদ্দেশ্যের কথা বলা আছে, তা কি রাষ্ট্রের জন্য প্রযোজ্য ? রাষ্ট্র কি সত্যিই সবচেয়ে মঙ্গলজনক কাজের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ ? রাষ্ট্র কি সত্যিই তার মাঝে অবস্থিত সকল ভাল সংস্থাকেই শুধু বক্ষে ধারণ করে? আধুনিক যুগে শুধুমাত্র ভ্যাটিকান রাষ্ট্রকেই হয়তোবা 'পলিসঃ-এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। তবুও 'পলিস'-এর কার্যাবলীর সাথে এর মিল খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। মূলতঃ এরিষ্টটল যে শাসনব্যবস্থায়

www.pathagar.com

রাষ্ট্র, সমাজ, সংঘ ও মানুষকে মহৎ উদ্দেশ্যে একে অপরের মাঝে একাত্ম করে বিলীন করতে চেয়েছেন, তেমন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বাস্তবে কখনোই হয়তো দেখা যায়নি। এরিষ্টটল প্রায়ই 'পলিস'-কে একটি জীবন্ত শরীরের সমতুল্য মনে করতেন।

মানুষের শরীরের কার্যাবলীর জন্য যেমন একই সাথে শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্মিলিত কর্ম তৎপরতা প্রয়োজন, তেমনি 'পলিস'-এর কার্যাবলীর জন্যও এরিষ্টটল তার সকল সংঘ ও সদস্যের ঐক্যবদ্ধ কর্মতৎপরতা জরুরী বলে অভিহিত করেন।

আধুনিক যুগে প্লেটোর আদর্শ-রাষ্ট্র বা এরিষ্টটলের 'পলিস' বাস্তবে রূপলাভ করার প্রচেষ্টা একান্তই কল্পনাবিলাস মাত্র। কিন্তু এরিষ্টটল মনে করেন, যেহেতু মানুষ মাত্রই কল্যাণ ও মহত্ত্বর কিছুর চেষ্টায় নিবেদিত, তাই 'পলিস' এরও উদ্দেশ্য অনুরূপ হতে বাধ্য। উভয়ের উদ্দেশ্য যেহেতু এক ও অভিন্ন, তাই কার্যাবলীও একই ধরনের হতে বাধ্য। এরিষ্টটল মানুষকে আদর্শ মানুষ এবং শাসন ব্যবস্থাকে আদর্শ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা হিসেবে পেতে চেয়েছেন। তাই তিনি রাষ্ট্র না বলে 'সম্প্রদায়' কথাটি বারবার ব্যবহার করেছেন। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের প্রভাব প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। কাজেই 'পলিস'-এর অনুরূপ কার্যাবলী নিয়ে কোন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন আজ আর সম্ভব নয় বলেই মনে হয়।

এরিষ্টটল আজকের দিনের উদারতাবাদ বা সর্বাত্মকবাদ কোনটার সমার্থক অন্য কোন রাষ্ট্র-চিন্তা দাঁড় করাননি। তিনি আইন, রাষ্ট্র ও মানুষকে নিজ নিজ প্রয়োজনেই একই পথের পথিক করে একই উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রাণ করতে চেয়েছিলেন। ব্যাপারটা অনেকটা এরূপ, একজন ছাত্র লেখাপড়া করে জানার জন্য। জ্ঞান অর্জন করা তার উদ্দেশ্য। তার জ্ঞান তাকে কিছু কাজ করতে সাহায্য করে। কাজটা করার প্রয়োজন হয়তো এমনিতেই রয়েছে। কিন্তু কাজটি করে যে কিছু অর্থ বা খাদ্য লাভ করার সুযোগ পাচ্ছে। লেখাপড়া করা বা জ্ঞানসাধনার সাথে ছাত্রের ক্ষুধা মেটানোর হয়তো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। কিন্তু তাদের পরোক্ষ যোগাযোগ রয়েছে বৈকি? তাদের পরোক্ষ যোগাযোগটি মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সবকিছুরই একটা চূড়ান্ত বা চরম উদ্দেশ্যের কথা এরিষ্টটল বলেন, আর সেখানেই সবাই একাত্ম।

ক্ষুধা নিবারনের জন্য খাদ্য প্রয়োজন, অজ্ঞতা দূর করার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। কিন্তু খাদ্য গ্রহণ বা জ্ঞানসাধনার মহৎ কোন উদ্দেশ্য থাকতেই হবে। খাদ্য গ্রহণের জন্য

www.pathagar.com

বেঁচে থাকার কোন মূল্যই নেই। জ্ঞানসাধনা করে শুধু চাকরি করে রোজগার করাটা মূখ্য হলে এ জ্ঞান তেমন একটা মহৎ নয়। সব কাজেরই মহৎ উদ্দেশ্য থাকতে হবে। 'পলিস'-এর সংজ্ঞা দিয়ে এরিষ্টটল প্রথম পুস্তকেই দু'টি ব্যাপার পরিস্কার করে দেন। যেমনঃ

প্রথমতঃ 'পলিস'-এ যে ঐক্যতান তিনি দেখতে চেয়েছেন তা সাধারণ অংকের নিয়ম নয়। এটি একটি জটিল সামগ্রিক ব্যাপার।

দ্বিতীয়তঃ 'পলিসঃ আইন বা ঐতিহ্য দ্বারা সৃষ্ট নয়, এটি প্রকৃতি দ্বারাই সৃষ্ট। 'পলিস'-এর কর্তৃত্ব জোর করে চাপানোর জিনিস নয়। এটি প্রকৃতিই নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে।

দাসতত্ত্ব

এরিষ্টটলের পলিটিক্স শুরু হয় নগর-রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিয়ে। এর প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে, পরিবার, দাসপ্রথা, সম্পদ সংগ্রহ ও এর ব্যবহার এবং শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক। কিন্তু প্রথম পুস্তকের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর দাসতত্ত্ব। অনেকে হয়ত ভাববেন সে যুগে দাসের আধিক্য ও রাষ্ট্রীয় জীবনের তাদের বাধ্যতামূলক শ্রমের কারণেই হয়ত এরিষ্টটল তাঁর দাসতত্ত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ব্যাপারটি কিন্তু তা নাও হতে পারে।

এরিষ্টটল প্রতিটি জিনিসের ভিতরই দাস ও প্রভুর সন্ধান পেয়েছেন। প্রথমে তিনি প্রকৃতির ভিতর একশ্রেণীকে প্রভু, আর অন্য শ্রেণীকে দাস হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। মানুষকে একক ধরে এর ভিতরে শরীরকে দাসের প্রতিনিধি, আর মন বা আত্মাকে প্রভুর প্রতিনিধি ভাবতে শুরু করেছেন। প্রকৃতি বা একজন মানুষের ভিতরই দাস ও প্রভুর পৃথকীকরণ হয়ত অনেকের কাছেই বোধগম্য নাও হতে পারে। তাই তিনি পরিবারকে একটি একক ধরে এর ভিতরের অবস্থা ব্যাখা করেছেন। পরিবার সৃষ্টির জন্য শুধু একজন নারী ও পুরুষের একত্রে বসবাসকে তিনি যথেষ্ট মনে করেননি। তাঁর দৃষ্টিতে পরিবারে দাসের উপস্থিতি অপরিহার্য। তা না হলে পরিবার বেশিদিন সচল থাকবে না। তাঁর মতে, পরিবারের প্রধান রাজার মত। তিনি স্ত্রী ও সন্তানের উপরও রাজত্ব করবেন। কিন্তু দাসের উপর রাজত্বের প্রকৃতি হবে ভিন্ন।

www.pathagar.com

পরিবারের ভিতর এরিষ্টটল তিন ধরনের সম্পর্ক খুঁজে বের করেছেন। এ তিন ধরনের সম্পর্কই পরিবারের প্রধানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। পরিবারের এ ধরনের সম্পর্ককে তিনি পরিবার গঠনের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পরিবারের তিনটি উপাদান; যেমন - (১) প্রভু-দাস, (২) স্বামী-স্ত্রী এবং (৩) পিতা-সন্তান স্বীকার্য। ছোট পরিবারে প্রভু, স্বামী ও পিতা একই ব্যক্তির মাঝে সমন্বিত হয়। কিন্তু বড় পরিবারে তা নাও হতে পারে। তাই পারিবারিক সম্পর্ককে তিনি দুইভাবে ভাগ করেছেন (১) বৈবাহিক ও (২) পিতৃগত। কিন্তু দাস-প্রভুর সম্পর্কতো এর কোনটির মধ্যেই পড়ে না। তাই ঐ সম্পর্ককে অভিহিত করেছেন স্বৈরতান্ত্রিক হিসেবে। স্বৈরতান্ত্রিক নামকরণ করে তিনি এর পক্ষেই কথা বলেছেন। কারণ তাঁর মতে, পরিবারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে চালু রাখার জন্য এ সম্পর্কের বিকল্প নেই। আধুনিক জীবনের প্রবাহ দিয়ে দেখতে গেলে এসব দাসকে পরিবারের "কাজের লোক" (চাকর-চাকরানী)-এর সাথে তুলনা করা যায়। কাজের লোক শুধু এজন্যই প্রয়োজন নয় যে, পরিবারের কাজ অনেক। বরং প্রয়োজন পরিবারের সদস্যদের কাজ করা থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য। পরিবারের প্রধানের কথায় যদি স্ত্রী বা সন্তান কাজ না করে, অবাধ্যতা দেখায়, তখন কাজের মানুষই একমাত্র ভরসা। এ প্রক্রিয়া এক পর্যায়ে পরিবারের সবাইকেই বাসার কাজের মানুষের অপরিহার্যতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এরিষ্টটলের মতে, কৃষি কাজ থেকে শুরু করে গৃহস্থালী সকল কাজের জন্য দাস ছিল পরিবার গঠনের অন্যতম উপাদান। দাসকে তিনি পরিবারের সম্পদ হিসেবে দেখেছেন। সম্পদের সংজ্ঞা দিয়ে তিনি বলেন, গৃহের ভেতর ও বাইরে পরিবারের জন্য প্রয়োজন সব কিছুই হচ্ছে সম্পদ। সম্পদের অপর নাম দিয়েছেন যন্ত্র। যন্ত্রকে ভাগ করেছেন দুই ভাগে (১) সজীব যন্ত্র ও (২) অজীব যন্ত্র। দাসকে সজীব যন্ত্র হিসেবে দেখে এর মধ্যে একাধিক যন্ত্রের কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ করেছেন। কাজেই তাঁর দৃষ্টিতে দাস হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি অতি প্রয়োজনীয় সম্পদ। সম্পদ হিসেবেই দাস তখন বাজারে বিক্রি হতো। দাসের কোন নিজস্ব আইনানুগ ব্যক্তিসত্ত্বা স্বীকৃত ছিল না। কাজেই এরিষ্টটল দাসকে সম্পদ বিবেচনা করে তখনকার দিনের সাধারণ নিয়ম-নীতির প্রতিফলনই ঘটিয়েছেন। "আর এদিক থেকে সম্পদ বলতে আমরা জীবন যাপনের উপায়ের সমষ্টিকে বুঝাব। জীবন যাপনের উপায়ের সমষ্টির মধ্যে দাসও অর্ন্তভূক্ত। দাস পরিবারের জন্য একাধিক যন্ত্রের মত কাজ করে যাবে। পরিবারকে সচল রেখে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখবে। তাকে সবাই প্রয়োজনীয় সম্পদ হিসেবে দেখবে। তার অভাব সবাই

www.pathagar.com

অনুভব করবে। কিন্তু তাতে মানুষ হিসেবে দাসের লাভ কি ? এ প্রশ্নের সন্ধানে এরিষ্টটল বেশ কিছু যুক্তির অবতারণা করেছেন। তাঁর যুক্তি সরাসরি দাসের পক্ষে যায়নি। বরং প্রভুর স্বার্থের অনুকুলেই শক্তি যুগিয়েছে। তাই এক পর্যায়ে এসে তিনি বলেছেন, এখানে কাউকে দায়ী করা যায় না কারণ প্রকৃতিই যেন দাস হওয়ার উপযুক্ত করে তাকে সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ শরীরকে যখন আত্মার দাস বানানো হচ্ছে, তখন শরীরকে খাটো করার জন্য যেমন কাউকে দায়ী করা যায় না; তেমনি প্রভুর মোকাবিলায় দাসের অসহায়ত্বকেও এরিষ্টটল স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়ম হিসেবে গণ্য করেছেন।

একজন মানুষ প্রকৃতিগতভাবে দাস এবং তার সত্তা প্রভুর কাছে এমনভাবে সমর্পিত যে, তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার উপায় নেই, এ যুক্তিকে মেনে নিলে অন্য একটি প্রশ্ন উঁকি দেয়। তাহলে কি এরিষ্টটল দাসকে মানুষ বলতেই নারাজ? তার "মানুষ" তো অবশ্যই শরীর ও আত্মার ভারসাম্যমূলক সম্মিলিত রূপ। তাহলে কি তিনি বলতে চাইছেন যে, একজন দাসের আত্মা নেই। নাকি দাসের আত্মা তার শরীরের সাথে ভারসাম্যহীনতায় ভুগছে ? সর্বোপরি এজন্য কি সত্যিই প্রকৃতি দায়ী? নাকি মানুষ ও তার সমাজই এর জন্য দায়ী ? এসব প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান লিখিত হয়েছে প্রথম পুস্তকে পঞ্চম অধ্যায়ে। অধ্যায়টির নামকরণ করা হয়েছে "প্রকৃতিগতভাবে কে দাস, কে প্রভু?" এখানে এরিষ্টটল বুঝাতে চেয়েছেন যে, একই ধরনের সৃষ্টির একটি অংশ শাসক, আর অন্যটি শাসিতের ভূমিকা পালন করে। কাজেই মানুসের মধ্যেও একটি শাসক শ্রেণী, আর অন্যটি শাসিতের ভূমিকা পালন করে। কাজেই মানুসের মধ্যেও একটি শাসক শ্রেণী, অন্যটি শাসিত। মানুষ হিসেবে কোন কোন বিচারে হয়ত তারা একই কাতারবন্দী; কিন্তু যোগ্যতা হিসেবে তাদের পার্থক্য মৌলিক ও প্রকৃতিগত। আদি হিন্দু শাস্ত্রে যেমন স্ত্রী মানুষ ঠিকই, কিন্তু যেহেতু তার সমগ্র সত্তা স্বামীর হৃদয়ে সমর্পিত, তাই স্বামীর মৃত্যুর পর সতীদাহ করেই তার জন্মের স্বার্থকতা। ঠিক তেমনি এরিষ্টটলীয় যুক্তি হচ্ছে, দাস মানুষ বটে; কিন্তু যেহেতু প্রভুর উপস্থিতির কারণেই সে মানুষ, তাই প্রভুর মাঝে বিলীন হয়েই তার জন্মের সার্থকতা। কিন্তু সজীব প্রাণীর যে সংজ্ঞা তিনি দেন, তাতে কিন্তু তার যুক্তি তেমন একটা অকাট্য বলে ধরা যায় না। "মন শাসক এবং দেহ শাসিত, একথা বলতে আমরা নির্ভর করব মানসিক এবং দৈহিকভাবে একজন সুস্থ মানুষের উপর অর্থাৎ যে মানুষের মধ্যে দেহের উপর মনের শাসন সুস্পষ্ট। এর বিপরীত, অর্থাৎ মনের উপর দেহের শাসন সংঘটিত হয় অধম মানুষ কিংবা অধম অবস্থার

www.pathagar.com

মানুষের মধ্যে।

কিভাবে বুঝা যাবে, একজন প্রভু-মানুষ তার দেহের উপর অর্থাৎ সকল প্রবৃত্তির উপর যুক্তিযুক্ত নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখছে। পক্ষান্তরে দাস মানুষটি যে তার প্রবৃত্তির দাস তাই বা বুঝার উপায় কি হবে? সতীদাহ প্রথাও যদি স্বামীকে একইভাবে স্ত্রীর মৃত্যুর পর জ্বলন্ত চিতায় একই সাথে পুড়িয়ে মারার বিধান দিত, তাহলে হয়ত স্বামী-স্ত্রী মিলে যে একটি মাত্র সত্তা সৃষ্টি করেছে তার পক্ষে কথা বলা যেত। কিন্তু তা তো হয়নি। তেমনি দাস-মানুষ তার শরীরের উপর কিরূপ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারত, তা দেখানোর কোন সুযোগই তার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। অথচ বলা হচ্ছে, যেহেতু তার আত্মা (এখানে বুদ্ধিমত্তা বলা যেতে পারে) তার প্রবৃত্তির (দৈহিক ক্ষমতার) উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছে না, তাই সে শুধুমাত্র দাস হিসেবেই চিহ্নিত। তদুপরি এও বলা হচ্ছে না যে, একজন প্রভু-মানুষ যখন প্রবৃত্তির দাস হয়ে যাবে, তখন তাকে দাস-মানুষে রূপান্তরিত হতে হবে এবং একই প্রক্রিয়াতে একজন দাস-মানুষকে প্রভু-মানুষে উন্নীত করা হবে। মূলতঃ একটি শিশু তা যে ঘরেই জন্ম নিক না কেন, সে তো তার প্রবৃত্তির উপর কোনই নিয়ন্ত্রণ রাখে না।

এরিষ্টটল মনে হয়, তার এ যুক্তির দুর্বলতা খানিকটা হলেও অনুভব করেছেন। তাই মানুসের বুদ্ধিমত্তার পার্থক্যকে জন্ম ও প্রকৃতির অন্তর্নিহিত নিয়মের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। অর্থাৎ প্রকৃতিগত বা জন্মগতভাবেই একজন অন্যজনের চেয়ে বেশি বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অধিকারী। চেষ্টা-সাধনা, অধ্যবসায় ও পরিবেশ-পরিস্থিধতির অবদান এখানে যৎসামান্য। একথা বলেই আবার এরিষ্টটল বলেছেন যে, প্রকৃতির যেমন নিয়ম আছে, আবার সে ব্যতিক্রমও সৃষ্টি করে। ব্যতিক্রম সৃষ্টিতেও প্রকৃতিই কর্মকার, মানুষ নির্বাক ও হতবাক।

এরিষ্টটলীয় মর্মবাণী আজকের জীবনের ঘটনা দিয়ে বুঝতে গেলে বলতে হবে, শ্রমিককে মালিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কারখানা বন্ধ না করিয়ে, বরং শ্রমিক হিসেবে কাজ করে মজুরী নেয়াই তার নিজের জন্য কল্যাণকর। গৃহস্থায়ী কাজে নিয়োজিত লক্ষ লক্ষ কাজের ছেলে-মেয়েকে হয়ত গৃহস্বামীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসা যাবে কিন্তু তাতে কি তাদের লাভ হবে? এখন তারা নির্যাতিত হচ্ছে নানাভাবে, একথা ঠিক এবং বর্তমান অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে, তাদের উপর আর নির্যাতনের ভয় থাকবে না, এটিও ঠিক। কিন্তু তাদের জীবন ধারণে কোন

www.pathagar.com

উপায় কি তারা খুজে পাবে? এটি এক নিষ্ঠুর বাস্তবতা। রিক্সাচালকদের অবস্থাও ঠিক অনুরূপ। এরিষ্টটল বাস্তব এ নিষ্ঠুরতার আলোকেই দাস প্রথাকে মেনে নিয়েছিলেন এবং একে আইন সংগত রাখার জন্য দাস সংগ্রহের উপায়সমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

প্রথম পুস্তকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এরিষ্টটল দাস শ্রেণীকে দুই ভাগে ভাগ করেছেনঃ প্রকৃতিগত দাস ও আইনগত বা প্রথাগত দাস। তখনকার দিনে যাদেরকে দাসত্ব মেনে নিতে হচ্ছিল, তাদের কতজন প্রকৃতিগত দাস, আর কতজন আইন বা প্রথাগত পড়ে দাস, তা বলা কষ্টকর ছিল। দাস যেহেতু কেনা বেচা হতো তাই তাদের দামও উঠা নামা করত। বয়স ও শারীরিক যোগ্যতাই দাসের মুল্য বেশি হওয়ার মাপকাঠি হতো। কিন্তু চাহিদা ও সরবরাহের নিয়ম-নীতিও এতে প্রতিফলিত হতো। বাজারে দাসের সংখ্যা বেশি হলে, অবশ্যই মুল্য কমে যেত। বংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে দাসের সংখ্যা বাড়ানো ছিল সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই যুদ্ধই মূলতঃ দাস সংগ্রহের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হিসেবে কাজ করত। যুদ্ধে বিজিত দলের সবাইকে দাসত্ব বরণ করতে হত। নতুন দাসদের মাঝে শুধু নারী পুরুষ বা শিশুরাই থাকত না, বরং বহু প্রভূ বা নেতৃস্থানীয় মানুষও থাকত। কাজেই এরিষ্টটলের প্রকৃতিগতভাবে প্রভু ও দাসের সংজ্ঞা অচল হয়ে পড়ত। অর্থাৎ জবরদখলের নীতির ফলেই সৃষ্টি হতো দাস ও প্রভু শ্রেণী। প্রকৃতিগত গুণাগুণের মূল্য এখানে একভাবে অপ্রাসংগিক, আবার অন্যভাবে প্রাসংগিক। বিজয়ী দলটি কি কোন গুণ ছাড়া যুদ্ধে জিতেছে? যে বিজয়ী সে নিশ্চয়ই তার কোন গুণের উত্তমতার কারণে বিজয়ী। কাজেই শক্তির কোন উত্তমতা নেই, একথা ঠিক নয়।

এখানে কিন্তু দল হিসেবে সব কিছু বিবেচিত হচ্ছে। অর্থাৎ বিজিতরা যে সবাই দাস হচ্ছে, এটা শুধু শক্তির কারণে দেখলেই অন্যায় মনে হবে, আর গুণ ও দক্ষতার কারণে দেখলে প্রকৃতির সঠিক নিয়ম বলেই মনে হবে। যেমন ইংরেজরা যখন মুসলিম শাসকদের পরাভুত করে ভারত দখল করলো, তা যুক্তি প্রয়োগের বিবেচনায় অন্যায় মনে হতে পারে। কিন্তু ইংরেজ শাসকরা যে দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে ভারত দখল করলো, তাতে প্রকৃতির ইনসাফধর্মী দৃষ্টি ফুটে উঠে। কাজেই যুদ্ধের মাধ্যমে হাজার হাজার নতুন দাস প্রজন্মের মাঝে প্রকৃতির কোন স্বভাববিরুদ্ধ কাজ রয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু অভিজাত শ্রেণীর লোকদের দাস হওয়ার ব্যাপারটি এরিষ্টটল সহজে মেনে নিতে চাননি। কারণ তাহলে তার তত্ত্ব মানুষের মধ্যে কিছু আছে যারা সর্বত্রই দাস

www.pathagar.com

এবং কিছু আছে যারা কোথাও দাস নয় মাঠে মারা যায়। এ তত্ত্বটি মাঠে মারা গেলে বাস্তবে যুদ্ধের কারণে বহু উচ্চবংশীয় লোককে দাসত্ব বরণ করতে হয়।

এরিষ্টটলের গুরু প্লেটোই অল্পের জন্য চিরস্থায়ী দাসত্ব বরণ করার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। শক্তিমানরা একবার কাউকে জোর করে বাজারে বিক্রি করে দিতে পারলেই তার কপালে দাস-ক্ষত লেগে যেতে পারত আমৃত্যু। এজন্য যুদ্ধেরও প্রয়োজন ছিল না। আধুনিককালে যেমন মানুষের কিডনী বা অন্য যেকোন অংগ প্রত্যংগ বিক্রি করার জন্য বিভিন্ন দেশে এখন মানুষ চোর বেরিয়েছে তখনও অনেক দাস চোর পাওয়া যেত। দাস ব্যবসা যখন কিছুটা নিয়মতান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহ করলো তখন বাহ্যিকভাবে দাসদের নিয়ে ধীরে ধীরে অন্যায় ব্যবসা কমে আসল। আধুনিক আমেরিকা সৃষ্টির পেছনে আফ্রিকান লাখ লাখ দাসের ভূমিকা সবারই জানা। স্বল্পমূল্যে চুরি করা বা জোরপূর্বক ধরে আনা কালো মানুষগুলোকে দাস করে নিয়ে যেত আধুনিক সভ্যতার ধ্বজাধারী সাদা মানুষগুলো। এরিষ্টটল তাই তার দাসতত্ত্ব নিয়ে যথেষ্ট সমস্যায় ছিলেন এবং বারবার বলতে চেষ্টা করেছেন, যেন অভিজাত শ্রেণীর মানুষকে দাসে রূপান্তরিত করা না হয়। কিন্তু তখনকার নগর-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অভিজাত শ্রেণী চিহ্নিত করা যত সহজ ছিল, পরবর্তীতে তেমনটি ছিল না। যেমন, বর্তমানে অর্থের জোরে অনেকেই নিজেদের আভিজাত্য দাবি করে। আবার দারিদ্রতা অনেকের আভিজাত্য কেড়ে নেয়।

এরিষ্টটলের দৃষ্টিতে

সংবিধান, সার্বভৌমত্ব ও আইন , নাগরিক

এ অংশে নাগরিকের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে এরিষ্টটল বিস্তারিত আলাপ আলোচনার অবতারণা করেন। নানা কারণে তার জন্য নাগরিকের সংজ্ঞা নির্ধারণ ছিল কষ্টসাধ্য। দাস, শ্রমিক ও শিশু এদের মধ্যে কে নাগরিক আর কে নাগরিক নয়, এ নিয়ে তিনি তখনকার সময়ের বাস্তবতার আলোকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়েছেন। প্রথমে এরিষ্টটল যুক্তিতর্ক শুরু করার জন্য একটি সংজ্ঞার অবতারণা করেন। বিচারালয়ে যাদের অধিকার আছে এবং যারা আইনগত অভিযোগ আনয়ন করতে পারে এবং যাদের বিরুদ্ধে আইনগত অভিযোগ আনয়ন করা যেতে পারে তারা হচ্ছে নাগরিক। এটি এরিষ্টটলের মতে একটি অতি ব্যাপক সংজ্ঞা। এ সংজ্ঞার দৃষ্টিতে বিদেশী, শিশু ও বৃদ্ধ সবাই নাগরিক হিসেবে গণ্য হতে পারে। এরিষ্টটলের মতে শিশুরা হচ্ছে অপরিণত নাগরিক, আর বৃদ্ধদের তিনি বলেছেন অবসরপ্রাপ্ত নাগরিক। এ সংজ্ঞার দুর্বলতার কথা

www.pathagar.com

আবার তিনি নিজেই উল্লেখ করেন। রাজনৈতিক ও শাসন ক্ষমতাকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করার জন্য নাগরিকদের যেভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন, তা বাস্তবে খুজে পাওয়া অসম্ভব। তাই তিনি জন্মসূত্রেই নাগরিক নির্বাচনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তিনি এ ব্যাপারে দু'টি ধারণার কথা উল্লেখ করেন।

প্রথমতঃ পিতামাতা উভয়ই যদি রাষ্ট্রের নাগরিক হয়, তবে সন্তান স্বাভাবিকভাবেই নাগরিক বলে গণ্য হবে।

দ্বিতীয়তঃ যে নবজাতকের দুই, তিন বা চার পূর্বপুরুষ পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রের নাগরিক, সেই সত্যিকারের নাগরিকত্ব লাভ করবে। কিন্তু দাসরা তাহলে নাগরিকের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হল কিভাবে? এথেন্সে স্বৈরশাসনের বিলুপ্তির পর ক্লিয়েসথেনিস অনেক বিদেশী ও দাসদেরকে নাগরিক হিসেবে গ্রহণ করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, জন্মসুত্রে নাগরিকত্বের তত্ত্বের চেয়ে আইনগতভাবে নাগরিকত্বের তত্ত্বই বেশি শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য। এমনকি দাসরা মুক্ত জীবন যাপন করার সুযোগ লাভ করলেও তাদেরকে নাগরিক হিসেবে বরণ করার মত আইন ছিল না।

প্রচলিত আইন ব্যবস্থা এমনই ছিল যে, এরিষ্টটল শ্রমিকদের নাগরিক দলভুক্ত করতে চাননি। এরিষ্টটল যথার্থ অর্থে নাগরিক হওয়ার জন্য কোন মানুষকে উত্তম মানুষ হওয়া জরুরী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। উত্তম মানুষকে জানা ও বুঝার জন্য প্রয়োজন তার দায়িত্বশীলতা। আদেশ দেওয়া ও আদেশ মান্য করার সঠিক গুণাবলীর উপরই নির্ভর করবে, সে এরিষ্টটলের দৃষ্টিতে উত্তম মানুষ হয়ে নাগরিকত্ব দাবি করতে পারবে কি-না। মানুষের এ উত্তমতার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে এরিষ্টটল বুঝাতে চেয়েছেন যে, বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিতে উত্তমতার মাপকাঠি এক থাকে না। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে উত্তমতার পার্থক্য সত্ত্বেও নাগরিকদের উত্তমতার প্রথম শর্ত হচ্ছে, স্বাধীন মানুষের উত্তম গুণাবলী অর্জন।

মানুষ যদি স্বাধীনভাবে তার ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করে, সৎ গুণাবলী অর্জন করে, তবেই সে উত্তম মানুষ হতে পারে। উত্তম মানুষের পক্ষেই শুধু রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম তা আদেশ দেয়া ও মান্য করা যাই হোক না কেন সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব। তবে যেহেতু শাসকের উত্তমতা ও শাসিতের উত্তমতা এক ও অভিন্ন নয়, তাই এ ব্যাপারে এরিষ্টটল বিশদ ব্যাখ্যা টেনে নারী-পুরুষের উত্তমতার মাপকাঠির ভিন্নতা ব্যাখ্যা করেন।

www.pathagar.com

এখানে নারী-পুরুষ ও শাসক-শাসিতের মধ্যকার পার্থক্য নির্ধারণকে তেমন একটা জোরালো উদাহরণ হিসেবে মেনে নিতে বাধা দেবে আধুনিকতা। অবশ্য শাসক যদি নারীকে ধরা যায়, আর শাসিত যদি পুরুষকে ধরা যায়, তাহলে একটি ভিন্নধর্মী যুক্তি দাড় করানো যায়। কারণ এরিষ্টটলের দৃষ্টিতে শাসকের কাজ সৃষ্টি বা অর্জন করা নয়, বরং তা ব্যবহার করা, শ্রম ও নিয়মতান্ত্রিক কিছু পদ্ধতি চালু থাকলেই প্রকৃতি থেকে সম্পদের নানা ধরনের সমাহার ঘটানো সম্ভব। এক্ষেত্রে নারী পুরুষের পার্থক্য কোন মৌলিক ব্যাপার নয়। কিন্তু ঐ সব সম্পদকে কল্যাণমুখী করে রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার করার জন্য অবশ্যই চাই প্রজ্ঞা, যা শাসকের না থাকলে রাষ্ট্র ও জনসাধারণ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। শাসকের প্রজ্ঞা আছে কি নেই, তা বুঝার জন্য নাগরিকদের ও অবশ্যই উত্তম মানুষ হতে হবে।

শাসনতন্ত্রের প্রকারভেদঃ শাসন ব্যবস্থার এরিষ্টটলীয় প্রকারভেদ আজ পর্যন্ত একটি অতি সুপরিচিত শ্রেণীবিন্যাস হিসেবে চালু রয়েছে। তিনি শাসন ব্যবস্থাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেনঃ যেমন - (১) রাজতন্ত্র; (২) অভিজাততন্ত্র; (৩) পলিটি।

রাজতন্ত্রঃ রাজতন্ত্রকে তিনি একজনের শাসন বলে আখ্যায়িত করেছেন। আদিতে তিনি একে ক্ষতিকারক হিসেবে ধরে নেননি। বরং সকলের মঙ্গলের অন্য এটিও একটি গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা হতে পারে বলে অভিমত পেশ করেন। তবে রাজতন্ত্রে সঠিক রূপ থেকে বিচ্যুতি ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই তা স্বৈরতান্ত্রিক রূপ নেবে, এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই স্পষ্টবাদী।

অভিজাততন্ত্রঃ অভিজাততন্ত্রকে তিনি সর্বোত্তমতন্ত্র হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। এরিষ্টটল মনে করতেন, অভিজাততন্ত্রী শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা একজনের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকবে না, আবার ক্ষমতার ভাগাভাগি এত বেশি হাতে ছড়িয়ে পড়বে না, যা শাসনব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেবে। অভিজাতশ্রেণী হবে প্রজ্ঞাবান। প্রজ্ঞা ও সদগুণাবলীর কারণেই শুধু তারা শাসনভার গ্রহণ করবেন। সকলের জন্য মঙ্গলময় একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও চালু রাখাই হচ্ছে অভিজাততন্ত্রের মূলমন্ত্র। এরিষ্টটল এ অভিজাততন্ত্রের খাঁটি রূপেরও বিচ্যুত অবস্থা বর্ণনা করে একে কতিপয়তন্ত্র আখ্যা দিচ্ছেন। কতিপয়তন্ত্রের মূলমন্ত্র হচ্ছে, এটি ধনিকশ্রেণীর শাসন। বিত্তবানদের স্বার্থরক্ষা করাই এর মূল কাজ। সৎ গুণাবলীর ভিত্তিতে যখন আর অভিজাতরা শাসন কাজ চালাতে পারে না, তখন তাদের মাঝে বিত্তশালীরাই ক্ষমতা দখল করে এবং সকলের মঙ্গল চিন্তা বাদ দিয়ে ধনিক-বণিক

www.pathagar.com

শ্রেণীর মঙ্গলেই রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালিত হয়।

পলিটিঃ এরিষ্টটলীয় পলিটি হচ্ছে, সাংবিধানিক শাসনেরই নামান্তর। এ শাসনব্যবস্থাকে এরিষ্টটল অধিকাংশের শাসন বলে মনে করতেন। কোন সমাজে অধিকাংশ ভাল মানুষ যদি রাষ্ট্রের সঠিক কল্যাণে নিবেদিত কোন ব্যবস্থা চালু করে, তবেই তাকে পলিটি বলা যায়। তাত্ত্বিকভাবে এটি মঙ্গলজনক হলেও তার মতে বাস্তবে এটি গণতন্ত্র নামধারী একটি বিকৃত রূপ ধারণ করে। কতিপয়তন্ত্রের ঠিক উল্টো শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রকে তিনি ধনিক বণিকের বিরুদ্ধে গরীব-বিত্তহীনদের শাসন হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

রাজতন্ত্র ও পলিটি তাত্ত্বিকভাবে যত ভাল ব্যবস্থা হোক না কেন, এগুলো যেহেতু বাস্তবে যথাক্রমে স্বৈরতন্ত্র ও গণতন্ত্র নামে বিকৃত অবস্থায় থাকে, তাই এরিষ্টটল এগুলো প্রত্যাখ্যান করে অভিজাততন্ত্রের পক্ষেই ওকালতি করেন। তবে অভিভাজততন্ত্র যাতে কতিপয়তন্ত্রে রূপ নিতে না পারে সেদিকে সচেষ্ট থাকতে বলেন।

রাষ্ট্রের চূড়ান্ত কল্যাণকামী ধর্মঃ রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিৎ, এটি নির্ভর করে রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্য কি তার উপর। এরিষ্টটল মনে করেন শাসনব্যবস্থার প্রকারভেদে রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্র ভিন্ন হতে বাধ্য। যারা রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র একটি পারস্পরিক চুক্তির ফসল ও জের মনে করেন, তারা নানাভাবে ভুল করেন। শুধুমাত্র পারস্পরিক লেন-দেন ও নিরাপত্তার জন্যই রাষ্ট্র নয়। এরিষ্টটল মনে করেন রাষ্ট্রের মুল কাজ হচ্ছে ন্যায় তালাশ করা।

রাষ্ট্রকে এরূপ একটি কল্যাণকামী সংজ্ঞা হিসেবে চিত্রিত করে এরিষ্টটল মনে করেন, রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি কতিপয়তন্ত্র বা গণতন্ত্র দিয়ে অর্জন করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন বিশেষ গুনাবলী সম্পন্ন মানুষের। যারা সবসময় ন্যায়ের জন্য হবে নিবেদিত প্রাণ। এরিষ্টটল মনে করেন, যদি কোন সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে, সঠিক ব্যবসা-বাণিজ্যনীতি বহাল থাকে, এমনকি কেউ কারো ক্ষতি না করে তারপরেও নিদিষ্ট ভূ-খন্ডে বসবাসকারী কোন জনশক্তিকে রাষ্ট্র বলা যায় না। রাষ্ট্রের সকল বৈষয়িক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকার করে এরিষ্টটল বলেনঃ রাষ্ট্র হতে হলে এ বিষয়গুলোকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রত্যেকটির উপস্থিতি মাত্রই কাউকে রাষ্ট্রে পরিণত করে না। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকলের তথা সকল পরিবারের জন্য উত্তম জীবনযাপন নিশ্চিত করা। উত্তম জীবনের

www.pathagar.com

অর্থ হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ ও সন্তোষজনক জীবন।

একই সঙ্গে উত্তম মানুষ ও উত্তম নাগরিক সৃষ্টি করে উত্তম জীবনযাপন উপহার দেয়াই রাষ্ট্রের মূল দায়িত্ব। কোন রাষ্ট্রের নাগরিকগণ উত্তম ও পরিপূর্ণ জীবনযাপন করেন কি-না, তা বুঝার জন্য এরিষ্টটল নিজেই কিছু শর্তের কথা উল্লেখ করেন। মানুষের মধ্যে বিবাহ ও পারিবারিক বন্ধন, ভ্রাতৃত্ববোধ, লেন-দেনে সততা এবং স্রষ্টার জন্য নিবেদিত আচার অনুষ্ঠানের ধরন দিয়েই বুঝতে হবে কোন সমাজের মানুষ কতখানি পরিপূর্ণ ও সন্তোষজনক জীবন অর্জনে সমর্থ হয়েছে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অবদান কতটুকু তা দিয়েই নির্ধারিত হয় রাষ্ট্রের কল্যাণকামী ধর্ম। রাষ্ট্রের এ কল্যাণকামী ধর্ম অর্জনে নাগরিকদের অবদান বিচার করেই তার স্থান চিহ্নিত হবে সমাজে। রাষ্ট্রের এ উত্তম কাজে অবদান না রেখে অন্য কোন উপায়ে কোন নাগরিক অধিক কোন মর্যাদার অধিকারী হবে না, এটাই এরিষ্টটলীয় নীতি। এক্ষেত্রে যাদের অবদান সর্বাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে তাদের অধিকার অপরের চেয়ে অধিক। অপর সকলে জন্মগতভাবে উত্তমদের সমান হতে পারে কিংবা পারিবারিকভাবে উচ্চতর হতে পারে। কিন্তু উত্তম কার্যসাধনের ক্ষেত্রে তথা রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে তারা হীনতর এবং একারণে বিত্তের ক্ষেত্রে উচ্চতর এবং উত্তমতর ক্ষেত্রে হীনতর যারা তাদের চেয়ে রাষ্ট্রের অংশীদারিত্বে উত্তমজনদের স্থানই উচ্চে অবস্থিত হবে। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠাকেই মূলতঃ এরিষ্টটল রাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এরিষ্টটলীয় চিন্তায় রাষ্ট্র একটি আধ্যাত্মিক রূপ পরিগ্রহ না করা পর্যন্ত এটি একটি অসম্পূর্ণ সংস্থা হিসেবে থেকে যায়। আর ঐ রাষ্ট্রে বসবাসকারী মানুষ অপরিপূর্ণ ও অসন্তোষজনক জীবন যাপন করতে থাকে।

এরিষ্টটলের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্বঃ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে এরিষ্টটল প্রথমে বেশ কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তার সবগুলো প্রশ্নকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমতঃ সার্বভৌমত্বের অধিকারীদের সংখ্যা কত হবে?

দ্বিতীয়তঃ তাদের গুণগত যোগ্যতা কি হবে? এরিষ্টটলীয় চিন্তা এ ব্যাপারে এতদূর বিস্তৃত যে, বলা যায় তিনি বিশ্বাস করতেন, জনগণই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। কখনও কখনও এ ধরণের কথার প্রতি তিনি দৃঢ় অভিমতও ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই এ নীতির বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে শংকিত হয়ে পড়েছেন। তাই নাগরিক, রাষ্ট্র, সংবিধান ও সার্বভৌমত্বের ধারণাসমূহকে এত বেশি কাল্পনিক করে চিন্তা করেছেন

www.pathagar.com

যেন এরা সবাই মিলেমিশে এককার হয়ে গেছে। আমরা দেখেছি সংবিধান এবং রাষ্ট্র বলতে এক জিনিসকেই বুঝায়। নাগরিকই হচ্ছে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা। সার্বভৌমের অবস্থান ঘটে এক কিংবা কতিপয় কিংবা বহুর মধ্যে। কিন্তু এই এক, কতিপয় কিংবা বহু যেই শাসন করুক না কেন, এদের শাসনের লক্ষ্য যদি সকলের মঙ্গল হয়, তাহলে এদের প্রত্যেক শাসন ব্যবস্থাই যথার্থ শাসন ব্যবস্থা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সংখ্যার ব্যাপারে এরিষ্টটল কোন নীতি বেধে দিতে আগ্রহী ছিলেন না। তবে শাসন করার ভার কি সংখ্যাগরিষ্ঠেরা না সংখ্যালঘিষ্ঠের এ ব্যাপারে তিনি কিছু মৌলিক ভাবনার অবতারণা করেছেন। সংখ্যালঘিষ্ঠের শাসনক্ষমতা গ্রহণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠেরা হৃতসর্বস্ব করবে, এটি এরিষ্টটল পছন্দ করেননি; তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠদের নাম করে বা জনসাধারণের প্রতিনিধি সেজে বিত্তবানদের সম্পত্তি কেড়ে নেয়া হবে, এমন অনুমোদনও তিনি দিতে নারাজ। উভয় অবস্থাকেই তিনি স্বৈরতন্ত্র বলে চিহ্নিত করেছেন। যে উত্তম অভিজাতশ্রেণীর প্রতি এরিষ্টটলের এত দুর্বলতা প্রকাশিত হয়েছে, তাদের হাতেও তিনি সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ করতে রাজী ছিলেন না। সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকারকে এরিষ্টটল স্বীকার করেননি। শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য সর্বোত্তম কোন শ্রেণীর সৃষ্টিকেও তিনি অসম্ভব বলে মনে করতেন। সকল মানুষকেই তিনি আবেগ ও প্রবৃত্তির বশীভূত মনে করেন। পার্থক্য শুধু আনুপাতিক হারের। মানষের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে প্রবৃত্তির তাড়না থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব নয় বিধায় আইনকেই তিনি সবকিছুর উপর স্থান দেন। আইনকেই সার্বভৌম শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে এরিষ্টটল বেশ কিছু নতুন ভাবনার বিষয় উত্থাপন করেন।

এরিষ্টটলীয় আইন ভাবনাঃ আইনকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দিয়েও এরিষ্টটল আবার মানুষকে নিয়েই সমস্যায় পড়েছেন। কারণ আইনতো প্রয়োগ করবে মানুষই। এসব মানুষরূপী পশুদের সমাজে অবস্থান নিয়েই এরিষ্টটল সবচেয়ে বেশি বিব্রতবোধ করছেন। শাসনব্যবস্থা বা আইনব্যবস্থা যাই হোক না কেন, পশুত্বের গুণাবলীর থেকে উত্তীর্ণ হওয়া না গেলে ভাল আইনও মন্দ ফলই বহন করবে। মানুষ ও আইনকে ভাল রাখা এবং উত্তমভাবে এর প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য এরিস্টটল শাসনকার্যে জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, কে কার কাছে জবাবদিহি করবে? শিক্ষককে যদি ছাত্রদের কাছে জাবাবদিহি করতে হয়, তবে ভাল শিক্ষক খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ ছাত্ররা জ্ঞানার্জনের মত কষ্টসাধ্য বিষয়কে

www.pathagar.com

যতভাবে এড়ানো যায়, তার ব্যবস্থা করে ফেলবে সুচারুরূপে। শিক্ষকদের মধ্যে যারা বেশি সত্যাশ্রয়ী ও নিষ্ঠাবান, তারাই ছাত্রদের কাছে খারাপ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেবে। অন্যসব পেশার ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। ডাক্তারকে যদি রোগীর কাছে জবাবদিহি করতে হয়, তবে ডাক্তারী বিদ্যা খাটানোর অবকাশই থাকবে না। তাই এরিষ্টটল বলেন, চিকিৎসাবিদদের ক্ষেত্রে যেমন একজন চিকিৎসাবিদ অন্য চিকিৎসাবিদের কাছে জবাব দান করবে, সে রকম অপর কর্মের ক্ষেত্রেও সমানের কাছেই সমানের জবাবদান সঙ্গত।

জনসাধারণের কাছে শাসকের জবাবদিহির ব্যাপারটা এখানেও অমীমাংসিতই থেকে যায়। শাসনকার্য সম্পাদনের ফলে শাসক ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে যদি কথায় কথায় জনসাধারণের কাছে জবাব দিতে হয়, তবে তো শাসন ও বিচারব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। এখন এরিষ্টটল ব্যাপারটি নিষ্পত্তির জন্য সূত্র আবিষ্কার করেছেন। প্রথমে তিনি ধরে নিচ্ছেন যে, একজন সাধারণ নাগরিক একজন শাসকের কাছে জবাবদিহি চাইতে পারে না, কারণ সাধারণ নাগরিকের সে গুণগত মান নেই। কিন্তু একজন নাগরিকের গুণগত জ্ঞান আর দশজনের সাথে মিলিত হয়ে উচ্চতর রূপ লাভ করে।

এক্ষেত্রে এরিষ্টটল কয়েকটি উদাহরণের অবতারণা করেন, যে গৃহ নির্মাণ করেন, তিনি গৃহের গুণাগুণ সম্পর্কে অবগত থাকেন। তাই বলে যারা গৃহে বসবাস করেন, তারা গৃহে সুবিধা অসুবিধা কম বুঝেন, এমন ধারণা ঠিক নয়। গৃহে বসবাসকারী একজন হয়ত ভুল করতে পারেন। কিন্তু সবাই ভুল ধারণা রাখবেন, এমনটি ঠিক নয়। তবে এ দু'পক্ষের জ্ঞানের ভিন্নতা রয়েছে। যেমন, নৌকার মাঝি ও আরোহীর জ্ঞানের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও নৌবিহারের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে সবারই ধারণা থাকে। কিন্তু জ্ঞানের পার্থক্য অবশ্যই থাকবে। আজকের জ্ঞান, ধারণা বা উপলব্ধি কোনটি সত্যের বেশি কাছাকাছি তা হলফ করে বলা মুশকিল।

খাদ্যের ব্যাপারে রাধুনী নয়, যে আহার করে সে-ই ভোজের ভাল-মন্দের উপর অভিমত দেয়। শাসনকার্য ভালভাবে চলছে কি চলছে না, তা শাসকদের চেয়ে শাসিতরা অনেক সময় ভাল বুঝে। এত কিছুর পর এরিষ্টটল আবার স্বীকার করেছেন যে, অনেক বিষয় আছে যেখানে পারদর্শিতার উপরই নির্ভর করে জ্ঞানের ঠিক অবস্থা। শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক যেহেতু আইন নির্ধারণ করে, তাই আইনের শাসনের উপর এরিষ্টটল জোর দিয়েছেন। কিন্তু আইনের পক্ষে কি এতদূর সুনিশ্চিত হওয়া সম্ভব যে, ভবিষ্যৎ

www.pathagar.com

উদ্ভূত সকল সমস্যার সমাধানই তার কাছে আছে। জীবন তো একটি চলমান নদীর মত। একই স্রোতে যেমন কোন লোক দুইবার ডুব দিতে পারে না, তেমনি মানুষও সমাজে সব সময়ই একই পরিবেশ পরিস্থিতির মাঝে অবগাহন করতে পারে না। ব্যাপারটা ঠিক একটা জীবন্ত মানুষের মত। একজন বয়স্ক মানুষ বাহ্যিক দিক থেকে একই থাকলেও মূলতঃ শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক দিক থেকে সে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত রূপ লাভ করছে। এ পরিবর্তনের মাঝেই আবার শরীর তত্ত্বের নিয়মাবলী কার্যকর থাকছে।

এরিষ্টটলের মতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মাবলী কার্যকর থাকা সত্ত্বেও এমন অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে নিয়ম বহির্ভূতভাবেও রোগী আরোগ্য লাভ করে। তাই চিকিৎসকদের সবসময় নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হয়। নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির আবিষ্কার কিন্তু নতুন জীবতত্ত্ব বা শরীরতত্ত্বের আবিষ্কারের নামান্তর নয়। আইনের ক্ষেত্রেও আইনের নতুন নতুন ধারা-উপধারা সৃষ্টি তেমনি কোন নতুন আইন সৃষ্টি নয়। আইনকে ব্যাপক অর্থে ধরলে এটি একটি সাধারণ নিয়মনীতি বৈ আর কিছুই নয়। সে কারণে প্রতিদিনের সমস্যার ক্ষেত্রে সর্বদা পুস্তকের ভিত্তিতে কিংবা আইনের অক্ষর দ্বারা পরিচালিত হতে হবে, এমন কথা বলা মুর্খতার নামান্তর।

ছাপার অক্ষরের সীমানায় যে আইন আবদ্ধ, তা বাস্তবে বেশিদিন কার্যকরী হতে পারে না। তাই আইনের গতিশীলতার জন্য প্রয়োজন এর অন্তর্নিহিত ভাবের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং সে মোতাবেক কর্মপন্থা নির্ধারণ। আইন বলতে এরিষ্টটল যা বুঝতে চেয়েছেন, তা হচ্ছে সংবিধান, যেখানে সাধারণ নীতিমালা বিধৃত। এরিষ্টটলের সাংবিধানিক আইনের ধারণাও একটু ভিন্নতর। এর নিছক বৈষয়িক দিক যেমন রয়েছে, তেমনি নৈতিক দিক রয়েছে বলে তার অভিমত অত্যন্ত সুস্পষ্ট। শাসক ও আইন উভয়কেই যদি আইনের নীতিগত ও নৈতিক দিক দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তবে সমূহ বিপদের আভাসও তিনি দিয়েছেন। ন্যায়-নীতির জন্যই আইন। শাসনের বেলায়ও একই নীতি প্রযোজ্য। নীতির আইন, বস্তুগত আইনের চেয়ে যেমন অধিক বাধ্যতামূলক, তেমনি অধিক মৌলিক। অন্য কথায় বলা যায়, শাসক হিসেবে কোন মানুষ যদি লিখিত আইনের চেয়ে কম ভ্রমক্ষম হয়, তাহলে মনে করতে হবে নীতির আইনের চেয়ে সে অধিক ভ্রমক্ষম।

www.pathagar.com

আইন যদি নীতিশাস্ত্রের বাঁধন মুক্ত হয়, তবে তা আর যথার্থ অর্থে আইন থাকে না। আইন শোষণ ও বঞ্চনার হাতিয়ারে পরিণত হয়। তাই এরিষ্টটলও উত্তম ব্যক্তির মাধমে উত্তম আইন, যা নীতির কাছে সব সময়ই নতজানু, প্রতিষ্ঠার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করে দেন।

গণতন্ত্র ও মধ্যবিত্তের শাসন

এরিষ্টটল পলিটিক্সেসের চতুর্থ পুস্তকটিতে বিভিন্ন ধরণের শাসনব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করেন। তাঁর মতে তাত্ত্বিকভাবে যা সর্বোত্তম, বাস্তবে তা সর্বোত্তম নাও হতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, শাসনব্যবস্থা। কিন্তু সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা বলে সত্যিই কি কোন কালজয়ী ব্যবস্থা মানুষের পক্ষে আবিস্কার করা সম্ভব? এরিষ্টটলের মতে, সর্বোত্তম শাসন ব্যবস্থার কথা বলার সাথে সাথেই যে প্রশ্নটি উথাপিত হয়, তাহলো কোন ধরণের মানুষের জন্য শাসনব্যবস্থা। মানুষকে যতই আদর্শবাদীরূপে দেখা যাক না কেন, সামগ্রিকভাবে কোন সমাজের মানুসের গুণগত মানের উপরই মুলতঃ নির্ভর করে কোন ধরণের শাসনব্যবস্থা তাদের জন্য উপযোগী। কারণ কেবলমাত্র সর্বোত্তম নিয়ে আলোচনা করলে আমাদের চলবে না। যা সম্ভব, যাকে সাধন করা সহজতর এবং সাধারণভাবে যা আয়ত্তের মধ্যে তাকেও আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে।

এ যুক্তিতেই এরিষ্টটল তাঁর প্রস্তাবিত অভিজাততন্ত্রকে সবার জন্য সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা বলেননি। যারা শাসনব্যবস্থার শ্রেণীকে শুধুমাত্র গণতন্ত্র ও কতিপয়তন্ত্র বা চক্রতন্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন, তাদেরকে সমালোচনা করে এরিষ্টটল বলেন, তাহলে মানুষের দ্বারা আবিস্কৃত অন্যান্য শাসনব্যবস্থা উপেক্ষিত হবে। এখানে তিনি আইন ও সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তার দৃষ্টিতে আইন হচ্ছে শাসকদের হাতের অস্ত্র, যার দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করা হয়। এবং এ অস্ত্রের মূলকাজই হচ্ছে আইন-ভঙ্গকারীদের দন্ড দেবার ব্যবস্থা করা। আইন শাসনব্যবস্থার নির্ণায়ক নয়। শাসনব্যবস্থায় নির্ধারিত থাকে রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতার অবস্থান এবং এর প্রয়োগ পদ্ধতি। শাসনব্যবস্থার জন্য গৃহীত আইনকে তিনি আবার শাসনতন্ত্র নামে অভিহিত করেননি। সংবিধান বা শাসনতন্ত্র হচ্ছে, ক্ষমতার পদগুলোকে বন্টন করার জন্য রাষ্ট্রকর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা বিশেষ।

www.pathagar.com

বিশুদ্ধ শাসনব্যবস্থার তিনটি অবস্থার কথা তিনি বলেন। অর্থাৎ রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও পলিটির বাইরে বিশুদ্ধ কোন শাসনব্যবস্থার অস্তিত্ব তিনি খুজে পাননি। কিন্তু তাদের এ বিশুদ্ধতার সাথে বাস্তবে তাদের বিকৃতরূপের একটি চমৎকার যোগসূত্র তিনি দেখিয়েছেন। ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে যেটি প্রথম ও সর্বোত্তম তার বিচ্যুতরূপটি অবশ্যই সবচেয়ে খারাপ।

গণতন্ত্রকে তিনি স্পষ্টভাষায় একটি খারাপ ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু এর কার্যকারিতার কথা বিবেচনা করে তিনি বলেন, এই সকল খারাপের মধ্যে বলতে গেলে গণতন্ত্রকে সর্বোত্তম বলতে হবে।

গণতন্ত্র

তাত্ত্বিক বিবেচনায় গণতন্ত্র খারাপ হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু এর ব্যবহারিক উপযোগিতা রয়েছে। তাই ব্যবহারিক জীবনে গণতন্ত্রের স্বরূপও ভিন্ন হতে পারে। এরিষ্টটলের মতে, গণতন্ত্র মোটামুটি চারটি রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়। যথাঃ-

(ক) সম্পদের বিবেচনায় মানুষ দায়িত্ব লাভ করবে এবং সম্পদের বিবেচনায় তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে।

(খ) জন্মের সূত্রের সাথে সম্পর্কিত আইনের দাবি পূরণ হলেই সবাই সমান। বিধানসমুহ সার্বভৌম।

(গ) সম্পদ বা জন্মসূত্রের বিবেচনায় নয়, নাগরিকত্ব পেলেই সবাই সমান। আইন সার্বভৌম।

(ঘ) আইন নয়, জনগণই সার্বভৌম। জনগণ ইচ্ছা করলেই পুরাতন আইন রদ এবং নতুন আইন গ্রহণ করতে পারে।

কতিপয়তন্ত্রঃ গণতন্ত্রের মত কতিপয় তন্ত্রকে এরিষ্টটল চারভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা ঃ-

(ক) নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদশালী হওয়া ছাড়া শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করা যায় না।

(খ) প্রচুর পরিমাণ সম্পদের মালিক না হলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অংশলাভ সম্ভব হয় না।

(গ) জন্মসূত্রেই নির্ধারিত হয় কে ক্ষমতায় বসবে। পুত্রই পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়।

(ঘ) বংশগত কারণেই উচ্চতর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়। আইনের তেমন কোন সার্বভৌম ক্ষমতা নেই।

www.pathagar.com

গণতন্ত্র ও কতিপয়তন্ত্র ছাড়া যেসব শাসন ব্যবস্থার সন্ধান লাভ করা সম্ভব, তা হচ্ছে অভিজাততন্ত্র ও রাজতন্ত্র। আর এরিষ্টটল এই চারটি বাদে পঞ্চম ব্যবস্থা হিসেবে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন পলিটিকে। তার প্রস্তাবিত এ ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সম্পদ বা জন্মসূত্রে কেউ কোন দায়িত্ব লাভ করবে না। গুণের কারণেই মানুষ সব দায়িত্ব লাভ করবে। মূলতঃ নিজ দোষাবলী থেকে মুক্ত হলে গণতন্ত্র যে রূপ লাভ করতে পারতো তাই এরিষ্টটলীয় পলিটি। "বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের যে মিশ্রণের মধ্যে গণতন্ত্রের প্রবণতা প্রকাশ পায় সেগুলোকে সাধারণতঃ 'পলিটি বলে আখ্যায়িত করা হয়।" আইনের সাথে রাষ্ট্রে ও নাগরিকদের সম্পর্কে দিয়েই নির্ধারিত হয় শাসনব্যবস্থার মূল প্রকৃতি। এরিষ্টটলের মতে এখানে বিবেচ্য বিষয় দু'টি; যেমনঃ

প্রথমত ঃ রাষ্ট্রে প্রচলিত বা প্রতিষ্ঠিত আইনের প্রতি আনুগত্য;
দ্বিতীয়ত ঃ উত্তম আইনের প্রতি আনুগত্য।

এখানে কয়েকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। আইনের পেছনে রাষ্ট্রীয় শক্তির অনুমোদন থাকলেই যে তা উত্তম হবে, এমনটি জোর দিয়ে বলা যায় না। কিন্তু রাষ্ট্র আইন সৃষ্টি করেই সবাইকে তাঁর প্রতি অনুগত হতে বলে। রাষ্ট্রের নাগরিকগণ উত্তম ও অধম আইন নাও চিনতে পারে। কিন্তু শাস্তির ভয়ে আইন পালনে বাধ্য হতে পারে। আবার কোন সমাজের মানুষ উত্তম আইনের জন্য সংগ্রাম করতে পারে। এবং হয়তো বা সে আইনকে প্রতিষ্ঠিতও করে রাখতে পারে। আবার বহু মানুষ তা নাও মানতে পারে। বাস্তবে এ সমস্যাই পলিটিকে গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের খুব কাছাকাছি নিয়ে আসে।

স্বৈরতন্ত্র

স্বৈরতন্ত্র-এর তিনটি রূপের কথা এরিষ্টটল উল্লেখ করেন। রাজতন্ত্রকে প্রথমে এরিষ্টটল ভাল বা মন্দ না বলে এটিকে একটি বাস্তবভাবে বহুল প্রচলিত ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকার ও গ্রহণ করেন। তবে যে রাজতন্ত্রের রাজকীয় হাবভাব, হালচাল ও হাঁকডাকই বেশি তাকেই তিনি এক ধরনের স্বৈরতন্ত্র বলে আখ্যাদেন। এ ধরনের শাসনব্যবস্থাতেও আইন কার্যকর থাকে বলে তার বিশ্বাস। প্রজারা নিজ ইচ্ছামাফিক আইনের প্রতি আনুগত্য দেখায়। কিন্তু যথার্থ অর্থে স্বৈরশাসনে আইনের কোন বালাই থাকে না। অর্থাৎ এটিকে আমরা বলতে পারি 'রাজতন্ত্রীয় স্বৈরতন্ত্র', অপরটি আসল স্বৈরতন্ত্র। দ্বিতীয়টিতে রাজতন্ত্রের ছোঁয়া নেই। স্বৈরশাসক শুরু থেকেই স্বৈরশাসন চালায়। তৃতীয় আর একটি স্বৈরশাসনকে এরিষ্টটল চরম স্বৈরশাসন বলে অভিহিত করেন। চরম স্বৈরশাসনের

www.pathagar.com

কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা তিনি উল্লেখ করেন। যেমন ঃ

(ক) শাসককে কারো কাছেই জবাবদিহি করতে হয় না।

(খ) শাসক নিজের স্বার্থেই রাষ্ট্র চালান, শাসিতের স্বার্থ তার লক্ষ্য নয়।

(গ) স্বাধীনভাবে অর্থাৎ স্বেচ্ছায় কোন নাগরিক এ ধরনের শাসনব্যবস্থা বা শাসককে গ্রহণ করবে না।

মধ্যবিত্তের শাসন

এরিষ্টটল রাষ্ট্রে বা সমাজে বসবাসকারী মানুষকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, যথাঃ (ক) খুব সচ্ছল, (খ) খুব দারিদ্র ও (গ) এ দু'টির মধ্যবর্তী। কোন কিছুর আধিক্যকে এরিষ্টটল কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। নাগরিকদের অত্যধিক সম্পদ ও অত্যধিক দারিদ্রকে রাষ্ট্রের জন্য খুবই অকল্যাণকর বিবেচনা করেছেন। সম্পদশালীদেরকে হিংসাত্মক সকল ঘটনার উৎস এবং দারিদ্রদেরকে সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বেশিমাত্রার সম্পদশালীদের প্রতি এরিষ্টটল রীতিমত ঘৃণার ভাব প্রদর্শন করেছেন। দায়িত্বহীনতা, বেপরোয়া আচরণ ও মূর্খতা তাদের জন্য স্বভাবধর্ম হয়ে পড়ার আশংকাবোধ করেছেন। "তাদের চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য শৈশব থেকেই তাদের মধ্যে উপ্ত হতে থাকে। এর ফলে বিদ্যায়তনে পর্যন্ত এরা এমন বাড়ত্বের বোধ দ্বারা আবিষ্ট থাকে যে, শিক্ষকের নির্দেশিত কার্যসম্পন্ন করার শিক্ষাও তারা অর্জন করে না"। এরিষ্টটলের এ উক্তি আজকের দুনিয়াতেও সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

দারিদ্রের ক্ষতিকারক দিকের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এরা হীনমন্যতায় ভোগে। শাসকদেরকে প্রভুর মত ভয় পায়। দায়িত্বগ্রহণ ও পালনে দৃঢ়চিত্তের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়। কাজেই এদের দ্বারা রাষ্ট্রের তেমন কোন উপকারই হয় না।

রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য তাই নাগরিকদের মাঝে অধিকসংখ্যক মধ্যবিত্তের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তাঁর দৃষ্টিতে মধ্যবিত্তরাই সমাজের স্থিতিস্থাপক। শাসনকার্যে মধ্যবিত্তের আধিপত্যকে এরিষ্টটল কোন শ্রেণীর শাসন হিসেবে দেখেননি। বরং অধিক সম্পদশালী, অতিমাত্রায় দারিদ্র জনগোষ্ঠী যাতে শাসনকার্যের উপর কোন শ্রেণীগত প্রভাব ফেলতে না পারে, সেদিকে মধ্যবিত্তের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেবার পরামর্শ দেন। যদি কোন একপক্ষ চরম দৌরাত্ম্য প্রদর্শনে লিপ্ত হয়, তখন মধ্যবিত্তের কাজ হবে অন্য পক্ষের সাথে যোগ দিয়ে সমাজে ভারসাম্য আনয়ন করা। কারণ রাষ্ট্রের একাংশের যদি

www.pathagar.com

আধিক্য থাকে এবং অপর অংশের কিছু না তাকে তাহলে হয় চরম গণতন্ত্র কিংবা নির্ভেজাল কতিপয়তন্ত্র কিংবা দু'ইটি শ্রেণীরই দৌরাত্ম্যের ফলে স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। স্বৈরতন্ত্র অনেক সময় সৃষ্টি হয় গণতন্ত্র কিংবা কতিপয়তন্ত্রের অতি উৎসাহের কারণে।

ব্যক্তিজীবনে মানুষ যখন খুব একটা সম্পদশালী ও দরিদ্র হয় না, আবার এদের সংখ্যা যদি সবসময় খুব বেশি থাকে, তবে স্বৈরতন্ত্র সহজে তার ভিত্তি গড়ে তুলতে পারে না। কিন্তু খুব কম সমাজের মানুষের মাঝেই মধ্যবিত্তের সংখ্যা প্রয়োজনীয় অবস্থায় থাকে। কারণ প্রতিটি মধ্যবিত্ত চায় অধিক হিসেবে সমাজের অধিকাংশ মানুষ হয় দারিদ্র, নয় তো ধনীতে রূপান্তরিত হয়। সমাজের অধিকাংশ মানুষকে ধনীক শ্রেণীভুক্ত করার জন্য শুধু নিজ রাষ্ট্রীয় সীমানার সম্পত্তিই যথেষ্ট নয়, বরং প্রয়োজন পড়ে ভিন্ন রাষ্ট্র দখল ও শোষনের। গ্রীক নগর রাষ্ট্রসমূহের ইতিহাসেই নয়, বরং আধুনিক রাষ্ট্রের ইতিহাসেও এর অসংখ্য প্রমাণ মেলে। ফলে দু'ধরণের চরম অবস্থা বিরাজ করে রাষ্ট্রের ভেতর ও বাইরে। তাই স্থিতিশীল শাসনব্যবস্থার উপায় হিসেবে মধ্যবিত্তকেই রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত করার সুপারিশ করেন এরিষ্টটল।

বিপ্লব

মানুষ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপঃ এ কথাটি সর্বজনবিদিত যে, পলিটিক্স গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হচ্ছে, শাসনব্যবস্থা রক্ষা ও এর বিলোপ। সাধারণভাবে বলা হয় বিপ্লবই হচ্ছে এ অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ধরে নেয়া হয় যে, চতুর্থ অধ্যায়ে এরিষ্টটল শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের যে আলোচনার অবতারণা করেছেন, পঞ্চম অধ্যায়ে বিপ্লবের বিভিন্ন কারণ ও পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার মধ্য দিয়ে তা শেষ করেছেন। এ অধ্যায়ের শুরুতেই এরিষ্টটল বলেন যে, তাঁর গ্রন্থের সকল মৌলিক ব্যাপারেই তিনি আলোচনা শেষ করেছেন। কিন্তু শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনের কারণসমূহ আলোচনা বাকি রয়েছে।

শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন প্রক্রিয়াকাল বুঝানোর জন্য গ্রীক শব্দ স্টাটিস ব্যবহার করা হয়েছে। স্টাটিস বলতে এমন এক অবস্থাকে বুঝায় যেখানে প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থায় বড় ধরনের ফাটল সৃষ্টি হয় এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপ সমাজের সকল ক্ষেত্রে তার ছোবল হানে অহরহ। প্রচলিত আইন হয়ে পড়ে নিষ্ক্রিয়। আর এ অবস্থার জন্য সবচেয়ে বড় কারণের সন্ধান মিলে প্রতিষ্ঠিত সাম্য নীতির মাঝে। পঞ্চম অধ্যায় সঠিকভাবে উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন এ অধ্যায়টিকে প্রথম অধ্যায় সবচেয়ে মৌলিক

www.pathagar.com

বিষয় "মানুষ" সম্পর্কে এরিষ্টটলের মতবাদ সঠিকভাবে মেনে নেওয়া।

মানুষ সম্পর্কে তিনি বলেন, "প্রাণি হিসাবে বিকাশের চরমে মানুষ যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ, তেমনি আইন ও নীতিহীন অবস্থাতে সে সবচেয়ে অধম। সশস্ত্র বর্বরতার মোকাবেলা করা সবচেয়ে কঠিন। জন্ম থেকে মানুষ বুদ্ধিমান। বুদ্ধি তার অস্ত্র। কিন্তু এ অস্ত্রকে যেমন সে ন্যায়ের পক্ষে ব্যবহার করতে পারে, তেমনি তাকে ব্যবহার করতে পারে সর্বাধিক অন্যায় সাধন করার জন্য। ন্যায় এবং উত্তমের বোধশূন্য মানুষ দানবের অধিক। সে বর্বরে অধম। সে চরম অন্যায়কারী। সে যৌন আচরণে বল্গাহীন। সে ভোজনে উদরসর্বস্ব। রাষ্ট্র ও আইনের প্রধান দায়িত্বই হচ্ছে মানুষের দ্বারা সংঘটিত সকল হিংস্রতা বন্ধ করে তার মাঝে লুক্কায়িত সুকুমার প্রবৃত্তি লালন-পালন। এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতাই বয়ে আনে শাসনব্যবস্থার জন্য বিপর্যয়। রাষ্ট্র যাদের দ্বারা পরিচালিত হয়, আইন যাদের দ্বারা রক্ষিত হয়, তাদের অপরিণামদর্শীতাই ব্যাপক হিংসাত্মক কার্যকলাপকে অবশ্যসম্ভাবী করে তোলে। এরিষ্টটলের মতে, বিপ্লবের মূল কারণ তিনটি; যথা ঃ (১) নির্দয়তা, (২) মুনাফা ও (৩) ঘৃণা।

মানুষের মাঝে এই তিনটি স্বভাবই স্বজাত। নশ্বরদেহের মানুষ আজীবন মুনাফার পিছে ছুটে বেড়ায়। মুনাফা লাভের অদম্য ইচ্ছাই তাকে করে তোলে নির্দয়। মুনাফার লোভেই সে সকল ন্যায়-নীতি বিসর্জন দেয়। সে হয় ঘৃণার পাত্র। নয়তো ঘৃণার শিকার হয়। ঘৃণা ছড়িয়ে বা ঘৃণার শিকার হয়ে মানুষ নিজেই আবার সবচেয়ে বেশি অপমানিত বোধ করে। বিদ্রোহ ঘোষণা করে রাষ্ট্রশক্তি ও আইন দণ্ডের বিরুদ্ধে। এরিষ্টটলের ভাষায়, "যারা অপরকে সম্মানিত ও নিজেকে অপমানিত হতে দেখে তারা শীঘ্র বিপ্লব-মনা হয়ে উঠে। ঘৃণামুলক মনোভাবের কারণেও বিপ্লব এবং গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হতে পারে।

রাষ্ট্রের মাঝে এ ভারসাম্যহীনতা ও আইনের চরম অক্ষমতাকে তিনি মানুষের দৈহিক ভারসাম্যহীনতার সাথে তুলনা করেছেন। স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন একজন মানুষ নিজের আকৃতি ও প্রকৃতিতে সহজেই এক অসাধারণ ভারসাম্য লক্ষ্য করতে পারে। হাতের পাঁচটি আঙ্গুলের কোনটিকেই তার কাছে অপ্রয়োজনীয় বা অসুন্দর মনে হয় না বা সবচেয়ে কনিষ্ঠ আঙ্গুলটিকে মোটা-তাজা করার চেষ্টায় সে লিপ্ত হয় না। বরং বড়-ছোট সবগুলো আঙ্গুলের একই ধরনের পরিচর্যায় নিষ্ঠাবান হয়। রাষ্ট্র ও আইন যখন ছোট- বড় সকলের পরিচর্যায় নিষ্ঠাবান হতে ব্যর্থ হয়, তখনই হিংসাত্মক কার্যকলাপের

www.pathagar.com

পথ বেয়ে সমাজ ও মানুষ বিপ্লবের জয়গান গায়। এরিষ্টটলের মতে, "বিষম অবস্থা দাঁড়ায় তখন, যখন এক ফুট উঁচু দেহতে এক গজ লম্বা পা গজিয়ে যায়। কিংবা মানুষের দেহে কোন অংশে পশুর আকৃতি কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদ্ভূত হতে থাকে। রাষ্ট্রের ধনী-গরীবের আনুপাতিক হারকে তিনি এ ধরনের শারীরিক ভারসাম্যের সাথে তুলনা করেছেন।

ছিলেন না সত্য; কিন্তু ধনীদের তুলনায় গরীবদের সংখ্যাবিধকে রাষ্ট্র ও আইনব্যবস্থার জন্য বিপজ্জনক সংকেত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। "যেমন গণতন্ত্র এবং পলিটিতে অসচ্ছল লোকের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে পারে"।

রাষ্ট্রযন্ত্র ও আইন যখন শুধুমাত্র ধনিক-বণিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে, অর্থাৎ দারিদ্র জনগোষ্ঠির স্বার্থ যখন হয় অবহেলিত ও উপেক্ষিত, তখন বিপ্লবের অভ্যন্তরীণ শর্ত পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু এ শর্ত পূর্ণ হয়ে গেলেই বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যাবে, এমন কোন কথা নেই। কারণ ধনিক শ্রেণী সদাই সতর্ক থাকে অনাহারক্লিষ্ট মানুষের সংঘবদ্ধ বিপ্লব সাধনের চেষ্টার বিরুদ্ধে দারিদ্রেরা যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে নির্দিয়তা ও ঘৃণার শিকার হয়ে জীবনযাপন করে, তাই তাদের দ্বারা হিংসাত্মক কার্যকলাপ ঘটানো সহজ হয়। কিন্তু আইন যখন ধনীদের একাংশের ও স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়, তখনই শাসন ব্যবস্থায় এক ধরনের অদৃশ্য কালোহাত কার্যকর হয়ে উঠে। এরিষ্টটলের ভাষায়, "তদবির, ষড়যন্ত্র, সতর্কতার অভাব এবং অদৃশ্যপ্রায় ক্রমপরিবর্তন - এই তিন প্রকারে এমন পরিবর্তন সংঘটিত হতে পারে।

ধনিক-বণিক শ্রেণী যখন তদবির ও ষড়যন্ত্রের সাহায্যে সকলের অলক্ষ্যে শাসকবর্গের সহযোগিতায় নিজ নিজ স্বার্থ হাছিল করে, তখন এক অদৃশ্য পরিবর্তন ঘটে যায় জনজীবনের মন-মানসিকতায়। এ অদৃশ্য পরিবর্তন বয়ে নিয়ে আসে দ্রুত পরিবর্তন লাভের বিপ্লবী প্রেরণা। এ অদৃশ্য ক্রম পরিবর্তনে ধনিক শ্রেণী বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে শাসনব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে সমাজের আরো বৃহৎ জনগোষ্ঠী। জন-অসন্তোষকে পুঁজি করে বিবাদমান কোন এক শিবির বা দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত কোন পক্ষকে সম্পূর্ণরূপে ভাল বা মন্দ বলার অবকাশ কম। এরিষ্টটলের ভাষায়, "একথা ঠিক যে তাদের প্রত্যেকের কথায় কিছু ন্যায়ের ব্যাপার রয়েছে। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের দাবি চূড়ান্তরূপে ন্যায়সঙ্গত - এরূপ ধারণা ভুল" এ কারণে প্রতিটি রাষ্ট্র, শাসনব্যবস্থা, আইনব্যবস্থা

www.pathagar.com

পরিচালনার জন্য চাই কিছু সাংবিধানিক মূলনীতি। এ মূলনীতি সমূহের আলোকে প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থাকে আমরা নিয়মতান্ত্রিকতা (Constitutionalism) নামে আখ্যায়িত করতে পারি।

কোন নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই পারে হিংসাত্মক কার্যকলাপ রোধকল্পে আইনানুগ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। এরূপ নিয়মতান্ত্রিকতার অভাব ঘটলে আইন কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। শাসকগণ স্বেচ্ছাচারী আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সমাজ হয়ে পড়ে দ্বিধাবিভক্ত। এরিষ্টটলের ভাষায়, "রাষ্ট্রের সদস্যগণ যখন তাদের পারস্পরিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের মূলনীতিকে লঙ্ঘন করে, তখনই তাদের মধ্যে একটা বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতিকে এরিষ্টটল নেতিবাচক হিসেবে দেখেছেন। তার মতে বিশেষ গুণের অধিকারীদেরই শুধু উচিৎ শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। তিনি অভির্জাত শ্রেণীর লোকদেরকেই শুধু বিশেষ গুণের অধিকারী মনে করতেন।

ভৌগোলিক কারণে বিপ্লব

যে কোন রাষ্ট্রের জন্য তার ভৌগোলিক অবস্থা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কোন অভিজাতশ্রেণীর খুব কমই বিপ্লবের পক্ষে কাজ করে। কারণ তাতে তাদের সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা হানির সম্ভাবনা থাকে। তাই বলে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন থেমে থাকে না। শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম এরিষ্টটল নিজেও বাতায়ে দেননি। তার মতে, "গণতন্ত্র থেকে কতিপয়তন্ত্রের উদ্ভব, কিংবা কতিপয়তন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের বা পলিটি থেকে অভিজাততন্ত্রের উদ্ভব। প্রক্রিয়াটি বিপরীতভাবেও ঘটতে পারে।

যে কোন শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন অবশ্যাম্ভাবী। বড় ধরনের পরিবর্তন ঠেকানোর জন্য প্রয়োজন ছোট ছোট পরিবর্তন। এ ধরনের পরিবর্তনকে সংশোধনবাদও বলা যায়। আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সংশোধনবাদ কাম্য নয়। কিন্তু বাস্তবতার দাবি পূরণ করতে হলে শাসনব্যবস্থায় সংশোধন একান্তই প্রয়োজন। তা না হলে শাসনব্যবস্থা ও আইন নির্যাতনের হাতিয়ারে রূপান্তরিত হয়। আইন শুধু ভীতিপ্রদর্শন, ক্ষমতার দৌরাত্ম্য, ঘৃণামূলক মনোভাব এবং বেপরোয়া আগ্রাসনের জন্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আইন ও শাসন ব্যবস্থার এরূপ নানাভাবেই হতে পারে। সরকারী ও বেসরকারীভাবে যেমন হতে পারে, ন্যায়-অন্যায়, দুই পদ্ধতিই এতে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে এর পরিণাম একইরূপ হতে বাধ্য, মানুষ এ অবস্থার পরিবর্তন কামনা করবে। ভাল-মন্দ

www.pathagar.com

এবং ধনী দারিদ্র নির্বিশেষে মানুষ প্রতিষ্ঠিত আইন অমান্য করবে। সমাজে মাত্রাতিরিক্ত অসাম্য সৃষ্টির ফলে যে ঘৃণার মনোভাব সমাজের সর্বত্র বিরাজ করে, তাকে কেন্দ্র করে ভাল বা মন্দ যে কোন সংগঠিত শক্তি সহজেই প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ভীত নড়বড়ে করে দিতে পারে। এমন কি কোন বিপ্লবেরও সূচনা করতে পারে। এটিকে এরিষ্টটল বিপ্লবের সাধারণ কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থা যদি রাষ্ট্র কর্তৃক অনুসৃত রাজনৈতিক, অর্থনেতিক ও আইনব্যবস্থার অনুকূল না হয়, তবে সে রাষ্ট্রের পক্ষে স্থিতিশীল কোন সমাজ নির্মাণ করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন দ্বীপ, প্রণালী ও নদী নিয়ে গ্রীসের নগর রাষ্ট্রসমূহের মাঝে যে সব বিরোধ চলত, তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে গিয়েই এরিষ্টটল রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার জন্য ভৌগোলিক অবস্থার গুরত্বের কথা বলেছেন। কিন্তু সাথে সাথে এর পেছনে একটা দার্শনিক তত্ত্বও দাঁড় করিয়াছেন। "একথা আমরা জানি যুদ্ধের মধ্যে অনেক সময় নদী কিংবা অপর কোন জলস্রোত পারাপারের কারণে সৈন্যরা বিভক্ত হয়ে পড়ে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও সেরূপ। বিভিন্নতা থেকে বিভাগের সৃষ্টি হয়। অবশ্য এই ভৌগোলিক বিভাগগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়।"

নগর-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় হয়তবা ভৌগোলিক অবস্থান কোন রাষ্ট্রের আমূল কোন পরিবর্তনের পেছনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নাও রাখতে পারে। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে এটি আমুল পরিবর্তনের পিছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টিতে ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সাম্প্রতিক কালের মানচিত্রের গুরুত্বপূর্ণ সবক'টি পরিবর্তনের পেছনেই জাতিগত বৈশিষ্ট্যের পর ভৌগোলিক কারণ সবচেয়ে শক্তিশালী অবদান রেখেছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতার এই বিশ্বে ভবিষ্যতেও রাষ্ট্রীয় মানচিত্রের যে কোন পরিবর্তনে ভৌগোলিক পরিবেশ-পরিস্থিতি নিশ্চয়ই আরও অধিক কার্যকরী নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে। নদীর পানি ও সাগরের মাছ বন্টন নিয়ে বড় ধরনের যুদ্ধবিগ্রহ হয়ে যাওয়াটাও বিচিত্র কিছু হবে না। এরিষ্টটল তার সমকালীন উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, "ক্লাজোমেনিতে যারা প্রণালীর উপর ছিল তাদের সঙ্গে বিরোধ ছিল দ্বীপের অধিবাসীদের সাথে। অনুরূপভাবে বিরোধ ছিল ক্লোকনীয় এবং নোটীয়দের মাঝে। এরূপ পরিস্থিতির অবসান এখনও হয়নি। পানি বন্টন নিয়ে ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশের মধ্যকার বিরোধ এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সমুদ্রের মাছ নিয়ে কানাড়া ও স্পেনের মাঝে বিরোধ কম তিক্ততায় পৌছায়নি!

www.pathagar.com

বিপ্লব ঃ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিরোধ

কোন রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার আমূল কোন পরিবর্তনের পেছনে এখন আর হয়ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণ তেমন বড় করে দেখার উপায় নেই। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সংঘাত বা বিরোধের জের অনেক সময় স্পষ্ট নয় বরং দলীয় কোন্দল বা আবশ্যিক দ্বন্দ্বের পথ বেয়েই সূচিত হয় বড় বড় পরিবর্তন। কিন্তু মতাদর্শগত সকল পার্থক্যের জন্যই ঘটে প্রথমে মানুষের চিন্তা-চেতনায়। চিন্তা-চেতনার সকল পরিবর্তন ধারণ করে প্রথমে গুটিকতক মানুষ। এরিষ্টটল মানুষের মধ্যে ক্ষমতা প্রয়োগকারী ব্যক্তিদেরকেই বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায়ী করেছেন। "এখানে যে কথাটি স্বরণ রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এই যে, যারা ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য দায়ী, তারা ব্যক্তি, সরকারের অঙ্গ, বা নাগরিক গোষ্ঠী, বড় কিংবা ছোট, যা-ই তুমি বল না কেন তারাই গন্ডগোলের সৃষ্টি করে বিপ্লবের সুত্রপাত ঘটায়। রাজতান্ত্রিক যে কোন ব্যবস্থায় এর প্রমাণ লাভ করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। এমনকি বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ও পরোক্ষভাবে এটি সত্য। একদলীয় ব্যবস্থায় এর সত্যতা উপলব্ধির জন্য ইতিহাসের একটু বেশি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শাসনে কমিউনিষ্ট পাটির সর্বাধিক অধিপত্য থাকা সত্ত্বেও লেনিন থেকে গরবাচেভ পর্যন্ত পট পরিক্রমায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহারে রাষ্ট্রনায়ক বা দলনেতার ব্যক্তিগত মতাদর্শন ও অভিরুচি এবং প্রভাব মোটেই খাটো করে দেখার উপায় নেই। গরবাচেভের মত একজন নেতার উত্থান হয়তো ইতিহাসের অমোঘ দাবি হয়ে পড়েছিল, তবুও ব্যক্তি গরবাচেভের ভূমিকা মোটেই তুচ্ছ নয়।

ব্যক্তিগত বা পারিবারিক উপাদান বিপ্লব সৃষ্টিতে বা বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটাতে কতখানি সফল নিয়ামক, তা নিশ্চয়ই বিতর্কের দাবি রাখে। তাই এরিষ্টটল এ কারণের সাথে যুক্ত করেছেন, জনগণের মাঝে বিরাজিত মতাদর্শগত পার্থক্যের বাস্তব অবস্থাকে। কোন আদর্শ বা পদ্ধতির প্রতি যদি বেশি মানুষ সক্রিয়ভাবে তাদের সমর্থন যোগাতে থাকে, তখন অল্প কিছু সংখ্যক মানুষ এর বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু এই নীতিগত বা পদ্ধতিগত বিরোধে ব্যক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য। ব্যক্তি সৎ বা অসৎ ভাল বা মন্দ যেকোন পন্থাই অবলম্বন করতে পারে তার অনুসৃত আদর্শ বা কাংখিত পরিবর্তনকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে। "এর পদ্ধতি হিসেবে বলা চলে যে, হিংসা এবং চাতুরী - উভয় পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। হিংসা দিয়েই যে সব

www.pathagar.com

সময় শুরু হয় এমন নয়। অনেক-সময় হিংসা আসে পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজন অনুসারে। চাতুরীর ব্যবহারও দু'প্রকারের হতে পারে। কোন ক্ষেত্রে বিপ্লবীগণ তাদের প্রতারণায় সফল হয় এবং গোড়ার দিকে তাদের সহজে স্বাগত জানান হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য তাদের জোর প্রয়োগ করতে হয়"। যে কোন বিপ্লবীচেতনা বা কর্মকাণ্ড প্রথমে কোন মহত্বর পরিবর্তন ঘটানোর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ঐসব উদ্যোগ নিন্দিতও হয়ে থাকে। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই ঐসব বিপ্লবী কর্মকান্ডের সঠিক অবস্থা সহজে বুঝা যায়। কোন আদর্শের অনুসারীগণ প্রধানতঃ দুটি কারণে হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। যেমন ঃ

প্রথমতঃ যেন -তিনভাবে ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম তাদেরকে নীতিবিবর্জিত যে কোন কাজে জড়িয়ে ফেলতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ সার্বিক রাজনীতি যদি নীতিবিবর্জিত হয়, তবে যে কোন আদর্শের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত দল বা গোষ্ঠী বেশি দিন নিজেদেরকে ন্যায়পারায়ণ রাখতে পারে না। ক্ষমতায় অধিষ্টিত হওয়ার পর সমগ্র ব্যাপারটিই ভিন্নরূপ ধারণ করে। দেখা যায় যে সব অনিয়ম ও নীতিহীন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে যারা কস্তা দখল করল, তারা ধীরে ধীরে একই ধরনের নীতিবিবর্জিত কাজে লিপ্ত হয়। তাত্ত্বিকভাবে কোন আদর্শ যতই উন্নত হউক না কেন, বাস্তবে প্রয়োগ করতে গেলে সে সব নীতিমালা কিছুটা ফ্যাকাসে হয়ে যেতে বাধ্য। এরূপ ঘটনার পেছনেও দু'ধরনের কারণ বিদ্যমান। একদিকে এর জন্য যেমন আদর্শিক নীতিমালার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা কাজ করতে পারে। অন্যদিকে আদর্শের অনুসারীদের পদস্খলন ও আপোষকামিতা দুই-ই এজন্য দায়ী হতে পারে।

আদর্শিক বিবেচনায় যা-ই হোক না কেন, ক্ষমতা বা নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ভূমিকাকে এরিষ্টটল বিপ্লবী পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আর সে কারণেই তিনি রক্ষণশীল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। সমালোচকরা অনেকে আবার তাকে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পক্ষে ওকালতি করার দোষে অভিযুক্ত করেছেন।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ পুস্তক

শাসনব্যবস্থার প্রকারভেদ ও গণতন্ত্রের ত্রুটি

ষষ্ঠ পুস্তকে মৌলিকভাবে নতুন তেমন কোন বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়নি; বরং ৪র্থ ও ৫ম পুস্তকের আলোচনার জের টানা হয়েছে এতে। শাসনব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়েই আলোচনা হয়েছে বেশি। কোন সুনির্দিষ্ট শাসনব্যবস্থাকে যে নামেই আখ্যায়িত করা হোক না কেন এবং যত শক্তভাবেই তাকে কার্যকর করার চেষ্টা করা হোক না কেন, তাকে ধ্বংস বা পরিবর্তনের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয় বলেই অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে এ অংশে। এখানে শাসনব্যবস্থার ধারনের চেয়ে যাদের জন্য গৃহীত শাসনব্যবস্থা তাদের ধ্যান-ধারণা ও জীবিকা উপার্যনের পদ্ধতির উপর বেশী গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শাসনব্যবস্থা যা-ই হোক না কেন যদি তা রাষ্ট্রের অধিবাসীদের জীবনধারণ পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যশীল না হয়, তবে তা কার্যকর হতে পারে না। তাই এরিষ্টটল গণতন্ত্রকের চারভাগে বিভক্ত করেছেন। গণতন্ত্রের এই শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে নাগরিকদের জীবিকা উপার্জন পদ্ধতিকে মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কৃষিজীবী মানুসের গণতন্ত্রকেই সর্বোত্তম গণতন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর পেছনে কয়েকটি কারণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন -

প্রথমতঃ কৃষকরা তেমন একটা প্রাচুর্যের মধ্যে থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ তাদের অবসর কম বিধায় তারা বাহুল্য রাজনীতি চর্চা করে না। আবার অন্যের সম্পত্তির প্রতি লোভও করে না।

কৃষিজীবীদের অনুসৃত গণতন্ত্রের পর পশুচারকদের গণতন্ত্রকে গুণগত মানের বিবেচনায় দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়েছে। তারপরই তিনি বলেছেন শ্রমিকদের গণতন্ত্রের কথা। চতুর্থ স্থানে বলেছেন তথাকথিত ভাড়াটে ও একবারেই নিম্নশ্রেণীর মানুষের গণতন্ত্রের কথা। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর গণতন্ত্রের কথা উল্লেখ করে এরিষ্টটল বলেন, যেহেতু এরূপ গণতন্ত্রের চর্চাকারীদের গুণগত মান নিম্ন এবং এরা নগরীর জনস্রোতের সাথে মিশে থাকে, তাই এদের অনুসৃত গণতন্ত্র তেমন একটা ভাল হতে পারে না, তা যে ভাবেই চর্চা করা হোক না কেন। এরূপ গণতন্ত্র মূলতঃ স্বৈরতন্ত্রেরই নামান্তর বলে উল্লেখ করেন এরিষ্টটল। নিজেদের পক্ষে যত বেশি সম্ভব মানুষকে ভিড়িয়ে সত্যিকার অর্থে জীবনের উপর যেরূপ আইনের নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার তা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করাই

www.pathagar.com

হচ্ছে এ ধরনের নিম্নশ্রেণীর গণতন্ত্রের সারকথা। "যে শাসন ব্যবস্থার কথা আমরা বলছি তার মূল কাঠামো হচ্ছে এটি, আসলে বেশির ভাগ লোকই নিয়ন্ত্রণহীন জীবন অধিক পছন্দ করে। কোন কর্তৃপক্ষের বাধ্য হওয়ার চেয়ে নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতাকেই তারা অধিকতর আনন্দদায়ক বলে গণ্য করে।" প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের যুগে কৃষিজীবী মানুষের গণতন্ত্রই যে সর্বোত্তম ছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কৃষিজীবী সমাজে মানুষ সহজে একে অপরকে চিনতে পারত। আবার সঠিক লোকদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করতে পারত এবং প্রয়োজনে ক্ষমতার রদবদলও সহজ ছিল। কিন্তু নগর জীবনে বিশেষ করে আধুনিক নগর-নিয়মের ফলে এরূপ গণতন্ত্র চর্চা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ছে। আধুনিক গণতন্ত্র চর্চাকে এরিষ্টটলীয় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র চর্চার আলোকে বিচার করতে গেলে এর গুণের চেয়ে দোষই বেশি পরিস্ফুটিত হয়ে পড়ে।

এরূপ গণতন্ত্রে মান্যগণ্য ভাব উঠে যায়। সরকারী কোষাগার থেকে বেতন বা সুবিধাদি না দিয়ে কোন কাজ করানো যায় না। "সরকারী রাজস্ব থেকে এরূপ বেতন দানের অর্থ যোগানো সম্ভব না হলে উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে বিরোধিতা উদ্ভব ঘটে? সর্বাত্মক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শুধু যে ব্যয়বহুল তাই নয়, এরিস্টটলের মতে এটি সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার কারণ ও হয়ে উঠতে পারে। তবে, এরিষ্টটল, গণতন্ত্র যাদের হাতে ব্যবহৃত হচ্ছে তাদেরকে মূল বিবেচনাধীন রেখেছেন। আর জনসাধারণকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেনঃ- জমিকর্ষণকারী, দৈহিক শ্রমজীবী, ব্যবসায়ী এবং অপরের দ্বারা নিযুক্ত লোক। চতুর্থ শ্রেণীর লোকদেরকে তিনি ভাড়াটে বলেছেন। আর এদের গণতন্ত্রকেই তিনি সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে অভিহিত করেছেন।

অধিকাংশ দারিদ্র দেশসমূহেই এখন এ ধরনের "বাড়াটে গণতন্ত্রের" চর্চা চলছে জোরেসোরে। এর ফলেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুফল থেকে সাধারণ জনগণ বঞ্চিত হচ্ছে।

সপ্তম পুস্তক

সম্পদ ও মূল্যবোধ

ষষ্ঠ পুস্তকে সর্বোত্তম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর সপ্তম পুস্তকে আলোচিত হয়েছে সর্বোত্তম রাষ্ট্রের কথা। গ্রীক দর্শনে আদর্শ রাষ্ট্রচিন্তা এক বিশাল স্থান জুড়ে আছে। মানুষকে আদর্শবান করার জন্য আদর্শ রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের কথা বলা হয়েছে। নানাভাবে প্লেটো তো আদর্শ রাষ্ট্র গড়ার ভাবনায় এতদূর অগ্রসর

www.pathagar.com

ছিলেন যে, অন্য যে কোন আদর্শ বা প্রতিষ্ঠানকে তিনি অবলীলাক্রমে রাষ্ট্রের স্বার্থে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। এরিষ্টটল অবশ্য অন্যান্য সব বুনিয়াদি ও আদি ন্যায়-নীতির ধারণা এবং সামাজিক ও পরিবারিক মূল্যবোধ টিকিয়ে রেখেই সর্বোত্তম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছেন।

এরিষ্টটল আদর্শ রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করতে গিয়ে আদর্শ মানুষকেই প্রথমে সামনে রেখেছেন। মানুষের জন্য সবচেয়ে কাঙ্খিত জীবনের স্বরূপ কি? কিসে মানুষ সবচেয়ে সুখী? উত্তম জীবনবোধ বলতেইবা কি বুঝায়? এসব প্রশ্নের উত্তরে এরিষ্টটল বলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান ছাড়া মানুষের জীবন সুখের হতে পারে না।

তাই তিনি প্রথমে মানুষের যথার্থ মানসিক উন্নতির কথা ভেবেছেন। মানুষের মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ ঘটার পূর্বেই যেন তার হাতে ক্ষমতা ও সম্পদ জড়ো না হয় সেদিকে নজর রাখতে বলেছেন রাষ্ট্রকে। বস্তুগত সকল সম্পত্তিকে তিনি হাতিয়ারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। হাতিয়ার দ্বারা মানুষ একদিকে যেমন উপকৃত হয়, অন্যদিকে তেমনি অপকৃতও হতে পারে। ধনী ব্যক্তির ধন অনেক সময়ই তার জন্য বিপর্যয় ডেকে আনে। সে কারণেই বলা হয়, "অর্থই অনর্থের মূল।" অভাবী সংসারে অবশ্য এরূপ সত্যের গুরুত্ব তেমন একটা উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু মানবীয় গুণাবলীর ক্ষেত্রে অবস্থা ভিন্নতর। "মনের উত্তম যে গুণাবলী তার প্রত্যেকটিই আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় এবং এর যে কোন গুণের যত অধিক আমরা অর্জন করতে পারব, সে গুন ততই আমাদের সার্থক করে তুলবে।

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষ যেমন হঠাৎ করেই সম্পদশালী হয়ে উঠতে পারে, তেমনি রাষ্ট্রের পক্ষেও এমনটি হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। হঠাৎ কোন খনিজ সম্পদের সন্ধান লাভই রাষ্ট্রকে ধনী করে তুলতে পারে। মানুষের চোখের সামনে আরব দেশসমূহে তেলের সন্ধান লাভের সাথে তাদের সম্পদশালী হওয়ার উদাহরণ স্পষ্ট। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোন আদর্শ রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনও কি এরূপ দ্রুততার সাথে হওয়া সম্ভব?

রাষ্ট্রকে জানতে হবে কিভাবে সে ক্ষমতা ব্যবহার করবে। রাষ্ট্র যেহেতু শাসনকার্য পরিচালনা করে, কাজেই তাকে অবশ্যই মানুষের উপর ক্ষমতা ব্যবহার করতে হবে কিন্তু সে ক্ষমতা আবার রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মানুষকেই ব্যবহার করতে হয়। কাজেই শাসকদের গুণের কথা এখানে এসেই যাবে। শাসকদের সম্পদশালী হওয়া না

www.pathagar.com

হওয়ার ব্যাপারটি অনেক সময়ই গৌণ্য। তবে শাসকদের অধিক ধনী হওয়া বা গরীব হওয়া রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক।

শাসককেও তার আপন গুণেই হতে হয় মহিমান্বিত। তাকে বুঝতে হবে যে, শাসন করা মানেই আধিপত্য বিস্তার করা নয়। সাধারণ মানুষ হয়ত এ দুটির পার্থক্য বুঝবে না। কারণ তাদের কাছে শাসন মানেই আধিপত্য বিস্তার করা। শাসকের ক্ষমতাকে এরিষ্টটল সন্তানের উপর পিতার ক্ষমতা, স্ত্রীর উপর স্বামীর ক্ষমতা এবং দাসের উপর প্রভুর ক্ষমতার সাথে তুলনা করে বলেন যে, নিশ্চয়ই নাগরিকদের উপর শাসকের ক্ষমতা এর চেয়ে অনেক কম। কিন্তু শাসক যেহেতু সংখ্যার দিক থেকে অনেক বেশি লোকের উপর ক্ষমতা ব্যবহার করে তাই তাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য শাসন করতে দেয়া ঠিক নয়। তবে তাই বলে অযোগ্য হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করাও ঠিক নয়।

এরিষ্টটলের মতে, শাসকদের মূল কাজই হচ্ছে নাগরিকদের জীবন কল্যাণধর্মী কাজে নিয়োজিত রাখা। বেকার জীবনকে বিধাতা পছন্দ করেন না বলে তিনি জোরালো বক্তব্য পেশ করেন এবং সকলের জন্য কাজ নিশ্চিত করা না গেলে তিনি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ করেছেন।

নাগরিকদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে কর্তব্যে নিয়োজিত রাখা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। রাষ্ট্রেকে তার সামরিক বাহিনী গঠন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই দুরদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে। নাগরিকদের শ্রেণীবিভাগ ও সকল দায়িত্ব বণ্টনের জন্য শিশু প্রতিপালনের দিকে এরিষ্টটল নজর দিয়েছেন। শিশুদের কোমল মনে যাতে খারাপ কিছু প্রভাব ফেলতে না পারে, সেজন্য শাসকদের কঠোর হতে উপদেশ দিয়েছেন। তরুণদের অশ্লীল কোন জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা যারা করবে তাদের জন্য দণ্ড হিসেবে বেত্রাঘাত, এমনকি তাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়ার পক্ষে এরিষ্টটল জোর সুপারিশ করেন।

অষ্টম পুস্তক

শিক্ষা

অষ্টম পুস্তকটি অন্যান্য সাতটি পুস্তকের তুলনায় সবচেয়ে ছোট। কিন্তু মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। রাষ্ট্রের নাগরিকদের কিভাবে গড়ে তুলতে হবে, এটিই হলো এ অধ্যায়ের প্রধান বিষয়বস্তু। শিক্ষাকে এরিষ্টটল একটি রাষ্ট্রীয় বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, আইন দ্বারা শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। তার মতে শিশুদের

www.pathagar.com

চারটি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। যেমন (১) পড়া ও লিখা; (২) শরীরচর্চা; (৩) সংগীত এবং (৪) অংকন।

রাষ্ট্রীয়, পারিবারিক এবং সামাজিক কাজকর্মে শিক্ষা কতখানি মূল্য বহন করবে, এ দিয়ে শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারিত না হয়ে বরং শিক্ষা মানুষকে কতকানি আদর্শবান হতে শেখাবে, তা দিয়ে বিষয়টি বিচার হওয়া উচিত।

তবে তিনি শিক্ষাকে শুধুমাত্র বিশেষ কোন গুণবৃদ্ধির জন্যই নিবেদিত করতে চাননি। সাহিত্য, সঙ্গীত, শরীরচর্চার মত শিক্ষা কখনও মানুষের মনের খোরাক, আবার কখনওবা দেহের খোরাক, কখনও এর প্রয়োজন যিনি করেন তার জন্য আবার কখনও এটি প্রয়োজন দর্শকদের জন্য। আবার একই জিনিষ বিভিন্ন জনের আবেগে বিভিন্ন রূপে নাড়া দেয়। শিক্ষা যদি মানুষকে প্রথমতঃ অধিকতর আদর্শবান হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে, তবে সে শিক্ষা নিশ্চয়ই তাকে পরবর্তীতে কর্মে ও অবসর-যাপনে শুধু সাহায্যই করবে না; বরং নির্মল আনন্দ দান করবে বলে এরিষ্টটল দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

তিনি কোন প্রশিক্ষণকেই প্রথমে পেশাদারী ও প্রতিযোগিতামূলক করার পক্ষপাতি নন। এরূপ কাজকে তিনি মানুষের চরিত্র গঠনের জন্য হানিকর মনে করেন এবং বলেন, এরূপ কাজ যে কম খরচে আনন্দ দান করে তা পরবর্তীতে মূলতঃ মানুষের দেহ ও মনের জন্য বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। "জনতা যে সঙ্গীত তার কাছ থেকে প্রত্যাশা করে এবং যে অঙ্গভঙ্গী দ্বারা যে সঙ্গীত তাকে সৃষ্টি করতে হয়, তাতে গায়কের দেহ ও মন উভয়ই ক্ষতিকর ভাবে প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ নিজের মনের চাহিদা পুরণের জন্য শিল্পকর্মের একটি শাখা বেছে নাও ও তা চর্চা কর এবং এ থেকে যদি অন্যান্য মানুষ আনন্দ পায় তবে তাও তাদেরকে বিলাও। কিন্তু ফরমায়েশী শিল্পচর্চা থেকে বিরত থাক। ফরমায়েশী শিল্পচর্চা সবাইকে বাস্তব জীবন থেকে সরিয়ে নিয়ে কাল্পনিক জীবনে অভ্যস্ত করে তোলে। মানুষ হয়ে পড়ে স্বার্থপর ও বিলাসী; এবং সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণে শ্রম ও মেধা ব্যয় করার মত শক্তি হারিয়ে ফেলে।

www.pathagar.com

বিভিন্ন তন্ত্রে বিপ্লব

গণতন্ত্র, কতিপয়তন্ত্র, অভিজাততন্ত্র

গণতন্ত্রঃ এরিষ্টটল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তনের মূলে প্রকাশ্য অত্যাচার অবিচারকে দায়ী করেছেন। তাঁর মতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় টিকে থাকার জন্য শক্তিপ্রয়োগ করেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে স্বৈতান্ত্রিক করা হয়। শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজেই যে সরাসরি অন্যায়-অবিচার করে গণতন্ত্রকে স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত করবে, এমনটি নাও হতে পারে। বিদ্রোহ দমনের জন্য সেনাবাহিনীর ব্যবহারও এরূপ পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে এরিষ্টটল এথেন্সের পিসিসট্রাটাসের নাম উল্লেখ করেন। পিসিসট্রাটাস মূলতঃ জমির মালিকদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়েই স্বৈরশাসনে পরিণত হয়।

আধুনিককালেও দেখা যায় যে, যেসব দেশে একবার সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা হয রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, সেসব দেশে বার বার সামরিক শাসনের অধীনে চলে যায়। বহু নগর-রাষ্ট্রে অবশ্য রাষ্ট্র প্রধানরাই সামরিক নেতাও ছিলেন। রাষ্ট্রনায়ক হবার জন্য সামরিক নেতা হওয়াটা রীতিমত পূর্বশর্তের মতই কাজ করত। "বর্তমানে যে এমনটি তত ঘটে না তার কারণ, পূর্বে সেনাবাহিনী পরিচালনাকারীদের মধ্য থেকেই জনপ্রিয় নেতা আবির্ভূত হত, বক্তৃতায় দক্ষ যারা তাদের মধ্য থেকে নয়।" আজও দেখা যায়, বিভিন্ন দেশে সেনাবাহিনীর লোকরা ক্ষমতা দখল করে যথেষ্ট জনপ্রিয় রাষ্ট্রনায়কের আত্মপ্রকাশ ঘটায়। উন্নত বিশ্বে অবশ্য এমনটি এখন আর হবার জো নেই।

সেনাবাহিনীর লোকেরা শুধুমাত্র যুদ্ধ ও জরুরী অবস্থায় জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের অধীনে থেকে কাজ করবে, এটি এখন প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের একটি মৌলিক সাংবিধানিক নীতি। সুপ্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তাই সামরিক শাসন ও বিপ্লব প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। এরিষ্টটল সামরিক বাহিনী বা হিংসাত্মক কার্যকলাপ কোনটিকেই গণতন্ত্রের জন্য সবেচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে চিহ্নিত না করে জননেতাদের দুর্নীতি পরায়ণতাকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পতনের এক নম্বর কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এটাই হয়ত স্বাভাবিক। কারণ রক্ষকরাই যখন ভক্ষক সেজে যায়, তখন অস্বাভাবিক বা অনিয়মতান্ত্রিক পথ বেয়েই শুধু পরিবর্তনের আশা করা যায়।

কতিপয়তন্ত্রঃ কতিপয়তন্ত্রের নাম শুনে মনে হয়, এটি যেন কয়েকজন লোক দ্বারা পরিচালিত কোন শাসনব্যবস্থা। এরিষ্টটল কতিপয় লোকের শাসনকেই কতিপয়তন্ত্র

www.pathagar.com

বলেননি। কারণ এ বিবেচনায় অভিজাততন্ত্রও কতিপয়তন্ত্র হতে পারে। তার মতে গণতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র না হলেই শাসনব্যবস্থা হবে কতিপয়তান্ত্রিক। কতিপয়তন্ত্রের শাসকদের সংখ্যা কয়েক শতও হতে পারে। কতিপয়তন্ত্রের শাসকদের সংখ্যা যা-ই হোক না কেন তাদের মাঝে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই এর পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। আদর্শগত মতপার্থক্য বা নেতৃত্বের অধিকতর অংশীদারিত্বের আকাঙ্ক্ষা কতিপয়ী শাসনব্যবস্থার ভিত্তিমূলে দ্রুত আঘাত হানতে পারে।

অভ্যন্তরীণ কোন্দলের অনুপস্থিতিতে কতিপয়ী শাসনব্যবস্থা যথেষ্ট মজবুত থাকে। তবুও নানা কারণে এটি বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। প্রধানতঃ দুটি কারণে কতিপয়ী ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে পারে। যেমন -

প্রথমতঃ শাসকরা যদি ক্রমাগত জনতার উপর নির্যাতনমূলক আচরণ করতে থাকে, তখন গণবিদ্রোহের জের হিসেবে তাদের পতন হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ ধনিক-বণিক শ্রেণীর সক্রিয় অসন্তোষ কতিপয়ী শাসনব্যবস্থার পতন ঘটাতে পারে।

স্বাভাবিকবাবেই ধনীরা শাসনকার্যে নিজেদের ভূমিকা রাখতে চাইবে। প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ সম্ভব না হলেও পরোক্ষভাবে শাসনব্যবস্থা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইবে, যাতে তাদের শ্রেণী বা গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষিত হয়। কতিপয়ী শাসনব্যবস্থা সম্পদশালীদের এরূপ স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে, তার পক্ষে টিকে থাকা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। "অনেক সময় বিপদটা আসে প্রকৃতপক্ষে ধনিক শ্রেণীর মধ্য থেকেই। বিশেষ করে ধনিক শ্রেণীর যারা সরকারের অন্তর্ভূক্ত হয় না, তাদের কাছ থেকে।

এ দুটি কারণ ছাড়াও কোন শাসকের মৃত্যুর পর কার উপর শাসনভার ন্যস্ত হবে, এ নিয়মে মতবিরোধের পরিণতিতেও কতিপয়ী শাসনব্যবস্থায় পতন ঘটতে পারে। তাছাড়া কোন গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায়কে কেন্দ্র করেও কতিপয়ী শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হতে পারে। "নগর-রাষ্ট্র হেরাক্লিয়া ও থিবিস-এর বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের পেছনে কাজ করেছে আদালতের বিতর্কিত সিদ্ধান্ত। সর্বোপরি মাত্রাতিরিক্ত স্বৈরাচারী স্বরূপও কতিপয়ী ব্যবস্থার পতন ঘটাতে পারে।

কতিপয়ী ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পারস্পপরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এরিষ্টটল বলেন, এদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন কষ্টকর। কতিপয়ী ব্যবস্থা

www.pathagar.com

পরিবর্তিত হয়ে যেমন গণতন্ত্রী রূপ নিতে পারে, তেমনি গণতন্ত্রী ব্যবস্থাও কতিপয়ী শাসনব্যবস্থায় রূপান্তরিত হতে পারে।

অভিজাততন্ত্রঃ এরিষ্টটলকে সহজেই অভিজাততন্ত্রের সমর্থক ধরে নেয়া যায়। কিন্তু তাই বলে এ ধরনের শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা এবং এর পতন সম্পর্কে সুস্পষ্ট মন্তব্য করতে কার্পণ্য করেননি তিনি। কয়েক জনের দ্বারা শাসিত শাসনব্যবস্থার স্বাভাবিক রূপকে অভিজাততন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করেই তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, "অভিজাততন্ত্র ও একপ্রকার কতিপয়তন্ত্র। কারণ উভয় ব্যবস্থাতে শাসক হবার যোগ্যতা কতিপয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু তাই বলে সীমাবদ্ধতার ভিত্তি এক নয়। তাহলে বলা যায়, সকল কতিপয়ী শাসনব্যবস্থায়ই অভিজাততন্ত্রী হতে পারে না। কিন্তু সকল অভিজাততন্ত্রী শাসনব্যবস্থাই প্রকারান্তরে কতিপয়ী ব্যবস্থা। তবে অভিজাততন্ত্রে রক্তের সম্পর্কের গুরুত্ব অপরিসীম। জন্মসূত্রই ঠিক করে দেয় কে শাসক, আর কে শাসিত। এ ধরনের শাসনব্যবস্থা কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হতে বাধ্য।

প্রথমতঃ জন্মসূত্রের কারণেই জনতার যে বিশাল অংশকে শাসক হবার অযোগ্য বলে ধরা হয়, তারা অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে। স্পারটার পারথেনী বলে পরিচিত মানুষরা অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে তাদেরকে সিসিলিতে নির্বাসিত করা হয়। এরাই পরবর্তীতে টারেন্টাম নগরী প্রতিষ্ঠা করে। এ সমস্যাকে গোত্রীয় বা গোষ্ঠীয় সমস্যা বলা যেতে পারে। .

দ্বিতীয়তঃ কোন বংশ বা গোত্রের সকল মানুষ একইরূপ গুণসম্পন্ন হবে, এমন কোন কথা নেই। অসাধারণ গুণাবলীর অধিকারী লোকরা যখন শাসনকার্যে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে, তখন তাদের স্বাভাবিক আনুগত্য শাসকরা আশা করতে পারে না। তাই শাসকরা এদেরকে দমিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়। স্পারটার রাজারা লাইসানডারকে ও কিনডানকে দমিয়ে রেখেছিল, যদিও তাদের যোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা ছিল প্রায় সর্বজনবিদিত।

তৃতীয়তঃ অভিজাতশ্রেণী যদি বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়ে যায়, তখন তাদের মাঝে উচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা কমতে থাকে। অন্যদিকে জনসাধারণের মাঝে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কোন যুদ্ধ বা জরুরী অবস্থাকে কেন্দ্র করে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অভিজাতশ্রেণীর দ্রুত প্রচুর পরিমাণ সম্পদ কুক্ষিগত করার বহু উদাহরণ সহজেই দেখতে পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

চতুর্থতঃ অভিজাতশ্রেণীর পক্ষ থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে যখন কোন শাসক মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতাবান হয়ে উঠে, তখন জন অসন্তোষ সৃষ্টি হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

অভিজাততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সব রকমের পতনের প্রধান কারণকে এরিষ্টটল চিহ্নিত করেছেন শাসনতন্ত্রের নীতি থেকে বিচ্যুতিকে। এ শাসনতান্ত্রিক বিচ্যুতি বুঝার পূর্বে জানা দরকার অভিজাততন্ত্রের সাংবিধনিক মূলনীতি বলতে তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন। "পলিটির ক্ষেত্রে এই বিচ্যুতি হচ্ছে, কতিপয়ী ব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংমিশ্রণের ব্যর্থতা। অভিজাততন্ত্রের ব্যর্থতা হচ্ছে এ দুটির সঙ্গে গুণের মিশ্রণের এবং বিশেষ করে গণতন্ত্র এবং কতিপয় তন্ত্রের মিশ্রণের ব্যর্থতা। নির্ভেজাল গণতন্ত্র ও আক্ষরিক অর্থে কতিপয়তন্ত্রের দোষাবলী থেকে মুক্ত করে শাসনব্যবস্থাকে একটি মধ্যবর্তী রূপ দিতে চেয়েছিলেন এরিষ্টটল।

গণতন্ত্রের মূর্খতা প্রকট আকার ধারণ করতে পারে বলে তিনি আশংকা প্রকাশ করেন। গণতন্ত্রকে মূলতঃ তিনি একটি বিকৃত শাসনব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। গণতন্ত্রেকে যদি বহুলোকের শাসন ধরা হয়, তবে এরিষ্টটল এর স্বাভাবিক রূপকে নামকরণ করেছেন পলিটি বা মধ্যতন্ত্র হিসেবে। তার মতে মধ্যতন্ত্র খাঁটি অভিজাততন্ত্রের চেয়ে বেশি স্থিতিশীল ব্যবস্থা খাঁটি অভিজাততন্ত্রের আয়ুষ্কাল যেহেতু স্বল্প, তাই অভিজাততন্ত্র কোন্ কোন্ দিকে মোড় নিতে পারে, তা নিয়ে এরিষ্টটল ভাবনায় পড়েন। তার মতে অভিজাততন্ত্রের পরিবর্তন ঘটে যায় সবার অলক্ষ্যে, তাই এর পতন রোধ করা প্রায় অসম্ভব।

অভিজাত তন্ত্রের পতনের চেয়ে অভিজাত তান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিবর্তীতে কি ধরনের শাসন ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়, তা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। "অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের দিকে মোড় নিতে পারে। দারিদ্রগণ যদি নির্যাতিত হয়, তাহেল তারা গণতন্ত্রের দিকে শাসনব্যবস্থাকে আকর্ষণ করতে পারে এবং পলিটি যখন তার স্থায়িত্বের গুণগুলোকে হারিয়ে ফেলে, তখন পলিটিও কতিপয়তন্ত্রে পর্যবসিত হয়ে যায়। পলিটিক্স স্থায়ী হবার গুণ হচ্ছে, সম্পদের সমতা এবং ব্যক্তিগত স্বত্বভোগের স্বাধীনতা। প্রকৃত প্রস্তাবে অযৌক্তিক অসাম্যকেই এরিষ্টটল সকল শাসনব্যবস্থার পতনের মুল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এটিকে আমরা অভিজাততন্ত্রের পতনের পেছনে প্রধান কারণ বলতে পারি।

www.pathagar.com

এরিষ্টটল শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ কারণ বর্ণনা করার সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী দেশে প্রচলিত শাসনব্যবস্থার প্রভাবের কথাও জোরালোভাবে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি দুটি দেশে পরস্পরবিরোধী ব্যবস্থা বেশিদিন কার্যকরী হতে পারে না। "যেমন প্রতিবেশী কোন শাসনব্যবস্থা যদি বিপরীতধর্মী হয় এবং তার অবস্থান যদি তেমন দূরবর্তী না হয়, কিংবা দূরবর্তী হলেও যদি সে ব্যবস্থা বিশেষ ক্ষমতাশালী হয়, তাহলে তার প্রভাব দুর্বলতরের উপর পড়তে বাধ্য। এরিষ্টটলের এ কথাগুলো তার সময়কার এথেনীয় ও ল্যাসিডিমনীয় (স্পারটার) শাসনব্যবস্থার ব্যাপারে গণতান্ত্রিক সরকারের বিলুপ্তি ঘটিয়ে কতিপয়ী ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজেদের নগর-রাষ্ট্র, স্পার্টকে কঠোর আইনের অধীনে রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

আধুনিককালেও বিভিন্ন দেশের শাসনব্যবস্থায় এরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের পুঁজিবাদে প্রত্যাবর্তন এত দ্রুত সাধিত হত না, যদি পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক জৌলুস সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মানুষকে এত পাগলপারা করতে সমর্থ না হতো। অন্যদিকে চীন বা কিউবার মত দেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এত প্রবল চাপের মুখেও তাদের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে, কারণ ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ পুঁজিবাদে ফিরে গিয়ে সামান্যই লাভবান হয়েছে। এর মূল কারণই হচ্ছে, তিনি রাষ্ট্র-যন্ত্র ও সরকার পদ্ধতিকে সর্বতোভাবে নৈতিকতার উঁচু মাপকাঠিতে বিচার করেছেন।

এরিষ্টটলের ন্যায়তন্ত্র

এরিষ্টটলীয় 'পলিটি' ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষেই একটি নীতিশাস্ত্রীয় ব্যবস্থার মত শুনায়। সে কারণে তার রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে এক ধরনের ন্যায়তন্ত্র হিসেবেও ব্যাখ্যা করা যায়। গ্রীক সভ্যতার স্বর্ণযুগে নীতিশাস্ত্রকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখার মাতৃশাস্ত্র (mother-science) বলা হতো। তাই জ্ঞানী ব্যক্তি বলতে বুঝাতো একজন তিন্দ্রী বিষয়ক জ্ঞানী সংষমী ও শুদ্ধাচারী তাপসকে। প্লেটোই যেন ছিলেন এর মূর্ত প্রতীক। জ্ঞান, শিক্ষা, ন্যায়, ধর্মসবই যেন এক ধরনের অমূর্ত ভাবের লীলা। বাস্তব জীবনে এই অমূর্ত ভাবের প্রতিফলনের প্রচেষ্টাই এরিষ্টটলকে প্রয়াসী করেছে নীতিশাস্ত্র ও রাষ্টবিজ্ঞানের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক খুঁজতে। রাষ্ট্র তার কাছে কেবলই জীবনধারণ পদ্ধতির বা আইনগত অধিকারের রক্ষাকবচ নয়; বরং উন্নততর জীবন-বোধ সৃষ্টি শক্তিশালী হাতিয়ার। "জন বাউলের" (John Bowle) মতে এটি ছিল

www.pathagar.com

এরিষ্টটলের একটি অতি দুঃসাহসিক অনুসন্ধান। এ দুঃসাহসিক অভিযানে এরিষ্টটল জয়ী হয়েছিলেন। বিশ্ব, রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি-মানুষের মাঝে তিনি সন্ধান দেন ক্রমবিকাশমান গতিশীলতার। বিকাশমান এ গতিধারা কোন অনাড়ী হাতে আবদ্ধ হলেই বিপদ। অভিজ্ঞতামূলক পর্যবেক্ষণের (imperical observation)_ ভিত্তিতে ব্যবহারিক প্রজ্ঞাকে (Practical wisdom) কাজে লাগিয়েই মানুষকে প্রমাণ করতে হয় রাজনৈতিক জীব হিসেবে তার সার্থকতা।

এরিষ্টটলীয় এ প্রজ্ঞা নিছক কোন তত্ত্বগত ধারণা নয়। তার চিন্তাধারায় রাষ্ট্র, আইন ও মানুষকে বেশ কিছু শাশ্বত সৎগুণের অধিকারী হতে হয়। সৎগুণগুলো কেউ যেমন আপনাআপনি অর্জন করে না, তেমনি শুধুমাত্র জীবিকা-নির্বাহের নিমিত্ত কর্মযোগেও এর সহজ অর্জন প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত নয়। আইন তখনই এ ব্যপারে মানুষকে সহায়ক শক্তি যোগান দিতে পারে, যদি এতে নিরাসক্ত যুক্তির (Passionless reason) অভিব্যক্তি ঘটে। আইনকে এ ভূমিকা পালন করতে হলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ঘরে নীতিশাস্ত্রকে গড়ে দিতে হয় সুখের সংসার।

এরিষ্টটল মূলতঃ এরূপ আপাতঃ অসম্ভব একই নীড়ের বাসিন্দা করেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রকে। এখানে রাষ্ট্রনীতি ও মানুষের স্বভাবজাত সৎগুণাবলীর মাঝে সুসামঞ্জস্য বিধানে আইন অক্ষম হয়ে পড়ে, যদি আইনবিবর্জিত হয় নীতিশাস্ত্রের আলোকে থেকে। রাষ্ট্রনীতির সাথে নৈতিকতার এ বন্ধনের যে পথনির্দেশ এরিষ্টটল করেন, তা পরবর্তীতে "সুবর্ণময় মধ্যপন্থা" (golden mean) নামে আখ্যায়িত। আইন যখন এরিষ্টটলীয় এ মধ্যপন্থা অবলম্বন করে, তখন এর সৃষ্টি এবং প্রয়োগে যুক্ত ও নীতি, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা, তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতা, কঠোরতা ও উদারতা, কল্পনা ও বাস্তবতার এক প্রাকৃতিক আনুপাতিক সংমিশ্রণ ঘটে। এ পথ নির্দেশনায় এরিষ্টটল এত সফল যে, তিনি আজও উজ্জ্বল সে সব সমাজে, যেখানে প্রচেষ্টা চলে রাষ্ট্র ও আইনকে একদেশদর্শিতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার। আর্নেস্ট বার্কারের ভাষায়, "এরিষ্টটল নিয়মতন্ত্রবাদ শিক্ষা দেন সেন্ট টমাসকে, সেন্ট টমাস তা শিক্ষা দেন ক্যাথলিক ইউরোপকে ও রিচার্ড হুকারকে বিচক্ষণ হুকার তা শিক্ষা দেন জন লককে এবং লকের হাত হয়ে তা আসে এডমন্ড বার্কের কাছে। সপ্তাদশ ও অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ডীয় রাষ্ট্রচিন্তার আবহাওয়ার সাথে এরিষ্টটলের 'পলিটিক্সের' আবহাওয়ার শুধু যে মিল আছে তাই নয়, তারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে একাত্মও বটে।

www.pathagar.com

এ একাত্মতা ইদানিংকালে দারুণভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মানুষ আইনকে শাস্তির ভাষায় রূপ দিয়েছে, তাই সে এখন সভ্যতাকে গ্রাস করতে চাইছে। প্রাচীনকালে মানুষ বলি হতো বিভিন্ন ধর্ম ও দেবতার বেদীমূলে। পরবর্তীতে অসীম শক্তিধর রাজা-বাদশার হাতে। তারপর বিভিন্ন মতবাদ ও জাতীয়তার কবলে আক্রান্ত মানুষ আবিষ্কার করল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। প্রত্যক্ষ বলিদান প্রথা রহিত হলো। কিন্তু পরোক্ষ শোষণ-নির্যাতন লাগাম ছাড়াভাবে গ্রাস করল বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে। "আধুনিক গণতন্ত্র মানুষের মাঝে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠায় নিবদ্ধ। কিন্তু গণতন্ত্রের পথে দারিদ্র্যতা অন্যতম বাধাস্বরূপ। গরীব জনসাধারণ সব সময় বেকার, ক্ষুধা এবং দুঃখ-কষ্টের চাপে মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত, তাই তারা নৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিমূলক কার্যে কোন প্রকার উন্নতি করতে পারে না। সুতরাং গণতন্ত্রের আদর্শ, স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধ তাদের কাছে বাগাড়ম্বর বলে মনে হয়। খাদ্য এবং বাসস্থান তাদের কাছে মূল দাবি, আর তার জন্য তারা একনায়কত্বকেও স্বাগতম জানাতে পারে। তাই এরিষ্টটল বলেছেন যে, দারিদ্র্য জনসাধারণকে বেপরোয়া করে তুলে এবং গণতন্ত্রকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যায়।

গণতন্ত্র রক্ষা পাবে কি-না, তা নির্ভর করবে এরিষ্টটলীয় ন্যায়তন্ত্র তার নিজের স্থান পুরুদ্ধার করতে পারবে কি- না তার উপর। এ ন্যায়তন্ত্র কোন শাসন ব্যবস্থার নামান্তর নয়। এটি একটি সমন্বয় সাধন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র, আইন ও মানুষ সক্রিয় অভিনেতা। আর এদের সকলের জন্য বিধিসম্মত আনুগত্য ও স্বাধীনতার নির্দেশ দানই হচ্ছে ন্যায়তন্ত্রের মৌলিক কাজ। সহজভাবে বলতে গেলে রাষ্ট্র ও আইনের কর্তৃত্বের সাথে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী অধিকারের সাংবিধানিক কাঠামোগত রূপরেখাই এ ন্যায়তন্ত্রের মৌলিক নির্যাস। এরিষ্টটলের ন্যায়তন্ত্রী মানুষ ও আদর্শ আইন একদিকে যেমন হবে সহজ, সরল, সুন্দর, আবার অন্যদিকে হবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি। রাষ্ট্র হবে এদের সকলের ধারক। ন্যায়তন্ত্র রাষ্ট্র রক্ষার জন্য যেমন ন্যায়ধর্মী মানুষ চাই, তেমনি ন্যায় পরায়ণ মানুষ সৃষ্টিতে চাই সত্যপন্থী রাষ্ট্র। আইন উভয়ের জন্য নিছক হাতিয়ার মাত্র।

"The state, therefore, exists to satisfy the higher moral and intellectual needs of man the household, within the state to provide for the physical needs of life.

কাজেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিরাজ করে মানুষের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজন

www.pathagar.com

মেটানোর জন্য; আর রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত সহায়- সম্পদ জীবনের জন্য শারীরিক প্রয়োজন মেটায়।

এরিস্টটলীয় আদর্শ হচ্ছে, মানুষ যেহেতু আত্মিকভাবে উন্নত, তাই জৈব প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে সে বল্লাহীন নয়।তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রও তাই মানুষের মনোজগত ও আত্মিক প্রয়োজনের দাবি মেটানোর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনের দাবিদার: তবে বস্তুগত প্রয়োজন উপেক্ষা করে নয়। সহজ কথায় বলতে গেলে তার ন্যায়তান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিজের জন্যই বাঁচে না বা শুধুমাত্র খাওয়া-পরার মাঝেই জীবনের উদ্দেশ্যে সীমিত নয়। আবার বাঁচার জন্য খেতে- পরতে তো হবেই, তাছাড়া নিজে বাঁচলে তবেই তো অন্যের জন্য কিছু করা যাবে। স্বার্থপরতা ও আত্মত্যাগ এ দুয়ের মাঝে বাস্তবসম্মত সামঞ্জস্য বিধানের নামই ন্যায়তন্ত্র। এরিস্টটল তার ন্যায়তন্ত্রকে সবকিছুর সাথে এক প্রাকৃতিক অমোঘ বিধানের মত করে জড়িয়ে দিতে চেয়েছেন।

তুলনামূলক আলোচনাঃ প্লেটো ও এরিষ্টটল

পূর্বকথাঃ সময়টা সেই খ্রীষ্টপূর্ব ৩৬৬ অব্দ। থেরেস নগরীর অষ্টাদশ বর্ষীয় এক কিশোর এলেন বিশ্বশ্রুতি জ্ঞানপীঠ এথেন্স নগরীতে। মহান দার্শনিক প্লেটোর একাডেমিতে নিলেন শিষ্যত্বের পাঠ। সেই শুরু। তারপর গুরুর সাথে অতিবাহিত করলেন আরো বিশটি বছর (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৪৬ অব্দে- প্লেটোর মৃত্যু) তবু বিস্ময় জাগে, যখন দেখি, এহেন জাঁদরেল শিক্ষকের অধীনে বিশটি বছর কাটিয়েও এরিস্টটল তার নিজস্ব চিন্তায় মৌলিক, প্রোজ্জ্বল ও অনন্য। শুধু তাই নয়, প্লেটো ও এরিস্টটলের রচনাবলী পড়লে মনে হয়, এ যেন সম্পূর্ণ দুই ভিন্ন ভাবাদর্শের কথা। এদের মাঝে কোনকালে সামান্যতম সংযোগ ও ছিল বলে অনুমান করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। আদর্শগত এই ব্যবধান আরো প্রকট হয়ে সূচিত হয়, যখন কেউ প্লেটোর Republic এবং এরিস্টটলের Politics পাশাপাশি রেখে পড়ে। অথচ তাদের সবগুলো রচনাবলীর মূল সুরে যেন একই ঐক্যতানের ব্যঞ্জনা।

বিশ্বের খ্যাতিমান কিছু রাষ্ট্রনৈতিক দার্শনিকের (Political philosophers) যেমন Sabin, Mill, Gilchrist, Laski, বিশ্লেষণ অনুসারে এ দুই মহান দার্শনিক সম্পর্কে গুরু- শিষ্য মতবাদ ও চিন্তা- চেতনার পারস্পরিক কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সংক্ষেপে তুলে দেয়া হলোঃ

www.pathagar.com

প্রথমতঃ ব্যক্তি - মানুষ হিসেবে চিন্তা করলে প্লেটো ছিলেন অতিমাত্রায় বিপ্লবী। আবেগ ও কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতঃ প্রায়ই তিনি ভুলে যেতেন মাটির পৃথিবীকে। প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার পুরোটা ভেঙ্গে - চুরে নতুন সমাজ নির্মাণে তার ছিল সর্বাত্মক আগ্রহ। আদর্শ- রাষ্ট্র ও আদর্শ- রাজার (Philosopher- king) স্বপ্নে তিনি ছিলেন বিভোর। পক্ষান্তরে এরিষ্টটল ছিলেন বাস্তবধর্মী মানুষ। তিনি যেন সমাজের ভেতরেই পরিবর্তনের নিয়ামক সন্ধান করেন। সমাজের প্রচলিত নিয়ম-কানুন তিনি সংশোধন করতে চাইতেন বিদ্রোহ বা ঘৃণা দিয়ে নয়, বরং মমতা দিয়ে। মানুষের সংস্কার, কৃষ্টি ও প্রথাকে তিনি দেখতেন অপরিসীম শ্রদ্ধা ভরে।

দ্বিতীয়তঃ প্লেটোর উপর গণিতশাস্ত্র ও সংগীতের প্রভাব অতিমাত্রায় বেশি। তিনি সংগীতের এত বেশী ভক্ত ছিলেন যে, সামগ্রিক শিক্ষাকে তিনি প্রধানতঃ দুভাবে ভাগ করেছিলেন- (১) Music ও (২) Gymnastics, তিনি অবশ্য Music বলতে শুধু সংগীত নয়, বরং নন্দনকলার অন্তর্গত যাবতীয় বিষয়সমূহকেই বুঝিয়েছেন। সে হিসেবে কাব্য, চিত্রকলা, নাটক, চিন্তা (reasoning) এ সবই Music এর অন্তর্গত। অন্যদিকে এরিস্টটলের উপর জীববিদ্যা, অধিবিদ্যা ও নীতিশাস্ত্রের প্রভাব গভীর।

তৃতীয়তঃ অনুসৃত গবেষণা পদ্ধতির বিচারে প্লেটো অবরোহ পদ্ধতি (Deductive Method) অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ, সার্বজনীন কোন সত্যকে অকাট্য ধরে নিয়ে তা থেকে বিভিন্ন নিয়ম-নীতি আবিষ্কার করা। এরিস্টটল তাঁর গবেষণার জন্য আরোহ পদ্ধতি (Inductive Method) বেছে নিয়েছেন। কোন অমোঘ সত্যে পৌছানোর জন্য হাজার রকমের তত্ত্ব ও তথ্য পুনঃপুনঃ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করা।

চতুর্থতঃ বক্তব্যের উপস্থাপনার প্লেটো একজন শক্তিশালী কথাশিল্পী। উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও রসবোধের সার্থক সমন্বয়ে প্লেটোর জটিলতম প্রবন্ধটিও উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক মনে হয়। কিন্তু এরিষ্টটলের ভাষা সে তুলনায় ভারী, সাদামাটা, তাতে নাহি বর্ণনার ছটা, নাহি ঘটনার ঘনঘটা।

পঞ্চমতঃ রাষ্ট্রের ঐক্যের প্রশ্নে প্লেটো সর্বাত্মকবাদী। আদর্শ রাষ্ট্রের জন্য সকল নাগরিকের মাঝে সুনির্দিষ্ট চিন্তার ঐক্যের কথা তিনি ভেবেছেন দৃঢ়তার সাথে। আইনকে সর্বগ্রাসী করতে তিনি চেয়েছেন। সাম্যকে অনেকটা আক্ষরিক সমাজ ও জনগণের জন্য

www.pathagar.com

ক্ষতিকর ভেবে প্রত্যাহার করেছেন। যুক্তি দেখিয়েছেন Unity in diversity (বৈচিত্রের মাঝে ঐক্য)- এর পক্ষে। তাঁর মতে সৃষ্টির ধারাই এমন যে. অনৈক্যের মাঝে ঐক্য খুঁজে বের করতে হয়। তার যুক্তি. অসাম্যের মাঝেই প্রতিষ্ঠিত থাকে সাম্য।

ষষ্ঠতঃ প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের শাসক শ্রেণীকে (The Guardians) সহায় সম্পদ বা পরিবার - পরিজনের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করতে দিতে নারাজ। পক্ষান্তরে. সম্পদ ও পরিবার রক্ষণের সুযোগকে এরিস্টটল সকল মানুষের জন্য স্বাভাবিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

সপ্তমতঃ প্লেটো নীতিশাস্ত্র ও রাজনীতিকে অনেক ক্ষেত্রেই গুলিয়ে ফেলেছেন। অথচ এরিষ্টটল দুটিকে আলাদা বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এরিস্টটলের মতে. নীতিশাস্ত্রের পরিধি বিশাল ও বিস্তৃত। রাজনীতি এর মাঝে একটি অতি ক্ষুদ্র বিষয় মাত্র। তবে রাজনীতিকে তিনি একটি বিজ্ঞানের মর্যাদা দিয়েছেন।

অষ্টমতঃ প্লেটো যেহেতু একটি বিশেষ অভিভাবক শ্রেণী গড়ে তুলে তার হাতেই সকল ক্ষমতা অর্পণ করতে চেয়েছেন. তাই প্লেটোর কাংখিত শাসনব্যবস্থাকে আমরা এক প্রকার স্বেচ্ছাচারী শাসন বলতে পারি। কারণ তিনি তার অভিভাবকশ্রেণীকে সর্বদাই আইনের উর্ধ্বে রাখতে চেয়েছেন। এ শ্রেণী ইচ্ছে করলেই আইন তৈরী. রদ ও পরিবর্তন করতে পারত। পক্ষান্তরে এরিস্টটল শাসনব্যবস্থাকে সর্বদাই আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখার কথা বলেছেন। এরিষ্টটল সাংবিধানিক শাসনের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। আইনের শাসন ও সার্বভৌমত্ব- এ দুই ধারণার উপর জোর দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, মূলতঃ আইন ও ন্যায়বিচার বিবর্জিত মানুষ নিকৃষ্টতম পশুর সমতুল্য। রাষ্ট্রের গন্ডিতে বসবাস করা বলতে তিনি কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর আধিপত্যে থাকার কথা বুঝাননি. বরং সকল শ্রেণীকেই সুনির্দিষ্ট আইনের অনুসারী হওয়াকেই বুঝিয়েছেন।

নবমতঃ বিভিন্ন ধরণের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কেও উভয়ের মাঝে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। দুজনের মতেই রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও সাংবিধানিক গণতন্ত্রের প্রত্যেকটিই উত্তম সরকার হতে পারে এবং এগুলোর বিকৃত রূপ হচ্ছে যথাক্রমে স্বৈরতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র ও উগ্রগণতন্ত্র। তবে প্লেটোর মতে, অভিজাততন্ত্র সবচেয়ে উত্তম শাসনব্যবস্থা হিসেবে বহাল থাকতে পারে। রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের বিকৃত রূপের প্রশ্ন এরিষ্টটল যদিওবা গুরুর সাথে একমত, তবে গণতন্ত্রের প্রশ্নে তিনি ভিন্নমত পোষণ করেন। এরিস্টটল

www.pathagar.com

গণতন্ত্রের নিরীহ বা উগ্র- এ দু'য়ের পরিবর্তে মধ্যতন্ত্রের (Polity) সমর্থন করেন। আর, সে থেকেই শাসনব্যবস্থায় মধ্যবিত্তের একটি বিশেষ ভূমিকা পালনের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। ধনিকশ্রেণী শাসনকার্যে যেমন দারিদ্রের প্রতি উদাসীনতা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করে ও স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের পরিচয় দেয়, তেমনি দারিদ্রশ্রেণী প্রশাসনিক কাজে সর্বদাই হীনমন্যতা ও নীচতার পরিচয় বহন করে এরিস্টটল তাই এ দুই শ্রেণীর কাউকেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে দিতে নারাজ। তাঁর মতে, মধ্যবিত্তের শাসনই সর্বোত্তম আইন ও বিচারব্যবস্থার জন্ম দিতে পারে।

দশমতঃ নাগরিকত্বের প্রশ্নেরও "গুরু" শিষ্যের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। প্লেটো রাষ্ট্রের- ভূ-খন্ডে বসবাসকারী সকলকেই নাগরিক শ্রেণীভূক্ত করতে চেয়েছেন। এ হিসেবে, অশিক্ষিত ও রাজনৈতিক দর্শনবিবর্জিত মানুষকেও তিনি নাগরিক হিসেবে মেনে নেন। অথচ, এরিস্টটল তাঁর সুবিখ্যাত, Constitution of Athens নামক গ্রন্থে স্পষ্টতঃ উল্লেখ করেছেন,

Ferrdom, wealth, culture তদুপরি, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়কর দানক্ষমতা ও দেশের জ্বলন্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগতিও তাঁর মতে সুনাগরিকত্বের অপরিহার্য শর্ত। এরিস্টটল স্পষ্টতঃ সুনাগরিক ও সাধারণ নাগরিকের মাঝে বিভাজন রেখা টেনেছেন।

উপসংহারঃ মনীষার যোগসূত্র মতাদর্শের ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিল এক অতুলনীয় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক। প্লেটো যেমন গভীর স্নেহের সাথে ছাত্রকে সুশিক্ষা দান করেছেন, তেমনি এরিস্টটলও পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুর অবদানের কথা স্বীকার করেছেন সশ্রদ্ধ চিত্তে। ছোট-খাট নানা পার্থক্যের কথা স্মরণ রেখেই বলা যায়, অনেক বিষয়ে তাদের মাঝে পরম মিল বা সাদৃশ্য ছিল।

বিতর্কিত বিষয়সমূহকে অধিকতর স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করার কারণেই মূলতঃ প্লেটো ও এরিষ্টটল নিজেরাই বিতর্কিত হয়ে পড়েন। তবে দু'জন দু'ভাবে।
প্লেটো তার পারিবারিক ব্যবস্থা রক্তের সম্পর্ক গোপন করার নীতিসহ তার চূড়ান্ত সাম্যনীতির জন্য বিতর্কিত।

আর এরিস্টটল দাসপ্রথাকে প্রকৃতি প্রদত্ত সঠিক নীতি হিসেবে ব্যাখ্যা করতে

www.pathagar.com

গিয়ে অনেকের কাছেই শুধু রক্ষণশীলই নন, বরং প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন।

বিতর্কিত বিষয়সমূহ স্পষ্টভাবে দর্শন বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় রূপ দেবার পরিণতিতে রূপকার অতি বিপ্লবী বা প্রতিক্রয়াশীল হিসেবে আখ্যায়িত হবার ঘটনা ইতিহাসে বিরল নয়। তাছাড়া বিতর্কের উর্ধ্বে উঠার চেষ্টাও বোধ করি মহৎ প্রাণ দার্শনিকগণ করেন না। সত্য উদ্ঘাটনের নিরলস চেষ্টায় তারা হন স্পষ্টবাদী। এ চেষ্টায় সক্রেটিসের মত প্লেটো ও এরিষ্টটল কালের পরীক্ষায় সামগ্রিক ভাবেই উত্তীর্ণ।

www.pathagar.com

প্লেটো

(খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৭-৩৪৭ অব্দ)

প্রেক্ষাপটঃ খ্রীঃ পূঃ ৪২৭ অব্দে এথেন্সের এক অভিজাত পরিবারে প্লেটো জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নামএরিষ্টোন। পিতার দিক থেকে প্লেটো এথেন্সের শেষ নৃপতি কোড্রসের বংশের সাথে সংযুক্ত। মাতার নাম ছিল পেরিষ্টিওনী। মাতার বংশ ছিল এথেন্সের বিখ্যাত সলোন (Solon) বংশের সাথে সংযুক্ত। সলোন পরিবারকেই মুলতঃ এথেন্সীয় গণতন্ত্রের স্থপতি মনে করা হয়। প্লেটোর শিশুকাল কাটে সম্পূর্ণরূপে অভিজাত ধাঁচে। ছোট বেলার পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট স্পষ্টভাবেই পরিলক্ষিত হয় তার চিন্তা-চেতনায়।

মূলতঃ প্লেটো এমন এক সময় জন্মগ্রহণ করেন যখন এথেন্সের অধিবাসীগণ দারুণভাবে মানসিক নৈরাজ্যে (Intellectual Anarchism) ভুগছিল। ক্ষয়িষ্ণু রাজনীতির চিন্তায় তারা ছিল বিকারগ্রস্ত। জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছেড়ে বৈরাগ্য সাধনায় লিপ্ত হয়ে সিদ্ধি অর্জনের চেষ্টা করছিল। অনেকেই রাষ্ট্রীয় স্বাভাবিক জীবনযাপনকে পাপ কাজ বলে মনে করত। Cynics- রাও Sophists-দের মত প্রকাশ্যে সমাজবিরুদ্ধ দর্শন শিক্ষা দিচ্ছিল। মানুষকে রাজনৈতিক জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়ার দীক্ষাদানে তারা তৎপর হয়ে উঠেছিল। এমনকি মানুষকে আদিম পন্থায় বসবাস করে মুক্তিলাভের চেষ্টা করতে বলা হচ্ছিল। সভ্যতা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক জীবনকে মানুষের আত্মিক উন্নতির পথে এক বিরাট অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এমনি এক পরিস্থিতিকে প্লেটোর চিন্তা-চেতনা ও মতাদর্শ চ্যালেঞ্জ করলো সমগ্র সমাজব্যবস্থাকে।

গণতন্ত্রের মোকাবিলায় অভিজাততন্ত্রকে প্রাধান্য দেয়া প্লেটোর জন্য ছিল খুবই স্বাভাবিক। কিন্তুর তার বয়স যখন কুড়ি পার হয়, তখন তিনি (Revolt of the Thirty)-তে অংশ নেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। খ্রীঃ পূঃ ৪০৪ অব্দে যখন পেলোপোনেসিয়ার (Peloponnesian) যুদ্ধে এথেন্স পরাজিত হয় এবং এর অধিবাসীদের সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে যায়, তখন এথেন্স ও প্লেটো উভয়েই যেন একযোগে শিক্ষা-দীক্ষায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করে। রাজনৈতিক জীবনের প্রতি প্লেটোরও বেশ কিছুটা অনীহার উদ্রেক হয়। এ সময়ে তার মানস গঠনে

www.pathagar.com

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়েছে সক্রেটিসের সান্নিধ্যলাভ। ব্যক্তি-মানুষ বা আপাতদৃষ্টিতে পণ্ডিত হিসেবেও সক্রেটিস মোটেই তেমন একটা আকর্ষণীয় ছিলেন না। কিন্তু প্লেটো তার সান্নিধ্যে এসে বুঝতে পারলেন সক্রেটিস কত বড় মাপের দার্শনিক, জ্ঞানী ও গুণী। সক্রেটিসই তাকে শিক্ষা দিলেন যে, Virtue is Knowledge. অর্থাৎ সৎগুণই জ্ঞান। গুরু সক্রেটিসের কাছে জ্ঞান সাধনায় প্লেটো ছিলেন বড়ই নিষ্ঠাবান। তখনকার দিনে গুরু শিষ্যের সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের সম্পর্কের চেয়েও নিবিড়। ছাত্র গুরুকে পিতা বলেই সম্বোধন করত। এথেন্স যখন তার যুদ্ধরাজ নীতি পরিহার করলো, তখন খুব দ্রুত সর্বত্রই জ্ঞানচর্চার হিড়িক পড়ে গেল। কিন্তু সক্রেটিসের বিপ্লবী মনোভাব ও চিন্তাধারা ধারন করার ক্ষমতা এথেন্সের ছিল না। খ্রীঃ পূঃ ৩৯৯ অব্দে ডেমোক্রেটরা সক্রেটিসকে হত্যা করে। এ ঘটনা প্লেটোকে ভীষণভাবে আলোড়িত করে। ক্ষোভে-দুঃখে তিনি এথেন্স ত্যাগ করে বিদেশ ভ্রমণে বের হন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, তখনকার দিনে গুরুর সাথে আলাপ-আলোচনা ও বিদ্যাচর্চার পরই বিদেশ ভ্রমণকে জ্ঞান-সাধনার অপর একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ধরা হতো। প্লেটো ক'টি দেশ ভ্রমণ করেছেন, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে সক্রেটিসের মৃত্যুর পর তিনি যে একটানা তের বছর ভবঘুরের মত জীবনযাপন করেছিলেন, এ তথ্যখুবই জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত। কারণ খ্রীঃ পূঃ ৩৮৬ অব্দের পূর্বে তাকে আর এথেন্সে দেখা যায়নি। এই তের বছরের জীবন তার কাছে অর্থহীন বলেই মনে হয়েছে। সক্রেটিস ছাড়া এবং আবার নতুন করে জ্ঞান সাধনা করতে না পারার কারণে তার জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ।

আজকের আধুনিক মানসিকতায় হয়তো এর অর্থ তেমন একটা বোধগম্য হবে না। কিন্তু যারা তাদের সমগ্র সত্তা দিয়ে জ্ঞানচর্চা করে এবং জ্ঞান চর্চাকেই জীবনের সবচেয়ে বড় আরাধ্য বলে মনে করে, তাদের কাছে ব্যাপারটি হয়তো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাছাড়া যেখানে সক্রেটিস ছাত্র পাচ্ছে না তার দর্শন পড়াবার জন্য, প্লেটো যোগ্য গুরু পাচ্ছে না দীক্ষা নেয়ার জন্য, সেখানে ব্যাপারটি কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী হতে বাধ্য। এমনকি গত শতাব্দীতে বসবাস করেও দার্শনিক হেগেল জীবনের শেষ লগ্নে এসে বলেছিলেন, তিনি শুধু একজন ছাত্রকেই মোটামুটিভাবে তার দর্শন বুঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন। সক্রেটিসকে এমন সুযোগ দেয়া হলে হয়তোবা তিনি বলে যেতেন যে, প্লেটোই তার সন্তানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এরূপ একটা কথা হয়তো প্লেটো নিজের সম্পর্কে

www.pathagar.com

তার গুরুর কাছে শুনতেও চেয়েছিলেন। দেখা যায় প্লেটো নিজে এরিষ্টটলকে তার সন্তানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন।

ধারণা করা হয় যে, জীবনের প্রতি আগ্রহ হারিয়েই প্লেটো পারস্য, মিসর, ব্যাবিলন, আফ্রিকা, ইটালী ও সিসিলি ভ্রমণ করেন। ভ্রমণের জন্য আজকের দিনে তের বছর বেশ দীর্ঘ সময়। কিন্তু তখনকার দিনে এ সময় ততটা দীর্ঘ নয়। মুলতঃ ইটালী ও সিসিলি যে তিনি ভ্রমন করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। অন্যান্য দেশ ভ্রমণের ব্যাপারে প্রশ্নাতীতভাবে কিছু বলা যায় না।

ইটালী ভ্রমণকালে প্লেটো Tarentum-এ Pythagorean Colony-এর সংস্পর্শে আসেন। পিথাগোরাসের সংস্পর্শে এসে তিনি দেখলেন যে বহু কিছুই সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে বলে দেয়া যায়। ভুলের কোন সম্ভাবনাই জ্যামিতিক নিয়ম মানে না। তাই তিনি ভাবলেন যে, রাজনীতি বিদ্যায়ও জ্যামিতির মতো নিয়ম-কানুন আবিস্কার ও ব্যবহার করা সম্ভব। সে কারণেই তিনি diductive method বা অবরোহ পদ্ধতিকে বেছে নিলেন তার গবেষণার জন্য।

"সিসিলি ভ্রমণকালে প্লেটো সিরাকিউসের (Syracuse) একচ্ছত্র অধিপতি প্রথম ডিওনিসিয়াসের (Dionysius) সান্নিধ্যে আসেন। ডিওনিসিয়াস ছিলেন চরম স্বেচ্ছাচারী। ক্ষমতার প্রতি ছিল তার অসাধারণ লিপ্সা। প্রতিটি কথাই তার পালিত হতো অক্ষরে অক্ষরে।

খুব দ্রুত প্লেটোর সাথে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। তার রাজদরবারে এমন একজন জ্ঞানী লোক আছেন, এটি রাজার খ্যাতির জন্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করার কথা ছিল। পক্ষান্তরে প্লেটো ভাবলেন, এতদিনে তার কাল্পনিক Philosopher-king (দার্শনিক-রাজা) পাওয়া গেছে। তাই তিনি উৎসাহের সাথে ডিওনিসিয়াসকে বুঝাতে লাগলেন কিভাবে আদর্শ রাজার গুণাবলী অর্জন করা যায়।

কিছুদিনের মধ্যেই রাজপ্রাসাদে প্লেটো তার সমালোচনার জন্য আপদ বলে চিহ্নিত হয়ে গেলেন। সামান্য মূল্যের বিনিময়ে তাকে দাস ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেয়া হলো। সৌভাগ্যবশতঃ তাকে বিশটি মুদ্রার বিনিময়ে ফেরত এনে মুক্তকরলেন এক সুহৃদ। কিন্তু সিসিলির সাথে এখানেই প্লেটোর অভিজ্ঞতার সমাপ্তি ঘটেনি।

www.pathagar.com

'Dion' নামের যুবকটি যখন প্লেটোকে প্রথম ডিওনিসিয়াসের হাতে লাঞ্ছিত হতে দেখলেন, তখন থেকেই সে ভীষণভাবে প্লেটোর ভক্ত হয়ে যায়। প্রথম ডিওনিসিয়াস ছিলেন তার ভগ্নিপতি। পরে Dion দ্বিতীয় ডিওনিসিয়াস হিসেবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। স্বাভাবিকভাবে বন্ধুকে রাজার পদে সমাসীন শুনে প্লেটো সুখী হন এবং খ্রীঃ পূঃ ৩৬৭ অব্দে যুবক রাজাকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য সিরাকিউসে আসেন। কিন্তু দুঃখের সাথে লক্ষ্য করলেন যে, বন্ধু ডিওন ও রাজা ডিওনের মধ্যে অনেক তফাৎ। এখন আর তার জ্ঞানসাধনার প্রতি কোন আগ্রহ নেই, নেই প্লেটোর দার্শনিক-রাজা সাজবার আগ্রহ। তাই পুনরায় তিনি এথেন্সে ফিরে আসেন। কিন্তু ডিওনের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলেন এবং চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করেন। পরবর্তীতে প্লেটো আরো একবার সিরাকিউসের দরবারে আসেন তাকে দার্শনিক-রাজা বানানোর প্রয়াসে, কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে যান।

খ্রীঃ পূঃ ৩৮৬ অব্দ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বেশিরভাগ সময়ই তিনি এথেন্সে কাটান। এ দীর্ঘ সময় তিনি তার একাডেমির সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বাস্তবে দার্শনিক-রাজা সৃষ্টিতে তিনি ব্যর্থ হলেও একাডেমি প্রতিষ্ঠা করে তিনি বিশ্বজোড়া সুনাম অর্জন করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এতো সুনাম আর কারো ভাগ্যে জুটেনি। তার মৃত্যুর পরও কয়েক শতাব্দী যাবত প্লেটোর একাডেমিই ছিল সকল জ্ঞানপিপাসু মানুষের জন্য মডেলস্বরূপ। এই একাডেমীর মাধ্যমই মূলতঃ প্লেটো সক্রেটিসকে বাঁচিয়ে রেখে এরিষ্টটলের হাতে সোপর্দ করে যান। সক্রেটিস ও এরিষ্টটলের দক্ষ সংযোগকারী হিসেবে প্লেটোকে শুধু প্লেটোর সাথেই তুলনা করা যায়। আর সম্ভবতঃ এ সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছেন বলেই তিনি রাজনীতি বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিশাল নক্ষত্র হয়ে আজো ভাস্কর হয়ে আছেন। খ্রীঃ পূঃ ৩৪৭ অব্দে ৮০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

গবেষণা কর্মঃ সংলাপ হিসেবে (dialogue) পঁয়ত্রিশটি এবং চিঠি হিসেবে তেরটি প্লেটোনীয় লিখা আমাদের কাছে আজ পর্যন্ত পৌঁছেছে বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু এর প্রত্যেকটিই প্লেটোর নিজের সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন। অনেকেই বলেন, মূলতঃ চিঠিগুলো তার নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে, এর কোনটাই তার লিখা নয়। তবে বিখ্যাত সংলাপসমূহ সম্পর্কে এমনটি শুনা যায় না।

প্লেটোর লিখার ধরন ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি যেন নিজে কোন কথাই বলেননি। সংলাপে অংশগ্রহণকারীরাই মূলতঃ তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সক্রেটিসকেই

www.pathagar.com

তিনি অধিকাংশ গ্রন্থে তাঁর প্রধান চরিত্র করেছেন। সেদিক থেকে চিন্তা করলে মনে হবে প্লেটোর শিক্ষা বা মতার্দশ বলে কিছু নেই, আছে সক্রেটিসের চিন্তা-চেতানা। কিন্তু তার ল'জ গ্রন্থে সক্রেটিস অনুপস্থিত। হয়তোবা ল'জকেই প্লেটো সাজিয়েছেন নিজের করে অন্যগুলোকে উপস্থাপনা করেছেন গুরুর হয়ে।

প্লেটোর সংলাপগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এদের রাজনৈতিক চরিত্র সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত। প্লেটোর লিখিত গ্রন্থের মাঝে অন্যতম হচ্ছে ঃ Phaedrus, Protagoras, symposium, Gorgias, Timaeus, Theaetetus, phaedo Republic, Law FmÄ Stateman. সবকটি গ্রন্থের মাঝে শেষের তিনটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও বহুল আলোচিত। প্লেটোর চিন্তা-চেতনা সঠিকভাবে জানতে হলে এ তিনটি গ্রন্থ সম্পর্কেই জ্ঞান রাখা প্রয়োজন।

রিপাবলিক (Republic):

মূলতঃ আধুনিক মাপকাঠিতে প্লেটোর বিচার করতে গেলেই বেশি জটিল সমস্যার উদ্ভব ঘটে। তাকে সহজেই ইচ্ছামত বিভিন্ন শিবিরভুক্ত করা সহজ বলে মনে হয়। রিপাবলিকে যেসব আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোর স্বরূপ আদতেই ভিন্নতর। যেমন, সুবিচার সম্পর্কে আলোচনার শেষ পর্যায়ে বলা হয়েছে, সেই ন্যায় পরায়ণ হতে পারেন, যিনি তার বন্ধুর উপকার করেন আর শক্রর অপকার করেন। এরূপ হওয়ার পূর্বশর্তই হয়েছে জ্ঞানী হওয়া। শুধু জ্ঞানী মানুষই সঠিকভাবে বন্ধু ও শত্রু চিহ্নিত করতে পারে। জ্ঞানের অভাবে মানুষ বন্ধুকে শত্রু শত্রুকে বন্ধু বলে মেনে নেয়। তাই বলা চলে রিপাবলিকের সবচেয়ে বড় নীতি হচ্ছে, 'সদগুণই জ্ঞান/। ভাল-মন্দের এমন সংজ্ঞা আবিস্কার করতে চেয়েছে রিপাবলিক, যা ঠিক করে দেবে কোনটা সদগুণ আর কোনটা নয়।

"সদ্গুণই জ্ঞান' একথার অর্থ হলো ভাল বলতে একটি আদর্শ কিছুকে বুঝায়, যা আয়ত্ত করা যায় এবং যাকে অতিইন্দ্রীয় অনুভূতি, কল্পনা বা ভাগ্যের সাহায্যে না জেনে বুদ্ধিজাত ও যুক্তিনির্ভর উপায়ে অনুসন্ধান করা যায়। অন্যে যাই মনে করুক না কেন, ভাল যা তা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সত্য এবং তা লোকে কামনা করে বলে নয়, বরং ভাল বলেই আমাদের আয়ত্ত করা উচিত। অন্য কথায় বস্তু জগতে ধারণা আসে পরে। মানুষ কি চায় তা নির্ভর করে মানুষ সেটাকে কতখানি ভাল মনে করে তার উপর।

www.pathagar.com

এক কথায় ভাল, সদগুণ, জ্ঞান আদর্শ-দার্শনিক, দার্শনিক-রাজা সবই বস্তু ও পরিবেশ নিরপেক্ষ। সমাজ, কাল ও পরিবেশ ভেদে এসব জিনিসের ধারণা অভিন্ন। সদ্গুণ ও জ্ঞান যেমন সকল অবস্থাতেই ভাল ও মঙ্গলজনক, ভাল রাজা বা শাসকও সকল সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর।

তবে রাজার ভাল হওয়ার জন্য তাকে এমন কিছু কাজ করতে হবে, যা কোন অবস্থাতেই বস্তু বা পরিবেশ নির্ভর হবে না। অর্থাৎ মানুষের দাবি-দাওয়া, চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে উঠে শাসককে এমন কিছু নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে যা রাষ্ট্রকে কল্যাণকামী সংস্থা হিসেবে টিকিয়ে রাখবে। অর্থাৎ প্লেটোর মতে, শাসক জ্ঞানী না হলে রাষ্ট্র অবশ্যই বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। প্লেটো সরকারী কাজকর্মকে শিল্পকর্মের সাথে তুলনা করেছেন। এ শিল্পকর্মটি কেহই একদিনে আয়ত্তে আনতে পারে না। চলমান সমাজে মানুষের পারস্পারিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলোতে সঠিক ভুমিকা রাখার জন্য চাই শাসকের উন্নততর সহজাত গুণাবলী, আদর্শ শিক্ষা ও ঐশ্বর্যশালী অভিজ্ঞতার অন্তদৃষ্টি।

রাষ্ট্র সম্পর্কে রিপাবলিকঃ প্লেটোর দৃষ্টিতে মানুষের জন্য যা ভাল, তাই রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক। 'ভাল' কি এ প্রশ্নে যেহেতু প্লেটো অলংঘনীয় ও অপরিবর্তনীয় কিছু নিয়ম-নীতি ও অবস্থার কথা বলেন, তাই রাষ্ট্রের করণীয় কি, সে ব্যাপারেও তিনি একটি কিছু অপরিবর্তনীয় রীতি-নীতির আভাস দেন। রাষ্ট্রীয় এসব নিয়ম-নীতি, প্রথা ও অবস্থানকে তিনি প্রকৃতির কিছু অমোঘ রীতি-নীতির সাথে একভাবে দেখতে প্রয়াসী। প্রকৃতিতে যেমন দুটো ধারা পরিলক্ষিত হয়; একটির নিয়ম কখনোই পরিবর্তিত হয় না, যেমন সূর্য ও চন্দ্র যেভাবে কিরণ ও আলো ছড়ায় বা জন্ম-মৃত্যু যেভাবে ঘটে। আবার অন্যদিকে প্রকৃতি কখনোই একইরূপে মানুষের বাস্তবজীবনে ধরা দেয় না। কখনো সে শান্ত ও কল্যাণময়ী, কখনও আবার রুদ্রমূর্তি ধারণ করে বয়ে নিয়ে আসে ধ্বংসযজ্ঞ ও বিপর্যয়। প্রকৃতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী না হলে যেমন বুঝা যাবে না, কোনটি তার অলংঘনীয় মূর্তি, আর কোন্টি অপরিবর্তনীয়; তেমনি রাষ্ট্র সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞানের অভাব শাসককে আনাড়ি করে তোলে এবং সে মানুষের জন্য বয়ে আনে অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট। ব্যাপারটিকে প্লেটো অনেকটা পেশাগত শিক্ষা ও দক্ষতার সাথে তুলনা করেছেন।

রিপাবলিকের রাষ্ট্রকে বাস্তবে জীবনে দেখা যাবে, কি যাবে না সেদিকে প্লেটো কোনই দৃষ্টি দেননি। তাঁর মূল কাজ ছিল আদর্শ রাষ্ট্র সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দান করা

www.pathagar.com

তিনি এমনি একটি রাষ্ট্রের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে চেয়েছেন, যার অনুকরণে বাকি সব রাষ্ট্র তাদের নির্মাণ প্রক্রিয়া চালু রাখলে সকলের জন্যই কল্যাণকর ব্যবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তনশীল নিয়ম-কানুন নিয়ে প্লেটো তেমন একটা মাথা ঘামাননি। তাঁর আগ্রহ ছিল রাষ্ট্রের জন্য অপরিবর্তনীয় কিছু নীতিমালার সন্ধান দেয়া। তাঁর মতে, পরিবর্তনশীল নিয়মনীতি মানুষ হয়তো সহজেই জানতে বা বুঝতে পারবে। সূর্য উঠলে বা বৃষ্টি পড়লে সবাই দেখে, কিন্তু পরিবেশের উপর অত্যাচার করার কারণে যে পৃথিবীর মানুষ আজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন তা দেখার বা বুঝার ক্ষমতা বা সুযোগ আছে খুব অল্পসংখ্যক মানুষের। অন্য আর একটি উদাহরণ দেয়া যাক। একটি মানুসের দৈহিক বৃদ্ধি সহজেই চোখে পড়ে, কিন্তু তার বুদ্ধিবৃত্তিক, মানসিক, আত্মিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি এতটা সহজে ধরা পড়ে না কিন্তু দু'টি বৃদ্ধিই ঘটে প্রাকৃতিক নিয়মকে মেনেই। ভিন্নভাবে বলতে গেলে, মানুষের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আমরা তার পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত রূপ দেখি, কিন্তু মূলতঃ সে তার ক্ষয় ও লয় প্রাপ্তির দিকেই দ্রুত অগ্রসর হয়েছে।

এসব কারণেই প্লেটো বাস্তবে রাষ্ট্র কেমন আছে ও কিভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং এতে কি আইন-কানুন চালু আছে, তা নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে রাষ্ট্রের আদর্শিক কাঠামোর সফল চিত্রকর বা রূপকার হতে চেয়েছেন, অথচ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে রাষ্ট্রের বাস্তব ক্ষণস্থায়ী আলোচনা - পর্যালোচনাই বেশি আকর্ষণীয়।

নীতিগতভাবে রাষ্ট্র কিরূপ হওয়া উচিত, তাই তিনি দেখতে চেয়েছেন। যদি সত্যিকারের অবস্থা সে নীতিমাফিক না হয়, তাহলে তার জন্য প্রচলিত ব্যবস্থার পুরোধা না করাই ভাল। এ চিন্তার দিক থেকে প্লেটো যথার্থ অর্থে রাষ্ট্রীয় ভাবনায় একজন বিপ্লবী ছিলেন। আদর্শ রাষ্ট্র ও শাসকসৃষ্টির জন্য তিনি কয়েকটি নীতিমালা বেঁধে দিয়েছেন ।

প্রথমতঃ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা পদ্ধতি, যা অহরহ পরিবর্তিত হবে না। রাষ্ট্রের প্রভাবশালী মহলের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে।

দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রে খুব বেশি প্রাচুর্য থাকা চলবে না। অতিরিক্ত ঐশ্বর্য ও বিলাসিতা নাগরিকদের সদগুণাবলী ও জ্ঞান অর্জনে বাঁধা দেবে।

তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ নিজ নিজ পেশাগত সীমানার মধ্যে থেকে

www.pathagar.com

নিষ্ঠার সাথে কাজ করবে। যেমন শিক্ষক ছাত্রদেরকে পাঠদানেই ব্যস্ত থাকবে, বাকি সব কাজে তার কোনই আগ্রহ থাকবে না। ছাত্ররা পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকবে, অন্যকাজে তাকে পাওয়াই যাবে না। বর্তমানে বহু রাষ্ট্রের অধঃপতনের মূল কারণই হয়েছে অধিকাংশ মানুষ তার নিজের কাজের খোঁজ রাখে না, কিন্তু বাকি সকলের কাজে মাথা ঘামায়। যেমন, একজন বাংলাদেশী ছাত্র পৃথিবীর সব ব্যাপারেই আগ্রহ প্রকাশ করে, কিন্তু পড়াশুনার ব্যাপারেই তার যত অনীহা। অনেক শিক্ষকের ক্ষেত্রেও হয়তো কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য।

চতুর্থতঃ প্লেটো রাষ্ট্রের বড় আয়তনকে আদর্শ রাষ্ট্র সৃষ্টির পথে অন্তরায় মনে করতেন। গ্রীক নগর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হয়তো এ ব্যাপারে তার চিন্তাকে প্রভাবিত করে থাকবে। তবুও তার মতে কোন ঔপনিবেশিক ও বড় ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা আদর্শ রাষ্ট্র উপহার দিতে সমর্থ নয়। সে বিবেচনায় সাবেক বৃটিশ সাম্রাজ্য, রুশ সাম্রাজ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন, অখন্ড ভারত, অখণ্ড পাকিস্তান এমনিতেই কোন ভাল রাষ্ট্র ব্যবস্থা জন্ম দিতে পারে না। এমনকি বর্তমান ভারতে ও পাকিস্তানে আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

প্লেটোর মতে, এসব শর্ত পূরণ হলে এবং জ্ঞানী লোকেরা শাসন করলেই আদর্শ রাষ্ট্র সৃষ্টি করা সম্ভব। অবশ্য অনেকেই প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবে সৃষ্টি করার চিন্তাকে কল্পনার বিলাসিতা ভেবেছেন। কিন্তু রাষ্ট্র সম্পর্কে তার চিন্তা আজো মানুষের চিন্তাজগতকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করে।

রিপাবলিকে আইনের অনুল্লেখঃ রিপাবলিক একটি রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কিত পুস্তক হওয়া সত্ত্বেও আইনের ব্যাপারে এতে খুব কম কথাই লিখা হয়েছে। এটি কিন্তু কোন অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নয়। যারা প্লেটোর রাষ্ট্রদর্শন বুঝবেন তাদের কাছে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। তিনি আইনের জীবন্ত উৎসের দিকে তাঁর দৃষ্টিনিবদ্ধ করেছেন। সাধারণ মানুষকে ঠিক করতে চেয়েছেন শিক্ষার আলো দ্বারা। আর শাসককে তার বংশমর্যাদা, সহজাত গুণাবলী, অভিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠত্বে যাচাই-বাছাই করতে চেয়েছেন। বইয়ের কালো হরফে আইন কি ভাষা নিয়ে অবস্থান করছে, তাতে প্লেটোর তেমন কোনই আগ্রহ ছিল না। আইনকে যারা কালো অক্ষরে রূপান্তরিত করেন এবং ঐ অক্ষরসমূহ থেকে ভাব বের করে বাস্তবে প্রয়োগ করেন, তাদেরকেই তিনি প্রকৃতিস্থ রাখতে চেয়েছেন সকল অবস্থাতে। এখানে যুক্তি হয়েছে, ডাক্তার যদি রোগীকে ঔষধ দেন বইয়ের ভাষ্য

www.pathagar.com

অনুসারে, তবে ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কারণ রোগী যে রোগ নিয়েই ডাক্তারের কাছে আসুক না কেন, সে একটি বিশেষ শরীর নিয়েই ডাক্তারের কাছে আসে। ঐ শরীরটা একবারেই তার নিজস্ব, এরূপ অবিকল আর দ্বিতীয়টি নেই।

সমাজ-দেহ, রাষ্ট্র-যন্ত্রের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য। কাজেই সব জায়গায় সব নিয়ম চলবে না। অনেকেই প্লেটোর অপরিবর্তনীয় কিছু নীতিমালার কথা শুনে ভেবে বসেন যে প্লেটো বুঝি বাস্তবতাবিবর্জিত আইন দিতে চাইছেন। বরং আদর্শ শাসকদের হাতে অনেক ক্ষমতা দিয়ে প্লেটো নিশ্চিত হতে চেয়েছেন যে, জনগণ থেকে দাবি উত্থাপিত হওয়ার বহু পূর্বেই যেন তারা প্রয়োজনীয় আইন-কানুন তৈরী করতে পারে।

আইনের ব্যাপারে প্লেটোর বক্তব্য আজ আর মানার উপায় নেই। কারণ আইনবিজ্ঞান অনেক পথ অতিক্রম করে প্রমাণ করেছে যে, এটি এখন আর কোন রাজা নির্ভর সৃষ্টি নয়, কোন এক যুগ বা জনপদের একক সৃষ্টিও নয়। প্লেটো তার সদ্‌গুণ ও জ্ঞানের ধারণার সাথে যদি আইনকেও বস্তুনিরপেক্ষ করতে পারতেন তবে বোধহয় তাঁর রিপাবলিক আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠতো। কিন্তু আজ থেকে দুই হাজার চারশ/ বছর পূর্বে আইন সম্পর্কে এমন ধারণা দেয়া সত্যিই দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। তারপরও আজ সুস্থ আইন ও শাসনব্যবস্থা সৃষ্টির পেছনে মানুষের জীবন্ত বুদ্ধিমত্তার অবদান খাটো করে দেখার উপায় নেই। জনমত আজ অনেকটা এক ধরনের বুদ্ধিমত্তারই ফল। কাজেই রিপাবলিকে আইনকানুনকে একবারেই অবজ্ঞা করা হয়েছে, এ ধরণের ধারনা নানা বিচারে সত্যের অপলাপ মাত্র।

রিপাবলিকে আইন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে, তাতে মূল সমস্যা হিসেবে দেখানো হয়েছে, আইন, কখন, কার জন্য, কি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তত্ত্বগতভাবে যা ন্যায়সংগত, তাই আইন হওয়া উচিত। আইনের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে 'শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন'। কিন্তু বাস্তবে শক্তিমানরা আইন ব্যবহার করে বেশি সুবিধা ভোগ করে আর দুর্বলরা আইনের দ্বার পর্যন্তই পৌছতে পারে না। রিপাবলিকেও আমরা দুই ধরনের আইনের কথা দেখি। যেমন - (১) প্রাকৃতিক আইন (Natural Law) এবং (২) মানুষের তৈরি আইন (Man made Law). আদিতে আমরা এক বা একাধিক ব্যক্তিকে আইনদাতা হিসেবে পাই। একটি রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারী, সাধারণ ও অভিজাত সব ধরনের মানুষের জন্যই কি একই ধরনের আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ সম্ভব ? আজকের দিনে হয়তো এ প্রশ্নকে সবাই Legal

www.pathagar.com

Positivism (আইন দৃষ্টবাদ)-এর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করবেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে Thrasymachos-এর মতে, একটি শাসন প্রণালী (Regime) নিজেকে রক্ষার জন্যই আইন প্রণয়ন করে। শাসন প্রণালীকে রক্ষা করাই আইনের ধর্ম। কোন প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থাই এমন আইন তৈরি করবে না, যা তার ধ্বংস ডেকে আনবে। শাসনব্যবস্থা আইনের মাধ্যমে সকলের আনুগত্য দাবি করে, আনুগত্য পেলেই সে সন্তুষ্ট। আনুগত্য প্রকাশ করে বা আইন মেনে শাসিত কি ধরনের সুবিধা পাচ্ছে, তা কিন্তু এভাবেই গৌণ ব্যাপার হয়ে পড়ে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আইন শাসিতের জন্য অসুবিধারও সৃষ্টি করতে পারে। আর শাসিতের জন্য অসুবিধা সৃষ্টি করে আইন তার অস্তিত্ব নিয়েই সমস্যায় পড়তে পারে।

তাহলে বুঝা যাচ্ছে, আইনকে সঠিক হতে হলে তাকে এমনরূপে থাকতে হয়, যাতে সে শাসকদের জন্য সর্বদাই অসুবিধা সৃষ্টি করবে, আর নাগরিকদের মধ্যে যারা আইন মানবে তারাই শুধু সুবিধা ভোগ করবে। Thrasymachos অবশ্য এ মতের সাথেও একাত্ম হতে পারেন না। তাই তিনি দাবি করছেন যে, শাসককে অবশ্যই ভুলের উর্ধ্বে থাকতে হবে, তাহলেই শুধু আইনকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। আর একজন নাগরিক শুধুমাত্র একটি পেশাতেই নিয়োজিত থাকবে এবং সকলেরই কাজ থাকতে হবে, তবেই আইন হয়তো তার অবস্থানে থেকে সকলের সুযোগ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি দিতে পারবে।

রিপাবলিকে শিক্ষাব্যবস্থাঃ প্লেটো রিপাবলিকে তাঁর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রে সরকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থার উপর এর বিশদ আলোচনা করেছেন যে, অনেকেই এ গ্রন্থটির কেন্দ্রীয় বিষয় ঠিক করেছেন মানুষ গড়ার শিক্ষাব্যবস্থা। মূলতঃ প্লেটোর দর্শনের গভীরে গেলে এমনটি না হয়ে উপায় নেই। কারণ আইন দিয়ে তো তিনি তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র গড়তে চাননি। মানুষকে শিক্ষিত করে জ্ঞানী-গুণী করে, তবেই তিনি পেতে চেয়েছেন তাঁর অভীষ্ট শাসন ও বিচারব্যবস্থা। মানুষের উন্নতি নৈতিক চরিত্রই শেষ ভরসা এখানে।

প্লেটো শিক্ষাব্যবস্থার উপর কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণকে চরম ক্ষতিকর বলে উল্লেখ করেছেন। রাষ্ট্রীয় জীবনে একই ধরনের সুর ধ্বনিত করার লক্ষ্যে একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার কথা তিনি বলেন। ছেলে-মেয়েদের জন্যও তিনি আলাদা কোন বিশেষ ধরনের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। বংশ, শ্রেণী ও লিঙ্গ নির্বিশেষে

www.pathagar.com

সকলের জন্য একই শিক্ষাব্যবস্থার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তবে বয়সের তারতম্যভেদে শিক্ষাকে তিনি প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করেছেন।

প্রাথমিক স্তরে সবাই বাধ্যতামূলকভাবে বিশ বছর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া করবে। প্রাথমিক স্তরের শেষভাগে সবাই সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করবে। প্লেটো সামরিক শিক্ষা রিপাবলিকে বাধ্যতামূলক না করলেও পরবর্তীতে তিনি এর পক্ষে মত দেন এবং এথেন্সে ছেলে-মেয়ে সকলের জন্যই ১৮-২০ বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামুলক সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়।

একাডেমিক উচ্চ শিক্ষাকে তিনি বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন এবং এটিকে মূলতঃ শাসক শ্রেণীর নারী-পুরুষের ভেতরেই কার্যকর দেখতে চেয়েছেন। শাসকশ্রেণীর যারা নেতৃত্ব দেবেন তাদের চূড়ান্ত শিক্ষালাভের বয়স চিহ্নিত করা হয়েছে পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ। এ বয়সের শিক্ষাকে তিনি অন্তরচক্ষু খোলার শিক্ষা বলেছেন। এ পনের বছর হয়েছে ধ্যানমগ্ন থেকে সবকিছুর গভীরে প্রবেশ করে সঠিক সত্যলাভের যোগ্যতা অর্জনের শিক্ষাকাল। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্তই যে একাডেমী শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত সময় এটি ইউরোপে এখনো বিশেষভাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এ বয়সের পরে কাউকে নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষার প্রতি খুব একটা উৎসাহিত করা হয় না, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠগুলোতে।

পঞ্চাশের বয়স সীমার ব্যাপারটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্লেটোর মতে, এরপর নিজের অন্তর জগতকে সমৃদ্ধ করার সম্ভাবনা কম। তাঁর মতে, ৩৫-৫০ পর্যন্ত বয়সেই মানুষকে সকল জটিল সমস্যা সম্পর্কে নির্ভুল ও পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ করতে হবে।

শাসনভার বহন করার ক্ষমতা এর পূর্বে অর্জন করা সম্ভব নয় বলেই তিনি মনে করতেন। পঞ্চাশে পদার্পণের মাধ্যমে একজন অভিভাবককে প্রমাণ করতে হবে যে, তার অন্তদৃষ্টি খুলেছে, তিনি নির্বাণ লাভ করেছেন। ব্যক্তিস্বার্থ তাকে আচ্ছন্ন করে না। হিংসা, লোভ, পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা এবং মিথ্যা-মায়ার তিনি অনেক উর্ধ্বে।

এ সময়েই একজন মানুষ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে, কিন্তু তাকে দিয়ে কোন অন্যায় হবে না। প্লেটোর অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া ও সিদ্ধিলাভের প্রক্রিয়ার সাথে ইসলামের নবীর কিছু ব্যাপারে মিল দেখা যাচ্ছে। প্লেটোর মতে, ধ্যানমগ্নতা শুরু করতে হবে পঁয়ত্রিশে, ইসলামের নবীর ক্ষেত্রে তা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে চল্লিশে।

www.pathagar.com

তিপান্ন বছর বয়সে হযরত মুহম্মদ (সঃ) আদিষ্ট হলেন হিজরত করার জন্য। হিজরতের মূল উদ্দেশ্য ছিল মদীনায় রাষ্ট্র ও আইনব্যবস্থার মাধ্যমে ঐশী প্রত্যাদেশের বাস্তব রূপায়ণ। হিজরতের পূর্বে অনেক সাহাবী, এমনকি কুরাইশ নেতারা পর্যন্ত মক্কাতেই ইসলামের নবীকে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে বলেছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে ঐশী কোন প্রত্যাদেশ মিলেনি বা তিনি নিজেও এর পক্ষে কোন কথা বলেননি। শিক্ষার ক্ষেত্রে এ অসাধারণ পদ্ধতির ব্যাপারটি আধুনিক যুগে অনেকটা উপেক্ষিত। এসবের মর্মবাণী বোঝার লোকের সংখ্যাও খুব কম।

কঠিন সিদ্ধিলাভের প্রক্রিয়া কিন্তু প্লেটোর তত্ত্বেও শুরু হয় একেবারেই ছোটবেলা থেকে। প্রথমেই তিনি দেখেন মানুষকে দেহ ও মনের একটি সম্মিলিত সুস্থ অবস্থায়। দেহের বিকাশ ও কর্মক্ষমতা অর্জন ও বজায় রাখার জন্য নির্দেশ দেন বাধ্যতামূলক ব্যায়ামের। ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীর গঠন যখন মোটামুটি পূর্ণতার পথে থাকে, তখন বাধ্য করা হয় রণকৌশল অর্জন করতে। ১৮-২০ বছর বয়সকেই বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার উপযুক্ত সময় ধরা হয়েছে। দৈহিক এসব দক্ষতা অর্জনের চেয়ে প্লেটো মনের বিকাশের উপর অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

সঙ্গীত শিক্ষা প্লেটোর ব্যাখ্যায় অনেক ব্যাপক। সঙ্গীতকে তিনি প্রকৃতি, জীবন ও জগতের সর্বত্রই এক ঐক্যতান হিসেবে দেখেছেন। এ সুর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিস্তৃত। মানুষের হাসি-কান্নায় সর্বত্রই এক ধরনের সুর ভেসে বেড়ায়। শরীরে শিরা-উপশিরায় রক্ত প্রবাহে তিনি আবিষ্কার করেন এধরনের রহস্যজনক সঙ্গীতের সুর। সর্বোপরি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হৃদয়ের (এখানে বস্তুগত ও অবস্তুগত বিবেচনায় হার্ট) চলার গতিতে যে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে, তাতেও রয়েছে এক অপূর্ব শৈল্পিক মূর্ছনা। সে কারণেই অতিসম্প্রতি কিছু পপ গান শুরুই হয়েছে হার্টের স্পন্দনের অনুরূপ শব্দ দিয়ে। মনের বিকাশের জন্য হৃদয়ের খোরাককে অতি যত্নের সাথে ব্যবহার করতে চেয়েছেন প্লেটো। অবাঞ্ছিত বা অমার্জিত কোন বস্তু বা দৃশ্যের ব্যবহারের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন প্রতিটি নাগরিকের হৃদয়-মনকে।

কবি সাহিত্যিকদের তিনি মোটেই সহ্য করেননি এই কারণে যে, তারা নিজেদেরকে মোটেই সংযত রাখতে জানেন না। মূকাভিনেতার ব্যাপারেও তার আপত্তি ছিল।

সার্বিকভাবে প্লেটোর দর্শনের সাথে পরিচিত হওয়ার পর হয়তো মনেই হবে না

www.pathagar.com

যে, তার মতাদর্শ হঠাৎ করে এসে এত বেশি নৈতিক বাঁধনে আটকে পড়তে পারে। এ যেন অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কিন্তু তরুণ মনে খারাপ প্রভাব ফেলে কিছু লোক কবি, সাহিত্যিক, গায়ক বা বাদক হয়ে বাহবা লুটবে, এমনটি প্লেটো হতে দিতে নারাজ।

প্লেটো তরুণদের মন-মানসিকতাকে বিকৃত রুচির হাত থেকে রক্ষার জন্যএরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ কারণে তাঁর মাঝে উদারতার অভাব খোঁজার চেষ্টা মূলতঃ এ মহান মনীষীর প্রতি অবজ্ঞা বা অনীহা প্রকাশের সামিল। কবিদের প্রতি তার কড়াকড়ি মনোভাবের কারণে অনেকে তাকে কবি হওয়ার গৌরব অর্জনের অক্ষমতাকে দায়ী করতে চেয়েছেন। ব্যাপারটি সত্যবলে ধরে নেয়া যেত, যদি তিনি শুধু কবি বা লেখকদের কাব্য, উপন্যাস বা নাটকের প্রতি কঠোর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখতেন। তিনি শিল্পের নামে সস্তা হাস্যরস বা নোংরামিকেই কঠোর হস্তে দমন করতে চেয়েছেন। কারণ তিনি জানতেন শিল্পের নামে এসব সস্তা চিত্তবিনোদনমূলক উপায় উপকরণ তরুণ মনের নানা যন্ত্রণা বৃদ্ধি করে। অনেক সময়ই তরুণরা এসবের প্রভাবেই বিপথগামী হয়।

ইদানীংকালে ঘরে ঘরে নব্য কবি, গায়ক বা নর্তক- নর্তকীর অশুভ পদচারণা জনজীবনকেই অতিষ্ঠ করে তুলছে পৃথিবীর বহু দেশে। অনেক দেশে অনেক ক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যমগুলোই হয়ে উঠেছে সুস্থ চিন্তা-চেতনা সৃষ্টির পথে অন্তরায়। তাছাড়া কবি সাহিত্যিকরা অনেকেই রাজ-কবি সাজার পাঁয়তারা করে থাকেন। ক্ষমতাসীনদের পৃষ্ঠপোষকতা ও মদদ নিয়েই তারা সমাজে নিজেদের যশ ও প্রতিপত্তি বাড়ানোর চেষ্টা করে।

এখানেই প্লেটোর বিশালত্ব যে, তিনি এত আগে থেকেই আজকের পৃথিবীর এ দুর্দশা অন্তরচোখে অবলোকন করতে পেরেছিলেন। আর তাই প্লেটোর কঠোর সমালোচকরাও তার পান্ডিত্যের কাছে অসহায়।

রিপাবলিকের ন্যায়বিচার

প্রকৃতিগতভাবে মানুষ কতখানি ন্যায়পরায়ণ? এটি একটি বিতর্কিত ব্যাপার। তবে মানুষ যে স্বার্থপর, একথা প্রায় নিশ্চিত। এখন প্রশ্ন হয়েছে, স্বার্থপরতা ও ন্যায়বিচার পাশাপাশি চলবে কিভাবে? ন্যায়বিচার কি সব সময়ই সকলের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে? স্বার্থের সংঘাত তো এ ধারায় অতি সাধারণ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। একজনের স্বার্থের হানি ঘটিয়ে প্রায়ই অন্যজন নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করে।

www.pathagar.com

কিন্তু অন্যের ক্ষতি করলেই কি নিজে লাভবান হওয়া যায়? আপাতদৃষ্টিতে অনেক ক্ষেত্রে হয়তোবা হওয়া যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে নিজের লাভ করার জন্য অন্যেরও লাভ করে দিতে হয়। যদি তাই হয়, তবে তো ন্যায়বিচারকে সার্বজনীন কোন ধারণা বা পরিস্থিতি বলা যাবে না। এ কারণেই ন্যায়বিচার কি সে আলোচনার পূর্বে প্লেটো সত্যিকার অর্থে মানুষের স্বরূপ উদঘটান করার চেষ্টা করেছেন। মানুষকে তিনি শুধু জড়বস্তুর সমাহার হিসেবে দেখেননি। তিনি মানুষের আত্মার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর ফীডো গ্রন্থ আত্মার অমরত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে।

মানবদেহ সম্পর্কে প্লেটো বলেন যে, ক্ষুধা, সাহস ও বিবেকই এর মধ্যে প্রাধান্য পায়। আর আত্মাকে তিনি সম্পৃক্ত করেন ন্যায়-নীতি, আত্মসংযম, জ্ঞান ও সাহসের সাথে। রাষ্ট্রে Money-makers (অর্থ সম্পদ উৎপাদনকারী লোকজন), যোদ্ধা (Warrior), শাসক (ruler)-এ তিন শ্রেণীর একত্রে বসবাস যেমন জরুরী তেমনি মানবদেহ ও আত্মার একাকার হয়ে মিশে যাওয়া অত্যাবশ্যক। আবার অন্যদিকে আত্মার গুণাবলীকেও একই সাথে কাজ করতে হয় মানুষের মানব ধর্ম রক্ষার জন্য। আত্মার অবস্থান দিয়ে মূলতঃ ঠিক করা হয় কোন মানুষ সুস্থ বা প্রকৃতিস্থ কি-না। প্লেটোর মতে, ঠিক তেমনি ন্যায়বিচার দিয়েই ঠিক করতে হয়, কোন রাষ্ট্র সুস্থ কি অসুস্থ। ন্যায়বিচারকে তিনি একই সাথে রাষ্ট্র ও মানুষের আত্মার সুস্থতার মাপকাঠি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আত্মার সুস্থতা না থাকলে মানবদেহ ঠিকঠাক মত কাজ করতে পারে না, রাষ্ট্রও ন্যায়বিচার ছাড়া নিজের বাহ্যিক উপাদানসমূহ নিয়ে বলিষ্ঠরূপ পরিগ্রহ করতে পারে না। আত্মার অসুস্থতা যেমন সহজে চোখে পড়ে না, তেমনি রাষ্ট্রের ন্যায়বিচার সংক্রান্ত বহু বিষয়ই সাধারণ চোখের অন্তরালে থাকে। অনেকেই প্লেটোর এ তত্ত্বকে মেনে নিতে চাননি।

রাষ্ট্র ও আত্মার মাঝে তুলনা সঠিক নয় বলে যারা মনে করেন, তাদের যুক্তি হচ্ছে আত্মার অসুস্থ অবস্থা বা অপ্রকৃতিস্থতা আদৌ ধরা নাও পড়তে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রে ন্যায়বিচারের অভাব কখনো না কখনো অবশ্যই ধরা পড়বে। প্লেটোর দার্শনিক রাজা শুধু রাষ্ট্রের উপরই রাজত্ব করবে না বরং আত্মারও সে রাজা। কারণ তার যুক্তি হয়েছে, আত্মার উপর বিশেষ পারদর্শিতা ছাড়া রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব করার চেষ্টা বৃথা।

মানুষের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেয়ার মাঝেই রাষ্ট্র বা শাসকের ন্যায়বিচারক হওয়ার প্রমাণ রয়েছে বলে প্লেটো বিশ্বাস করেন না। দৈহিকভাবে বা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে মানুষের

www.pathagar.com

দেনা-পাওনার যত সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশই করা হোক না কেন, তা পরিশেষে ন্যায়বিচারের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ সমাজের বিরাটসংখ্যক মানুষ রাষ্ট্রীয় হিসাবের বাইরে থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই প্লেটো এমন একটি সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছেন, যেখানে সবাইকে ন্যায়বিচারের আওতাধীন আনা যাবে।

মানুষ মাত্রই ন্যায়বিচার দাবি করতে পারবে, অপরাধ তার যাই হোক না কেন। কিন্তু কোন মানুষ যদি কাজ না করে বা কাজ করার যোগ্যতা তার না থাকে, তাহলে তার ন্যায্য পাওনা কিভাবে নির্ণয় করা যাবে। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে অবশ্যই সবারই এ যোগ্যতা ও সুযোগ থাকবে। কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের কি হবে? নাগরিকদের সকল দুরবস্থার জন্য প্লেটো অসুস্থ শাসনব্যবস্থা ও অপ্রকৃতিস্থ বা মূর্খ রাজার আইনকে দায়ী করেছেন। যেহেতু প্রতিটি নাগরিকই আত্মসম্পন্ন, কাজেই সে সুস্থ পরিবেশ পরিস্থিতি, আইন ও বিচার পেলে অবশ্যই কল্যাণকামী নাগরিক হতে বাধ্য। রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত প্লেটোর কড়া রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ দিয়ে মানুষকে সভ্য, জ্ঞানী ও গুণী করে ন্যায়বিচার ভোগ করার উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন প্লেটো। মানুষ যদি ন্যায়বিচার বুঝে ও তা ধারণ করতে চায় এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ যদি এর পক্ষে যথেষ্ট শক্তি নিয়ে সদাজাগ্রত থাকে, তবে সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব নয় বলে প্লেটো অভিমত ব্যক্ত করেন।

রিপাবলিকে সাম্য নীতিঃ রিপাবলিক তার সাম্যনীতিকে খুবই জোর গলায় প্রচার করেছে। অনেকেই প্লেটোর সাম্যবাদকে আধুনিক কম্যুনিজমের সাম্যবাদের অনুরূপ বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছেন। তাঁর সর্বাত্মকবাদী নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাকে অনেকেই বিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা সমতুল্য হিসেবে ভাববার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু প্লেটোর সাম্যবাদী নীতিতে একটি বিরাট কাকতালীয় (Paradoxical) ব্যাপার নিহিত রয়েছে। তার সাম্যবাদী নীতি সর্বত্র বিস্তৃত হবে। কিন্তু এর রূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একইরূপ হবে না।

আদর্শ-রাজাশ্রেণী ব্যক্তিগত পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। আর সাধারণ নাগরিকরা বঞ্চিত হবে আইন প্রণয়ন ও শাসন করার অধিকার থেকে। অন্যদিকে সাধারণ নাগরিকগণ নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করবে। অথচ রাজাদের বাসগৃহের বাইরের ও ভেতরের সকল কর্মকাণ্ড জনগণের

www.pathagar.com

দৃষ্টির আওতায় থাকবে। এমনকি তারা খাওয়া-দাওয়া ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে রাষ্ট্রের নির্ধারিত নীতি মেনে চলবে। প্লেটোর এ নীতি ভিন্নভাবে হলেও সমগ্র খ্রীষ্টীয় বিশ্বে এখনো পালিত হচ্ছে। সাধারণ পশ্চিমা মানুষের জন্য যা নীতিবিরুদ্ধ নয়, তাই কিন্তু একজন পশ্চিমা রাষ্ট্রনায়কের জন্য কঠিন আপত্তিকর। যেমন নায়ক হিসেবে রিগান তার ব্যক্তিগত জীবন যেভাবে খুশি চালাতে পারেন। যেই প্রেসিডেন্ট হলেন, সেই বাঁধা পড়লেন নৈতিকতার জালে। এখানে আইন নয়, নৈতিকতাই বড় অস্ত্র। রাজাশ্রেণী একত্রে একইভাবে বসবাস করবেনএবং একই রকম খাদ্য-সামগ্রী খাবেন, এমনকি যৌথ স্বামিত্ববরণ করবেন। এসবই প্লেটোর রাষ্ট্রীয় আইনের অত্যাবশ্যক বিধান। এসব নিয়ম লংঘিত হওয়া চলবে না। রাষ্ট্রীয় কাজের সুবিধার জন্য রাজা ও যোদ্ধারা সুনির্দিষ্টভাবে কারো স্ত্রীত্বের অধীন থাকবে না, নিজ সন্তানদেরও চিনবে না। এ কঠোর অনুশাসন মূলতঃ সাম্যবাদী নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য। কারণ তাঁর মতে, মানুষ নিজ বাবা-মা, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল থাকে। আর এ দুর্বলতার সুযোগেই সমাজে গড়ে উঠে বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী। এ সুবিধাভোগী শ্রেণীর উদ্ভব ও উপস্থিতিই সমাজে সাম্যের নীতি প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায়। তাই প্লেটো এখানে অস্বাভাবিক কঠোরতা পালন করতে চেয়েছেন।

প্লেটোর সাম্যবাদের মর্মবাণীই হচ্ছে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা যাতে একই ব্যক্তি বা শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত না হয়। যারা আইন প্রণয়ন করবে, দেশ শাসন করবে অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষমতাধর হবে, তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে মোটেই শক্তিশালী হতে দেয়া যাবে না। তাদের অর্থনৈতিক যেকোন মজবুত ভিত্তির অর্থই হচ্ছে, সমাজে ও রাষ্ট্রে দুর্নীতি ও অনিয়মের প্রসার। তাদের অর্থনেতিক জীবন চলবে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে। পক্ষান্তরে যারা রাষ্ট্রের বিত্তবান তাদেরকে রাজনৈতিক ক্ষমতার ধারে কাছে ঘেষতে দেয়া যাবে না। অর্থাৎ-ব্যবসায়ীরা রাজনীতি করবে না, এবং রাজনীতিবিদদের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অর্থ সমাগমের সাথে সম্পৃক্ত সকল কায়কারবার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে। বাহ্যতঃ এটি একটি অসাম্যনীতি। কিন্তু ফলতঃ এটি একটি সামগ্রিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠার পথে বিরাট বাধা দুর করে। প্লেটোর সার্বিক সামাজিক সাম্যনীতির এ আপাতঃ পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তিনি কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন। কিন্তু আজকের পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ যখন অনাহার, অর্ধাহার, অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও সার্বিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, তখন মনে হয়, পৃথিবীর

www.pathagar.com

সর্বত্রই রাজনৈতিক ক্ষমতাকে অর্থনৈতিক ক্ষমতা থেকে আলাদা করা উচিত। রাজনীতিবিদদের কিছুতেই ধনী হতে দেওয়া উচিত নয়, আর ধনীদের জন্য রাজনীতি নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। এতে হয়তো মানবতার সেবা কিছুটা হলেও প্রাণ ফিরে পাবে।

পাশ্চাত্যে অবশ্য অলিখিতভাবে এ নিয়মটি কিছুটা হলেও পালিত হয়েছে। যেমন বৃটেনে রক্ষণশীলরা মাইকেল হেজেলটাইনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনয়ন দেননি, কারণ তিনি অতিমাত্রায় ধনী। অবশ্য এতে বৃটেনের অর্থনৈতিক দুরবস্থা হয়তো ঠেকানো যাবে না, তবুও একেবারের উপরতলাকে কিছুটা হলেও একচ্ছত্র ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার বিষক্রিয়া থেকে রক্ষা করা যাবে। তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে এরূপ কোনই ব্যবস্থা নেই। আবার বিশ্বের সব রাজা-বাদশাহরাই, এমনকি প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রীরা পর্যন্ত অসম্ভব রকমের ধনী। পাকিস্তানের নেওয়াজ শরীফও তার দেশের প্রথম দশজন ধনীর তালিকায় নিজের নাম স্পষ্ট অক্ষরে লিখিয়েছেন। এর মুল কারণ হচ্ছে, এসব দেশে মূলতঃ ধনী না হয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা বা একে আকড়ে রাখার কোন বিকল্প ব্যবস্থা আবিস্কৃত বা অনুসৃত হয়নি। তাই প্লেটোর সাম্যনীতি ঠিক কম্যুনিজমের সাম্যবাদের অনুরূপ এবং এর মাঝে আমাদের জন্য কোন চিন্তার খোরাক নেই, এমনটি বলা ঠিক নয়। কারণ তার সাম্যনীতিতে কিছু স্বভাববিরুদ্ধ কথা থাকলেও এতে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীকে মানবেতর জীবনযাপন থেকে উদ্ধার করার পরিকল্পনা রয়েছে।

রিপাবলিক পরিবারতত্ত্বঃ সম্ভবতঃ প্লেটোর পরিবারতত্ত্বই সবচেয়ে বেশি বিতর্কিত। এরিষ্টটলের দাসতত্ত্বের মতই এটি কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন। এরিষ্টটলের মতাদর্শ থেকে দাসতত্ত্ব বাদ দিলে হয়তোবা আজকের পৃথিবীর মানুষের কাছে তিনি আরো বড় হয়ে ধরা দিতেন। তেমনি প্লেটো যদি তার রিপাবলিক থেকে বিতর্কিত পরিবারতত্ত্ব বাদ দিতেন, তাহলে হয়তো কেউ আর তাকে বিকৃত রুচিসম্পন্ন বলার সুযোগ পেত না।

একজন দার্শনিক যত বড়ই হোন না কেন, যে সমাজে তিনি বসবাস করেন, চর্মচক্ষে যে সমাজ তিনি পর্যবেক্ষণ করেন, তাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে তার তাত্ত্বিক সৌধ নির্মাণের কল্পনা বৃথা। তাই শত বিতর্কিত হওয়া সত্ত্বেও এসব সমস্যা নিয়ে গবেষণা, পর্যালোচনা, বিচারবিশ্লেষণ করা ছাড়া তাদের উপায় ছিল না। বরং এসব বিতর্কিত ব্যাপারই তাদেরকে সহজে আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছে। তাছাড়া

www.pathagar.com

তাদের শিষ্যদের মনোজগতে এসবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই তারা মৃত্যুর প্রথম কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত নিজ অনুসারীদের মাঝে জীবিত থাকতে পেরেছিলেন। তাদের কালজয়ী হওয়ার সাথে এসব তত্ত্বের যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে বৈকি।

প্লেটোর পরিবার-তত্ত্বকে অনেকেই তাঁর কল্পনা বিলাসিতার জের হিসেবে দেখেছেন। তাঁর পরিবার তত্ত্বের মূলে রয়েছে শাসক ও যোদ্ধাশ্রেণীকে পরিবার গড়তে আইন দিয়ে বাঁধা দেয়া। যিনিই পরিবার গড়তে চাইবেন, তিনিই আর শাসক বা যোদ্ধাশ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত থাকবেন না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কিভাবে মানুষকে পারিবারিক জীবনযাপনে বাঁধা দেয়া হবে! প্লেটোর এ সূত্র কার্যকর থাকে শিশুর জন্মের পর পরই। এই শ্রেণীতে কোন শিশু জন্ম নেয়ার পর পরই তাকে নিয়ে যেতে হবে সরকারী মাতৃ ও শিশু সদনে। শিশুরা ওখানেই থাকবে। মায়েরা সেখানে গিয়েই দুধ পান করাবেন। কিন্তু কেউ তার নিজ সন্তানকে চিনবে না।

শিশুটি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তাকে বিয়ে করতে দেয়া যাবে না। ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্যই একই আইন। যদি দেখা যায়, কোন তরুণ বা তরুণী অভিজাত বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও তার মাঝে রাষ্ট্রীয় বা সরকারী ও সামাজিক গুরুদায়িত্ব পালনের যোগ্যতা ও সাহস কম, তবে তাকে পরিবার গঠন করে অভিভাবক শ্রেণী থেকে বের হয়ে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে। অন্যদিকে নিম্নশ্রেণীতে যদি কোন সম্ভাবনাময় সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে তাকে অভিজাত শ্রেণীভুক্ত করারও ব্যবস্থা থাকতে হবে। তবে এ শ্রেণীভূক্ত হওয়ার অর্থ হয়েছে পরিবার ও সম্পত্তিতে সকল প্রকার মালিকানার অধিকার প্রত্যাখ্যান করা।
এখন প্রশ্ন হয়েছে এদের পরিচয় কিভাবে থাকবে?

এটি কতখানি বাস্তবসম্মত, তা প্লেটোর কাছে বড় নয়, বড় হয়েছে মানবতাকে রক্ষার জন্য এটি তাঁর দৃষ্টিতে অপরিহার্য। আর মানুষ যেহেতু বহু অসম্ভব ও অসাধ্যকে সাধন করতে পারে, কাজেই সে এটিও পারবে। তাহলে প্রশ্ন হয়েছে, কেন এ ব্যবস্থা এত জরুরী? সহজ-সরল উত্তর হয়েছে, মানুষকে নিঃস্বার্থ রাখার জন্য। সরকারী বা সামষ্টিক কাজে সত্যিকার অর্থে কল্যাণধর্মী কিছু করার জন্য প্রয়োজন উৎসর্গীকৃত প্রাণ। যিনি সব সময়ই আমার আমার করে মরবেন, তার পক্ষে বৃহত্তর কিছুতে নিবেদিতপ্রাণ হওয়া সম্ভব নয়। আমার ঘর, আমার পরিজন-এসব কথা উচ্চারণ করার সুযোগ থেকেই বঞ্চিত করতে চান প্লেটো সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের। তারা বলবেন দেশ আমার,

www.pathagar.com

মাটি আমার, রাষ্ট্র আমার, আর আমি এদের জন্যই বিক্রি হয়ে গেছি। নিঃশেষ হয়ে গেছি। আমার অস্তিত্ব এসবের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। কাজেই দেশের প্রতিটি সন্তানই আমার সন্তান।

প্লেটোর পরিবারতত্ত্বের এদিকটা বুঝতে হলে ব্যক্তি প্লেটোকে বুঝতে হবে। একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে, একজন উৎসর্গীকৃত জ্ঞান-তাপস হিসেবে, তিনি তাঁর সকলছাত্রকে নিজ সন্তানের মত ভালবাসতে পেরেছিলেন। ছাত্র-ছাত্রীদের একটা পোষাক পরাতেন, যাতে বুঝা না যায় কে পুরুষ, আর কে নারী। ছাত্ররাও তাঁকে পিতার মত শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন। তাই তার মনে হয়েছে, কেন একজন শাসক তার অধীনস্থ সকলকে সন্তানের মায়ামমতা বিলিয়ে দিতে পারবেন না! স্নেহ, মায়া-মমতার তো কোন সীমা-পরিসীমা মানুষের মনোজগতে নেই।আজকের এ নিষ্ঠুর মমত্বহীন পৃথিবীতে প্লেটোর এ যুক্তি আনুধাবন সত্যিই কষ্টসাধ্য। এখনকার দিনে একজন শিক্ষক হয়তো তার নিজ সন্তানের জন্য সব উজাড় করে দিতে পারবেন। এজন্য স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতির আশ্রয় নিতেও তার বাঁধবে না। কিন্তু তার হাজার হাজার ছাত্রের জন্যও নিজের একটু বড় ধরনের স্বার্থ ত্যাগ করতে তার হাজারো আপত্তি।

প্লেটোর এ পরিবারতত্ত্ব একেবারেই কোন বাস্তব প্রভাব রাখতে পারেনি এমনটি বলা যায় না। পাশ্চাত্যে আধুনিক শিশুপালন পদ্ধতি দেখে মনে হয় প্লেটোর চিন্তা একেবারেই অবাস্তব নয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, বিয়ে-সাদীর ব্যাপার নিয়ে। শাসক ও যোদ্ধাশ্রেণীর মাঝে কি বিবাহ ব্যবস্থা চালু থাকবে?

পাশ্চাত্যের দিকে তাকালে মনে হয় তাদের পারিবারিক বন্ধন শিথিল হওয়ার সাথে পৃথিবীজোড়া তাদের দৌরাত্ম্যের একটা সম্পর্ক রয়েছে। পশ্চিমের মানুষ ঘরমুখী না হয়ে বহির্মুখী হওয়ার কারণেই হয়তো তাদের এত বস্তুগত উন্নতি সম্ভব হয়েছে। কিন্তু যৌথ স্বামিত্ব ও স্ত্রীত্ব প্লেটো যেভাবে চেয়েছেন সেটি কিন্তু আজ আর পৃথিবীর সভ্যসমাজের কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ইসলাম-পূর্ব আরবে অবশ্য এ ধরনের বিয়ের ব্যবস্থা ছিল, যেখানে কোন এক পুরুষ একজন মহিলার স্বামী না হয়ে একদল মহিলার স্বামিত্ব বরণ করতো। আবার একজন স্ত্রীও তার স্ত্রীত্বের অধীন করতে পারতো বেশ কিছু পুরুষকে। এমনি ব্যবস্থা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেছে। আজকের চিকিৎসাবিজ্ঞানও এ ধরনের ব্যবস্থার অসংখ্য খারাপ প্রতিক্রিয়ার কথা সুনির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যৌথ স্বামিত্ব ও স্ত্রীত্বের বিষয়টি একেবারেই বিভ্রান্তিকর ও

www.pathagar.com

আপত্তিজনক। তবে প্রাচ্যে এটি যত বেশি সমালোচিত, পাশ্চাত্যে কিন্তু ততটি নয়। কারণ প্লেটো ব্যাপারটিকে দিতে চেয়েছেন আইনগত রূপ। পাশ্চাত্যে আধুনিক পারিবারিক ব্যবস্থা মূলতঃ এ ধরনের গোপন যৌথ স্বামিত্ব ও যৌথ স্ত্রীত্ব মেনেই নিয়েছে। যার ফলে তাদের পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তবে আমাদের উপরতলার মানুষরা সুকৌশলে এ ধরনের ব্যবস্থার ক্ষতিকারক দিক থেকে নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

রিপাবলিক

জন্মশাসন ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

প্লেটো যে আদর্শ রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছেন, তা বাস্তবে রূপদানের জন্য রাষ্ট্রের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন। "রাষ্ট্রের লোকসংখ্যা অত্যধিক বেশি কিংবা অত্যধিক কমে পরিনত হয়ে না যায় তার যথাসম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।" নগর রাষ্ট্রে হয়ত জনসংখ্যার আধিক্য ও স্বল্পতা সহজেই ধরা পড়ত। জনসংখ্যার স্বল্পতাকেও সমস্যা হিসেবে ধরা হত। কারণ জনসংখ্যার অভাবে, নগররাষ্ট্রের জীবনই বিঘ্নিত হতে পারত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারীর কারণেই অনেক সময় বহু জনগোষ্ঠী তাদের রাষ্ট্রত্ব বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়ে পড়ত। কিন্তু প্লেটোর ভাবনা নিবদ্ধ ছিল অন্যদিকে। তিনি জনসংখ্যার আধিক্যকে ভয় পাওয়ার চেয়ে বেশি ভয় পেতেন নিম্ন জাতের মানুষের সংখ্যাধিক্যকে। আজকের দিনে মানুষ জন্মনিয়ন্ত্রণ বলতে বুঝায় পরিবার ছোট করার নিয়মকে। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী মিলে ঠিক করবে তারা ক'জন সন্তানের জন্ম দেবে। পৃথিবীর কোথাও দু'জন, আবার কোথাও একজন করে সন্তান জন্ম দিয়ে পরিবার ছোট রাখার ব্যবস্থা করাই হয়েছে আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রীয় ধারণা।

প্লেটো কিন্তু এ পদ্ধতির জন্মশাসন অনুমোদন করেননি। তাঁর জন্মশাসনের মূখ্য বিষয় ছিল নতুন প্রজন্মকে অধিকতর উঁচু জাতের সন্তান উপহার দেয়া। জন্মসূত্রেই মানুষ অনেক গুণাবলী ও দোষাবলী অর্জন করে থাকে বলে প্লেটোর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে অবশ্য মানুষ স্বীকার করছে যে, কোন মানুষের জ্ঞানী-গুণী, দৃঢ় প্রত্যয়ী, সাহসী, উদ্যমী ও সর্বোপরি সৃজনশীল হওয়ার পেছনে প্রতিটি মানুষের জন্মগতসূত্রের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এ জন্মসূত্রকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার

www.pathagar.com

পূর্বের কয়েক মাস বা পরবর্তী সুযোগ সুবিধার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হচ্ছে না। একে মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাবা-মায়ের গুণাবলীর চেয়ে দাদা-দাদী বা নানা-নানীর গুণাগুণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। প্লেটোর সময়ে এমন কিছু আবিষ্কৃত হয়েছিল কি-না বলা মুশকিল। তবে রক্তের আভিজাত্যকে তিনি খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন।

প্লেটো "উন্নত জাতের" ও "নিকৃষ্ট জাতের" মানুষের মাঝে পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে কুকুরের বংশবিস্তারের সাথে এর তুলনা করতেও দ্বিধা করেননি। অর্থাৎ কুকুরের বংশবিস্তারের প্রক্রিয়ার উপর যেমন নিয়ন্ত্রণ করেই ভাল জাতের কুকুরের সংখ্যা বাড়াতে হয়, মানুষের ক্ষেত্রে তিনি একই নিয়ম চালু করতে চেয়েছেন। পিতা হওয়ার যোগ্যতা ধরা হয়েছে সাহসকে আর তার বংশবিস্তারে পুত্রের ভূমিকাকে করা হয়েছে অগ্রগন্য। প্লেটো কিন্তু কোথাও নারীদেরকে খাটো করে দেখার প্রবণতা প্রকাশ করেননি। তিনি বরাবারই মনে করতেন, নারী -পুরুষ সবাই একই কর্ম সাধনের জন্য সৃষ্টি। তাদের মাঝে স্বাভাবিক কর্মক্ষমতার তারতম্যকে তিনি নেহায়েতই আপেক্ষিক ব্যাপার মনে করতেন। এতে কোন মৌলিক প্রাকৃতিক পার্থক্য তিনি দেখতে চাননি। তবে উন্নতজাতের মানুষ সৃষ্টির পেছনে তিনি পিতার সাহসিকতা ও পুরুষের ভূমিকাকে প্রাধান্য দিয়েছেন বলে মনে হয়। এর কারণ হয়ত মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়ার সাথেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একজন পুরুষ একই সাথে অর্থাৎ খুব ছোট সময়ের পরিসরে অনেক সন্তানের জনক হতে পারে। কিন্তু একজন নারীকে এজন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। উন্নতজাতের মেয়েদেরকেও তিনি অধিকতর ভাল প্রজন্ম সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছেন এবং সে কারণেই ভাল জাতের মেয়েদেরকে তিনি মন্দ জাতের পুরুষের সাথে মেলামেশা করতে দিতে রাজী ছিলেন না। অবশ্য ভাল জাতের পুরুষের ক্ষেত্রেও প্লেটোর একই নিয়ম প্রযোজ্য। এসব মিলনের ফল হিসেবে যত সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে তাদের সকলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে যত্নের সাথে পালন করার পরামর্শ দিয়েছেন। তাহলে "নিকৃষ্ট জাতের' মানব সন্তানের কি হবে? অর্থাৎ যারা নিম্ন জাতের মানুষ তাদের সন্তান ধারণ ক্ষমতার ব্যবহার করার ক্ষেত্রে, একদিকে রাষ্ট্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকবে, অন্যদিকে তাদের সন্তানদের ভরণপোষণের দায়িত্বও রাষ্ট্র পালন করবে না। অথচ উন্নত জাতের মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধিকে সকল দিক থেকেই উৎসাহিত করা হবে।

www.pathagar.com

অবস্থা যদি তাই হয়, তবে তো খুব দ্রুত কোন রাষ্ট্রের জনসংখ্যার আধিক্য দেখা দিতে পারে। আলোচনার ধরন থেকে মনে হয় প্লেটো এ ব্যাপারে সজাগ ছিলেন। গ্লকন যখন সক্রেটিসকে জিজ্ঞেস করলেন, সন্তান জন্মদানের জন্য পরিপূর্ণ বয়স বলতে দ্বিতীয় জন কি বুঝাতে চান, তখন সক্রেটিস মেয়েদের জন্য ২০-৪০ আর পুরষদের জন্য ২৬-৫৫ বয়স-সীমা নির্ধারণ করার কথা বললেন। এতে দেখা যাচ্ছে, উত্তম-অধম নির্বিশেষে এ বয়স সীমাকেই জনক-জননী হওয়ার সবচেয়ে উত্তম সময় বলে ধরা হয়েছে। এ ব্যাপারে প্লেটোর মনোভাব ছিল অত্যন্ত কঠোর। এ বয়স-সীমার বাইরে কাউকে তিনি পিতা-মাতা হতে দিতে রাজী ছিলেন না। "এরূপ নিষিদ্ধ মিলনের সন্তানকে অপবিত্র বলে গণ্য করা হবে ... এবং লালসার সন্তান বলে গণ্য করবে।

যৌন সম্পর্ক আইন সংগতভাবে স্থাপিত হয়েছে কি-না বা আদৌ বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে সন্তান ধারণ করা হয়েছে কি-না, এটি প্লেটোর কাছে মৌলিক ব্যাপার ছিল না। মৌলিক ব্যাপার হয়েছে বয়সের বিচারে পিতা-মাতা হওয়ার পরিপূর্ণ যোগ্যতা তারা অর্জন করেছিলেন কি-না। অন্যথায় এমনকি তারা যদি উন্নত জাতের সন্তান লাভ করার যোগ্যতাসম্পন্নও হয়ে থাকেন, তবুও ঐ সন্তান রাষ্ট্রের অবৈধ ও অপবিত্র বলেই গণ্য হবে। অর্থাৎ, নিকৃষ্টদের তুলনায় তারা যে শ্রেষ্ঠত্ব ভোগ করে আসছিল এখানে সে বিধান আর থাকছে না। পরিপূর্ণ বয়স সীমার মধ্যেই শুধু উত্তম-অধমের পার্থক্যের ব্যবস্থা রয়েছে। বয়সের এ সীমার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে গিয়ে প্লেটো বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে সমস্যায় পড়েছেন, তার সমাধান দেয়ার চেষ্টা করেছেন দুটি উপায়ে।

নর-নারী উভয়েই যথাক্রমে পঞ্চাশ ও চল্লিশ বছর বয়সের পরও তাদের বৈবাহিক সম্পর্কের সকল দিক বজায় রাখতে পারবে এ শর্তে যে, তারা কোন সন্তানের জন্ম দেবে না এবং তারা "রাষ্ট্রের বিবাহ উৎসবে" যোগদান করবে না। "রাষ্ট্রের বিবাহ উৎসবে" শুধু পিতা-মাতা হওয়ার পরিপূর্ণবয়সের নর-নারীই অংশগ্রহণ করবে। মুলতঃ ঐসব বিবাহ উৎসব থেকেই চিহ্নিত হবে যৌথ পিতৃত্ব ও যৌথ মাতৃত্ব। জন্মকে এভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে ভ্রুণ হত্যার কোন বিকল্প প্লেটো আবিস্কার করতে পারেননি। কারণ শুধুমাত্র প্রাকৃতিক পদ্ধতির উপর নির্ভর করে এভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ প্রায় অসম্ভব।

বাহ্যিকভাবে প্লেটোকে এখানে কঠোর জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষেই শুধু যুক্তি প্রদর্শন করতে দেখা যাচ্ছে না; বরং তাকে যথেষ্ট নিষ্ঠুর বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু প্লেটোর

www.pathagar.com

চরম মানবতাবাদী আদর্শ তাকে এ নীতির দিকে ঠেলে দেয়। সব সময়ই তার ভাবনা ছিল যেন রাষ্ট্রের সবাই সুখী জীবনযাপন করতে পারে। এ সুখ সবার মাঝে বিলিয়ে দেয়ার পন্থা উদ্ভাবনেই তিনি ছিলেন সদা সচেষ্ট। আর এজন্য তার কাছে ভ্রুণ হত্যা মোটেই নিষ্ঠুর বলে মনে হয়নি। বৃহত্তর মঙ্গল সাধনের লক্ষ্যে এটি তার কাছে খুবই ছোট একটি প্রয়োজনীয় ক্ষতিকারক কাজ বলেই মনে হয়েছে।

প্লেটো তার নগর-রাষ্ট্রের সবাইকে একই সাথে হাসতে ও কাঁদতে দেখতে চেয়েছেন। কাজেই তার কাছে জন্মনিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার ছিল না। ভ্রুণ হত্যা কোন পাপ তো মনেই হয়নি; বরং একটি পবিত্র পুণ্য কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ধর্মীয় দৃষ্টিতেও মা ও ইতিমধ্যে দুনিয়াতে যেসব শিশু ন্যায্য পাওনার জন্য সংগ্রামরত তাদের স্বার্থে ভ্রুণ হত্যা পাপ নয়। মায়ের জীবনের জন্য হুমকি হলে তো ভ্রুণ হত্যা পাপ নয়। মায়ের জীবনের জন্য হুমকি হলে তো ভ্রুণ নষ্ট করা পূণ্যই বটে। প্লেটোর হিসেবে কোন ভ্রুণই কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, এটি সর্ব প্রথমই রাষ্ট্রীয় সম্পদ। শিশু আবার আমার বা তোমার হবে কেন, শিশু সে সকলের জন্যই শিশু। রিপাবলিকের যে অংশে প্লেটো জন্ম নিয়ন্ত্রণের এসব নিয়ম-কানুন ব্যাখ্যা করেছেন, সেখানে তিনি মানব বংশ বিস্তারের মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে "আমার" "তোমার" প্রসঙ্গ বাদ দিতে পরামর্শ দেন। সমগ্র দেহের স্বার্থের সাথে যদি তার প্রতিটি অংগ-প্রত্যঙ্গের স্বার্থ অঙ্গাঙ্গিভাবে উপলব্ধি করা না যায়, তাহলে সে শরীরকে আমরা সুস্থ বলতে পারি না। তেমনি নিজের বংশ বিস্তারের সাথে যদি জাতির বংশ বিস্তারের ব্যাপারটিকে জড়িত করা না যায়, তবে রাষ্ট্র সুস্থ হয়ে গড়ে উঠতে পারে না।

ইদানিং পৃথিবীর সর্বত্রই জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রসারের জোয়ার বইছে। কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহ মূলতঃ ব্যবহৃত হয়েছে অন্যায় ও অবৈধ যৌনলালসা চরিতার্থ করার জন্য। মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি রোধে এখন পর্যন্ত এর কার্যকরী প্রভাব রাষ্ট্রীয় জীবনে অল্পই প্রতিফলিত হয়েছে। অবশ্য উন্নত বিশ্বের কথা স্বতন্ত্র। সেখানে একই জোড়া নারী-পুরুষের পারিবারিক জীবন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী নয় বলেই জন্ম নিয়ন্ত্রন খুবই জোরালোভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে। কারন বিবাহবিচ্ছেদ পাশ্চাত্যে ইতিমধ্যেই এত সহজরূপ ধারণ করেছে যে, স্বামী-স্ত্রী উভয় পক্ষই সব সময়ই এর জন্য প্রস্তুত থাকে। কাজেই সন্তান আসে অনেক দেরিতে ও স্বল্প সংখ্যায়। তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে পারিবারিক জীবন স্থিতিশীলতা ও সন্তানের প্রতি ব্যক্তিগত মাত্রাতিরিক্ত দুর্বলতা

www.pathagar.com

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে নিচে নামতে দিচ্ছে না। তৃতীয় বিশ্বের মানসিকতায় স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পুত্র-সন্তানের আশায় বেশ কটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়াকে তেমন কোন অন্যায় কাজ মনে করে না। জন্মনিয়ন্ত্রণকে এখন পর্যন্ত মূলতঃ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক লাভ-লোকসানের ভিত্তিতেই বিচার করা হয়েছে। কারণ প্লেটোর মত করে খুব কম সংখ্যক মানুষই রাষ্ট্রকে একটি আত্মাবিশিষ্ট জৈব-শরীরী সংগঠন হিসেবে দেখেছেন। সমাজ জীবনকে এমনিভাবে দেখার প্রবণতা বহু দর্শনেই বিধৃত রয়েছে। ইসলামে সমগ্র মুসলিম মিল্লাতকে একটি মানুষের শরীরের সাথে তুলনা করেছে। বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানদের অন্য মুসলমানের সুখ-দুঃখের সাথে একাত্ম হতে বলা হয়েছে এমনভাবে, যেন তা একই দেহের আনন্দ বেদনার মতই অনুভূত হয়। কিন্তু বাস্তবে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের মাঝে এমন ভ্রাতৃত্ববোধ দূরে থাক, একই জাতি বা রাষ্ট্রের মুসলমানদের মাঝেও সে ধরনের কোন অনুভূতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না কয়েক শতাব্দী যাবত। পাশ্চাত্যে সন্তানের জন্মসূত্রের কোন বাদ-বিচার না করে যে পদ্ধতিতে সন্তান-সন্ততি রাষ্ট্রীয় যত্ন লাভ করে তাতে মনে হয় প্লেটো এ ব্যাপারে একেবারেই নিরর্থক কিছু বলেননি। অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের বিরাজিত দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিতে রক্তের সম্পর্ক যেভাবে ভূমিকা পালন করছে, তাতে এ সম্পর্কের ব্যাপারে প্লেটোর ভীতি ও আশংকা একেবারেই অমূলক নয় বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

বংশ বিস্তারে রক্তের সম্পর্ক গোপন করার পদ্ধতি এখন আর মানুষের কাছে একটি সার্বজনীন নীতি হিসেবে গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বিভিন্ন ধরনের জাগতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করার স্বার্থে বাবা-মার কাছে বংশবিস্তারের বিকল্প এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। এ ব্যাপারে মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক কারণের ভূমিকাও খাট করে দেখার উপায় নেই। ধনীরা তাদের স্বার্থের ব্যাপারে অধিকতর সচেতন এবং নিজেদের কর্মকাণ্ডের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বেশি বিধায় তারাই কম সন্তান জন্ম দিচ্ছে। গরীবরা নিজেদের উপর তেমন একটা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখছে না বলে তারাই বেশি সন্তান উৎপাদন করছে। ধনীর ঘরেই শুধু মেধাবী সন্তান জন্ম নেয়, এমন কথা মানা যায় না। কারণ তাদের ঘরেও অনেক কম মেধাবী বা স্বল্প বুদ্ধির সন্তান জন্ম নেয়। আবার, গরীবের ঘরেও অনেক অসাধারণ শিশুর জন্ম হয়। তাই এ বিবেচনায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র প্রমাণ করেছে, রোগ-শোকের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বংশানুক্রমে চলে। গর্ভবর্তী মায়ের খাদ্যাভ্যাস, মদ্যপান ও ধূমপানের প্রতিক্রিয়া সন্তানের উপর

www.pathagar.com

প্রকট। কাজেই স্বামী-স্ত্রী যদিএইডস বা অন্যান্য দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকে, তবে তাদের সন্তান ধারণ করার অধিকার রহিত হওয়া উচিত। এমনকি বহু কুরুচীসম্পন্ন নর-নারীকে সন্তান লাভ করার পূর্বে তাদের বিকৃত রুচী পরিহার করতে বাধ্য করা উচিত। তাছাড়া বিবাহের পূর্বেই বর ও কনে উভয়েরই রক্ত ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাদি বিনিময় করা উচিত। যাতে করে পরবর্তী বংশধর সৃষ্টির পূর্বেই এ ব্যাপারে যাবতীয় পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব। তাছাড়া এতে করে কোন পক্ষেরই ধোঁকা খাওয়ার সম্ভাবনা নেই। যে সকল দেশে বেশিরভাগ বিবাহই সংঘটিত হয় বাবা-মা বা আত্মীয়-স্বজনদের মাধ্যমে, সেখানে প্রায়ই বর ও কনে সম্পর্কে বিভিন্ন সত্য কথা গোপন রাখার কারণে পরবর্তীতে বিড়ম্বনাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এমনকি এর ফলে পরবর্তী বংশধর জন্ম থেকেই রোগা, বিকলাঙ্গ ও বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে। শুধু তাই নয় নিকটআত্মীয় যেমন চাচাতো, খালাতো, ফুফাতো ভাই-বোনদের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক আবর্তিত হতে থাকলে এমনিতেই পরবর্তী বংশধর হীনবল হয়ে পড়ে। ইসলাম মানুষকে নিজ বংশ বা আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনকে নিরুৎসাহিত করেছে। ইসলামের নবী ভিন্ন বংশ বা গোত্রের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনকে উৎসাহিত করেছেন। বাস্তবেও দেখা যাচ্ছে, বাবা-মা দুই ভিন্ন জাতির মানুষ হলে তাদের সন্তানরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সবল ও বেশি মেধাবী হয়ে থাকে।

সন্তান ধারণের জন্য শুধু অর্থনৈতিক বা শারীরিক যোগ্যতাই যথেষ্ট নয়; বরং এজন্য মানসিক যোগ্যতার ভূমিকাই বড়। অথচ আজ এ যোগ্যতাটিই সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। অর্থের জোরেই সবাই সবকিছুকে ভাল বা মন্দ বলতে চায়। একটি মানব শিশুকে সত্যিকার অর্থে মানুষ করার দায়িত্বানুভূতি দ্বারা বাবা-মা, সমাজ ও রাষ্ট্র কেউ সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। ফলে বিংশ শতাব্দীর এ শেষ প্রান্তে এসেও সৎ ও জ্ঞানী-গুণী মানুষ সৃষ্টির পেছনে জন্মশাসন ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে মানুষের ভাবনার অন্ত নেই। প্লেটো যে এ ভাবনার ব্যাপারে এত আগেই এত বেশি গভীরে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে পেরেছিলেন সেটাই তার বড় কৃতিত্ব। কতখানি সুষ্ঠু পদ্ধতির সন্ধান তিনি দিতে পেরেছেন তা আজকের দিনে আর হয়তোবা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

www.pathagar.com

প্লেটোর স্টেট্‌সম্যান (The Statesman):

রিপাবলিক রচনার বেশ কিছু বছর পর প্লেটো তাঁর 'ষ্টেটসম্যান' সৃষ্টির কাজে হাত দেন। স্বভাবতঃই এতে আবেগ-উচ্ছ্বাস, কল্পনা ও আদর্শবাদিতার চেয়ে বাস্তব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা বেশি। ধারণা করা হয় Dion-এর সঙ্গকালে (খ্রীঃপূঃ ৩৬৭-৩৬১) প্লেটো ষ্টেসম্যান রচনা করেন। তাই মুল সমস্যা ছিল কিভাবে Syracuse-কে আদর্শ রাষ্ট ও Dion-কে আদর্শ রাজা বানানো যায়। যদিও রিপাবলিকের কাল্পনিক রূপ থেকে প্লেটো পুরোপুরি সরে আসেননি, তবুও বাস্তবতার দাবি মেটানোর জন্য চূড়ান্ত আদর্শিক রূপের সাথে কিছুটা হলেও আপোস করতে তিনি রাজি ছিলেন।

প্লেটো স্বীকার করতেন যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে বেশ কিছু দুর্বলতার শিকার। তাই কঠিন আদর্শিক শাসনব্যবস্থা হয়তো বাস্তব জীবনে সহজে সম্ভব নয়; কিন্তু তাই বলে তিনি আবার রণেভঙ্গ দিতেও রাজি ছিলেন না।

পুস্তক পরিকল্পনা ও উপস্থাপনার দিক থেকে বিচার করলে স্টেটসম্যান রিপাবলিকের চেয়ে বেশ খানিকটা বিজ্ঞানধর্মী। প্লেটো অবশ্য 'বিজ্ঞান' বলতে সব চেয়ে উচুমানের জ্ঞানকেই বুঝাতেন। তাঁর দৃষ্টিতে বিজ্ঞান হচ্ছে, এমনি এক সচেতনতা, যা তার চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করলে জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। এরূপ চূড়ান্ত জ্ঞানের নাম তিনি দিয়েছেন dialectics. প্রাথমিকভাবে dialectics মানে কথোপকথনের কলা-কৌশল। তাঁর দৃষ্টিতে সক্রেটিস যে কলা-কৌশল ব্যবহার করেছিলেন তাই dialectics- এর সর্বোচ্চ রূপ। কারণ সেরূপ পদ্ধতির ব্যবহারই শুধু মানুষকে বস্তু ও ধারণার অন্তর্নিহিতভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারদর্শী করে তোলে।

প্লেটো স্টেটসম্যান গ্রন্থে এ ধরনের জ্ঞানের পদ্ধতি বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। সক্রেটিস এ ধরনের জ্ঞান সম্পর্কিত ব্যাপারে আলাপ করছিলেন একজন Eleatic আগন্তুকের সাথে। এ জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরের কথা উল্লেখ করে সক্রেটিস আগন্তুককে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, সঠিক জ্ঞান মানুষকে কোনকিছুর গভীরে এমনভাবে প্রবেশ করার শক্তি যোগায় যে, সে সহজেই ক্ষুদ্র পরিসর থেকে গিয়ে বড় পরিসরে বা বড় পরিসর থেকে গিয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে তার জ্ঞান ব্যবহার করতে পাবে। এরূপ জ্ঞান মানুষকে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় এ দুয়ের ধারণার মাঝে এমন পূর্ণতা দান করে, যাতে তার কাছে এ দু'টি কখনোই আলাদা হয়ে ধরা দেয় না। প্রভু ও দাসকে করে তোলে একই মানুষ। আইন ও স্বাধীনতাকে করে তোলে সমার্থক।

www.pathagar.com

আইন বাহ্যিকভাবে আমার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে, আর স্বাধীনতা মুক্ত-বিহঙ্গের সন্ধান দেয়। কিন্তু dialiectic জ্ঞান দু'টি একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ। যে মানুষের জন্য এ জ্ঞান, তার সম্পর্কে এটি কি শিখায়? তাকে বড় হতে বলে ছোট হওয়ার নির্দেশ দিয়ে। এখন প্রশ্ন হয়েছে, ছোট সেজে বড় হওয়া যায় কিভাবে? সন্তান বা ছাত্র যখন তার বাবা-মা বা শিক্ষকের কাছে ছোট হয়, তখন মূলতঃ এটি তার বাড়ত্ব ও মহত্ত্ব সৃষ্টিতে সাহায্য করে। প্লেটো গুরু ও ছাত্র উভয় দিক থেকেই এ পদ্ধতির বাস্তবতা অনুধাবন করেছেন। ভারতের কদমবুসি প্রথা কিন্তু আদিতে এ দর্শনকেই ধারণা করতো। কদমবুসি করতে করতে একজন কদমবুসি পাওয়ার যোগ্য হয়ে উঠছে এটাই মূল সত্য। আর কদমবুসির মানসিকতা পরিহার করে একজন সমাজচ্যুত হয়েছে, নিক্ষিপ্ত হয়েছে অসামাজিক ও নিষ্ঠুর মমতাহীন পৃথিবীর আস্তাকুড়ে। অবশ্য এ সত্য টিকে থাকতে পারেনি। তবে স্রষ্টার কাছে ছোট থেকেই নিজেকে বড় করতে হয়, এ বিধান টিকে আছে।

নিজের অসহায়ত্ব ও দুর্বলতাকে অতিক্রম করার লক্ষ্যে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ করার জন্য মানুষকে শিশুসুলভ চর্চায় মেতে উঠতে হয়। একটি শিশু যখন অক্ষরজ্ঞান লাভ করে, তখন কিন্তু সে জানে না, এ জ্ঞান তার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হয়েছে সে পড়তে শিখবে। কিন্তু শিশুটি যদি অক্ষরজ্ঞান ছাড়াই পড়তে চায়, তাহলে সে তা পারবে না। পড়ার জ্ঞানটি আবার তার জন্য উদ্দেশ্য নয়। কারণ পড়তে সে চায় ভাব জানার জন্য। ভাব জানাও তার উদ্দেশ্যনয়, কারণ ভাব জেনে সে কোনকিছু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করতে চায়। কোনকিছুর সম্যক জ্ঞানও তার লক্ষ্য নয়, কারণ সে ঐ জ্ঞানের সাহায্যে অন্য জিনিস আয়ত্তে আনতে চায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রতিটি স্তরেই সে একই রকম অসহায়। কিন্তু প্রতিটি উচ্চতর অবস্থান তার বড়ত্ব ও মহত্ত্বের মাত্রাতে একটি নতুন সংযোজন। ষ্টেটসম্যান তাই মূলতঃ জ্ঞানের যেসব কথা রিপাবলিকে অব্যক্ত রয়ে গেছে, তাই প্রকাশ করার চেষ্টা করেছে ভিন্ন স্টাইলে।

সক্রেটিস ও আগন্তুকের মাঝে ষ্টেটসম্যান গ্রন্থে শাসনপ্রণালীর যে শ্রেণীবিভাগ দেখানো হয়েছে, তা মূলতঃ এরিষ্টটলের পলিটিক্স গ্রন্থের তৃতীয় পুস্তকের অনুরূপ। আইন সম্পর্কে সক্রেটিস আগন্তুককে বুঝানোর চেষ্টা করছেন যে, প্রাকৃতিক আইন (natural law) ও মানুষের আইন (human law) এক জিনিস নয়। কাজেই আইনের শাসন নিয়ে মাতামাতি করে লাভ নেই। বাস্তব জীবন যেহেতু চলমান

www.pathagar.com

নদীর মত, এর উজান-ভাটি সব সময় ঘড়ির কাঁটার নিয়ম মানে না। অথচ আক্ষরিক আইন খুবই বিধিবদ্ধ নীতিমালা মেনে চলে। তাহলে স্থবির আইন কিভাবে চঞ্চল খরস্রোতা নদীর উত্তাল তরঙ্গের ঢেউয়ের সাথে তাল মিলাবে? প্লেটোর তাই প্রয়োজন জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মাঝির। অর্থাৎ প্লেটো নতুন রঙ্গে ও ভঙ্গিমায় আবার বলছেন আদর্শবান জ্ঞানী শাসকের কথা।

তাঁর মতে জীবন্ত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী মানুষই ঠিক করবে উত্তাল তরঙ্গে কিভাবে রাষ্ট্র নামক নৌকা চলবে। অবশ্য প্লেটো স্বীকার করছেন আইনের জ্ঞানও তার থাকা লাগবে। তবে সেটি নিতান্তই অক্ষরজ্ঞান সদৃশ জ্ঞান। অক্ষরে যেমন জ্ঞানের কথা থাকে না, শাসকের আইনের জ্ঞানে প্রজ্ঞা থাকে কম। প্রজ্ঞা তাকে অর্জন করতে হয় ডায়ালেকটিক্যাল জ্ঞান দ্বারা।

দি ল'জ (The Laws)

দি ল'জ গ্রন্থটি প্লেটোর পরিণত বয়সের লেখা। তাই স্বাভাবিকভাবে সবাই মনে করেন এটি তাঁর একেবারেই নিজস্ব চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ। এতে তার সময়কার পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রতি তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জের অনেক কম ফুটে উঠার কথা। গুরুর প্রভাবও এতে অনেক কম প্রতিফলিত হওয়া স্বাভাবিক। এটিই প্লেটোর একমাত্র সৃষ্টি, যেখানে সক্রেটিস সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। রিপাবলিকের সব কথাই মূলতঃ সক্রেটিসকে ঘিরে আবর্তিত; স্টেটসম্যানে এরূপ ভাব কিছুটা কম।

রিপাবলিকের মতই স্টেটসম্যানও মূলতঃ আদর্শ নগর রাষ্ট্রকেই মুল প্রতিপাদ্য হিসেবে দেখেছে। কিন্তু ল'জকে আমরা এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম দেখতে পাই। এখানে আদর্শবাদ ও কাল্পনিকতাকে চাপা দিয়ে তার রাষ্ট্র ও আইনতত্ত্বকে বাস্তবধর্মী করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। পুস্তকের শেষের অংশে এসে প্লেটোকে চেনাই যেন কষ্টকর হয়ে উঠে।

ল'জ-এ আলোচনা শুরু হয় তিনজনের মধ্যেঃ নাম ঠিকানাবিহীন একজন এথেন্সবাসী আগন্তুক, যিনি অন্যান্য রচনায় সক্রেটিসের ভূমিকা পালন করেন, The Cretan Kleinias এবং the Spartan Megillos। তাহলে দেখা যাচ্ছে আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে স্পার্টা, ক্রীট ও এথেন্সের প্রতিনিধিগণ। এ তিনটি নগর রাষ্ট্র সে সময়কার নামকরা রাষ্ট্রসমূহের অন্যতম। আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল

www.pathagar.com

এথেন্স থেকে অনেক দূরে ক্রীটের এক দ্বীপে। আলোচনার শুরুতে knosso,s শহর থেকে তিন বৃদ্ধ হেঁটে রওনা হয়েছে Zeus নামক গুহার দিকে।

Zeus ছিল ক্রীটবাসীদের দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। ক্রীটের আইন-কানুনকে মনে করা হতো Zeus-এর দান। ক্রীট নগরের আইন যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। স্পার্টা নগরীর আইন-কানুনের প্রসিদ্ধি ছিল ক্রীট নগরীর আইনের চেয়েও অনেক বেশি। এথেন্স থেকে আসা আগন্তুক প্রথমে প্রস্তাব দেয় যে, তাদের তিনজনের মধ্যে আইন ও শাসনপ্রণালী নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। ক্রীটবাসী বুঝানোর চেষ্টা করেন যে, তার দেশের সকল আইন যুদ্ধকে সামনে রেখেই রচিত। যেহেতু তখন নগর রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের মধ্যে সর্বদাই যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিল এবং যুদ্ধই ঠিক করে দিত কোন রাষ্ট্র ও জনপদের ভাগ্য; তাই ক্রীটবাসীর যুক্তি হয়েছে, তার রাষ্ট্রের আইনই যথার্থ। কারণ ঠিকমত যুদ্ধ করতে পারলেই রাষ্ট্রের উন্নতি-শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হতো। এথেন্সবাসী এ যুক্তি মানতে রাজী নয়। তার দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের প্রধান কাজ যুদ্ধ করা নয়, বরং যুদ্ধ ও গোলযোগ ঠেকানো এবং শান্তি রক্ষা করা। এথেন্সবাসীরা মনে করতো যে, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, শক্তি ও সমাজ রক্ষাই হয়েছে আইনের প্রধান কর্তব্য। কাজেই আইন যদি হয় যুদ্ধকেন্দ্রিক, তা কিভাবে শান্তির পক্ষে সহায়ক হবে? তবে তারা স্বীকার করতো যে, যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও রণকৌশল নিশ্চয়ই জ্ঞান; তবে তা নিম্নমানের জ্ঞান।

ক্রীট ও স্পার্টাতে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এথেন্সবাসীরা এ ধরনের আইনের যথার্থতা বুঝতে চাইতো না। তাদের যুক্তি ছিল মদ্যপান করেও তো মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রণের মত মহৎ গুণ অর্জন করতে সমর্থ। অবশ্য তারাও স্বীকার করতো যে, মাদকদ্রব্যের ব্যবহার মানুষকে বিপথগামী করতে পারে। তাই তারা গোপনে বা পারিবারিক পরিবেশে মদ্যপানে সবাইকে বিরত রাখার পক্ষপাতি ছিল। অথচ জনসভা বা উন্মুক্ত মদের আসরে মদ্যপানকে বৈধ, এমনকি সুন্দর কাজ হিসেবে জানতো। তাই এথেন্সবাসী জনসম্মুখে মদের ব্যবহারকে আইনসম্মত রাখার পক্ষে জোরালো বক্তব্য পেশ করেছে। মদপানের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি মানব প্রকৃতি ও এর বিকাশ সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন এবং ইন্দ্রীয়জাত সুখকে বেশিসংখ্যক নাগরিকদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার কথা বলেন। মদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, মদ না হলে অভিজাতদের সভাসমিতি, গানের আসর, কবিতার মঞ্চ, এমনকি গুরু-গম্ভীর চিন্তাধর্মী

www.pathagar.com

আলোচনা জমে ওঠে না। এথেন্সবাসীদের কাছে তাই স্পার্টা ও ক্রীটের এসব সংযমী নিয়মনীতি তেমন একটা বোধগম্য ছিল না। অবশ্য এসব আইনের কারণেই স্পার্টা ও ক্রীটের শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এবং এথেন্সও তা প্রত্যক্ষ করেছিল।

এথেন্সবাসীরা যখন দেখত যে, স্পার্টা ও ক্রীটের লোকরাও গান-বাজনায় কম পারদর্শী নয়, তখন তারা বলত, এসব তো রণসঙ্গীত বা কোরাসগান, সঙ্গীতের শিখরে উঠার ক্ষমতা নাকি শুধু এথেন্সবাসীদেরই ছিল। ল'জ যেমন খুব কঠিন আইনের বাঁধন পছন্দ করেনি, তেমনি আইনকে বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দেয়াও সে পছন্দ করেনি। আইনকে এমন হতে হবে যে, সে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করবে, আবার তাদেরকে নিজের মত করে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনায় মানবীয় আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের উপায় উপকরণ ব্যবহার করতে দেবে। শোকাহত হয়ে মানুষ যেমন আত্মহত্যা করবে না, তেমনি আনন্দে সে আত্মহারাও হয়ে পড়বে না। আইনের অন্যতম কাজ হয়েছে, সকল অবস্থাতেই ব্যক্তি-মানুষ ও সামষ্টিকভাবে মানবগোষ্ঠীকে সম্মানজনক আচরণ করতে শেখাবে। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে প্লেটো তার ল'জ গ্রন্থে সত্যের বেশ কাছাকাছি চলে আসতে চেয়েছেন।

আলোচনাকারীদের পরবর্তী বিষয় ছিল কেন সরকার ও শাসনপ্রণালী পরিবর্তিত হয়? রাজনৈতিক জীবনের শুরু ও শেষ কোথায়? প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঠেকানো যায় না কেন? মানুষকে কি পাপ-পুণ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেয়া সম্ভব নয়? গ্রীকরা কোন জনপদের পাপকার্যকেই তার ধ্বংসের ও পরিবর্তনের জন্য দায়ী করেছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, শুরুতে বহু জনপদ পাপকার্য না করা সত্ত্বেও কেন ধ্বংসের শিকার হলো? এখানে প্লেটো স্বভাবতই আবার জ্ঞান ও গুণের অভাবকেই দায়ী করেছেন। এ জ্ঞান ও গুণের অভাবের জন্য তিনি শাসকশ্রেণীকে মুখ্যতঃ দায়ী করেছেন। কিন্তু স্পার্টানরা দাবি করতেন যে, আইন ও শাসক উভয়ের ভূমিকাকে তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে সংমিশ্রণ ঘটাতে পেরেছেন, যা এথেন্স পারছিল না। প্লেটো দেখাতে সচেষ্ট ছিলেন যে, এথেন্সের অনিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র এবং স্পার্টার সামরিক চরিত্র কোনটাই রাষ্ট্র ও আইন ব্যবস্থার সঠিক রূপের উপস্থিতিতে ঘোষণা করে না। তাই তিনি মিশ্র-আইনের সন্ধান করছিলেন।

প্লেটোর মতে, শাস্তির ভয় দেখিয়ে মানুষকে সৎপথে রাখার চেষ্টা করা ঠিক নয়। কারন প্রকৃতিগতভাবে মানুষ স্বাধীনচেতা। দাসকেই শুধু শাস্তির ভয় দেখিয়ে কাবু করা যায়। স্বাধীন মানুষ স্বেচ্ছায় আইন মানবে। মানুষ আইন মানবে কারণ, বুদ্ধির হিসেব,

www.pathagar.com

যুক্তির জোর, বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতার ভান্ডার সবই প্রমান করে যে, আইন মানুষের মঙ্গলের জন্যই দরকার। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আইন না মেনে মানুষ হীন-নীচ বা দুর্বল হতে চায় না আইনের সাহায্যে সে বড় ও শক্তিশালী হতে চায়। চায় তার সম্মান প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করতে। আর সে কারণেই আইন মানার সাথে বিধাতার বাণীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের একটা সম্পর্ক এসে যায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ ও আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনই সবচেয়ে প্রথম দরকার। তবেই সে মহাপুরুষ, নিজ বংশধর ও বাবা-মাকে সম্মান দেখাতে পারবে। "যে তার আত্মাকে চিনল না, সে তার খোদাকে চিনল না" - এ বাণীর সত্যতা এখানে ধরা দেয়। আইন তৈরি ও মেনে চলার সাথে সাথে জীবনে কার প্রতি কখন কিরূপ আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে, সে ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। সে কারণেই প্লেটোর ল'জ গ্রন্থের আলোচনা শুরু হয়েছে একজন স্রষ্টার অস্তিত্বের কথা নিয়ে। আত্মা আগে, না শরীর আগে, এ নিয়ে কঠিন বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন তিন আলোচক।

প্রশ্ন উঠেছে, যদি কেউ নিজেকে নাস্তিক দাবি করে তাহলে তার কি শাস্তি হবে। অতীতে নাস্তিকতার জন্য মৃত্যুদন্ডই একমাত্র যথার্থ শাস্তি বলে বিবেচিত হতো। প্লেটো বুঝাতে চাইলেন যে, অজ্ঞতার কারণেই মানুষ নিজকে নাস্তিক বলে দাবি করে। আর এ অজ্ঞতার জন্য সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকারই দায়ী, কাজেই নাস্তিকতার জন্য মৃত্যুদন্ড দেয়া ঠিক নয়।

"আইনের নগরীতে দেবতাদের প্রতি বিশ্বাস ততটুকুই দাবি করা হয়, যতটুকু বাহ্যত প্রদর্শনযোগ্য। যারা বাহ্যিক নিদর্শনাবলীতে একমত হতে পারে না, অথচ ন্যায়পরায়ণ মানুষ তাদের জন্য মৃত্যুদন্ডের ব্যবস্থা করা হবে না।"

অনেক ব্যাপারে প্লেটো ল'জ-এ নিজেকে মধ্যপন্থী করার চেষ্টা করেছেন। কি আইনের শাসনে, কি শাস্তির বিধানে, কি ধর্মভীরুতায় সর্বত্রই তাকে কট্টরপন্থী মতবাদ পরিহার করে বাস্তবধর্মী হতে দেখা যাচ্ছে। বিদেশ ভ্রমণের স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও তিনি বাস্তবধর্মী। তবে ব্যক্তিগত কাজে ও অপরিণত বয়সে বিদেশ ভ্রমণের বিপক্ষে তিনি মত প্রকাশ করেন। জ্ঞানী ও পঞ্চাশোর্ধ মানুষকে তিনি বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি দিয়েছেন ।আজকের আধুনিক পৃথিবীতে খুব কম লোকই এ নিয়মের যথার্থতা বুঝতে চাইবে। কিন্তু অতীতে গুপ্তচরবৃত্তি রোধকল্পে এবং বিদেশী সংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে দেশীয় কৃষ্টি ও সভ্যতাকে রক্ষাকল্পে অনেকেই এ ধরনের নীতির পক্ষে জোরালো

www.pathagar.com

সমর্থন যুগিয়েছেন। আমাদের দেশেও অপরিণত বয়সে বিদেশ গমনের সাথে অপসংস্কৃতির প্রভাব বৃদ্ধির একটি সংযোগ খুঁজে বের করা যায়।

আইনের পক্ষে ল'জ যত উদারই হোক না কেন, প্লেটো তার আদর্শ রাষ্ট্র, আদর্শরাজ্য, গুণ ও জ্ঞান এসব নীতি থেকে একেবারেই সরে দাঁড়ায়নি।

জীবন্ত জ্ঞানী মানুষের প্রজ্ঞার কোন বিকল্প তিনি শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাননি। আইনকে ঐ প্রজ্ঞার পরেই শুধু দ্বিতীয় স্থান দিতে তিনি সম্মত হয়েছেন।

ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যাপারেও প্লেটো তার মূল সুর থেকে বেশি দূর অগ্রসর হননি। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার স্বীকার করে তিনি বলেছেন যে, জমি কর্ষণ ও ফসল ফলানোর জন্য কৃষকদের হাতে জমি তুলে দেয়া যেতে পারে এই শর্তে যে, তারা ঐসব জমি কখনোই বিক্রি বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করবে না, 'অর্থাৎ' তাদের শুধু ভোগ দখলের অধিকার থাকবে। পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহে সমাজতান্ত্রিক আইন ও অর্থ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার প্রাক্কালে এ ধরণের নীতি গৃহীত হয়েছিল কট্টরপন্থী সমাজতন্ত্রী নীতির পরিবর্তে। অর্থাৎ পুর্বে সরকারী মালিকানায় থাকতো সব জমিজমা, পরে কৃষকদের কাছে জমি লিজ দিতে শুরু করলো সরকার উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে। অর্থাৎ মালিকানার অধিকার নয়, তাদের মৃত্যুর পর কি হবে ঐ জমির? উত্তরাধিকারসুত্রে কিভাবে ভাগাভাগি হবে? যদি তাই হয় তাহলে তো সাম্য নীতি নিয়ে আবার সমস্যায় পড়তে হবে। প্লেটো এজন্য একটি ফমূর্লা বাতিয়ে দিয়েছেন। ভোগদখলকারীর মৃত্যুর পর তার কোন এক ছেলেই আবার ঐ সম্পত্তির ভোগদখল শুরু করবে। বাকি ছেলেরা এমন সব পরিবারে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে, যেখানে হয় কোন ছেলের উত্তরাধিকার নেই বা থাকলেও তারা অন্যত্র চলে গেছে। যদি মেয়ে উত্তরাধিকারী একাধিক হয়, তবে সেক্ষেত্রেও একজনকেই উক্ত জমি বরাদ্দ করে একজন স্বামী নিয়ে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বাকি মেয়েরা এমনসব বর খুঁজে নেবে, যেখানে তাদের স্বামীরাই উত্তরাধিকারসূত্রে জমিজমা ও সহায়-সম্পত্তির ব্যাপারে সুবিধা ভোগ করবে না। ইসলাম শুধু ভোগদখলের প্রশ্নেই নয়, বরং মালিকানার প্রশ্নেও একজন মহিলাকে একই সাথে তার বাবা ও স্বামীর সম্পত্তিতে মালিকানার অধিকার দেয়। আবার ছেলেরাও পিতা ও স্ত্রীর মৃত্যুর পর উভয়ের সম্পত্তিতে মালিক হতে পারে। এ ধরনের নীতি প্লেটোর জানা বা বুঝার বাইরে ছিল।

www.pathagar.com

প্লেটোর কল্পিত ব্যবস্থায় একবার জমি সরকারীভাবে ভোগদখলের জন্য ভাগ্যভাগি হয়ে গেলে, তা আর জনগণ কোনভাবেই নতুন করে ভাগ করতে পারবে না। কিন্তু যদি এ ব্যবস্থায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কিছু মানুষ ভোগদখলের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, তখন কি হবে? প্লেটোর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থায় তেমনটি হওয়ার কথা নয়, কারণ প্রতিটি শিশুর জন্মই ঘটবে ঐ হিসাবের ভিত্তিতে যে,তার জন্য প্লট ফাঁকা আছে। প্রতিটি নগরের জন্ম ও মৃত্যুর হিসেবের উপর থাকবে সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ। আর মানুষ স্বেচ্ছায় বুদ্ধিমত্তার সাথে ঐ নিয়ন্ত্রণকে সফল করার সর্বাত্মক প্রচেষ্ট চালিয়ে যাবে। নগরীর মৃত্যু সংখ্যাই ঠিক করবে, কোন বছর কতজন শিশু ভূমিষ্ঠ হবে। শুধু তাই নয়, কোন্ কোন্ পরিবার সন্তান লাভ করবে, আর করবে না, তাও সরকারেরই জানা থাকবে। কারণ প্লেটো শুধুমাত্র 'উন্নত জাতের' মানুষের সংখ্যাই বৃদ্ধি করতে চেয়েছেন, আর 'নিম্ন জাতের' মানুষের সংখ্যা দারুণভাবে কমানোর পক্ষপাতী ছিলেন।

সমস্যা হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর যতই কড়াকড়ি করা হোক না কেন, তা কিছুটা হলেও অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় বেড়ে যাবেই। এ অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা সম্পর্কে রিপাবলিকে প্লেটো কঠোর ছিলেন।

কিন্তু ষ্টেটম্যান ও ল'জে এই অতিরিক্ত জনসংখ্যা হয় কম বসতিসম্পন্ন এলাকা বা রাষ্ট্রে প্রেরণ, অথবা সম্পূর্ণ নতুন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের ব্যবস্থা করতে বলেছেন।

প্লেটো জানতেন, শুধুমাত্র স্থাবর সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ এনেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বা দুর্নীতি রোধ করা যাবে না। যাবে না তার অবাধ্য সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠা করা। তাই সব ধরণের সম্পত্তির ব্যাপারেই তিনি কঠোর নীতিমালা প্রণয়ন করেন। রিপাবলিকেই তিনি উল্লেখ করেন "সর্বোত্তম রাষ্ট্রে স্ত্রী-পুত্র হবে যৌথ সম্পত্তি... কারোর জাগতিক কোন বিষয়-সম্পত্তি থাকতে পারবে না। তারা হবে যোদ্ধা এবং রাষ্ট্রের শাসক"।

কিন্তু পরবর্তীকালে যখন দেখলেন, এত বেশি গাণিতিক সাম্য বাস্তব জীবনে সম্ভব নয়, তখন তিনি বিত্তের বিবেচনায় বিভিন্ন ধরনের অবস্থাপন্ন নাগরিকের উপস্থিতি সহ্য করতে রাজি ছিলেন। সেক্ষেত্রে প্লেটোর নীতি ছিল অন্ততঃপক্ষে সবার কাছেই এমন পরিমাণ সহায়-সম্পদ পৌছাতে হবে. যাতে করে কাউকেই মানবেতর জীবনযাপন করতে না হয়। অন্যদিকে বিত্তবানদের উপর একটি সীমা নির্ধারণ করে দিতে হবে। ঐ সীমার উপর কেউ সম্পদ জমা করতে পারবে না।

www.pathagar.com

"দরিদ্রতম নাগরিকগণ যে সম্পত্তির মালিক, বিত্তবানদের কিছুতেই তার চারগুণ সম্পত্তির বেশি মালিক হতে দেয়া যাবে না।"

অর্থাৎ দরিদ্র ব্যক্তির সম্পত্তি সবচেয়ে ধণিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত একজনের সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগের কম হবে না। ধনীরা যদি কখনো আরো সম্পদের মালিক হতে চায়, তাতে বাধা নেই, তবে দরিদ্রের প্রতি বরাদ্দকৃত সম্পদের নিম্নসীমার উন্নতি ঘটাতে হবে। এখন দরিদ্র কাদেরকে ধরা হবে? যাদের জীবিকার জন্য সরকার এমন সুনির্দিষ্ট একটি জমি ভোগ করতে দিয়েছে, যে ভুমিখণ্ডের ভবিষ্যতে আর কোন বিভাজনের অনুমতি আইনে নেই। আজকের আধুনিক বিশ্বের বহু দেশেই বিরাট সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্য-সীমার নিচে বসবাস করে। যেমন বাংলাদেশের ৭৫% ভাগ মানুষই দারিদ্র সীমার নিচে, অর্থাৎ প্রতিদিন তার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালরির যোগান দেয়, এমন খাদ্য গ্রহণ করতে সে পারছে না; যদিও প্লেটোর সময়ে দারিদ্র-সীমা নির্ধারণের এ ধরনের কোন মাপকাঠি ছিল না। কিন্তু প্লেটোর আলোচনা দৃষ্টে মানুষ স্বাভাবিক অসুস্থতাজনিত কারণ ছাড়া যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে অসমর্থ, এমন মানুষকেই প্লেটো দরিদ্র ভাবতে চেয়েছন এবং তাদের অবস্থার উন্নতি কামনা করেছেন।

প্লেটোর দর্শনের সমালোচনা

প্লেটোর দর্শন ও তাঁর সমগ্র চিন্তা-ধারণার সঠিক সমালোচনার জন্য প্রথমে জানা দরকার তাঁর সময়কার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। তারপরই সম্ভব তাঁর প্রধান রচনাবলীর সঠিক মূল্যায়ন। অনেকেই প্লেটোর বিভিন্ন বিতর্কিত যুক্তিকে তাঁর সমগ্র চিন্তাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে সমালোচনা করেছেন। সে কারণেই কেউ তাঁকে কমিউনিষ্ট কেউ বা তাঁকে নাস্তিক পর্যন্ত বলার প্রয়াস পেয়েছেন। পরিবার, সম্পত্তি ও যৌন-জীবন সম্পর্কে তার সবচেয়ে বিতর্কিত ব্যাপারকে কেন্দ্র করে কেউ কেউ তাকে কুরুচিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

মূলতঃ প্লেটোর মূল সমস্যা হয়েছে তার মাত্রাতিরিক্ত আদর্শবাদী চিন্তা নিয়ে। তিনি রাষ্ট্র, শাসক, জ্ঞান ও গুণকে এমন এক আদর্শিক রূপে দেখতে চেয়েছেন যাতে রয়েছে ভাবাবেগ ও কল্পনার অতিশয্যা। মানুষের ভাল দিকসমূহের উন্নতির ব্যাপারে তিনি ছিলেন ভীষণ আশাবাদী। তাঁর কাছে মনে হয়েছে, মানুষকে সঠিক শিক্ষা দিতে পারলে তাকে সম্পূর্ণরূপে স্বার্থহীন ও লোভহীন করে গড়ে তোলা যায়। সঠিক অর্থে মানুষ নানা বিবেচনায় ফেরেশতার চেয়েও বেশি গুণে গুণান্বিত। অথচ স্বার্থপরতা,

www.pathagar.com

হিংসা-বিদ্বেষ, কাম-ক্রোধ, পরশ্রীকাতরতা, যুদ্ধবাজিতা ও ক্ষমতালিপসা সবই মানুষের সহজাত দুর্বলতা। এসব দুর্বলতা কঠিন সাধনা দ্বারা অনেকাংশে দূর করা যায়; কিন্তু এগুলোকে একেবারেই ধুয়ে-মুছে ফেলা সম্ভব নয়। মানব-প্রকৃতির এ স্বাভাবিক ব্যাপারটি বুঝতে প্লেটোর অনেক সময় চলে যায়। তাই তার প্রথম জীবনের লিখাসমূহে এ ব্যাপারে তার প্রজ্ঞা যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। পরিণত বয়সে অবশ্য তিনি মানব-প্রকৃতির অসম্পূর্ণতাকে স্বীকার করেছেন। আর তাই আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

সকল পরিস্থিতিতে একইরূপ আদর্শিক রাষ্ট্র ও শাসক কামনা করলেও সকল মানুষের জন্য তিনি একই ধরণের আদর্শিক মানদন্ড নির্ধারণ করতে চাননি। এজন্যও তিনি কঠোর সমালোচনার শিকার হয়েছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তার যুক্তি অত্যন্ত পরিস্কার। মানুষের চিন্তাজগত, বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমন্ডল, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাবলয় বহুলাংশে ঠিক করে দেয় তার আদর্শ বাস্তব অবস্থায় কিভাবে প্রতিফলিত হবে। এখানে সস্তা সাম্যের বুলি অনেক ক্ষেত্রেই নিরর্থক। সাম্যবাদী হিসেবে প্লেটোকে প্রশংসা ও সমালোচনা যেভাবেই করা হোক না কেন, তাকে মূলতঃ কখনো মাত্রাতিরিক্ত সাম্যবাদী, আবার কখনো অসাম্যবাদী বলে মনে হবে। রাষ্ট্রের একটা সামগ্রিক এককরূপ প্রথমে নিজ চিন্তায় ধারণ করতে না পারার কারণেই এরূপ হওয়া স্বাভাবিক। যেমন কোন মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত একটি জীবন্ত হাতিকে না দেখছে, ততক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র হাতির বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাল্পনিক বর্ণনায় হাতিটির চিত্র মনোজগতে বড্ড বেশি কুৎসিত মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবে তার বিশালতা নিয়ে হাতি কি সত্যিই কুৎসিত ? হাতির মাঝে অনেক সৌন্দর্য খুঁজে বের করা সম্ভব। তার স্বাভাবিক রাজকীয় চলাফেরা ও প্রকান্ড দেহ সগৌরবে তার বলিষ্ঠ উপস্থিতির কথা ঘোষণা করে। মূল সমস্যা হয়েছে, প্লেটো নিজে না দেখেছেন কোন আদর্শ রাষ্ট্র, না আমাদের কাউকে দেখিযে দিতে পেরেছেন এরূপ কোন রাষ্ট্রের সন্ধান।

তাছাড়া বাস্তবে এরূপ রাষ্ট্রলাভের সম্ভাবনাকে তিনি মোটেই উজ্জ্বল বলে প্রমাণ করতে পারেননি। আদর্শ রাষ্ট্রের প্রথম পরিকল্পনা অর্থাৎ রিপাবলিকের চিন্তার সাথে পরবর্তী গ্রন্থসমূহে তাঁর আপোষকামিতা তার রচনা-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করলেও, আদর্শ রাষ্ট্রের সঠিক স্বরূপ বুঝতে অনেক জটিলতার সৃষ্টি করেছে।

যেসব ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে - তার অন্যতম হচ্ছে শাসকদের নারীসঙ্গ লাভে কড়াকড়ির ব্যাপারটি। ব্যারাকে গিয়েও যেন শাসকরা নারীদের সাথে বেশিক্ষণ কাটাতে না পারে, সেদিকেও তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে বলেছেন। শাসন কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ যাতে সদাই গুরুগম্ভীর পরিবেশ পছন্দ করেন ও ভাবগাম্ভীর্য যেন

www.pathagar.com

তাদের নিত্যসঙ্গী হয়, সেজন্যই এ ব্যবস্থা। ইতিহাস সাক্ষী, পুরুষসুলভ নিজের সামান্য আবেগ-অনুভূতিকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে বহু শাসক তার নিজ জনগণের বা অন্য দেশের জনগণের বহু অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা ডেকে এনেছেন। এর কারণ হিসেবে অনেক সময়ই নেপথ্যে রয়েছে কোন নারীর প্রতি রাজা-বাদশার দুর্বলতা। এসব অবাঞ্ছিত প্রেমের কারণে বহু রাজ্যও ধ্বংস হয়েছে; আত্মাহুতি দিতে হয়েছে বহু নিরপরাধ মানুষকে। প্লেটোকে এ ব্যাপারটি ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। সমাধানের রাস্তা হয়তো তিনি ঠিকমত বাতিয়ে দিতে পারেননি। তবে সমস্যার গুরুত্ব আজো বিদ্যমান। তাই কিছু কিছু মনীষী রাষ্ট্রনায়কের একাকী জীবনযাপনকেই আদর্শ হিসেবে বেছে নিয়ে থাকেন। অনেকে আবার বেশি বয়সেই কেবল পরিণয়সূত্রে বাঁধা পড়েন।

প্লেটোর দর্শন, চিন্তা-চেতনা ও গ্রন্থসমূহের দুর্বলতা হয়তো অনেক আছে, আর এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এমন এক জায়গায়, যেখানে সাধারণ নশ্বরদেহী মানুষ সহজে উঠতে পারে বলে মনে হয় না। সক্রেটিসের প্রতি ছাত্র হিসেবে প্লেটো যে অসাধারণ ভক্তি, শ্রদ্ধা, আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা দেখিয়ে গেছেন, তা ইতিহাসে বিরল। তারপরও হয়তো ইতিহাসের পাতায় এ ধরণের ছাত্রের সন্ধান লাভ অসম্ভব নয়। কিন্তু এরিষ্টটলকে সৃষ্টি করে প্লেটো নিজেকে এমন একজন শিক্ষক হিসেবে হাজির করলেন যে, ইতিহাস যেন নির্বাক হয়ে কুর্নিশ করে বসলো তাঁকে। কেন প্লেটো তাঁর একাডেমিক দায়িত্ব এরিস্টটলকে দিলেন না? এর বহু ব্যাখ্যাই হতে পারে। এরিষ্টটল এথেন্সের নাগরিক ছিলেন না, এটিও হয়তো তার দায়িত্ব না পাওয়ার পেছনে একটি বড় যুক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। কিন্তু ইতিহাস বলছে, একাডেমির দায়িত্ব পেলে হয়তো এরিষ্টটল এত বড় দার্শনিক হতেই পারতেন না। তিনি একাডেমিতে বাঁধা পড়েননি বলেই সৃষ্টি হয়েছিল লাইসিয়াম। কোন ছোট শিশু যখন হাঁটতে বা সাঁতার কাটতে শিখে, তখন মাকে কখনো কখনো নিষ্ঠুর হতে দেখা যায়। হঠাৎ সময় মতো না ধরার জন্য সন্তান পড়ে ব্যথা পায়। কিন্তু এটি সন্তানের প্রতি মায়ের নিষ্ঠুরতার প্রমাণ নয়। প্লেটো সত্যিই তার সবচেয়ে আর্শীবাদপ্রাপ্ত ছাত্রটিকে দেখতে চেয়েছিলেন এমন এক পর্যায়ে যা হয়তো ঐ এরিষ্টটলও প্রথম জীবনে বুঝতেন না। জীবন সায়েহ্নে এরিষ্টটল বলেছেন, তিনি চান না যে এথেন্সবাসী আর একবার দর্শনশাস্ত্রের প্রতি বড় অপরাধ করুক। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি সত্যই প্রেটোর মাধ্যমে সক্রোটিসের সাথে আত্মিক-বন্দনে আবদ্ধ ছিলেন। যে বন্ধন শুধু পবিত্র নয়, বরং দীর্ঘস্থায়ী ইতিহাস সৃষ্টিতে সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্তুগত নিয়ামক।

www.pathagar.com

চুক্তি মতবাদ সম্পর্কে টমাস হবস

(১৫৮৮– ১৬৭৯)ঃ

স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে চুক্তিমতবাদের মধ্যমনি হচ্ছে মানুষ। মানুষ সম্পর্কে বে কেমন ধারণা পোষণ করেছেন, তার উপরই নির্ভর করেছে তার চুক্তি মতবাদের স্বরুপ। হবসের মতে, "Nature has made man no equal in the faculties of the body and mind; as that though there be found one man manifestly stronger in body or quicker in mind than another, yet when all is reckoned with together, the difference between man and man is not considerable"

"প্রকৃতি দৈহিক ও মনোগত দিক থেকে মানুষে মানুষে এতটা সাদৃশ্য করে রেখেছে যে, বাহ্যিকভাবে একজন মানুষকে শারীরিক বা মনের দিক থেকে শক্তিশালী মনে হলেও, যখন সকল মানুষকে কাছাকাছি এনে এক সঙ্গে তুলনা করা হয়, তখন তাদের মধ্যে পার্থক্য খুব সামান্যই হয়ে থাকে।"

এ কথা দিয়ে হবস কিন্তু মানুষের মাঝে বিভিন্ন ধরণের যোগ্যতার পার্থক্য অস্বীকার করতে চান নি। তিনি একজন স্বাভাবিক মানুষের সাথে অন্য আর একজন স্বাভাবিক মানুষের পার্থক্যকে খুব যৎসামান্য বলতে চেয়েছেন। তাছাড়া কারো হয়ত শারীরিক যোগ্যতা বেশী থাকতে পারে, কিন্তু তার মানসিক যোগ্যতা কমও হতে পারে। আবার অন্য একজনের যথেষ্ট পরিমাণ মানসিক যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শারীরিক যোগ্যতার কমতি থাকাটাও বিচিত্র কিছু নয়। কোন মানুষের সকল গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের বিচার বিশ্লেষণ দেখা যায় সঠিকভাবে মানুষের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার মাঝে বিরাট রকম কোন পার্থক্য নেই।

হব্‌স প্রকৃতিগত বা জন্মগতভাবে মানুষকে সমান ভাবলেও মানুষ যে তার অর্জিত ক্ষমতাবলে সহজেই নিজেদের মাঝে বিরাট তফাৎ সৃষ্টি করে, সে ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তার মতে, মানুষ ক্ষমতা অর্জন করেই শান্ত বা ক্ষান্ত হয়ে যায় না। বরং সব সময়েই তা হারানোর ভয় করে। আর তাই তার কল্পিত প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষ শুধু নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার কাজে লিপ্ত ছিল। প্রকৃতিক রাজ্য ছিল অরাজকতাপূর্ণ। প্রত্যেকেই সংঘাত ও সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। ক্ষমতা লিপ্সা ও অন্যের উপর কর্তৃত্ব বিস্তারের চেষ্টাই ছিল অবিরাম যুদ্ধ বিগ্রহের কারণ। ভয় ভীতি ছিল সকলের নিত্য সঙ্গী। প্রাকৃতিক রাজ্যে কেউ নিরাপদ ছিল না। সবাইকে সবাই শত্রু ভাবত। আইনও ন্যায় বিচার বলে কোন জিনিস ছিল না সেখানে। তার ভাষায়, মানুষের জীবন ছিল নিঃসঙ্গ, দরিদ্র, ঘৃণ্য, পশুবৎ ও ক্ষণস্থায়ী (Solitary Poor, nesty, brutish and short)

www.pathagar.com

প্রকৃতিক অবস্থার এ নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি থেকে মুক্ত পাওয়ার জন্য মানুষের প্রয়োজন ছিল সাধারণ কর্তৃপক্ষ ও নিয়ম কানুনের। হব্সের প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষের জীবন যখন খুবই দূর্বিষহ হয়ে পড়ে এবং কারো পক্ষেই যখন আর নির্বিঘ্নে জীবন যাপন করা সম্ভব ছিল না, তখন তারা সকলে মিলে একটি চুক্তি করে। চুক্তির মাধ্যমে তারা সকলের জন্য প্রযোজ্য একটি সাধারণ কর্তৃপক্ষ ও কিছু আইন কানুন সৃষ্টি করে। এ চুক্তি হওয়ার পূর্বে সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতার চূড়ান্ত ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিল। অথচ চুক্তির মাধ্যমে সবাই নিজ ক্ষমতা কোন ব্যক্তি বা পরিষদের হাতে ন্যস্ত করল। হব্সের ভাষায়, " I authorise and give up my right of governing myself to this man or to this assembly of men, on this condition that thou give up thy right to rim, and authorise all his actions in like manner."

" এই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে আমি আমার উপর শাসন করার ক্ষমতা ছেড়ে দিচ্ছি এ মতে যে, তুমিও একই শর্তে অনুরূপ ক্ষমতা তাকে বা তাদেরকে ছেড়ে দেবে।" হব্সের মতে যেইমাত্র এ ধরণের চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেল তখন থেকেই সকলেই একটি কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতা অর্পন করে তাকে মানতে বাধ্য হল। সকলের ক্ষমতা এক হাতে অর্পিত হয়ে সৃষ্টি করল সার্বভৌম শক্তির, যার আদেশ অপ্রতিরোধ্য ও চূড়ান্ত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, হব্সের সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনুসারে প্রাকৃতিক রাজ্য থেকে মানুষ রাজতন্ত্রে প্রবেশ করল। মানুষ যদিও ইচ্ছা করেই রাজতন্ত্রে প্রবেশ করল, কিন্তু ইচ্ছা করলেই সে আর এ থেকে বের হতে পারবে না। কারণ রাজতান্ত্রিক এ শক্তি একবার সকলের দ্বারা স্বীকৃত হয়ে যাওয়ার পর তার বিরোধিতা করার অধিকার জনগণ চিরতরে হারিয়ে ফেলে। এ চুক্তিই চূড়ান্ত ও শেষ বোঝাপড়া। অর্থাৎ নিরঙ্কুশ রাজতান্ত্রিক শক্তির অভ্যুদয় ঘটল। এ থেকে প্রস্থানের অর্থই হচ্ছে আবার নৈরাজ্যকর প্রাকৃতিক পরিবেশে ফিরে যাওয়া। মানুষ তাই তার খেয়ালখুশীমত তার নিজ জীবন ও সম্পত্তি ব্যবহার করার অধিকার রাজাকে দিয়ে নিশ্চিত হল যে রাজাই তাদের সকলের পক্ষ থেকে এ কাজ সমাধা করবে। সার্বভৌম শক্তি, রাজাও আইন সবই একটি মাত্র সামাজিক চুক্তির ফলশ্রুতি হয়ে দাঁড়ায় এ মতবাদ অনুসারে। সার্বভৌম শক্তির নির্দেশই রাজার নির্দেশ, আবার রাজার নির্দেশই আইন।

যে চুক্তির সাহায্যে সার্বভৌম শক্তির সৃষ্টি হল, রাজা সকল ক্ষমতার মালিক বনে গেল, সে কর্তৃপক্ষ কিন্তু হব্সের কল্পিত চুক্তির পক্ষে নয়। রাজা শুধু নিরঙ্কুশ ও চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হল। জনগণ নিরাপত্তা লাভের প্রতিদানে রাজাকে সব ক্ষমতার মালিক বানালো। এভাবেই প্রাকৃতিক রাজ্যের অনিশ্চয়তা থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে মানুষ স্বেচ্ছায় ভাল রাজা লাভ করল হব্সের মতে মানুষ যেহেতু স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হয়েই চুক্তি করে রাজার উদ্ভব ঘটায়, তাই রাজা তাদের জন্য খারাপ হতেই পারে না।

হব্সের সামাজিক চুক্তি অনুসারে মানুষ প্রথমে যেমন স্বেচ্ছায় সকল ক্ষমতা হারিয়ে সার্বভৌ

www.pathagar.com

শক্তির জন্য দেয় এবং ঠিক তেমনি পরে সার্বভৌম শক্তি চুক্তির অধীনে নয়, বরং স্বেচ্ছায় আবার আইন তৈরী করে জনগণকে অধিকার ফিরিয়ে দেয়। যতক্ষণ চুক্তি ছিল না ততক্ষণ জনগণের উপর কোন কার্যকর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল না। যেই চুক্তি সম্পাদিত হল, সঙ্গে সঙ্গেই সার্বজনীন ক্ষমতার উদ্ভব ঘটল। হব্‌সের মতে এ ধরণের সার্বজনীন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বেআইনী। আর রাজা বা সার্বভৌম শক্তি সকল আইনের উর্ধ্বে। তার কোন কাজই বেআইনী হয় না বা হতে পারে না। কারণ জনগণ পূর্বেই রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে সকল কার্যকলাপে অনুমোদন দিয়েছে। কাজেই চুক্তি রক্ষা করার দায়িত্ব জনগণের। বিনিময়ে তারা আত্মরক্ষার অধিকার পায়। তাও সরকার যন্ত্র যেভাবে চায় সেভাবেই নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হয়।

হব্‌সের সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচনাঃ হব্‌সের সামাজিক চুক্তি মতবাদ যে সকল সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে তাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্যঃ

(ক) হব্‌স নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছেন যে, মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একাকীত্ব, কলহপ্রিয়তা ও চূড়ান্ত স্বার্থপরতা। কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘাত ও সংঘর্ষই মানুষের জীবনের সকল কার্যকলাপের চালিকা শক্তি বলে হব্‌স একটি স্বতসিদ্ধ সিদ্ধান্ত দেন। মানব সভ্যতার ইতিহাস কিন্তু এ ধরণের কোন স্বতসিদ্ধ নিয়ম মেনে চলে না। মানুষের সকল দোষাবলী ও স্বার্থপরতা সত্বেও তার মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে সহযোগিতার মনোভাব। সহযোগিতার কারণেই মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়ে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। প্রাকৃতিক সকল প্রতিকূলতা ও দূর্যোগকে মোকাবিলার জন্য মানুষ আদি থেকেই এক সঙ্গে মিলে কাজ করার তাগিদ অনুভব করে। তাই সে প্রথমে নিজকে পারিবারিক ও গোত্রীয় বন্ধনে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছে। আদিতে পারিবারিক বন্ধন ও রক্তের সম্পর্কের টান এত প্রবল ছিল যে সকল মানুষই নিজ সত্বাকে এসব বাঁধণ থেকে আলাদা করে ভাবতে পারত না। এসব সম্পর্কের গভীরতা ও দৃঢ়তাই একদিকে নিজ নিজ গন্ডীতে সহযোগিতার ভাব তীব্র করেছে, অন্যদিকে বাইরের সাথে শত্রুতা ও মিত্রতার ক্ষেত্রে এসব সম্পর্কের প্রভাব প্রত্যক্ষ। পরবর্তীতে আন্তঃগোত্রীয় সন্ধি ও সহযোগিতাই মানব ছিল সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে তরান্বিত করেছে। কাজেই মানব প্রকৃতি সম্পর্কে হব্‌সের সিদ্ধান্ত চরম একদেশদর্শীতার দোষে দুষ্ট ও সমর্থনযোগ্য নয়।

(খ) হব্‌সের দৃষ্টিতে যেহেতু সকল মানুষই চরমভাবে শুধু স্বার্থপর, কাজেই হঠাৎ করে তারা চুক্তি করে নিজেদের সকল ক্ষমতা অন্য কারো কাছে অর্পন করবে, এমন চিন্তা অবাস্তব ও অযৌক্তিক। চরমভাবে স্বার্থপর মানুষ কিছুতেই সমষ্টিক স্বার্থের খাতিরে নিজ সামান্যতম স্বার্থও বিসর্জন দিতে রাজী হয় না। এটাই সাধারণভাবে সর্বক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। অথচ হব্‌সের সামাজিক চুক্তি অনুসারে মানুষ তার সকল সহায় সম্পদ ও ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে বিসর্জন দিয়েছিল। কাজেই এটা মানুষের প্রকৃতি বিরুদ্ধ কথা এবং বাস্তবে এমনটি ঘটার তেমন কোন সম্ভাবনাই নেই।

www.pathagar.com

(গ) হব্সের উল্লেখিত রাজতন্ত্র মূলতঃ একটি চরমতন্ত্র। সমাজের সকলের ক্ষমতা ও সহায় সম্পদ রাষ্ট্র শক্তি বা রাজার বেদীমূলে নিঃস্বার্থভাবে বিসর্জনের কথা বলা হচ্ছে। এতে অবশ্য হব্স একজন রাজার কথাও বলেছেন, আবার একটি ব্যক্তি পরিষদের (assembly of men) হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনার ও ইঙ্গিত দিয়েছেন। তার কল্পিত ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া ও এর ব্যবহার একদিকে যেমন রাজতন্ত্র সমর্থন করে, আবার অন্যদিকে এর বিরোধিতাও করে। কারণ ব্যক্তি পরিষদের শাসন ব্যবস্থায় রাজার নিরঙ্কুশ ও চূড়ান্ত ক্ষমতা কিভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব, সে ব্যাপারে হব্সের বক্তব্য মোটেই পরিষ্কার নয়।

(ঘ) সাধারণতঃ যে কোন চুক্তির জন্য দু'টি পক্ষের অস্তিত্ব ও সম্মতি একটি অপরিহার্য শর্ত। অথচ হক্সের কল্পিত সামাজিক চুক্তিতে প্রকৃতিক রাজ্যের সবাই মিলে শুধু একটিমাত্র পক্ষই সৃষ্টি করে। রাজা বা ব্যক্তি পরিষদের উপর এ চুক্তির কোন বাধ্য-বাধাকতামূলক শর্ত আরোপিত না হওয়ার কারণে এখানে দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। কাজেই একটি অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক চুক্তি।

(ঙ) হব্স রাজা বা শাসকবর্গ ও সার্বভৌম শক্তির মাঝে কোন পার্থক্য দেখান নি। তিনি রাষ্ট্র ও সরকারের মাঝে পার্থক্য নির্দেশ করতেও ব্যর্থ হয়েছিন। রাজশক্তির পতনকেই তিনি মূলত রাষ্ট্র-যন্ত্রের ধ্বংসের সামিল করেছেন। হব্সের দৃষ্টিতে রাজশক্তির পতন ঘটলেই মানুষ আবার নৈরাজ্যপূর্ণ প্রাকৃতিক রাজ্যে ফিরে যেত। কিন্তু ইতিহাস ভিন্ন কথা বলে। রাজা আসে, রাজা যায়। কিন্তু রাষ্ট্র ঠিকই থাকে। রাজশক্তি পতনের সাথে সার্বভৌম শক্তি ধ্বংসের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ সার্বভৌমশক্তির মালিক সরকার নয়। রাষ্ট্রই শুধু সার্বভৌম শক্তির প্রকৃত অধিকারী। রাষ্ট্রশক্তি থেকেই সরকার ক্ষমতা লাভ করে। রাষ্ট্রের শাসক বর্গের বিশ্বাসঘাতকতা বা জনবিরোধী কাজের জন্য তাদের ক্ষমতাচ্যুতি কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কাজেই হব্সের সার্বভৌমের ধারণাও এর প্রয়োগ সম্পর্কিত ধারণা সমর্থন করা যায় না।

(চ) হব্সের সামাজিক চুক্তি অনুসারে শাসকরা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়েই জনগণের অধিকার নির্দ্দিষ্ট করে দেয়। এ ব্যাপারে আইনের কোন অস্ত্রই জনগণের হাতে থাকবে না। শুধু নৈতিক কারণেই শাসকবর্গ জনগণকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সম্পত্তিতে তাদের ন্যায্য অধিকার দেবে, এমনটি আশা করা যায় না। তাছাড়া শাসকরা দাবী করবে যে তারা ক্ষমতা লাভ করেছে আইনের বলে এবং সে কারণেই আইনের বিরোধিতা করা যাবে না; বরং জনগণের কোন আইনগত অধিকার থাকবে না। এটি আইন ও নৈতিক এ দু'দিক থেকে সুবিচার নীতির পরিপন্থী। যদি সরকার বিরোধী কোন কাজ আইন বিরুদ্ধ হয়, তবে জনগণের স্বার্থ বিরোধী কোন সরকারী পদক্ষেপ ও সমভাবেই আইন বিরুদ্ধ হতে পারে। এটাই সুবিচারের কথা। অন্যথায় স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার পত্তন ঘটবে।

(ছ) মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে তার মানবিক অধিকারের স্বীকৃতি। অথচ হব্সের সামাজিক চুক্তিতে এ ধরণের কোন আইন স্বীকৃত অধিকারের উল্লেখ নেই। শুধু বলা

www.pathagar.com

হচ্ছে, তার নিরাপত্তাও আত্মরক্ষার দায়িত্ব রাজশক্তির। এতে করে রাজশক্তির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে। অথচ জনগনের পক্ষে তার কোন ওকালতি এখানে অনুপস্থিত।

জ) মূলতঃ ইংল্যান্ডের রাজার সাথে ঘনিষ্ট যোগযোগ রাখার কারণে একতরফাভাবে রাজতন্ত্রের পক্ষে কথা বলেছেন। উল্লেখ্য, তিনি ছিলেন রাজা দ্বিতীয় চার্লসের গৃহশিক্ষক। ১৬৪২ সালের গৃহযুদ্ধ ইংরেজরাজশক্তিকে দারুণভাবে দূর্বল করে দেয়। গৃহযুদ্ধ দ্বারা বিধ্বস্ত ইংরেজ সমাজে শান্তি ও আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন ছিল কঠোর আইনের শাসন। তাই হব্‌স ১৬৫১ সালে প্রকাশিত তার 'লেভিয়াথান' (Liviathan) বইতে রাজার হাত চরমভাবে শক্তিশালী করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। এ বইটিতে গৃহযুদ্ধের বিরুদ্ধে যেভাবে নিন্দা করা হয়েছে, ঠিক অনেকটা সে মেজাজের বশবতী হয়েই লেখক প্রাকৃতিক রাজ্যে এত বেশী বিষাদময় ও শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করেছেন। সতের শতকের ইংরেজ সমাজের বিশৃঙ্খল অবস্থার আলোকে সমগ্র মানব সভ্যতার ইতিহাস ও এর গোড়া পত্তনের রহস্য বিচার বিশ্লেষন করার কারণেই হব্‌সের রাষ্ট্র ও আইন দর্শন এত বেশী একদেশদর্শী ও চরমপন্থী আকার ধারণ করেছে।

www.pathagar.com

জন লক– ১৬৩২– ১৭০৪ (JOHN LOCKE)

এর সামাজিক চুক্তি মতবাদঃ হব্‌সের মত লকেরও ধারণা প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের উদ্ভব। কিন্তু প্রকৃতিক অবস্থার একটি ভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছেন জন লক। লকের মতে, প্রাকৃতিক অবস্থায়ও মানুষ বহু সদগুণের অধিকারী ছিল এবং ঐসব সদগুণের প্রতিফলন তাদের কার্যাবলীতে প্রতিনিয়তই দেখতে পাওয়া যেত। প্রকৃতিক অবস্থায়ও মানুষ বন্য,হিংস্র, হিংসাপরায়ন, অসামাজিক ছিল না। বরং সৃষ্টিগত কারণেই সে ছিল যুক্তিবাদী ও সামাজিক জীব। তাই তাদের মাঝে নৈতিক শৃঙ্খলা বজায় ছিল। মানুষের যুক্তিবাদী মন প্রকৃতিতে যেসব নিয়ম কানুন অবলোকন করত তার আলোকে মানুষ নিজ আচার আচরণকে সুন্দর করতে চাইত, মেনে চলত এক ধরণের প্রকৃতিক আইন, যা মানুষকে যুদ্ধোংদেহী হতে বারণ করত এবং শান্তিকামী হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করত। মানুষের মাঝে স্বাভাবজাত শান্তিকাম্িতা, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার ভাব প্রাকৃতিক অবস্থায় তাদেরকে যথেষ্ট পরিমান সুখী জীবন–যাপন করতে সাহায্য করে থাকবে।

লকের ভাষায়, " The state of nature has a law of nature to govern it, which obliges everyone; and reason, which is that law, teaches all mankind who will but consult it, that being all equal and independent, no one ought to harm another in his life health, liberty and possessions ------- And that all men may be restrained from invading others rights and from doing hurt to one another, and the law of nature be observed, which wills the peace and preservition of all mankind, the exceution of the law of nature is in that state, put into every man's hands whereby everyone has the right to punish the transgrassor of that law to such a degree as may hinder its violetion, "

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকৃতিক অবস্থা সম্পর্কে হব্‌স যে ধারণা দিয়েছিল, লক সে ধারণাকে শুধু প্রত্যাখানই করে নি; বরং ঠিক তার উল্টো চিত্র অংকন করেছেন।

লক যদিও প্রকৃতিক অবস্থা, প্রকৃতিক আইন ও মানুষের যুক্তিবাদী মনকে একই সুত্রে গেঁথেছিলেন এবং মানুষের প্রাকৃতিক আচরণকে আইনের সাথে যথেষ্ট সংযত ও সামঞ্জস্যশীল হিসেবে ব্যাখ্য দিয়েছেন; তবুও প্রাকৃতিক আইনের স্বরূপ ব্যাখ্যায় ও তার প্রয়োগে মানুষের মাঝে যথেষ্ট মত বিরোধের কথা তিনি বলেছেন। তার মতে, প্রকৃতিক আইনের বিভিন্ন দিক নিয়ে যতই মতপার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছিল, ততই এর কার্যকারীতা কমে যাচ্ছিল। এর প্রয়োগ হয়ে উঠেছিল বিভিন্নক্ষেত্রে বিতকির্ত। শুধুমাত্র নৈতিক নিয়ম–কানুন দ্বারাই মানুষের আচরণকে সংযত করা কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। তাই প্রয়োজন দেখা দিল অভিন্ন কতৃপক্ষের । সার্বজনীন কর্তৃপক্ষের প্রধান কাজই ছিল

www.pathagar.com

প্রকৃতিক আইনের সর্বজনস্বীকৃত ব্যাখ্যা প্রদান ও তার প্রযোগ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এ সার্বজনীনতা অভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও আইন কিভাবে জন্ম নিল?

লকের সূত্র অনুসারে মানুষ একে একে দু' টি চুক্তি সম্পাদণ করল। প্রথম চুক্তি দ্বারা মানুষ স্থির করল, তার প্রকৃতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে নাগরিক সমাজ (civil Socicty) সৃষ্টি করবে। অর্থাৎ রাষ্ট্র পূর্ব (prepolitieal) অবস্থা থেকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গোড়া পত্তন করবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, লক রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বের অবস্থাকে সমাজ পূর্ব (pre-social) ভাবেন নি। নাগরিক সমাজই লকের জন্য রাষ্ট্র। মানুষসমাজ বদ্ধভাবেই বাস করত। কিন্তু সবার কাছে গ্রহণীয় কোন কর্তৃপক্ষ ও আইন না থাকাতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অনুপস্থিত ছিল। কাজেই সবাই মিলেই চুক্তি করে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গোড়া পত্তন করল। কিন্তু রাষ্ট্র সৃষ্টির এ চুক্তি সম্পাদন করেই মানুষ দেখল যে, তাদের জন্য অন্য একটি চুক্তির সম্পাদন করেই মানুষ দেখল যে, তাদের জন্য অন্য একটি চুক্তির প্রয়োজন। দ্বিতীয় চুক্তির কাজ হলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারীর সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক নিধারণ করা। লকের মতে সমাজের সদস্যগণ রাজার নিকট এ শর্তে ক্ষমতা হস্তান্তর করল যে, রাজা তাদের সকলের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকারসহ প্রাকৃতিক আইন কর্তৃক স্বীকৃত সকল অধিকার সুষ্ঠভাবে সংরক্ষণ করবে। অর্থাৎ লকের মতে রাজা আদৌ নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিক ছিল না। তার ক্ষমতা ছিল শর্তাধীন। রাজাছিল চুক্তির এক পক্ষ। রাজা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করলে জনগণ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার রাখত। এমন কি রাজাকে উৎখাত করতেও পারতো। হবসের সার্বভৌম ধারণার প্রকৃতি ছিল সর্বাত্মকবাদী (totalitariam) অথচ লক রাজতন্ত্রকে সাংবিধানিক রূপ দিয়ে একে নিয়মতান্ত্রিক হিসেবে চিত্রিত করেছেন। অর্থৎ রাজার ক্ষমতা একটি সরকারী চুক্তির ফলশ্রুতি। চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করলে রাজা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তাকে অবশ্যই জনগনের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। রাজা যদি জবাবদিহি না করে বা সংশোধিত না হয়, তবে হয় চুক্তিটি রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু প্রথম চুক্তিটি অক্ষত থাকবে সব্যবস্থায়। সে কারণেই লক প্রথম চুক্তির নাম দিয়েছেন "আদি চুক্তি" (original Contract)। আদি চুক্তিকে আবার সামাজিক চুক্তি (Social Contract) বলা হয়ে থাবে। আদি চুক্তির বিরোধিতা করার ক্ষমতা কাকো নেই। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা উদ্ভব হওয়া পর আবার " প্রকৃতিক রাজ্যে" ফিরে যাওয়ার চেষ্টা বেআইনী।

লকের সামাজিক চুক্তির সমালোচনাঃ

(ক) লকের " আদিচুক্তি" অনেকটা হব্সের সামাজিক চুক্তির অনুরূপ। এ আদি চুক্তিটি কখনও কিভাবে সম্পাদিত হয়েছিল, এ ব্যাপারে লক অনেকটা নিরুত্তর। স্বতর্স্ফূতভাবে কোথাও সর্বসম্মতভাবে কোন প্রাথমিক সমাজে চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারটি অনেকাংশেই যুক্তি নির্ভর নয়। তাছাড়া লক নিজেই বলেছেন, " প্রাকৃতিক রাজ্যে" প্রাকৃতিক আইন নিয়ে বির্তক সৃষ্টি হওয়ার ফলশ্রুতি হচ্ছে এ আদি চুক্তি, যার মাধ্যমে সবাই মত দিয়েছিল রাষ্টে সৃষ্টিতে। কিন্তু একটি

www.pathagar.com

সমাজে একবার আইনের প্রকৃতি ও স্বরূপ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গেলে সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে ঐ ব্যাপারে একটি চুক্তি সম্পাদন রীতিমত অসম্ভব হয়ে পড়ে।

খ) লক প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষকে যতবেশী ভাল এবং মানুষকে প্রাকৃতিক আইনের নিষ্ঠাবান অনুসারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, বাস্তবেই কি আদি সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ তার পশুসুলভ প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য সমূহকে এতখানি অবদহিত রাখতে পেরেছিল? যদি সত্যি সত্যিই তাই পেয়ে থাকে তাহলে তো সে সমাজের প্রাকৃতিক আইন না মেনে নিজেরাই আইন সৃষ্টি করার কথা। কারণ মানুষের সক্রিয় হস্তক্ষেপ ছাড়া শুধুমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মে এত বেশী সুবিচার স্থাপন মানুষেরস্বভাব ধর্মের বিরোধী। আর তাই আইনের সৃষ্টি ও রক্ষনাবেক্ষণের পেছনে কোন না কোন মানবীয় কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি এত বেশী জরুরী। কিন্তু লক আদি চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে তেমন কোন আইন বা কর্তৃপক্ষের অস্তিত্বের কথা আমাদের বলেন নি।

গ) প্রাকৃতিক রাজ্যে লক মানুষকে যতবেশী খুশী ও যুক্তিবাদী হিসেবে চিত্রিত করেছেন, তাতে মনে হয় না, সামান্য কোন বির্তক বা মতভেদের কারণেই হঠাৎ করে তাড়া প্রাকৃতিক অবস্থার এত সুন্দর স্বাধীন জীবনের ইতি ঘটাতে এত দ্রুত রাজী হয়েছে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক রাজ্যে ও পরবর্তীতে রাষ্ট্রের গোড়া পত্তনে যুদ্ধ বিগ্রহ বা বল প্রয়োগের কোন তথ্যই যেন লক স্বীকার করতে চান নি। অথচ ঐতিহাসিকরা যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাসকে মানুষের ইতিহাসের মত সু-প্রাচীন বলে কনে করেন।

ঘ) লকের কল্পিত দ্বিতীয় চুক্তির সম্পাদন প্রক্রিয়া এত বেশী নির্ভেজাল যে এটিকে হব্‌সের চিত্রায়িত চুক্তির অনুরূপ বলেই মনে হয়। তবে লকের মতে, রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা তাকে উৎখাত করার ব্যাপারটিও চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল। কিন্তু বাস্তবে কি এটা সম্ভব যে আদি রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একজন ক্ষমতাধর রাজা তার প্রজাদেরকে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার বা তাকে উৎখাত করার অধিকার দেবে। মানব সভ্যতা সাক্ষী যে রাজারা নিজেদেরকে ক্ষমতায় বহাল রাখার জন্য বহু ধবংসযজ্ঞ ও নিষ্ঠুর ঘটনাবলী দিয়ে ইতিহাসের অনেক খানি জায়গা রক্তে রঞ্জিত করে রেখেছে। লকের বর্ণিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার গোড়া পত্তন ও এর কার্যাবলীতে বলপ্রয়োগের ব্যাপারটি একেবারেই উপেক্ষিত হয়েছে। অবশ্য মানুষ এবং প্রকৃতিক আইন ও এর প্রয়োগের ব্যাপারে লক যে সুন্দর ও খাঁটি ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন, তার সাথে বলপ্রয়োগ বা জোরপ্রয়োগের কোন স্থান করে দেয়া রীতিমত কষ্টকর। আর তাই লকের নিরবচ্ছিন্ন ও সুন্দর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার চিত্রটি তার আদর্শবাদীতা ও ভাববাদিতার বহিঃপ্রকাশ।

ঙ) লক হব্‌সের মত রাষ্ট্র ও সরকার এ দু' টি ধারণাকে এক করে দেখেন নি। তবে তার প্রস্তাবিত সরকার ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির যা শুধু মুলতঃ আধুনিকরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়ই সম্ভব। আদিতে কোন সরকার ব্যবস্থা কেন্দ্রের হাতে এত কম ক্ষমতা রেখে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার আশা পোষন করত না। আর করলেও তা দীর্ঘদিন স্থায়ী হতোনা।

www.pathagar.com

চ) লক সরকারী কার্যাবলীতে বিভাজন নীতির যে ধরণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষন দিয়েছেন তা খুবই আধুনিক। আদিতে কোন রাষ্ট্রই নির্বাহী ক্ষমতাকে এত বেশী সংকোচিত করতে রাজী ছিল না। শাসন বিভাগ অপর দুই ভাগের কার্যাবলীতে এত কম হস্তক্ষেপের ইতিহাস খুবই নবীন। আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের আলাদা সুস্পষ্ট অস্তিত্ব আইন শাস্ত্র ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ইতিহাসের একেবারেই শেষ অধ্যায়। সরকারী ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতিকে লক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি অতি আদি মতবাদ হিসেবে দেখেছেন। একথা সত্য যে, মতবাদ হিসেবে ক্ষমতা বিভাজন নীতির উদ্ভব অনেক আগে। এ্যারিষ্টটল নিজেই ক্ষমতা পৃথকীকরণ মতবাদের কথা উল্লেখ করেছেন। এ মতবাদ বাস্তবে কার্যকরী হতে সময় লেগেছে বহুকাল। এখন ও পৃথিবীর খুব কম দেশেই এ নীতি সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু লক যেন রাষ্ট্র পত্তনের সাথে সাথেই তিন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন নীতির প্রয়োগ আবিষ্কার করতে চেয়েছেন।

ছ) লকের "Two Treoties of Government" গ্রন্থই তার রাষ্ট্র সর্ম্পকিত মতাদর্শের ধারক। বইটিতে বহু তত্ত্ব কথা থাকলেও এসব তত্ত্ব বিশেষ সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, এমনটি বলা কঠিন। বইটিতে মূলত ১৬৮৮ সালের ইংরেজ রাষ্ট্রও সমাজ ব্যবস্থায় সূচীত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের নানা দিকের প্রতিফলন ঘটেছে, তিনি বিপ্লবকে অভিবাদন জানিয়েছেন, কিন্তু তিনি ছিলেন সাবধানী। অর্থাৎ বিপ্লবের আবেগ উচ্ছাস যাতে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থায় নেতিবাচক ভূমিকা পালন করতে না পারে, সে ব্যাপারে তিনি সজাগ ছিলেন। আর তাই ইংরেজ সমাজ ও সরকার এ দু'টির স্বার্থকে আলাদাভাবে বিচার করেছেন। সরকারের নৈতিক বৈধতা ও জোরের বৈধতার মাঝে তিনি স্পষ্ট রেখা টেনে দিতে চেয়েছিলেন। সরকারে যদি জনগণের স্বার্থরক্ষা করতে ব্যর্থ হয় বা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার মতে ঐ সরকার এর টিকে থাকার কোন অধিকার নেই। কিন্তু ১৬৮৮ সালে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থায় সূচিত উদার নৈতিক গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া ইংল্যান্ডের পূজিবাদী সমাজব্যবস্থার দ্রুত উন্মেষেরই একটি ফলশ্রুতি। সব সমাজেই অনুরূপ প্রক্রিয়ার সন্ধান খুঁজে পাওয়া কষ্টকর । লকের লেখনীতে যে কারণে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের উপর এতবেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তার উত্তর অন্য কোন রাষ্ট্রব্যবস্থায় খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা নিরর্থক। লক মূলতঃ তার সময়কার ইংরেজ সমাজ ও সরকার ব্যবস্থার জটিলতাকে সহজ-সরল রূপ দিয়ে প্রগতিপন্থী ও রক্ষণশীল এ দু' ধরণের ইংরেজদের মাঝে একটি সমঝোতার ভাব সৃষ্টিতে প্রয়াসী ছিলেন। তার প্রবর্তিত মতবাদ যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যাপকভাবে চালু হয়, সম্ভবতঃ তার মূলে ছিল তাঁর চিন্তাধারার বিভ্রান্তিকর সরলতা, যা সাধারণের জ্ঞানের উপর আবেদন সৃষ্টি করে। যেসব উদার চিন্তাধারা বিপ্লবের সাফল্যের পরেও টিকে গিয়েছিল, তা ধর্মীয় সহনশীলতা সম্পর্কিত লকের দর্শনের মূল সুরটি যথাথভাবে বহন করে এবং টেষ্ট এ্যাক্ট চালুকাথর দরুণ ক্যাথলিক ও ডিসেন্টারদের উপর আরোপিত রাজনৈতিক অযোগ্যতা সত্ত্বেও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে এ মতবাদ সত্যিকার শক্তিরূপে বিদ্যমান ছিল।" (সেবইন, পৃষ্ঠা ৬৩৮) লকের রাষ্ট্র চিন্তায় যে তার সময়কার ইংরেজ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সমর্থক প্রতিফলন ঘটেছিল, এ কথা

www.pathagar.com

সবজনবিদিত। কিন্তু সতের শতকে ইংরেজ সমাজের আলোকে রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের আলোকে সমগ্র ইতিহাস মূল্যায়ন করতে গিয়েই লক দারুণভাবে নিজ সৃষ্ট স্ব-বিরোধিতায় ভূগেছে।

যেমন তিনি একচেটিয়া অধিকারের কথা বলেছেন, যা তারই ব্যক্তি মানুষের অধিকার সম্পর্কিত মতবাদের পরিপন্থী। শুধু তাই নয়, চূড়ান্ত একচেটিয়া মালিকানা ব্যবস্থার অধীনে কিভাবে সাধারণ জনগণের সম্পত্তির উপর অধিকার বাস্তবে কার্যকরী রাখা যাবে, সে ব্যাপারেও লক কোন সদউত্তর দিতে পারেন নি। তার প্রস্তাবিত ব্যক্তি স্বাধীনতা, স্বাধীন-সম্মতি, সম্পত্তি অর্জন ও ভোগের ব্যাপারে ব্যক্তি মানুষের অখন্ড অধিকার বাস্তবে শুধু একজন পুঁজিপতির পক্ষেই ভোগ করা সম্ভব। সাধারণ অধিকাংশ মানুষের জন্য এরূপ স্বাধীনতা ও অধিকার নিতান্তই কল্পনাবিলাস।

www.pathagar.com

জ্যা জ্যাক রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদ

(Jear Jacques Rousseau-1712-1778)

রুশো অষ্টাদশ শতাব্দীর অবিসংবাদিত ফরাসী দার্শনিক। তার সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন ১৭৬২ সালে প্রকাশিত The Social Controct গ্রন্থে।

মানুষ সম্পর্কিত ধারণাঃ মানুষকে মূলতঃ তিনি সহজ, সরল, উত্তম ও সহানুভূতিশীল জীব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তার মতে মানুষ হিংসা, দ্বেষ ও প্রতিশোধ স্পৃহা নিয়ে জন্মায় না। কিন্তু সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জটিলতাই তাকে খারাপ গুণসম্পন্ন করে তোলে। রুশোর মতে মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন হলেও সমগ্র জীবন ধরেই সে শৃঙ্খলিত। এখানেই মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় স্ববিরোধিতা। মানুষ সম্পর্কে হব্‌সের ধারণার সাথে রুশো একমত নন। আদি থেকেই মানুষ কলহপ্রিয়,এ ধারণা রুশো প্রত্যাখাণ করলেও, লকের মত মানুষকে তিনি এতটা শান্তিপ্রিয়ও মনে করেন নি। মানুষের স্বাধীনতা ভোগের ইচ্ছা ও তার উপর আইনের শৃঙ্খল, এ দু'টোর প্রথমটিকে মানুষের সহজাত গুন, আর দ্বিতীয়টিকে বাস্তব ও নিষ্ঠুর জীবনের দাবী হিসেবে চিত্রিত করেছেন রুশো।

রাষ্ট্র পূর্ব সামাজিক অবস্থা সম্পর্কেঃ রুশো রাষ্ট্র পূর্ব মানব সমাজকে হব্‌সের সমাজ পূর্ব অবস্থার মত করে দেখেন নি। তিনি মানব সমাজকে খনই একেবার বর্বর পশুতূল্য ব্যবস্থার সামিল করেন নি।তার মতে মানুষ সৃষ্টির প্রথম দিকে প্রধানতঃ তার স্বজাতগুণাবলীর দ্বারা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে সমর্থ হয়েছিল। তখন মানুষের জীবন ছিল আনন্দঘন। সমাজ পূর্ব অবস্থা ও সমাজ উত্তর অবস্থার মাঝে রুশো আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখান নি। তার মতে সমাজ পূর্ব অবস্থার বৈচিত্রময় অনাবীল আনন্দের জীবন যাপন পদ্ধতি সমাজ ব্যবস্থার উত্তরণের সাথে সাথেই তিরোহিত হয়ে যায় নি। বরং পূর্বের অবস্থার গুনগত মানই শুধু পরিবর্তিত হয়েছে। "Discourses on the original of inequality" গ্রন্থে রুশো প্রাকৃতিক সমাজ, স্বাধীনতা ও সাধারণ কর্তৃপক্ষ সৃষ্টির ব্যাপার গুলোকে পরস্পরবিরোধী ভূমিকায় রেখে মূল্যায়ন করলেও, Social Contract গ্রন্থে এসবের মাঝে একটি সেতু বন্ধন স্থাপন করেন। রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে স্বাধীনতা ও সার্বজনীন কর্তৃত্বকে এক অখন্ডিতরূপে দেখার প্রয়াস চালান।

সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে রুশো ঃ রুশো মানুষকে স্বভাবতই ভাল বলে আখ্যায়িত করে মানুষের কলুষিত আচরণের কারণ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্টিত আনুষ্ঠানিক জীবন যাত্রা ও এর ধারক ও বাহকদের দায়ী করেন। তার "Emile" গ্রন্থে তিনি সমাজে প্রচলিত অন্যায় অবিচার সম্পর্কে স্পষ্টভাষী হয়ে উঠেন। যার ফলশ্রুতিতে তাকে ফ্রান্স ত্যাগ করে প্রায় ষোল বছর পলাতক অবস্থায়

www.pathagar.com

জীবন যাপন করতে হয়। যে চুক্তির কারণে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছিল বলে রুশোর ধারনা, তাতে ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থ পরসম্পর বিরোধী রূপে দেখা হয় নি, অথচ রুশোর চর্মচক্ষুতে দেখা রাষ্ট্রব্যবস্থা রাষ্ট্রের স্বার্থের নামে অধিকাংশ মানুষের স্বার্থ টিকিয়ে দিয়েছিল। রুশোর কল্পিত রাষ্ট্রে General wlill (সর্বসাধারণের ইচ্ছা) ও প্রত্যেক ব্যক্তিসত্ত্বার ইচ্ছাও স্বার্থ অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত থাকার কথা।

চুক্তি সম্পর্কে রুশোঃ রুশো লকের সাথে একমত নয় যে, রাষ্ট্র সৃষ্টির পেছনে পরপর দু' টি চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন পড়েছিল। আবার হব্‌সের সাথেও একমত নয় এ ব্যাপারে যে, চুক্তির মাধ্যমে জনগণ তাদের সকল ক্ষমতাও অধিকার বিসর্জন দিয়েছে রাজার দেবত্বে। রুশো নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রকে (absoalute Monarch) ঘৃনাভরে প্রত্যাখান করেছেন এবং একে চরম প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা হিসেবে চিত্রিত করেছেন। তবে রুশোর বিশ্বাস একটি মাত্র সামাজিক চুক্তির মাধ্যমেই রাষ্ট্রযন্ত্রটি আবির্ভূত হয়েছে এবং সভ্য মানুষ অধিকতর শান্তির আশায় চুক্তি করেই এ প্রতিষ্ঠানটির জন্ম দিয়েছে। সার্বোভৌম কোন শক্তির জন্ম দেয়াই যেন ছিল এ·চুক্তির অন্যমত লক্ষ্য। তবে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে নয়।

রাষ্ট্র সম্পর্কে রুশো ঃ রুশোর মতে সমাজ পূর্ব মানব সভ্যতার মানুষের জীবনে যথেষ্ট পরিমান ভারসাম্য ছিল। সেখানে অসাম্য ও ভেদাভেদের অভিশাপ থেকে মানুষ ছিল মুক্ত। কিন্তু প্রাকৃতিক দূর্যোগ, আবহাওয়ার বৈপরীত্য, জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং মানুষে মানুষে রুচি অভিরুচী আচার আচরণের পার্থক্য মানব জাতিকে রাষ্ট্রের যাতাকলে আবদ্ধ হতে বাধ্য করে। রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ভেঙে সম্পূর্ণরূপে নতুন ব্যবস্থা সৃষ্টির বিপক্ষে ছিলেন রুশো। তার মতে সমাজ বা রাষ্ট্র যত বিপ্লবের মত জিনিসের হুমকীর সম্মুখীন হবে, মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনার ক্ষমতা তার ততবেশী হবে। বিপ্লব ঘটানোর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে সমাজে বসবাসকারী মানুষের জন্য বহু অকল্যাণ অপেক্ষা করে বলে রুশো অভিমত ব্যক্ত করেন। তাই তিনি সংগঠিত সমাজ পূর্ব অবস্থাকে সমাজ উন্নয়নের পরবর্তী অবস্থার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর ও সাবলীল হিসেবে চিত্রায়িত করেছেন।

রুশোর চুক্তি মতবাদে যেসব সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছেঃ

ক) জন্মগতভাবে সত্যিকার অর্থেই সকল মানুষ স্বাধীন, কিন্তু রাষ্ট্রের অধীনে সবাই মূলতঃ ভৃত্য।

খ) ব্যক্তি মানুষকে নিয়েই যেহেতু সমাজ ও রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন, তাই সাধারণ ইচ্ছাই সকল অবস্থাতে চুড়ান্ত, ন্যায্য ও সঠিক, সাধারণ ইচ্ছায় (General will) কোন ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন প্রাধান্য থাকে না। কিন্তু সবার ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে।

গ) রুশো পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে বিপদজনক মনে করেছেন এবং সে কারণেই প্রত্যক্ষ গনতন্ত্রকে সমর্থন জানিয়েছেন। তার মতে আইন প্রনয়নের ক্ষমতা সাধারণ জনগোষ্টীর

www.pathagar.com

হাতে থাকা উচিত এবং তাহলেই শুধু আইনকে কল্যাণকর রাখা সম্ভব। আর এজন্য প্রত্যক্ষ গনতন্ত্রের কোন বিকল্প নেই।

ঘ) রুশো জনমাধারণের সমষ্টিক ইচ্ছাকে সার্বভৌম শক্তির আধার হিসেবে একে কোন অবস্থাতেই বিভাজন বা হস্তান্তর করা যায় না। বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। চুক্তির বলে সরকার যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে তা নিতান্তই অর্পিত ক্ষমতা (delegated power) অর্থাৎ সরকার জনগণের এজেন্সী ছাড়া আর কিছু নয়।

ঙ) ব্যক্তি যে স্বাধীনতা ভোগ করে, তা জনসমষ্টির সাধারণ ইচ্ছা বা সম্মতি কর্তৃক স্বীকৃত। জনগণের সাধারণ এ স্বীকৃত আইনের কাঠামোর মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাধীনতার গন্তী নির্ধারণ করে দেয়।

চ) রুশোর মতে, সরকার হচ্ছে শাসন ক্ষমতার অধিকারী। আর বিচার করার মালিক হচ্ছে সার্বভৌম শক্তি।

রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচনাঃ

রাষ্ট্র দর্শনের অনিশ্চয়তাঃ রুশোর রাষ্ট্রদর্শন কি ছিল, তা হলফ করে বলা মুশকিল। কখনও মনে হয়, তিনি উদারনৈতিক কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন; কিন্তু তাকে সর্বাত্মক বাদী হিসেবে আখ্যায়িত করার যথেষ্ট যুক্তি খুঁজে বেরকরা যায় তার লেখনীতে। বার্টান্ড রাসেলের মত মনীষী তার বিখ্যাত গ্রন্থ History of western philosophy (পশ্চিমা দর্শনের ইতিহাস) এ রুশোকে সর্বাত্মকবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছেন হিটলারের মত লোকদের সৃষ্টিতে রুশোর রাষ্ট্রদর্শনের অবদান অনেক । ঠিক একই যুক্তি ব্যবহার করে আলফ্রেড কবান, জে, এল, উলমনস্ ও এ, জি, পি, টেইলরের মত লেখকরাও রুশোর রাষ্ট্রদর্শনকে সর্বাত্মক বাদীতার দোষে দুষ্ট বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সাধারণ ইচ্ছাঃ রুশোর সাধারণ ইচ্ছা সৃষ্টির প্রক্রিয়ার কোন সুনির্দিষ্ট রূপনেই। রুশোর সামাজিক চুক্তি মতে ব্যক্তি হিসেবে মানুষ মননও নিজস্ব সত্ত্বাকে হস্তান্তরিত করে সাধারণ ইচ্ছার জন্ম দেয়। প্রতিটি মানুষের মনন শক্তির দু' টি দিক রয়েছে। বাস্তব মনন (Actual will) প্রকৃত মনন (Real will) প্রতিটি মানুষের বাস্তব মনন স্বার্থপরতা আত্ম-কেন্দ্রীকতা ও সংকীর্ণতার দোষে দুষ্ট হওয়া খুব স্বাভাবিক। ব্যক্তি সত্ত্বার আত্মরক্ষার জন্য ও এধরণের মননশীলতার ও প্রয়োজনও রয়েছে বৈকি। তাছাড়া প্রতিটি ব্যক্তি সত্ত্বাই আত্ম-দান্দ্বিকতাপূর্ণ। ব্যক্তির মননশীলতার এদিকই হয়ত থাকে দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু তাইবলে ব্যক্তি মননের অপরদিক। Real will কে অস্বীকার করার উপায় নেই। কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি মানুষের মাঝে প্রকৃত মননের ক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী ও সমগ্র মানব সভ্যতার চাকাকে গতিশীল রাখার পেছনে প্রভাব অপরিসীম। প্রকৃতি মনন যে সত্য উপলব্ধি করে

www.pathagar.com

তা ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে এবং স্থান কালের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত। তাই রুশো সাধারণ ইচ্ছাকে সমাজের একক ও অমোঘ বানী তুল্য মনে করেছেন। কিন্তু এ অমোঘ বানী যা সমাজের সবাই মেনে চলবে, কিভাবে সৃষ্টি হবে ও কার্যকর হবে, তার কোন সূত্র রুশো দিতে পারেন নি।

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে ঃ রুশোর মতে সাধারণ ইচ্ছাই মূলতঃ সার্বভৌমিকতারূপে আত্মপ্রকাশ করে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি যেহেতু স্থায়ী হস্তান্তরের অযোগ্যও অনড় এবং অবিভাজ্য; তাই রুশোর মতে সাধারণ ইচ্ছাকে ও এসব গুনে গুণান্বিত হতে হবে। আর এসব গুণ আর্জন করার জন্য সাধারণ ইচ্ছাকে সর্বদাই সঠিক ও ন্যায় নিষ্ঠ হতে হয়। আর রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির কাজ হল ঐ সাধারণ ইচ্ছার সংরক্ষণ। কাজেই রাষ্ট্রশক্তি ও সারণ ইচ্ছা উভয়কেই রুশো সকল ভুলের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এর কোনটাই ভুলের উর্ধ্বে নয়।

আইন সম্পর্কিত ধারণাঃ সাধারণ ইচ্ছা সার্বভৌম শক্তি আইনকে রুশো একই সূত্রে আবদ্ধ করতে চেয়েছেন এবং এটি করতে গিয়ে এক জটিল মতবাদের জন্ম দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও ব্যক্তি স্বাধীনতার মাঝে পূর্ণাঙ্গ সমন্বয় সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি, কিন্তু বাস্তবে আইনের পক্ষে সব কিছুই Absolute truth (পরিপূর্ণ সত্য) হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। আইন গতিশীল, তার পক্ষে অনড় হয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়।

বিপ্লব ও সমাজ বিবর্তন সম্পর্কে ঃ রুশোকে একই সঙ্গে বিপ্লবী ও রক্ষণশীল বলা চলে। সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ব্যাপারে তিনি যেন দারুন দ্বিধা দ্বন্ধে ভুগেছেন। রাষ্ট্রীয় শক্তির সাথে জনগণের বিরোধ ঘটলে ব্যাপরটি কিভাবে মীমাংসিত হবে, এটি রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আইন শাস্ত্রের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। রুশোর মত একজন দার্শনিকের কাছ থেকে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট অভিমত পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে রুশোর যেন কিছুটা নিষ্ঠা ধৈর্য্যের কমতি ছিল। ম্যাকাইভারের মতে, " এ নীতি বিরাটভাবে বিকশিত হবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু দূর্ভাগ্য বশতঃ রুশো ছিলেন অত্যন্ত অধৈর্য্য এবং এ নীতিকে তেমন আর বিকশিত করেন নি--- রুশো আদর্শ আর বাস্তবতার মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠাণ অসম্ভব প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। --- এবং এসব তার সামাজিক চুক্তিবাদ সমগ্র মতবাদের ত্রুটি সুস্পষ্ট করে তোলে।" (পৃষ্ঠা ৪০০-৪০১) রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদের সকল ত্রুটি ও দুর্বলতা সত্ত্বেও " জনসাধারণের ইচ্ছার " সাথে " আইনের আধ্যত্মসত্ত্বকে " তিনি যে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করার অকৃত্রিম ইচ্ছা পোষণ করেছেন, তাতে তাকে একজন গণতন্ত্রীমনা দার্শনিক বলে মনে করার সংগত কারণ রয়েছে। যদিও বাস্তবে সাধারণ ইচ্ছাকে আইনের বাস্তব উৎস মনে করা এক জিনিস আর, একে বাস্তবে রূপ দান করার মত কার্যকরী প্রক্রিয়া নির্দেশ করা ভিন্ন ব্যাপার। এখানেই রুশোর ব্যর্থতা যে, তিনিও এ ব্যাপারে কোন সঠিক প্রক্রিয়া বা সূত্রের সন্ধান দিতে পারেন নি। রাষ্ট্রের সকল নাগরিক কিভাবে আধুনিক একটি দেশে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সরাসরি ভূমিকা রাখবে এবং সময়মত আইন পরিবর্তন করে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা নস্যাৎ করে দেবে, সে ব্যাপারে রুশোর কোন নির্দেশনা নেই।

www.pathagar.com

হব্‌স, লক ও রুশের সামাজিক চুক্তি মতবাদের তুলনা

চুক্তি সম্পর্কিত প্রবক্তাদের গ্রুপ	চুক্তিপক্ষ ও প্রকৃতি	প্রাকৃতিক রাজ্যের প্রকৃতি	সার্বভৌমত্ব ও আইনের প্রকৃতি	সরকারের ধরণ	মতবাদের ধরণ
হব্‌স Leviathar	চুক্তির পক্ষ আদিম অধিবাসীদের সবাই । সবাই মিলে শুধু একটি পক্ষের জন্য দিয়েছে। সম্পূর্ণরূপে অধিকার সম্পন্ন।	জীবন ছিল নৈরাজ্য পূর্ণ দূর্বিষহ। মানুষ ছিল কলহ প্রিয় ও স্বার্থপর।	রাজার বা শাসকবৃন্দের নির্দেশই আইন। আইন ও সার্বভৌম শক্তির ধার করা সব কিছুর উর্ধ্বে। এমনকি তাদের সমালোচনা ও নিষিদ্ধ।	চরম ও নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র	মূলতঃ একান্তাবাদী চরম রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সমর্থক।
লক Two Treaties of civil Government	চুক্তির পক্ষ দুটি। চুক্তির সংখ্যাও দুটি। প্রথম চুক্তিটি সম্পাদিত হয় আদিম সমাজের সকলের মধ্যে। দ্বিতীয়টি শাসক ও শাসিতের মাঝে। আংশিক ভাবে। অধিকার সম্পর্ন।	জীবন ছিল অনাবিল আনন্দে ভরপুর। মানুষ ছিল নিঃস্বার্থ, পরোপকারী ও শান্তি প্রিয় সামাজিক জীব।	রাজনৈতিক বোঝাপড়াই আইন ও সার্বভৌম শক্তির অভ্যুদয় ঘটায়।	নিয়মতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক রাজতন্ত্র।	ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ ও গণতন্ত্রের সংমিশ্রণে উদারনৈতিক অথচ রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থক।

www.pathagar.com

হব্‌স, লক ও রুশের সামাজিক চুক্তি মতবাদের তুলনা

রুশো Social Contract	চুক্তি রাজা ও জনগণের মাঝেই সম্পাদিত হয়েছিল। উভয় পক্ষের অধিকার সংরক্ষিত।	প্রথমে প্রাকৃতিক রাজ্যের জীবন ছিল মনোরম, শান্তিপ্রিয় ও আনন্দঘন। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অভাব অভিযোগ প্রাকৃতিক রাজ্যের জীবন বেশ খানিকটা কষ্টকর করে তোলে। মানুষ জন্মগতভাবে মুক্ত ও ভাল, কিন্তু জীবন মানুষকে খারাপ ও বন্দী করে তোলে।	জনগনের সাধারণ ইচ্ছার ভিন্ন নামই হচ্ছে আইন ও রাষ্ট্রীয় শক্তি জনগণের সাধারণ ইচ্ছাতেই সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের প্রতিফলন ঘটে। তাই আইনও সর্বদাই সঠিক ও নির্ভুল হতে বাধ্য।	গণতান্ত্রিক তবে প্রতিনিধিত্ব মূলক নয়; প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা।	জনগণের নিঃশর্ত সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী। জনগণই আইনের একমাত্র স্রষ্টা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পুরাতন পুরুষের প্রস্থানের ব্যাপারে মেয়েদের সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। ছেলেরা ছিল আজ্ঞাবাহী মাত্র। সবচেয়ে প্রবীন কর্তা মার স্বামীরাই যে কেবল তার অধীন ছিল এমন নয় বরং তার মেয়েদের স্বামীরা ও তার প্রতি সাধারণ আনুগত্য প্রদর্শন করত। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, প্রধাণ কর্তা-মার ছেলেরা যেত কোথায়? মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তারা অন্য পরিবারের মেয়েদের অধীনস্থ হয়ে পড়ত। ছেলেদেরকে মায়ের অধীন থাকার কথাটা চিন্তা করা হয়ত সহজ, কিন্তু একবার মায়ের অধীন থেকে বের করে আবার নতুন আর এক মহিলার বশে আনার ব্যাপাটি একটু জটিল। তার চেয়েও জটিল ছিল প্রধান কর্তা মার-মারা যাওয়ার পর তার স্বামীদের অবস্থান নিয়ে। তাদেরকে হয় আগে ভাগেই বিদায় দিতে হত, নতুবা তাদেরকে নতুন কর্তা মর হাতে সোর্পদ করা হতো।

এ মতবাদের প্রবক্তা ম্যাকলিনাম, মর্গান ও জেংকসের মতে এ সমস্ত জটিলতার কারণে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ধীরে ধীরে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে রূপান্তরিত হল। অনেকে আবার ভিন্ন মত পোষন করে বলেছেন, মাতৃতান্ত্রিক সামাজিক সংগঠন থেকে রাষ্ট্র উৎপত্তি হওয়ার পরই পুরুষরা নানা ফন্দি ফিকির ও কৌশলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করে নেয়।

পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ গুলোর সমালোচনাঃ

ক) আত্মীয়তা, গোত্রীয় সম্পর্ক ও রক্তীয় সম্পর্কের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা বাস্তবে খুবই কম। পরিবার মনূষ্য সমাজের সবচেয়ে আদি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তাই বলে এ প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্র সৃষ্টির দায়িত্ব নিতে হয়েছে, এমন কোন কথা নেই। তাছাড়া স্বেচ্ছা প্রনোদিত হয়ে পরিবার গঠন ও আইন সৃষ্ট রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া করা হতে পারে না।

খ) এ মতবাদ দু'টিতে রাষ্ট্র উদ্ভবের অতি গুরুত্বপূর্ন উপাদান সমুহকে অস্বীকার করা হয়েছে, অথচ রাষ্ট্রের উৎপত্তির পেছণে মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বহু ক্রিয়াকলাপের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বূমিকা রয়েছে।

গ) এ মতবাদগুলো পারিবারিক আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর যুক্তি পেশ করছে। পারিবারিক ব্যবস্থা শুধু নারী ও পুরুষের মাঝে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার এক নিরবচ্ছিন্ন সংঘর্ষয় ইতিহাসের ফলশ্রুতি, এমণটি বিশ্বাস করা দুরূহ। পরিবার প্রতিষ্ঠার পূর্বেও পরে নারী-পুরুষরা শুধু একে অপরকে করায়ত্ত বা বশীভূত করার আপ্রাণ চেষ্টায় লিপ্ত ছিল, এমন যুক্তি বাস্তবসম্মত নয়। কারণ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষ পারিবারিক বন্ধনের ভেতর আত্মার প্রশান্তি খোঁজে, সস্তি দিতে চায় তার শরীর ও মনকে। এখানে কৃত্রিমতা অচল; ফাঁকীবাজি, জোর জাবরদস্থি শুধু অকল্যানই বয়ে আনে। পারিবারিক জীবনকে করে তোলে দূর্বিষহ, আর একে অপরকে জোর জবরদস্থি ও বেকায়দায় ফেলে পরিবার সৃষ্টি করে, তাকে সম্প্রসারিত করে রাষ্ট্র সৃষ্টি করা একেবারেই অমূলক চিন্তা, নিছক কল্পনাবিলাস।

ঘ) মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রায় হয়তবা কোথাও না কোথাও পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক পারিবারিক ব্যবস্থার সন্ধান লাভ করা অসম্ভব না ও হতে পারে। কিন্তু এটিকে সর্বজনীন রূপ দিয়ে রাষ্ট্রের

www.pathagar.com

উৎপত্তির ইতিহাসের সাথে সংযুক্ত করা অনেকাংশেই হাস্যকর, পরিবারের ভেতরে দায়িত্ব বন্টনের ব্যাপারটি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব গ্রহণ ও প্রয়োগের বিষয়টির মাঝে মৌলিক নীতিগত পার্থক্য রয়েছে। পারিবারিক ব্যবস্থায় শ্রমবিভাগ ও দায়িত্ব বন্টন নিতান্তই একটি নৈতিক ও ইচ্ছাধীন ব্যাপার, আর রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা সর্বজনবিদিত। কাজেই পারিবারিক কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মাঝে গোড়া থেকেই দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য সুস্পষ্ট।

ঙ) পরিবারকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন , এ দাবীর সত্যতাও আপেক্ষিক। কারণ আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা এত বিকশিত রূপ লাভ করা সত্ত্বেও পারিবারিক ব্যবস্থাকে যথেষ্ট শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। বরং রাষ্ট্রের জৌলুস অতিমাত্রায় বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবারিক বন্ধন ক্ষনভঙ্গুর হয়ে পড়েছে। এতে বুঝা যায়, পারিবার ও রাষ্ট্র এ দু' টি সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের মূল ভিত্তিই আলাদা, একটির ভিত্তির মজবুতীর সঙ্গে অন্যটির মজবুতীর তেমন কোন প্রত্যাক্ষ যোগাযোগ নেই।

চ) এ মতবাদগুলোতে মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষকে খন্ডিত করা হয়েছে। সৃষ্টির রহস্য আমাদের বলে নারী পুরুষ মিলেই মানুষের সার্থকতা। এর ভেতর লুকিয়ে রয়েছে এক বিশাল রহস্যময় জগত। নারীকে খাটো করতে গেলেও পুরুষের বিপদ, আর পুরুষকে খাটো করতে গেলে নারীর জীবন অর্থহীন। জীবনকে অর্থবহ করার পেছনে নারী পুরুষ কার ভূমিকা বেশী জরুরী, এটি একটি অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক। অন্ততপক্ষে এটি একটি গৌণ ব্যাপার। মূখ্য ব্যাপার হচ্ছে, সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য উভয়ের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কাজেই রাষ্ট্রের উৎপত্তির পেছনে নর নারীর মধ্যে কার ভূমিকা বেশী ছিল, এ টি,ও গৌণ ব্যাপার। মুখ্য ব্যাপার হচ্ছে, উভয়ের অবদানই রয়েছে রাষ্ট্রের উৎপত্তির পেছনে।

ছ) পুরুষরা স্বার্থপর, আর মেয়েরাই শুধু পারিবারিক কীবণের গোড়াপত্তন করেছেন মাতৃত্বের মত মহান কর্মসাধণের জন্য বা পুরূষরা ক্ষমতা ও অর্থের লোভ দেখিয়েই কেবল নারীদের উদ্বুদ্ধ করেছে তাদের সাথে বাসা বাঁধতে, এ ধরণের ধারণাগুলো একদেশদর্শীতার দোষে দুষ্ট। এ ধরণের মতবাদে নারীত্ব ও পুরূষত্ব দু' যের জন্য রয়েছে অবমাননাকর ও বিভ্রান্তকর যুক্তি।

জ) এ মতবাদগুলো দু' টিদিক থেকেই চরম নীতির কথা বলে, একদিকে শুধুমাত্র আত্মীয়তার মত একটি মানবিক বন্ধনকেই অতিমাত্রয় গুরুত্ব দেয় রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ হিসেবে। অন্যদিকে ঐ বন্ধনের একটি পক্ষকেই দিয়ে দিতে চায় সকল কৃতিত্ব, আর অন্য পক্ষের অবদানকে করে উপেক্ষিত। কাজেই এ মতবাদগুলোর প্রবক্তাগণ যে কারণটিকে রাষ্ট্রের উৎপত্তির পেছনে একমাত্র কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে, তাকেও আবার খন্ডিত করে ফেলেছে। অর্থাৎ এ মতবাদগুলোর ভিত্তি বড়ই সরু ও দূর্বল। যার উপর নির্ভর করে রাষ্ট্র সৃষ্টির কোন শক্তিশালী মতবাদ গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে অষ্টিনীয় মতবাদ
(Austin's theory of sovereignty)

ইংরেজ আইনবিজ্ঞানী জন অস্টিনের বিখ্যাত বইদু'টি 'Lectures on Jurisprudence' এবং 'Province of Jurisprudence' প্রকাশিত হয় ১৮৩২ সালে। এদিক থেকে তাঁর মতাদর্শের জন্মকাল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ। তাঁর বই দু'টি যখন প্রকাশিত হয়, তখন তাঁর সয়স ৪২ বছর। অর্থাৎ যখন তিনি বই দুটি রচনায় নিয়োজিত ছিলেন তাঁর বয়স আরো কম ছিল। ত্রিশের কোঠায় একজন মানুষ যেসমস্ত মতাদর্শ দাঁড় করান, তাতে সাধারণত তার নিজের দেখা সমাজ ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া থাকে স্পষ্টভাবে। বিন্নভাবে বলতে গেলে নিজ দেশীয় ও ভৌগোলিক সীমারেখার পরিবেশ–পরিস্থিতির ছাপ থাকে অধিকতর গভীর। তা সত্ত্বেও সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে অস্টিনীয় মতবাদ যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বিশেষ করে এককালের বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহে অস্টিনীয় মতবাদ তাত্ত্বিকভাবে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। 'Lectures on Jurisprudence' গ্রন্থে তিনি বলেনঃ If a determinate human superior, not in the habit of obedience, to a like superior, receives habitual obedience, from the bulk of given society, that determinate human superior is the sovereign and that society (including the superior) is a society political and independent.

"যদি কোন সুনির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষ অন্যকোন অনুরূপ কর্তৃপক্ষের বশ্যতা স্বীকারে অভ্যস্ত না হয়ে সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির রীতিগত আনুগত্য লাভ করে, তাহলে সেই সুনির্দিষ্ট কর্তপক্ষ ঐ সমাজের সার্কভৌম শক্তি হবে এবং উক্ত কর্তৃপক্ষসহ ঐ সমাজকে রাজনৈতিকভাবে গঠিত ও স্বাধীন সমাজ বলা হবে।"

এ উক্তিটিকে আমরা অস্টিনীয় মতবাদের ভিত্তিও বলতে পারি। তবে সামগ্রীকভাবে সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে অস্টিনের মূল বক্তব্যের বিশিষ্ট দিক গুলো এভাবে সাজানো যেতে পারে ঃ

ক) সার্বভৌম কোন নির্দিস্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হাতে ন্যস্ত থাকে। অর্থাৎ সার্বভৌমি শক্তির অধিকারী থাকবে কোন সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ। সেই সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষই হবে সকল ক্ষমতার চূড়ান্ত উৎস। অর্থাৎ জনগণের সাধারণ ইচ্ছা, নির্বাচকমণ্ডলী বা ঈশ্বর কেউ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের মালিক নন। ভিন্নভাবে বলতে গেলে অস্টিন, অলীক বা সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা যায় না, এমন কোন সত্তা বা গোষ্ঠীর কাছে সার্ব ভৌমত্ব থাকতে পারে বলে বিশ্বাস করেন না।

খ) আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় সকল ক্ষেত্রেই সার্বভৌম শক্তি সম্পূর্ণ অবিভাজ্য ও অফুরন্ত। সাবৃভৌ শক্তি অপ্রতিরোধ্য, তাকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে না।

www.pathagar.com

গ) চূড়ান্ত সার্বভৌমত্ববিহীন সমাজকে রাষ্ট্র নামে আখ্যায়িত করা যায় না। ঘ) সার্বভৌমত্বের নির্দেশই আইন। সার্বভৌম শক্তিই শুধু আইন তৈরি করতে সমর্থ। তার নির্দেশ বা আইন লংঘন করলে শাস্তি অনিবার্য।

ঙ) রাষ্ট্রের ভেতরে কেউ সার্বভৌম শক্তির অধিকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সমকক্ষ নয়। তাকে নির্দেশ দিতে পারে না, সেই সবাইকে নির্দেশ দেয়।

চ) সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিটিই সার্বভৌমত্বের অধিকারী।

ছ) সার্বভৌম ক্ষমতাই ভাগাভাগি করতে গেলে তা আর সর্বপরিব্যাপ্ত ও অপরিসীম থাকে না। জনগণ অবশ্য অভ্যাসবশতই সার্বভৌম শক্তির নির্দেশ মানে।

অস্টিনের মার্বভৌমত্বের সমালোচনাঃ

অস্টিন সার্বভৌমত্বের যে মতবাদ পেশ করেছেন, যথেষ্ট প্রচার ও প্রসার সত্ত্বেও তা বেশ কিছু মৌলিক দুর্বলতায় ভুগছে। এসব মৌলিক দুর্বলতার কারণে মতবাদটি বিপুল সমালোচনার সম্মুখীন।

জনগণের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করেঃ অস্টিনের মতবাদ গণতন্ত্র বিরোধী। রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' (General will) মতবাদকে যেখানে আধুনিক ইউরোপ এতো সাদরে গ্রহণ করেচে, সেখানেঅস্টিন কার্যতঃ গণতন্ত্র বিরোধী মতবাদ দাঁড় করিয়েছেন। অস্টিনের মতবাদ জনগণের সার্বভৌমত্ব (Popular sovereignty) কে শুধু উপেক্ষাই করেনি, এর বিরোধিতা করেছে সর্বতোভাবে। অঢস্টনীয় সার্বভৌমত্বের অধিকারীদের স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক।

জনমত ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অস্বীকার করেঃ এমতবাদ জনমত ও রাজনৈতিক স্বাদীনতার দাবী উপেক্ষা করে। অস্টিন সার্বভৌম-ব্যক্তিকে এমন ভাবে চিত্রায়িত করেছেন যে, তার জন্য জনমত ও নির্বাচকমণ্ডলী যেন কোনই মূল্য বহণ করে না। রাজনৈতিক কোন অধিকার বা দাবীকে তোয়াক্কা করার কোনই প্রয়োজন যেন তার নেই। অথচ একটি দেশের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব আজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বই মূলতঃ আইনগত সার্বভৌমত্বের ধারক ও রক্ষাকবচ। অথচ জনমত, নির্বাচন, রাজনৈতি স্বাধীনতা অস্টিনের মতবাদের জন্য কোনই মূল্য বহন করে না।

আইন সার্বভৌমত্বের নির্দেশ নয়ঃ আইনকে কেবলমাত্র নির্দেশ বা আদেশের তুল্য হিসেবে চিহ্নিত করা নানা দিক থেকে বিভ্রান্তিকর। প্রথমতঃ আইন মানেই যে নির্দেশ হবে, এমন কোন কথা নেই। যেমন বহু আইন আছে যা নিজে কোন নির্দেশ দেয় না, কিন্তু বহু নির্দেশের জন্ম দেয়। আবার কিছু আইন শুধু কিছু নিয়ম-নীতি বেঁধে দেয়। যেমন সাংবিধানিক আইনের বিরাট অংশই নীতিমালা সংক্রান্ত। আদেশ বা নিষেধ সংক্রান্ত আইন সংবিধানে খুবই ছোট স্থান দখল করে।

www.pathagar.com

(আইন শুধু সার্বভৌমত্বের নির্দেশ, এ অর্থে প্রথাগত আইন, প্রশাসনিক আইন, ধর্মীয় আইন ও আন্তর্জাতিক আইন কোনটাই আইনের মর্যাদা পেতে পারে না। সার্বভৌমত্বের নির্দেশ বলে হয়তো বহু প্রচলিত আইন বাতিল করা যায়, আবার বহু প্রচলিত বিধি বিধানকে আইনের মর্যাদা দেয়া যায়। আই বাতিলের ব্যাপারটিকে হয়তো আদেশের সঙ্গে এক করে দেখা যেতে পারে, কিন্তু প্রচলিত বিধি বিধানকে স্বীকৃতি দান কোন ক্রমেই আদেশ তুল্য হতে পারে না। সার্বভৌম শক্তি বহু প্রচলিত বিধি বিধানকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। সমাজে প্রচলিত বহু নিয়ম কানুন, যা বিভিন্ন মানবিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ বা নির্ধারণ করে, যার প্রতি সার্বভৌম শক্তি কোনভাবেই তার বক্তব্য পেশ করে না, অথচ ঐসব নিয়ম কানুন এমনকি বিচারালয় কর্তৃক স্বীকৃত হয়েও আইনের মর্যাদা লাভ করে থাকে। আইনের উৎপত্তির ব্যাপারে সার্বভৌম শক্তির উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ অস্টিনের সার্বভৌমত্বের ও আইন সম্পর্কিত ধারণাকে খুবই সীমিত পরিসরে আবদ্ধ করেছে। এ ধারণের সীমিত অর্থে আইন ও সার্বভৌমত্বের ব্যবহার বাস্তবতা বিবর্জিত।

অন্যান্য সংঘের গুরুত্ব অস্বীকার করে ঃ রাষ্ট্রের ভেতরে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান বা সংঘ থাকে। রাষ্ট্রীয় আইন কাঠামোর ভেতর থেকেই এসব সংঘ নিজেদের কর্মতাৎপরতা চালিয়ে থাকে। মূলতঃ এসব সংঘ নিজেদের জন্য যেসব আচরণ বিধি তৈরি করে, তা ঐসব সংঘের সদস্যদের জন্য আইনের ভূমিকা পালন করে এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের এতে কোন প্রত্যক্ষ হাত নেই। আধুনিক রাষ্ট্রের ভেতরে নানাবিধ সংঘের কল্যাণমূলক কার্যাবলী রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের প্রকৃতির উপর যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। সার্বভৌমত্বের প্রকৃতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এসব সংঘের ভূমিকা অস্টিন বেমালুম অস্বীকার করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্তায় অস্টিনীয় সার্বভৌমত্বের সন্ধান এ কেবারেই মেলে নাঃ অস্টিনের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্ব কোন না কোন ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকে, কিন্তু কোন যুক্তারাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতেই এমন কোন ব্যক্তি পাওয়া যাবে না, যাকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলা যাবে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কথা ধরা যাক। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, হোয়াইট হাউসের প্রশাসন যন্ত্র বা কংগ্রেস কোনটাতেই সার্বভৌমত্বের সুনির্দিষ্ট স্থলের সন্ধান লাভ অসম্ভব। এ যুক্তিতে যদি বলা যায়, আমেরিকার কোন সার্বভৌমত্ব নেই, তাহলে মস্তবড় ভুলকরা হবে। শুধু আমেরিকার ক্ষেত্রেই নয়, ভারতের সংবিধান অনুসারেও সার্বভৌমত্বের কোন সুনির্দিষ্ট আবাসস্থল খুঁজে পাওয়া যাবে না।

জনপ্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার অভাবঃ সার্বভৌম শক্তির উৎপত্তি ও এর প্রয়োগে আধুনিক একটি রাষ্ট্রে জনসাধারণের যে বিরাট ভূমিকা রয়েছে, তা অস্টিন অস্বীকার করেছেন। আধুনিনক রাষ্ট্র নির্বাচন পদ্ধতি ছাড়া অচল। আর নির্বাচকমণ্ডলী যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকা পালন করে, তার কোন ধারণাই অস্টিনের সার্বভৌমত্ব মতবাদে নেই।

www.pathagar.com

সার্বভৌম শক্তির চূড়ান্ত পরিপূর্ণতা অসম্ভবঃ আধুনিক রাষ্ট্রে সার্বভৌম শক্তির অধীনে আইন, প্রথা, ধর্ম ও নৈতিকতা এখন আর অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকতে পারে না বিধায় রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ও শতকরা একশত ভাগ হতে পারে না। রাষ্ট্র ও এখন আর সকল ব্যাপারে সকলের কাছে একই ধারণের পরিপূর্ণ আনুগত্য দাবী করে না। সরাসরি রাষ্ট্রের প্রতি বিদ্রোহ না করলেই ধরেনেয়া হয় রাষ্ট্রের প্রতি সাধারণ অভ্যাসগত আনুহত্য রয়েছে। রাষ্ট্র নিজেই এখন আর সর্বভুক হতে চায় না। কাজেই সাব্যভৌমত্ব সম্পর্কে অষ্টিনীয় পরিপূর্ণতা এখন একটি অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার।

পার্লামেন্টে রাজার সার্বভৌমত্ব কথাটি ও কাল্পনিকঃ আস্টিন মনে করতেন ইংল্যাণ্ডের রাজাই সার্বভৌম। অথচ বৃটিশ পার্লামেন্টকেই সবাই সার্বভৌম বলে জানে ও মানে। দুই কক্ষ বিশিষ্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বকে কোন ভাবেই অষ্টিনীয় সংজ্ঞার আলোকে বিচার করা যায় না। কমন্স সভার অনুপস্থিতিতে লর্ড সভা প্রায় সর্বাংশেই অকেজো। আবার নির্বাচন ছাড়া কমন্স সভা গঠিতই হতে পারে না। জনগণ থেকে রাজা পর্যন্ত বিস্তৃত এ সার্বভৌমত্বের পরিধি এমনি জটিল যে, অষ্টিনীয় সংজ্ঞাতে খোদ তার জন্মভূমিতেই সার্বভৌম শক্তি অনুপস্থিত।

শক্তি প্রয়োগের ব্যাপারটি বিভ্রান্তিকরঃ রাষ্ট্র ও আইনের পেছনে শুধুমাত্র শক্তিই একমাত্র যুক্তি, কথাটি ঠিক নয়। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে অষ্টিনীয় ধারণা একেবারেই পরিত্যাজ্য। কারণ, সাধারণতঃ রক্তচক্ষুর ভয় থেকে নয়, বরং সমাজের সংহতি, আইন-শৃংখলা ও কল্যাণ চিন্তার ফসল হিসেবেই সার্বভৌম কর্তৃত্বের বিকাশ ও প্রয়োগ।

সার্বভৌমত্বের বহুত্ববাদী ধারণা (Pluralistic concept of Sovereignty) ঃ অষ্টিনীর সার্বভৌমত্বের মতবাদ একত্ববাদ হিসেবে পরিচিত। সার্বভৌমত্বের একত্ববাদী ধারণা শুধু বেশ কিছু মৌলিক সমালোচনারই জন্ম দেয় নি, বরং এর বিরুদ্ধবাদীরা সার্বভৌমত্বের আর একটি মতবাদ দাঁড় করিয়েছেন, এ মতবাদটি বহুত্ববাদী ধারণা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। মূলতঃ একত্ববাদী ধারণাটি বাস্তবতার সাথে অসংগতিপূর্ণ হয়ে পড়ার ফলেই সার্বভৌমত্বের বহুত্ববাদী ধারণার জন্ম হয়। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে এ ধারণা জন্ম নিলেও এটি খুব দ্রুত প্রসার লাভ করে। গিয়ার্কি (Gierke) মেইটল্যাণ্ড (Maitland), বার্কার (Barker), লিণ্ডসে (Lindsay) কবার (Cober), লাস্কি ও ম্যাকআইভার সহ অনেকেই সার্বভৌমত্বের একত্ববাদী ধারণাকে বাস্তবতা বিবর্জিত ও বিপদজনক হিসেবে আখ্যায়িত করে বহুত্ববাদী ধারণার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। লিণ্ডসে বলেনঃ যদি আমরা বাস্তবতার দিকে তাকাই,তাহলে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সার্বভৌম রাষ্ট্র তত্ত্ব ভেঙ্গে পড়েছে" (.... if we look at the facts it is clear that the theory of sovereín state has broken down).

এখানে সার্বভৌম রাষ্ট্রে তত্ত্ব বলতে একত্ববাদী চিন্তা ভাবনার কতাই বলা হচ্ছে।। বার্কার এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, " কোন রাজনৈতিক ধারণাই সার্বভৌম রাষ্ট্রের মতবাদের

www.pathagar.com

মতো এতো বেশি অনুর্বর ও অফলপ্রসূ রূপ পরিগ্রহ্ করেনি" (No political commonplace, has bccome more arid and untruthful than the doctrine of sovereign state).

সার্বভৌমত্বের একত্ববাদী ধারণার বিরুদ্ধে বহুত্ববাদীদের এ ধরণের উক্তি কিন্ত আদৌ কোন বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাবের ফল নয়। বরং ষোল শতক থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্র শক্তির বিকাশেরর গবেষণা পর্যালোচনার ফসল। পনের শতক পর্যন্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ছিল দুর্বল। তারপর আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের পর ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব সর্বগ্রাসী রূপ পরিগ্রহ্ করতে থাকে। জাতি-রাষ্ট্র সমূহের অপ্রতিরোধ্য কর্তৃত্ব সৃষ্টির সাথে সাথে আধুনিক গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার দ্রুত প্রচার ও প্রসার ঘটে। একহাতে রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা ন্যস্ত করে জাতির কল্যাণ চিন্তা প্রত্যাখ্যাত হয়। আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণা জনপ্রিয় হয়ে উঠে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তা প্রথমে চরমরূপে আবির্ভূত হয়। পরে চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও চরম রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মাঝে আপোষরফা হয়, আর এ আপোষ রফার ফলশ্রুতি হচ্ছে পশ্চাত্যের উদারনৈতিকতাবাদ। একত্ববাদী সার্বভৌমত্বের চিন্তাকে জনকল্যাণ বিরোধী আখ্যা দিয়ে লাস্কি এটিকে সার্বতোভাবে পরিত্যাগ করার সুপারিশ করেন। তাঁর ভাষায় ঃ" সার্বভৌমত্বের সমস্ত ধারণাটিকে বিসর্জন দিতে পারলেই হয়তো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জন্য স্থাযী কল্যাণ সাধিত হতো। (......it would be of lasting benefit to potitical science if the whole concept of sovereignty were surrendered).

বহুত্ববাদী ধারণা বিকাশের কারণঃ

ক) ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীদের সঙ্গে অনেকটা সুর মিলিয়েই বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দৌরাত্ম্য হ্রাস করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তবে বহুত্ব বাদীরা অনেক বেশি বাস্তবমুখী। চিন্তাভাবনা পেষণ করেন। ব্যক্তিস্বাতন্দ্রাবাদীরা শুধু ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেই খালাস, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে সকলের জন্য কিভাবে স্বাধীনতা নিশ্চিত করা যাবে, এ ব্যাপারে তারা উদাসীন। এ সমস্যা মোকাবেলার জন্য বহুত্ববাদীরা বহু সংঘের মত রাষ্ট্রকে একটি সংঘ হিসেবে রূপ দিতে চেয়েছেন। রাষ্ট্রের ভেতরে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান বা সংঘ তাদের আইনানুগ স্বাধীন কার্যাবলীর মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য অধিকার নিশ্চিত করতে পারবে বলে বহুত্ববাদীরা আশা ব্যক্ত করেছেন। এসব ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

খ) রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও জনগণের অধিকার- এ দু'টি ব্যাপারই যাতে সঠিক ভাবে সহযোগিতার ভাবে মানুষের কল্যাণ আনতে পারে, সেজন্য রাষ্ট্রসহ সকল সংঘের মাঝে সহযোগিতার ভাব আবশ্যক। বহত্ববাদীরা এ সহযোগীতার ভাবকে জোরদার করার পক্ষে মত দেন, অথচ কর্তৃত্বের ব্যাপারটিকে তেমন বড় করে দেখেন না।

গ) রাষ্ট্র শুধু তার আভ্যন্তরীণ সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখেই তার কাজ পরিচালনা করে না, বরং আধুনিক যুগে আন্তঃ রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা রাষ্ট্রের জন্য নানা ধরণের কল্যাণ বয়ে

www.pathagar.com

আনে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন ও সংঘের সাথে রাষ্ট্রের সহযোগিতা ও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কাজেই একত্ববাদী সার্বভৌমত্ব অচল হয়ে পড়েছে।

ঘ) মধ্যযুগে গীর্জা ও রাজতান্ত্রিক বিভিন্ন সংঘ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অংশীদারিত্বের দাবীদার ছিল। বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্ক নির্বিশেষে সকল সংঘের নিজস্ব পরিধির মাঝে স্বাধীন ভাবে কাজ পরিচালনার সুযোগের পক্ষে মত দেন। সব সংঘই যেন সমান ক্ষমতার অধিকারী।

ঙ) সর্বাত্মকবাদী চিন্তা ধারার মোকাবিলায় বহুত্ববাদীদের চিন্তা সহজেই জনপ্রিয়তা লাভ করে। মূলতঃ ব্যক্তিস্বাতন্দ্র্যবাদ ও সর্বাত্মকবাদ– এই দুই চরম মতবাদের মধ্যবর্তী পন্থাই হচ্ছে বহুত্ব বাদীদের সার্বভৌমত্বের ধারণা। তাই এটি আজ একটি বাস্তবধর্মী ধারণা হিসেবে স্বীকৃত।

বহুত্ববাদের সমালোচনাঃ তত্ত্ব হিসেবে বহুত্ববাদ অনেক দিক থেকে প্রর্শংসা লাভ করলেও এর সমালোচনা করার মতো অনেক যুক্তি থাকাই স্বাভাবিক। বহুত্ববাদীরা সাধারণত একত্ববাদীদের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়। তবে একত্ববাদীদের সমালোচনা ছাড়াও বহুত্ববাদের কিছু বাস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা হতে পারে।

ক) রাষ্ট্র যদি নিজেকে তার ভেতরকার অন্যান্য সংঘের মতো সাজাতে চায় তাহলে দেখা যাবে তার নিজের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হতে বসেছে। আধুনিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও পেশাজীবী সংগঠন যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। তাদের হাতে প্রচুর অর্থ কড়ি রয়েছে, রয়েছে তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি। রাষ্ট্র যদি যথেষ্ট বলিষ্ঠতার সাথে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে তবে বিভিন্ন সংঘের স্বার্থের সংঘাতে রাষ্ট্রীয় জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

খ) রাষ্ট্রের ভেতরে যদি কোথাও এমন শক্তি মওজুদ না থাকে, যা প্রয়োজনে যে কোন ধরণের শক্তি প্রয়োগ করতে পারবে, তাহলে কোন বিশেষ জটিল সমস্যা বা জরুরী পরিস্থিতির মোকাবেলায় সে অক্ষম হয়ে পড়বে।

গ) বহুতবাদী মতবাদ স্ববিরোধিতায় ভোগে। বহুত্ববাদীদের অনেকেই রাষ্ট্রের হাতে চরম ক্ষমতা থাকার কথা স্বীকার করেন, আবার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে তা হ্রাস করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।

ঘ) রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সাধারণ স্বার্থের কথা বহুত্ববাদীরা অস্বীকার করেন না। কিন্তু রাষ্ট্রের নাগরিকদের যে অংশ কোন প্রকার সংঘেরই সদস্য নয় বা সদস্য হলেও তাদের সংঘগুলো দুর্বল বিধায় তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকার ক্যাপারে বহুত্ববাদীরা অনেকটা নির্লিপ্ত।

ঙ) রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা থেকে মুক্তি লাভ করলেই যে ব্যক্তি মানুষ অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং সে অসহায় ও নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির শিকারও হতে পারে।

www.pathagar.com

চ) রাষ্ট্র শুধু আইনগত কিছু দায়িত্ব পালন করেই ক্ষান্ত থাকতে পারে না। তাকে বহু মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ ব্যাপারে আইনের উপরই রাষ্ট্রের স্থান। কারণ রাষ্ট্রই আইন সৃষ্টি করে ও তা প্রয়োগ করে। একে আরো উন্নত ও সমৃদ্ধ করার দায়িত্বও তার। কিভাবে রাষ্ট্রের এসব দায়িত্ব পালিত হবে, তার কোন নির্দেশনা বহুত্ববাদীদের জানা নেই।

ছ) রাজপথের একজন অতি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাজা বা রাণী পর্যন্ত সবাইকে সার্বভৌম শক্তির অংশিদারিত্ব দানের ব্যাপারটি শুনতে অবশ্যই খুব ভাল ও মানবিক শুনায় , কিন্তু বাস্তবে এমন আদর্শিক বাবস্থা প্রতিষ্ঠা অসম্ভব ব্যাপার। সে কারণেই অনেকে বহুত্ববাদকে কল্পনা বিলাস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

জ) বহুত্ববাদীরাই নানাভাবে তাদের উদ্ভাবিত মতবাদের সমালোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে লাস্কির নাম প্রণিধানযোগ্য। লাস্কি প্রথম সারির একজন বহুত্ববাদী হওয়া সত্ত্বেও নিজেই এ মতবাদের সমালোচনা করেছেন। সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় এক শ্রেণীর মালিকানা বহাল রেখে কিভাবে বিভিন্ন সংঘের মাধ্যমে সমাজের সকলের অধিকার নিশ্চিত করা যায়, এ সমস্যার কোন সমাধান বহুত্ববাদীরা দিতে পারেন নি।।

সার্বভৌত্ব সম্বন্ধে লাস্কি

লাস্কি তাঁর পূর্বসূরীদের মতবাদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সার্বভৌমত্বের আধুনিক মতবাদ দাঁড় করান। বিখ্যাত গ্রন্থ 'A Grammer of Politics. এ সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি বলেন, আধুনিক রাষ্ট্র মানেই সার্বভৌম রাষ্ট্র। বর্তমান যুগে অন্য রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হয়ে কোন আশ্রিত দেশের অস্তিত্ব নেই বিধায় তিনি এ ধরণের অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি রাষ্ট্রের বহির্দেশ ও আভ্যন্তরীণ কার্যাবলীতে সার্বভৌমত্বের প্রতিফলন ব্যাখ্যা করেন এভাবেঃ It may infuse its will towards them with a substance, which need not to be offected by the will of any external power. It is, moreover, internally supreme. Over the territory it controls. It issues orders to all men and all associations within that area; it receives orders from none of them.

লাস্কি সার্বভৌমত্বের এ দু' দিক সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যা করে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাঁর মতে সার্বভৌমত্বের তিনটি তাত্ত্বিক দিক রয়েছেঃ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ (Historical analysis), আইনের এত্ত্ব (theory of law) এবং রাজনৈতিক সংগঠন তত্ত্ব (theoy of political analysis).

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণঃ লাস্কির মতে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা ও গতি প্রকৃতি সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা না করে সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়। মূলত ঃ যে ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্য দিয়ে আজ আমরা বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছি, তা আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রীয়

www.pathagar.com

ক্ষমতার চরিত্র বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে এবং এর ভবিষ্যত প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের আগাম ধারণা উপহার দেয়।

আইন তত্ত্ব ঃ আইনের সবসময় তার ক্ষমতার অস্তিত্ব জনিয়ে দেয় সবাইকে, তার জন্য চূড়ান্ত যুক্তি। যতক্ষণ সে আইনরূপে থাকে, ততক্ষণ অন্যের যুক্তি বুদ্ধি তার কাছে অর্থহীন। আইন তার প্রকৃতির কারণে কোন রাজনৈতিক দর্শনকে মূল্যহীন ভাবতে শেখায়। স্বভাবতঃ লাস্কি বুঝতে চেয়েছেন, রাজনৈতিক দর্শন ও মতাদর্শ অনেক থাকতে পারে, কিন্তু কোন আইন থাকে একটি ব্যবস্থার; কাজেই কোন সুনির্দিষ্ট আইন তার নিজের অনুসৃত মতাদর্শ ছাড়া বাকীগুলোকে অর্থহীন ভাবার চেষ্টা করে। ভিন্নভাবে বলতে গেলে ঐসব মতবাদের কোন মূল্য প্রতিষ্ঠিত আইনের কাছে নেই।

রাজনৈতিক সংগঠন তত্ত্বঃ প্রতিটি রাষ্ট্রেরই একটি চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ থাকে। যে-কোন বিরোধ নিষ্পত্তিতে শেষ কথার মালিক হচ্ছে ঐ কর্তৃপক্ষ। অন্যথায় সামাজিক শৃঙ্খলা বিধান অসম্ভব। এ চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষটি ন্যায়-অন্যায় দুভাবেই যে কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। নৈতিকতা ও সার্বজনীন মানবতারোধের দৃষ্টিতে এ ধরণের ক্ষমতা বিপদজনক পরিস্থিতিরও উদ্ভব ঘটাতে পারে। তাই সার্বভৌমত্বের এ ধরণের প্রয়োগের হাত থেকে রেহাই পাওয়াকেই অনেকে সার্বিকভাবে কল্যাণকর মনে করেছেন। চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষই মূলতঃ ক্ষমতার উৎস। ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে দু'টি প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ ঃ প্রথমতঃ ক্ষমতা নিজকে কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করতে চায়? দ্বিতীয়তঃ উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে সে কি কি উপায় ও উপকরণ ব্যবহার করে? আর সে কারণেই একটি আইন কাঠামোর প্রয়োজন পড়ে। ক্ষমতা প্রয়োগের এ সংগঠনিক প্রক্রিয়ার ধরণ ইতিহাস বেঁধে দেয় না। অসংখ্য ভিন্নতায় ভরপুর সাংগঠনিক প্রক্রিয়াই ক্ষমতা ব্যবহারের পদ্ধতি। তাই লস্কির মতে আজকের রাষ্ট্র শুধু ঐতিহাসিক বিবর্তনের একটি অতীব উচুঁ শৃঙ্গ মাত্র। আজ রাষ্ট্র সমূহ পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় মানবতার স্বার্থের প্রতি অধিকতর যত্নবান হতে বাধ্য। লাস্কির মতে রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের চাইতেও বেশি জরুরী হয়ে পড়েছে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। রাষ্ট্র কি লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিবেদিত তাই আজ মূল প্রতিপাদ্য বিসয়।

লাস্কির মতে ষোল শতাব্দীর ধর্ম বিরোধেরই ফলশ্রুতি হচ্ছে আজকের রাষ্ট্রে এবং আধুনিক অর্থে সার্বভৌম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এর পূর্বে ইতিহাস জানত না। এর পূর্বে শুধু ধর্মযাজক বা রাজাবাদশাহরাই চূড়ান্ত ক্ষমতার মালিক ছিল। জাতীয়তাবাদের উত্থান গীর্জার শক্তিকে খাটো করে দেয়। কারণ গীর্জা জীবনের দাবী পূরণের জন্য সংস্কারের পথ বেছে নিতে ব্যর্থ হয়। মধ্যযুগে ইউরোপীয় রাজারাই ছিল সর্বশক্তিমান। লাস্কির ভাষায়ঃ What he willed was right because it was his will" (তোর ইচ্ছাই ঠিক, কেননা এটাই তার ইচ্ছা)

লাস্কির মতে জীন বদিন তাঁর বই প্রজাতন্ত্রে সার্বভৌমত্বের যে আধুনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন,

www.pathagar.com

তা ছিল মূলতঃ তখনকার জীবন ও জনতার দাবী। বদিন যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তির জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। বদিন যে সার্বভৌম শক্তির প্রয়োগ দেখতে চেয়েছিলেন তার মূল উদ্দেশ্যই ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠা। কেউ যাতে ধর্মের দোহাই দিয়ে যুদ্ধ শুরু করতে না পারে, সেটাই হবে রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রধান দায়িত্ব। আর সে কারণেই রাষ্ট্র শক্তির ধর্ম নিরপেক্ষ হওয়া। জরুরী লাস্কির মতে বদিন ও হব্স্ তাদের নিজ নিজ সময়ে যে বক্তব্যটি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চেয়েছেন, তহচ্ছে, রাষ্ট্রকে নিজ অস্তিত্ব রক্ষার প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে সুনির্দিষ্ট কর্তৃত্বের সাহায্যে টিকে থাকতে হবে। সে কারণেই তিনি বলেনঃ The will of the State must be all orr nitting (পৃষ্টা-৪৬) (রাষ্ট্রের ইচ্ছা হয় পরিপূর্ণ থাকবে, নতুব শূন্য থাকবে) রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে যেন কেউ চ্যালেঞ্জ করতে না পারে, কারণ সার্বভৌম জনগণের ইচ্ছাইতো রাষ্ট্রের ইচ্ছ।

লাস্কির মতে বদিন থেকে হেগেল পর্যন্ত রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্ব যেন সব সময়ই সংকটে ভুগেছে; সার্বভৌমত্বের দৃঢ়তার অভাবে রাষ্ট্রই যে বিলুপ্ত হতে পারে, এমন সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। তাই প্রয়োজন ছিল সার্বভৌম সংগঠনের প্রতি সকলের আইনগত আনুগত্য। যখন পর্যন্ত ইউরোপে খ্রীস্টীয় আনুগত্য প্রবল ছিল, তখন পর্যন্ত একই সংগঠনের জন্য আইন ও নৈতিক আনুগত্য অর্জন কষ্টকর ছিল। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ সমস্যার তীব্রতা কমে আসছিলো। রাষ্ট্রীয় নাগরিকত্বের একটি সাধারণ কন্ধন এমন হয়ে গেল যে, ইউরোপীয়রা আর কঠিন অর্থে খ্রীস্টীয় বা গ্রীসীয় রইল না, বা তারা যেন পরাধীন বা স্বাধীন কোনটাই নয়। রাষ্ট্রের ভেতরে সকল সংঘ ও প্রতিষ্ঠান অনেকটা নিজেদের মতো থেকেই রাষ্ট্রের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করলো। রাষ্ট্র সবাইকেই আলিঙ্গন করলো। রাষ্ট্র নামক সংঘটি সকলের উপর প্রাধান্য বহনকারী পরিচিতি অর্জনে সমর্থ হলে।

লাস্কির মতে সপ্তদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে গড়ে উঠা ঘনিষ্ট সম্পর্কও রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহারকে অধিকতর সুসংহত করেছে।

"The acknowledged rights of humanity became simply those rules which states agreed to observe, rules which, as in the case of Belgium in 1914, States were legally free, to break if they so pleased. The chain was then complete. (পৃষ্ঠা-৪৭)

এ ধরণের অবস্থাতে একজন নাগরিক অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে জানার সুযোগ লাভ করেছে, দেশের ভেতরে ও বাইরে রাষ্ট্র তাকে কি কি অধিকার দিয়েছে। রাষ্ট্রের সর্বভৌমত্বের এ ক্রমবিকাশের ধারা কোন চিরন্তন যুক্তির প্রমাণ বহণ করে না, বরং এটি একটি ঐতিহাসিক যুক্তি। কোন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের যে স্বীকৃতি বাহির্বিশ্বে থাকে, তা ইতিহাসের গতিপ্রবাহের ফসল। আর এভাবেই কার্যত রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ব্যাপারটি নিজ সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে।

রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের এ স্বীকৃতি আধুনিক একটি রাষ্ট্রকে স্বেচ্ছাচারিতা ও যুদ্ধের কবল থেকে রক্ষা করতে সহায়ক হয়।

www.pathagar.com

"Wherever in short, the interests ot a unified and interdependent world seem to demand an international standard of conduct, the conponate organisation of that standard and its corponate application, are at least conceivable"

সমগ্র মনুষ্য সমাজকে যদি সত্যিই একটি পরিবার হিসেবে ধরা যায়, তবে প্রতিটি রাষ্ট্রই এর একটি সদস্য। এ মানসিকতা পোষণ করতে পারলে কারো দেশপ্রেমই উগ্র জাতীয়তাবাদ জন্ম দেবে না।

কোন উগ্র জাতীয়তাবাদ যদি রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ব্যবহার করে সর্বগ্রাসী কোন রূপ পরিগ্রহ করতে চায় তবে ইতিহাসের অমোঘ বিধানেই তা নিজের স্থায়িত্ব হারিয়ে ফেলে। লাস্কির মতে ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধ ও সপ্তদশ শতকের বিপ্লব এবং ১৭৮৯ ও ১৯১৭ সালের যথাক্রমে ফরাসী ও রুশ বিপ্লব মূলতঃ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বভুক হওয়ার ফলশ্রুতি। প্রতিটি রাষ্ট্রই যেহেতু কিছু নিয়ম কানুন দ্বারা পরিচালিত, তাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগকারী ব্যক্তিবর্গ সেসব নিয়ম-কানুন কিভাবে পালন করে তার উপর যেমন নির্ভর করে সার্বভৌমত্বের প্রকৃতি, তেমনি ঐ রাষ্ট্রশক্তিকে কি ধরণের বিরোধী শক্তির মোকাবেলা করতে হয়, তাও অনেকখানি ঠিক করে দেয় সার্বভৌম শক্তির ব্যবহারিক পদ্ধতি। অথচ সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা দাবী করে তার অফুরন্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার। কাজেই রাষ্ট্রের অসীম ক্ষমতার অধিকারী হওয়া ও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিরাজমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ক্ষমতা ব্যবহার পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা যেন একটি পরস্পর বিরোধী ব্যাপর।

লাস্কির মতে একমাত্র অস্টিন ছাড়া সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন প্রাবক্তা যেমন বদিন, হব্‌স, রুশো, রেন্থাম সবাই মুলত রাষ্ট্রকে একটি এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা হিসেবেই কল্পণা করেছেন। কারণ তারা আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে পরিস্ফুটিত অবস্থায় অবলোকন করতে পারেন নি। বদিন রাজার অসম ক্ষমতার কথা চিন্তা করেছেন আর বেন্থাম কল্পনা করেছেন আইন সভার অফুরন্ত ক্ষমতার। রুশো সহ অনেকেই প্রতিনিধিত্বমূলক সংঘ হিসেবে রাষ্ট্রের কোন আইনের বিরুদ্ধাচরণকেই বেআইনী মনে করেছেন। তাদের পক্ষে আধুনিক কালের সত্যিকার অর্থে কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োগ পদ্ধতি চিত্রায়ণ করা সম্ভাব ছিল না।

লস্কি অস্টিনের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্ব মতাবাদের বিশদ পর্যালোচনা করেছেন। তার দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্বের আইনগত দিক বুঝার জন্য অস্টিনই উত্তম। কারণ অস্টিনীয় মতাবাদের সার কথাই হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় সকল ব্যাপারেই একটি উচ্চতর কর্তৃপক্ষ রয়েছে, যার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হয় বাধ্যতামূলকভাবে। সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের উপর আর কেউ খবরদারি করতে পারে না। অর্থাৎ সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ শুধু হুকুমজারিই করে কারো তাবেদারি করে না। তাই অস্টিনের মতে আইন সার্বভৌম শক্তির নির্দেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। হবসের মতই অস্টিনও ভাবতেন, সার্বভৌম শক্তি সকল ভুলের উর্ধ্বে। কাজেই সে যা খুশি করতে পারে এবং যা করে তাই আইন। অস্টিনের সার্বভৌম মতবাদের তিনটি দিকের কথা উল্লেখ করেছেণ লাস্কি।

www.pathagar.com

প্রথমতঃ অস্টিনের মতে রাষ্ট্র হচ্ছে এমন একটি আইনানুগ ব্যবস্থা যেখানে ক্ষমতার একটি চূড়ান্ত উৎস রয়েছে এবং ঐ উৎসটি থেকে নিঃসৃত একটি সুনির্দিষ্ট কর্তৃত্ব সদা উপস্থিত। দ্বিতীয়তঃ সে কর্তত্ব অপরিসীম। এ কর্তৃত্ব অন্যায়, অসততা ও নির্বুদ্ধিতার সাথেও কাজ করতে পারে। আইনের তাত্ত্বিক মতবাদের জন্য সার্বভৌমত্বের কাজের প্রকৃতি কোন জরুরী বিষয় নয়। ক্ষমতার মালিক হিসেবে রাষ্ট্র তার আইনানুগ পরিধির মাধ্যে থেকে কাজ করেছে কিনা সেটাই বিবেচ্য, যদি করে থাকে তবে তাই আইন। কাজের ধরণ বা প্রকৃতি দিয়ে রাষ্ট্রের সমালোচনা অর্থহীন। তৃতীয়তঃ আইনের সারকথাই হচ্ছে কিছু কাজ আইনসঙ্গত আর কিচূ কাজ বেআইনী। আইনের এ দাবী পূরণ করতে অসমর্থ হলে শাস্তি অনিবার্য।

লক্কির মতে সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে অস্টিন ঠিক কথাই বলেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এরূপ ব্যাখ্যা মূল্যহীন। অন্যদিকে রাষ্ট্রের সকল কার্যক্রমকে নিছক নির্দেশ (Command) বলা আজ আর আদৌ যুক্তি সংঙ্গত নয়। তদুপরি কোন সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই অফুরন্ত ক্ষমতার মালিক হওয়া বাস্তবে সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বহু সংঘই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রকৃতির উপর কার্যকর প্রভাব ফেলতে সমর্থ। তাই অস্টিনের মতবাদটি মোটেই বস্তুনিষ্ঠ নয়। অস্টিনের এ দৃষ্টিতে এথেন্স থেকে শুরু করে আজকের এদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের অধিকারী এমন রাজ্য খুজে পাওয়া দুষ্কর হবে। লাক্কির মতে অস্টিনীয় সার্বভৌমত্ব আমেরিকায়ও খুঁজে পাওয়া যাবে না এবং তুরস্কের সবচাইতে শক্তিশালী সুলতানও যেহেতু বাধ্যতামূলকভাবেই কিছু ধর্মীয় অনুশাসন মানতেন, তাই অস্টিনীয় সার্বভৌমত্বের সাক্ষাত সেখানেও বাস্তবে পাওয়া অসম্ভব। আইনের দৃষ্টিতে তুর্কী সুলতান হয়তো সবই করতে পারতেন, কিন্তু বাস্তবে তায় পক্ষে অস্টিনীয় সার্বভৌমত্বের অধিকারী হওয়া সম্ভব ছিল না।

লাক্কির মতে অস্টিনীয় সার্বভৌমত্ব শুধু যুক্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতেই অনুপস্থিত নয়, বরং এককেন্দ্রিক ব্যবস্থাতেও এধরণের সার্বভৌম শক্তির প্রয়োগ অসম্ভব।

লাক্কি উদাহরণস্বরূপ তার প্রতিবেশী দেশ বেলজিয়ামের কথা উল্লেখ করেছেন। বেলজিয়ামের সংবিধান অনুযায়ী সে দেশের প্রতিটি নাগরিক নিজ খুশি মতো ধর্মপালন করতে পারে। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া ছাড়া কোন নাগরিকের কোন সম্পত্তি সরকার নিতে পারে না। সকল সভা - সমিতিই আইনসম্মত বলে বিবেচিত হয়, যদি না তাতে কেউ অস্ত্র বহন করে বা তা যদি উম্মুক্ত আকাশে না হয়। বেলজিয়ামের সংসদ (Belgiam Assembly) এসব অধিকারের ধরণ পাল্টে দিতে পারে সত্য, কিন্তু এজন্য সংসদকে বেশ কিছু নিয়মের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। সংসদের সিদ্ধান্ত সাংবিধানিকভাবে গৃহীত হওয়ার জন্য নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হয়। ঐ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দুই-তৃতীয়াংশ যেনতেন সাংবিধানিক সংশোধনী অনুমোদন দেবেন, এমন কোন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না। অস্টিনের দৃষ্টিতে তাহলে বেলজিয়াম তার আভ্যন্তরীণ

www.pathagar.com

ব্যাপারেও সার্বভৌম নয়। অথবা বলতে হবে নির্বাচকমণ্ডলীই সার্বভৌম। কিন্তু অস্টিনের মতে তেমনটি যুক্তিগ্রাহ্য হবার উপায় নেই, কারণ সব ভোটার মিলে কোন সংঘ তৈরি হয়, তার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমেই কাজ করতে বাধ্য। তাই দেখা যাচ্ছে সার্বভৌমত্বের এ ধরনে আইনগত তত্ত্ব রাজনৈতিক দর্শনের জন্য ব্যবহার করা যায় না। রাজনৈতিক দর্শন আইনকে সমাজ জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মনে করে। রাজনীতির ছাত্রদের জন্য আইন তাই সার্বজনীন সামাজিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করেই বেড়ে উঠে। আইন মূলতঃ কোন নির্দিষ্ট সময়ে রাষ্ট্রে সামাজিক সম্পর্কেরই প্রতিচ্ছবি। কোন সংঘ বা প্রতিষ্ঠান আইনটির ঘোষণা দিল তার চাইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামাজিক কোন কোন শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াতে ঐ আইনটির জন্ম হয়েছে এবং তা কিভাবে পালিত হচ্ছে।

লাস্কির মতে সার্বভৌমত্বের রাজনৈতিক চরিত্রই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের ইচ্ছা প্রকৃত প্রস্তাবে সরকারেরই ইচ্ছা। মূলতঃ সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক হয়ে পড়ে মুষ্টিমেয় কি লোক। তারাই সব ক্ষমতা প্রয়োগ করে। সব সরকারই যে জনগণের স্বার্থে নিষ্ঠার সাথে কা করবে বা করতে পারবে, এমন নিশ্চয়তার ভাবেই কয়েক বছর পর পর নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতার হাত বদলের ব্যবস্থার মতো রাজনৈতিক দর্শনের উদ্ভব ঘটেছে বলে লাস্কি অভিমত প্রকাশ করেন। এ ধারণের পরিবর্তন দু'টি দিকের নির্দেশ দেয়। প্রথমতঃ এতে করে সরকারের ব্যাপারে জনমত যাচাই করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ জনগণের আনুগত্যটা অন্ধ নয় তার প্রমাণ পাওয় যায়। দ্বিতীয়তঃ এ ব্যবস্থা সরকারকে যা খুশি তাই করা থেকে বিরত রাখে। সরকারকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয় জনগণ, পরিবেশ ও পরিস্থিতির দাবীর প্রতি। অন্যথায় সরকার তার ক্ষমতা টিকে থাকার বৈধতা পর্যন্ত হরাতে পারে। সরকারকে সজাগ হতে হয় রাষ্ট্রের ও জনগণের প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপারে। এটা শুধু আইনেরই দাবী নয়, বরং নৈতিকতাও তাই কাম করে। লাস্কির ভাষায়; প্রতিটি সরকারই একগুচ্ছ নৈতিক দায়িত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত (Every Government is this bulit upon a contingent monal obligation (পৃষ্ঠা ৫৭)

আভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের যেমন আইনের পরিধির বাইরে গিয়েও নৈতিক কারণে অনেক কাজ করতে হয়, তেমনি বিশ্ব–সমাজের প্রতিও তার থাকে অনেক নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু এ নৈতিক দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে রাষ্ট্র সমূহের মাঝে বেশ কিছু সমঝোতা রয়েছে। " আন্তঃ রাষ্ট্র সাধারণ জীবন ধারা ব্যাপারটি রাষ্ট্র সমূহের মাঝে সাধারণ বোঝাপড়ার বিষয়" (The common life of states is a matter for common agreement between States) (পৃষ্ঠা ৬৫) লাস্কি একথা দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে আইন ও নৈতিকতার মাঝে দেয়াল সৃষ্টিকারী কোন শক্তি নয়। যেমন নিজ দেশ ইংল্যাণ্ড সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, দেশটির উচিত হবে না নিজে নিজেই ঠিক করা কি কি ধরণের অস্ত্র-

www.pathagar.com

শস্ত্র তার প্রয়োজনজ, কি ধরণের আদমানী–রপ্তানী নীতি সে অনুসরণ করবে এবং কি ধরণের লোকদের ইংল্যাণ্ডে আসতে দেবে। লাস্কির একথাগুলোতে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের ইংরেজ মানসিকতার প্রতিফলন রয়েছে।

এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইংরেজদের নেতৃত্বাধীন বৃটিশ সাম্রাজ্যের সোনালী সূর্য অস্তমিত হতে যাচ্ছে। তবুও ইংরেজরা আশায় বুক বাঁধত এভেবে যে, সভ্যতার এক বিরাট লালনকারী ইংরেজজাতি তার আন্তর্জাতিক প্রভাব প্রতিপত্তি হারাতে পারেনা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব রক্ষা করার একমাত্র উপায়ই ছিল এক্ষেত্রে তাদের দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়া। সে কারণেই লাস্কি ইংরেজদের জন্য একতরফাভাবে এসব সমস্যার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া অনুচিত মনে করেছিলেন। আজকের একজন সাধারণ ইংরেজের কাছে এসব কথা নৈতিকতার বাগাড়ম্বর বৈই ভিন্ন কিছু নয়। থ্যাচারের নেতৃত্বাধীন ইংল্যাণ্ডতো কমনওয়েলথভুক্ত সবগুলো দেশের সর্বসম্মতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তকে একাধিকবার একটি মাত্র কথায় ফুঁদিয়ে উড়িয়ে প্রমাণ করেছে সে তার দেশ কেমন ধরণের সার্বভৌমিকতার অধিকারী এবং ইংরেজরা এ ব্যাপারে কেমন মানসিকতা পোষণ করেন। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর কথা বাদই দিলাম, এমনকি পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বর্তমান ইংল্যাণ্ডকে একাধিকবার সোচ্চার হতে দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র নিজের দেশের স্বার্থ ঠিকমতো রক্ষা নাও পেতে পারে ঐ ভয়ে। ই,ই, সি ভুক্ত দেশসমূহে উম্মক্ত রাষ্ট্রসীমানা ও একই মুদ্রা প্রচলনের ব্যাপারটি এখানে প্রণিধানযোগ্য। ইংরেজরা ছাড়া আর কোন পশ্চিম ইউরোপীয় জাতিই আজ এর বিরোধিতা করে না। কাজেই আন্তর্জাতিক ব্যাপারে লাস্কির এ উদারনৈতিক মনোভাব তার নিজ দেশেই আজ সবচাইতে বেশি মার খাচ্ছে।

লাস্কি শুধু যে বৈদেশিক নীতিসংক্রান্ত কার্যাবলীতেই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রয়োগের ব্যাপারে একটি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন তাই নয়, সার্বভৌমত্বের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তার নৈতিক দৃষ্টিকোণ ছিল উদার ও মানবিক। রাষ্ট্রের প্রতি সকলের আনুগত্য বাধ্যতামূলক দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন। যেহেতু সকল নাগরিককেই রাষ্ট্রের অধীনতা স্বীকার করতে হয়, সেহেতু রাষ্ট্রকেও সকলের প্রতি কিছু মৌলিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাদের সকলেরই খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও বাসস্থানের প্রয়োজন...... তাদের সকলেরই দাবি সমান" They all need food, education, and shelter........... Their claims are equal claims) (পৃষ্ঠা ৬৯৭০) এ ধরণের কথাকে লাস্কি নিতান্তই আইনের কাগজী ভাষ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি। তিনি রাষ্ট্রের মধ্যে সত্যি সত্যই এ ধরণের অবস্থা দেখতে চেয়েছেন। অর্থাৎ উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার মাঝে এমন একটি সুষম অবস্থা দেখতে চেয়েছেন, যাতে করে সকলের কাছেই জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর মতো উপকরণ পৌছেঁ যায়। মানুষকে তিনি নিছক উৎপাদনকারী যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করেননি। তাঁর মতে মানুষ কাজ করবে ঠিকই, কিন্তু তার

কাজ দ্বারা তার সকল মৌলিক চাহিদা মেটানোর মতো অর্থ সে উপার্জন করতে পারবে এমন কোন কথা নেই। এ ব্যাপারে লাস্কির বক্তব্য হচ্ছেঃ

"There is a limit to the number of hours of labour a man can work and yet remain a human being. There is an income below which no man can be allowed to fall if he is to maintain himself as a decent citizen. "

এরূপ ধারণা আজকের দিনের প্রতিটি কল্যাণকর রাষ্ট্রের হওয়া উচিত। রাষ্ট্রের এরূপ মতৎ উদ্দেশ্য আজ সবাই মানে। কিন্তু কিভাবে তা অর্জিত হবে, এনিয়েই মূল বিতর্ক। প্রচলিত পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে লাস্কি যেন তেমন একটা তাল মেলাতে চাননি। তার কথা হচ্ছে শুধু উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করলেই চলবে না, বরং ভোগ্যপণ্যের হাতবদল ও চলাচলের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থাকতে হবে। লাস্কি এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন যে, উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার সব খুটিনাটি ব্যাপারের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ রাখা অসম্ভব ব্যাপার। এ ব্যাপারে তিনি সরকারকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে বলেন, "To define the function of the state is not to define the powers of government to secure. there we meet the problem of internal sovereignty in its sharpest form."

একটি রাষ্ট্র ও সরকার আভ্যন্তরীণ কার্যাবলীতে কতখানি দায়িত্বশীল হবে এবং কিভাবে সে দায়িত্ব পালন করবে এটি শুধুমাত্র আইন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে না। এখানে রাষ্ট্র-দর্শন ও সরকার ব্যবস্থার কাঠামোগত দিকের যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। রাষ্ট্রের মহৎ উদ্দেশ্যের ব্যাপারে হয়তো সকল মতাদর্শকে এক টেবিলে বসানো যেতে পারে, কিন্তু কি কি পদ্ধতি ও উপায়-উপকরণের সাহায্যে ঐ মহৎ ইদ্দেশ্য হাসিল করা যেতে পারে এ নিয়ে আজ পর্যন্তও তর্কের শেষ নেই। এজন্যই রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্যকে বিতর্কের উর্ধ্বে রেখে সরকারের কার্যাবলীকেই কঠোর সমালোচনার অধীন রাখার পক্ষে বক্তব্য পেশ করেছেন লাস্কি। তিনি সরকারকে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার ছাড়া অন্য কিছু মনে করেন নি । "Government becomes the arbiter between the parties to production, not as an end in itself, but as a means to the end for which men produce." (প্রষ্ঠা-৮২)

লাস্কির এ ধারণের মনোভাবকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রতি তাঁর ঝোঁক-প্রবণতার প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ। কিন্তু লাস্কি নিজেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থার অসুবিধাগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। মূলতঃ লাস্কি যে সময় রাজনীতির ব্যাকরণ গ্রন্থ্য রচনা করেন, তখন পাশ্চাত্যের নামকরা সব রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও আইনবেত্তা কমিউনিজমকে পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য হুমকি স্বরুপ নিয়েছিলেন। কাজেই কমিউনিস্ট ব্যবস্থা সম্পর্কে নিরপেক্ষ পর্যালোচনা পাশ্চাত্যের মনমানসিকতায় সমাজতন্ত্রপ্রীতি বলে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

www.pathagar.com

রাষ্ট্র দর্শন হিসেবে সমাজতন্ত্রকে তেমন শক্ত ধরনের কাঠগড়ায় না উঠিয়ে লাস্কি ব্যবহারিক সমস্যার দিকেই বেশি আলোকপাত করেছেন। শিক্ষা–দীক্ষায় ও অর্থনৈতিক বিচারে সমাজের মানুষের মাঝে যত কম বৈষম্য থাকবে, ততই সবার জন্য কল্যাণকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, এটি একটি নির্জলা সত্য কথা। এ সত্য কেউ অস্বীকার করে না। নৈতিক বিচারে সবাই একথা মানবে। কিন্তু আইনগতভাবে এ ধারণের অবস্থা সৃষ্টি করা খুবই কঠিন ব্যাপার। "Moral co-ordination may be achieved; legal co-ordination is impossible because the state /through its agents defines the manner of vocational life." (75)

আইনগতভাবে আদর্শিক সমাজতান্ত্রিক সংঘ বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন বলে লাস্কি মত প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ সমাজের সকলকে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ দান করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সরকার–যন্ত্রের এ চরম জটিলতার দিনে বাস্তবে এ যন্ত্রটির কোন্ অংশ কখন কিভাবে সামগ্রিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করে, তা নির্ণয় করা প্রায়ই দুঃসাধ্য। দ্বিতীয়তঃ সমাজতান্ত্রিক সরকারকে যদি দেশের সকল সংঘের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংঘের মত কার্যকর দেখি, তাহলেও মৌলিক সমস্যার তেমন কোনই সমাধান হতে দেখিনা। "Guild officials would tend, just as ministers tend, to become bureaucratic and conservative" (প্রষ্ঠা–৮২)

সকল সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থাই লাস্কির এ উক্তিটিকে সত্য বলে প্রমাণিত করেছে। বিংশ শতাব্দীর আশির দশক প্রমাণ করেছে, ইতিমধ্যেই ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহ তাদের গণমুখিতা হারিয়ে এক ধরণের "কমিউনিষ্ট–পুঁজিবাদ" প্রতিষ্ঠা করেছিল। ক্ষমতাসীনরা হয়ে পড়েছিল জনগণের স্বার্থের ব্যাপারে চরমভাবে উদাসীন।

তৃতীয়তঃ মূলতঃ কোন ব্যবস্থাতেই প্রথমেই সকল ভোক্তার স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করে উৎপাদন ব্যবস্থা সাজানো সম্ভব হয়ে উঠেনি। সমাজতন্ত্রও এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নয়। 'এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য লাস্কি একটি সাধারণ নিয়মের কথা বলেছেন। তাঁর মতে যেহেতু সমাজতন্ত্র সহ প্রচলিত কোন ব্যবস্থাতেই সরকার যন্ত্র সমগ্র জনগোষ্ঠীকে সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করে না, তাই শাসকদেরকে সার্বক্ষণ সমালোচনার জালে আবদ্ধ রাখাই একমাত্র সমাধান। ("In any state where there is an absence of the critical spirit in the attitude. of the citizens to their rulers, the preservation of rights is a difficult matter. (পৃষ্ঠা ৮৫)

প্রশ্ন উঠতে পারে, এ ধারনের অবস্থা কি সরকার যন্ত্রকে দুর্বল করে ভেঙ্গে ফেলবে না? লাস্কির মতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ ধরনের অবস্থায় ঘন ঘন বিপ্লবের সম্ভাবনা রয়েছে সত্য, কিন্তু সরকার সদ্য সতর্কাবস্থায় দায়িত্ব পালন করবে বিধায় এমনটি হওয়ার সম্ভবনা নেই। লাস্কি জনমত কেই সরকারের স্থিতিশীলতার সবচাইতে শক্তিশালী নিয়মক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাছাড়া স্বাধীন

www.pathagar.com

বিচারব্যবস্থাও এ ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্রে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করা যায় ঠিক তেমনি, যেমনি করা যায় ব্যক্তি নাগরিকের বিরুদ্ধে।

মানুষের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠাকল্পে রাষ্ট্রীয় বার্বভৌমত্বের অবদানের কথা চিন্তা করেই লাস্কি সীমাবদ্ধ ভূখন্ডে আধুনিক রাষ্ট্র ও সরকারের কর্তৃত্বকে কল্যাণকামী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। লাস্কির সাম্য-চিন্তা কমিউনিজমের সাম্য-চিন্তার মতো নয়। লস্কি কমিউনিস্ট দর্শনের প্রতি তেনম কোন বিদেষ পোষণ না করেই এর বিজয় সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। "The expericnce of pussica has shown us that the astablishment of communism is not likely to come rapidly; men will sooner part with their surls than with their possesion"

ষাট বছর পূর্বে লিখিত লাস্কির এ সন্দেহ সত্য পরিণত হয়েছে। আর এটি শুধু কমিউনিজমের ক্ষেত্রেই নয় বরং মানুষের আভ্যন্তরীণ সত্তার স্ফূরণের অভাব ঘটলে সব মতাদর্শেরই একই পরিণতি হতে বাধ্য।

লাস্কি কিন্তু আজকের দিনের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পেছনে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব যেভাবে কাজ করছে, তারও ঘোর বিরোধী ছিলন। তাঁর তীব্র আকাঙ্খা ও দৃঢ় প্রত্যাশাছিল পশ্চিমা বিশ্ব আরো বেশি কল্যাণকামী ও সাম্যবাদী রাষ্ট্র গঠণ করতে সমর্থ হবে। সরকারকে তিনি ভাবতেন আরো কনেক বেশি দায়িত্ববান। প্রতিটি সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী সরকার নিজ দেশের ও বাইরের নাগরিকদের ব্যাপারে আরো বেশি দাত্বিশীলতার পরিচয় দিবেন বলে তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কোন গোষ্ঠী বা শ্রেণী স্বার্থের জন্য নয়, বরং দেশের ও বিশ্বের সার্বিক স্বার্থের কথা ভেবেই রাষ্ট্রসমূহের কাছ থেকে লাস্কি আরো কল্যাণকামী উৎপাদন ও কন্টন ব্যবস্থা আশা করেছিলেন। কন্তিু তাঁর সে স্বপ্ন সার্থক হয়নি। পৃথিবী আজ মানুষ ধ্বংস ও হননকারী অবৈধ অস্ত্র ও নেশাজাতি বিভিন্ন দ্রব্যাদির পুঁজিবাদী লেনদেনের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এসব অবৈধ ব্যবসায় বহু সরকারের স্বার্থ জড়িত রয়েছে নানাভাবে। অথচ লস্কি রাষ্ট্রকেই কোন চরম লক্ষ্য মনে করেন নি। চূড়ান্ত লক্ষ্য মনে করেছেন মানবতার কল্যানকে। তাঁর ভাষায়ঃ "the state is not itself an end, but menrely the meons to an end, which is realized only in the enrichment of human lives. Its power and allegiance it can win depend always upon what it achieves for that enrichment" (পৃষ্টা-৮৮)

সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে লস্কির নিজ দেশ ইংল্যাণ্ড এ নীতির কতখানি সত্যিকারের অনুসারী এ প্রশ্ন করার অধিকার রয়েছে বিশ্ব-পরিবারের প্রতিটি সদস্যের।

www.pathagar.com

আলীজা আলী ইজেতবেগোভিচের ভাবনা থেকে সভ্যতা ও সংস্কৃতি

গণসংস্কৃতি

সভ্যতা এবং সংস্কৃতি এক নয়। এখন প্রশ্ন হলো তথাকথিত গণসংস্কৃতি (Massculture) কি সংস্কৃতি নাকি সভ্যতারই একটি প্রকল্প বিশেষ? যে কোন সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় বিষয় হলো মানুষ ব্যক্তি হিসেবে, ব্যক্তিত্ব হিসেবে। কিন্তু গণসংস্কৃতির বিষয় হলো Mass. এই Mass হলো ব্যক্তিত্ব হারাণো কতক বেনামী, নিরয়বয়ব মানব ইউনিটের সমষ্টি। একজন মানুষের আত্মা রয়েছে, কিন্তু একদল জনতার চাহিদা ছাড়া কিছুই নেই। সুতরাং সকল সংস্কৃতি মানুষেরই লালিত সন্তান, যেখানে গণসংস্কৃতি হলো শুধুমাত্র প্রয়োজন পূরণ বা চাহিদার যোগানদার। সংস্কৃতি ব্যক্তিসত্তা অভিমুখী গণসংকৃতি পরিচালিত ঠিক বিপরীতক্রমে সার্বিক সমরুপতা (Uniformity) তথা নৈর্ব্যক্তিকরণের দিকে। একটি সর্বব্যপ্ত ভুল হলো গণসংস্কৃতির (Massculture) সাথে লোকসংস্কৃতিকে (Popular culture) এক করে দেখা। এটা লোকসংস্কৃতির জন্যে ক্ষতিকারক কারণ তা গণসংস্কৃতির চেয়ে সন্দেহাতীতভাবে স্বতন্ত্র এবং খাঁটি, সক্রিয় ও জীবন্ত। এর মধ্যে কোন চটকদারি নেই। লোকসংস্কৃতি সৃজন এবং --- উপর নির্ভশীল। কিন্তু গণসংস্কৃতির মূল কথা হলো নিপুণতার সাথে অন্যকে বশে আনা। নাচ, গাণ, ধর্মীয় আচার ইত্যাদি একটি গ্রাম কিংবা উপজাতীয় জীবনের সাধারণ সম্পদ। এগুলো পরিবেশনকরে তারাই উপভোগ করে সকলে মিলে অকৃত্রিম বন্ধন ও অনুভাবনা সহকারে। কিন্তু গণসংকৃতি উপভোগের ক্ষেত্রে মানুষ উৎপাদক এবং ভোক্তা এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দর্শকদের মধ্যে কেউ কি টেলিভিশনের অনুষ্ঠানমালাকে প্রভাবিত করতে পারেন। তথাকথিত গণমাধ্যম সংবাদপত্র, সম্প্রচার এবং টেলিভিশন প্রকৃত পক্ষে গণবশীকরণেরই মাধ্যম। একদিকে গুটিকতক মানুষের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদকীয় অফিস, অপর দিকে লক্ষ কোটি নিষ্ক্রিয় দর্শক শ্রোতা। ১৯৭১ সালে নেওয়া একটি অনুসন্ধান রিপোর্টে দেখায় যে প্রায় সকল ইংরেজ সপ্তাহে ষোল থেকে আঠারো ঘন্টা সময় ব্যয় করে টেলিভিশন দেখে। প্রতিদিন তিনজন ফরাসির একজন কখনো বই পড়ে না; ফরাসি জাতি তাদের অবসর কাটায় টেলিভিশর দেখে। দেশের শতকরা ৮৭ ভাগেরও বেশী মানুষের মূল সাংস্কৃতিক বিনোদনের মাধ্যম হলো টেলিভিশন। ব্যালে এবং অপেরার স্থান অনুসরণ তালিকার একেবারে নীচে। ১৯৭৬ সালে প্রায় ৩০ ভাগ জাপানী কোন রকম বই পড়ে না তাদের প্রায় প্রত্যেকে প্রতিদিন ২.৫ ঘন্টা সময় ব্যয় করে টেলিভিশন দেখে। সানফ্রানসিসকো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Horikara দাবী করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়গামী উঠতি প্রজন্মের জ্ঞান ধারণ ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মান থেকে অনেক নীচে। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন টেলিভিশন মানুষের সকল সমস্যার রেডিমেড সমাধান দিয়ে থাকে এবং অত্যন্ত সহজেই টেলিভিশন সাহিত্যের এবং চিন্তনের

www.pathagar.com

স্থান দখল করে নিয়েছে, ফলত সৃষ্টিশীল বুদ্ধিবিত্তিক কর্মকান্ডকে অসম্ভব করে তুলেছে। আমরা দেখছি কিভাবে সরকারী আধিপত্যের মধ্যে রেডিও, টেলিভিশনের মতো গণমাধ্যমগুলো গণপ্রবঞ্চনা করে যাচ্ছে। এখন আর শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষকে শাসন করার প্রয়োজন নেই। এখন বৈধ ভাবেই মানুষের ইচ্ছাকে অবশ করে তাদেরকে শাসন শোষণ এবং সত্যের বটিকা সেবন করিয়ে তাদের স্ব-চিন্তা ও মতামত গঠনে প্রতিহত করা যাচ্ছে সহজেই এবং তা সম্ভব হচ্ছে এই গণমাধ্যম দ্বারা। গণমনস্তত্ত্ব প্রমাণ করেছে যে ঘন ঘন পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে অবাস্তব কোন মীথের ব্যাপারে মানুষকে প্রভাবিত করা সম্ভব। গণমাধ্যম বিশেষতঃ টেলিভিশনকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে, তা মানুষের চৈতন্য এবং আবেগ এবং অনুপ্রেরণাময় দিকটিকেই বশীভূত করেনি শুধু, বরং তাদের মধ্যে এই অনুভূতিকেও সৃষ্টি করেছে যে আরোপিত মতামতটি যেন তারই। সকল অগণতান্ত্রিক ক্ষমতা ও তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে টেলিভিশনকে বেছে নিয়েছে। ফলত টেলিভিশন স্বাধীনতার শত্রু হবার পাশাপাশি পুলিশ, জেলখানা এবং কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের চেয়েও বেশী ভয়ংকর হয়েছে। অতীতে শাসকের ক্ষমতা হ্রাস করার জন্যে নতুন যদি সংবিধান প্রণীত হয়ে থাকে, তাহলে এই টেলিভিশন নতুন ছদ্ম বেশী ক্ষমতা নিবারণ করার জন্যে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে।

গণসংস্কৃতি মনের এমন একটি অবস্থা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত যাকে Johan Huizinga বলেছেন ছেলেমানুষি। তিনি সমকালীন মানুষের আচরণে শিশুসুলভতা লক্ষ্য করেছেন। যেমনঃ হালকা বিনোদনে ভক্তি, পরিপক্ক হিউমারের অভাব, গণশ্লোগান ও মিছিলের দিকে ঝোঁক, ঘৃণা কিংবা ভালোবাসা, প্রশংসা কিংবা নিন্দা ইত্যাদি প্রসঙ্গে অতিঅভিব্যক্তি ইত্যাদি। পরিশেষে আমরা যন্ত্রের প্রতি একটি আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়ে দৃষ্টিপাত করতে পারি। যন্ত্র এবং প্রযুক্তির প্রতি সংস্কৃতির একটি সহজাত ভীতি বিরাগ রয়েছে। Berdjajev বলছেন যে যন্ত্র হলো সংস্কৃতির প্রথম পাপ। এই ঋণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীটি আনছে এই কারণে যে, যন্ত্র প্রথম দিকে বিভিন্ন বস্তুর উপর আধিপত্য কতো আর এখন মানুষের উপরে আধিপত্য করতে শুরু করেছে। সমণ করুন ঠাকুর (রবীন্দ্রণাথ), টলস্টয়, হেইডেগার, নীজবাস্তনী, ফকনার এবং অন্য অনেকের সাবধানবাণী। অন্যদিকে মার্কসবাদী Hanri Lefeivre সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টিভংগী পোষণ করেছেন। স্বাধীনতার সর্বোচ্চ স্তর অর্জিত হবে শুধুমাত্র সেই সমাজে যেখানে প্রযুক্তি সমস্ত সম্ভাবনার স্ফুটন ঘটবে এবং সেটা হলো কমিউনিষ্ট সমাজ-আসলে যে সমাজ পত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইউটোপিয়াকে তাদের আদর্শ মানে যে সমাজ যন্ত্র এবং প্রযুক্তিকেও তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু যন্ত্র মানুষকে ব্যবহার করে, তাকে নিরাপত্তা দেয় না; শিক্ষা ও গণমাধ্যমের সহযোগিতায় তা একই কৌশল কেন্দ্রে সকলকে আনতে চায়, অতঃপর ব্যক্তিবিশেষের ব্যাক্তিত্বকে ভোঁতা করে, তার কর্ম, চিন্তা ও বক্তব্যকে পানসে করে তাকে একটি একক সমাজ (কর্তৃত্ব) এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

নাস্তিবাদ ঃ ধর্ম এবং আধুনিক নাস্তিবাদের মধ্যে কিছু সাধারণ সাদৃশ্য থাকায় নাস্তিবাদকে সভ্যতার অন্তর্গত একটি ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। নাস্তিবাদ খোদার অস্বীকৃতি নয়,

www.pathagar.com

বরং তার অনুপস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিংবা যেমনটি বেকেট বলছেন, মানুষের অনুপস্থিতির বিরুদ্ধে তথা এই সত্যের প্রতিবাদ। যে মানুষের ধারণাটি অবাস্তবায়নযোগ্য এবং অসম্ভবতানির্ভর। এই দৃষ্টিভংগী মানুষ এবং পৃথিবী সম্পর্কে ধর্মীয় ভাবনাকে নির্দেশ করে, বৈজ্ঞানিকতা নয়। বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা অনুসারে সম্ভবপর এবং বাস্তবায়নযোগ্য। কিন্তু যা কিছু চূড়ান্তরুপে গণ্য তা-ই "অমানবিক" এবং সাত্রের বিখ্যাত উক্তি Man is a fatile passion শুনতে যেমন অন্তনিষ্ট অর্থেও তেমনি ধর্মীয়। যেহেতু বস্তুবাদে আবেগ নেই সেহেতু নিরর্থকতারও বোধও নেই। সংসারের উচ্চতর উদ্দেশ্যকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে বস্তুবাদ অনর্থকতা ও তুচ্ছতার বোধকে ধারণ করার ঝুকি থেকে মুক্ত। বস্তুবাদী পৃথিবী এবং মানুষের একটি পয়োগিক লক্ষ্য রয়েছে। কিন্তু (Manisafutile Passion) এই বক্তব্য নির্দেশ করে যে মানুষ এবং পৃথিবী অভিন্ন নয়। পৃথিবীর প্রতি এই রকমের আমূল বিরোধী দৃষ্টিভংগী থেকেই সকল ধর্মের সূত্রপাত। সার্থের অনর্থকতার বোধ এবং কামুর এ্যাদ্বেয়বসাডী একই উদ্দেশ্য ও বোধবৈদ অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধান প্রক্রিয়াটি চরিত্রের কারণ। তা মানব জীবনযাপনের বৈশ্চিক উদ্দেশ্যকে প্রত্যাখ্যান করে। খোদার অনুসন্ধান এক ধরনের ধর্ম। কিন্তু সকল অনুসন্ধানেই খোদা মেলে না। আকার বলতে হচ্ছে যে, নাস্তিবাদী দর্শনের যে উদিগ্নতার প্রকাশ তাও সর্বোতভাবেই শুধু উপসংহার ব্যতীত, ধর্মানুসারী যেহেতু নাস্তিক এবং ধর্ম উভয় মতেই মানুষ এই পৃথিবীতে আগন্তুক মাত্র। কিন্তু নাস্তিবাদের আগনতক হতাশায় হারিয়ে যাবার গল্প শোনায়, আর ধর্মের আগন্তুক উচ্চারণ করেন মুক্তির পয়গাম। আলবেয়ার কামুর বক্তব্যকে বোঝা যেতে পারে শুধু একজন হতাশ বিশ্বাসীর চিন্তা-ভাবনা হিসেবে। যে পৃথিবী থেকে হঠাৎ করে আলোর ঝলকানি তিরোহিত হয়, সে পৃথিবীতে মানুষ নিজেকে আগন্তুকভাবে। তার কাছে এটা মুক্তি সম্ভাবনাহীন নির্বাসন, যেহেতু হারানো মাতৃভুমির কোন স্মৃতি কিংবা প্রতিশ্রুতি রাজ্যেও পৌছানোর কোন বন্দোবস্ত নেই। অথবা "আমি যদি গাছ গুলোর মত একটি গাছ হতাম তাহলে জীবনের একটি বোধ থাকত কিংবা এই বোধের কোন সমস্যাই উদ্ভূত হতো না, কারণ তাহলে আমি এই পৃথিবীরই একটি অংশ হতাম। যে পৃথিবীকে এক মুহূর্তে আমি আমার সমস্ত চৈতন্য দিয়ে প্রতিরোধ করছি।" অথবা all is allowed since God doesn't exist and man dies' এই শেষের বাক্যটির সাথে বুদ্ধিবাদী চিন্তাবিদদের ঠুনকো নাস্তিকতার কোন মিল নেই। বরং এটা হলো সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে পড়া আত্মার আহাজারী। ব্যর্থতা থেকে উদ্ভুত নাস্তিকতা। নৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নে অস্তিত্ববাদী ধর্মীয় দৃষ্টিভংগী পোষণ করে। Simon de Bonviore লিখেছেনঃ শুরুতে মানুষ কিছুই নয়, ভালো বা মন্দ হওয়াটা নির্ভর করছে তারই উপর, অন্য কথায় তার স্বাধীনতা গ্রহণ বা বর্জনের উপর। নির্বাচিত স্বাধীনতা তার লক্ষ্যকে চূড়ান্তরুপে প্রতিষ্ঠা করে এবং কোন বাহ্যিক শক্তি, এমনকি মৃত্যুও এই স্বাধীনতা অনুদানকে ধ্বংস করতে পারে না। যদি এই খেলায় হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকেও তাহা প্রত্যেক মানুষের উচিত প্রতিটি মুহূতে ঝুঁকি নেওয়া ও সংগ্রাম করে যাওয়া। এমনকি সার্থের অস্তিত্বের দ্বৈততা। অস্তিত্বের দ্বারা অস্তিত্ব (eter et soi) এবং

www.pathagar.com

অস্তিত্বের জন্যে অস্তিত্ব (etre pour Soi) এটাও বস্তুবাদের পরস্পর অস্বীকৃতি। শুধু প্রতিশব্দগুলো নতুন। সারসত্যটি পুরনো এবং সহজে সনাক্তকরণযোগ্য।

সভ্যতা : সভ্যতার সমালোচনার অর্থ সভ্যতাকে প্রত্যাখ্যান করার দাবী নয়। আমরা চাইলেও সেটা সম্ভব নয়। যেটা জরুরী এবং যা সম্ভব, সেটা হলো সভ্যতার মীথকে ধ্বংস করা। সভ্যাতের মীথকে ধ্বংস করতে পারলে পৃথিবীতে মানবিকীকরণ সম্ভব হবে এবং এই দায়িত্ব প্রকৃতিগতভাবে সংস্কৃতির উপরেই বর্তায়।

মঞ্চে বিষাদবাদ : লাক্ষণিক অর্থে অমঙ্গলবোধের দর্শন আসছে শুধু বিশ্বের ধনী ও উন্নত অঞ্চল থেকে। যেমন ইবসেন, হাইডেগার সেইলার পিন্টার, বেকেট ও নীল, বর্গম্যান, কামু, আন্তনিনি প্রমুখ এরকম অঞ্চলেরই বাসিন্দা। বিজ্ঞানী, যারা বস্তুত বাহ্যিক চরিত্র বিশ্লেষণ করেন, তারা সাধারণত আশাবাদী। কিন্তু চিন্তুক ও শিল্পী, বিশেষত শিল্পীরাই বড় বেশী দ্বিধাক্রান্ত। কিছুটা হালকাভাবে দেখলে একটি জাতির জীবনে বিমর্ষবাদ প্রকাশিত হয় সম্পূর্ণ সাক্ষরতা সামাজিক নিরাপত্তার মাথাপিছু আয় কয়েক হাজার ডলারে উন্নতি হবার পর। পরিহাস হলেও সত্য যে, উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের প্রথম পর্যন্ত স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর আর্থ সামাজিক অবস্থা সবচেয়ে ভালো থাকলেও সেখানেই উৎপত্তি লাভ করে চূড়ান্ত বিমর্ষবাদী দর্শন। এ দর্শনে মানুষের ভাগ্য হতাসাপূর্ণ এবং ট্রাজিক এবং সকল মানুষের চেষ্টা ও অস্তিত্ব অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং অনর্থক। তাহলে কি বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য আধ্যাত্মিক নিরানন্দের জন্ম দেয়? অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনের বাহ্যিক কর্মকান্ডের বিপরীতে সভ্যতা এখন চিহ্নিত হচ্ছে মন্থর এবং অর্ন্তমূখী জীবনযাপন ছন্দের অনুগামী হিসেবে। এ্যাবসার্ড নাটকগুলো আজকের সবচেয়ে উন্নত সমাজের মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি। স্বাচ্ছন্দ্য বহির্নিষ্ট এবং অনর্থকতা বোধ জীবনের অন্তর্নিষ্ট অতিজ্ঞান সভ্যতার। দ্বন্দ্বিকভারে প্রকাশ করলেঃ যত বেশী স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য তত বেশী শূন্যতা ও নৈরাশ্যের অনুভূতি। বিপরীতভাবে আদিম সমাজগুলো দরিদ্র হতে পারে এবং সূক্ষ্ম সামাজিক স্বাতন্ত্রদ্বারা আক্রান্ত হতে পারে, কিন্তু তাদের জীবন একটি জীবন্ত সমৃদ্ধ ও বিচিত্র অনভূতির ধারক। ফোকলোর প্রাচীন মানুষের জীবনযাপণের অনন্য সাধারণ চিত্র উপহার দেয়। অসন্তোষ এবং নৈরাশ্য তাদের দরিদ্র জীবনে অনুপস্থিত। এই মঞ্চেই সভ্য পৃথিবী উম্মোচন করেছে তার মানবিক ট্রাজেডি। বিজ্ঞান কর্তক সভ্যতাকে উপহার দেওয়া নিশ্চয়তার মুকুটকে ছিন্নভিন্ন করেছে থিয়েটার, বিজ্ঞান প্রদান করে থাকে উৎপাদন সামগ্রীর সমৃদ্ধ তালিকা, যান্ত্রিক শক্তির প্রদর্শন ইত্যাদি। আর শিল্প নির্দেশ করেছে মানবিক গুণাবলীর অচলাবস্থা, বুদ্ধি বৃত্তিক ও নৈতিক অবক্ষয়, সন্ত্রাস পশুত্ব–এর শূন্যতা। বস্তুগত সমৃদ্ধির মধ্যে থেকে থিয়েটার আবিষ্কার করছে আক্রমনাত্মক, অসহায় এবং অপরাধপ্রবণ মানুষকে। কবিরা যদি মানুষ্য জাতির সংবেদী নিরীক্ষক হন, তাহলে তাদের ভীতি এবং সংশয় দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, পৃথিবী মানবতার দিকে এগুচ্ছে না, এগুচ্ছে উম্মুক্ত বিমানবিকীকরণ ও বিচ্ছিন্নতার দিকে। ১৯৬৮. সালে সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার পাওয়া ইয়াসুনারী কাওয়াবাতা আত্মহত্যা করেন ১৯৭১ সালে। এর দু' বছর আগে ১৯৬৯ সালে

www.pathagar.com

আরেকজন জাপানী ঔপন্যাসিক তুকিয়ো মিশিমা একইভাবে জীবনাবসান ঘটান। ১৮৯৫ সাল থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত তেরজন জাপানী ঔপন্যাসিক এবং লেখক আত্মহত্যা করেছেন। জাপানী সংস্কৃতির এই অবিরাম ট্রাজেডি' হলো জাপানের প্রথাসিদ্ধ সংস্কৃতিতে পশ্চিমা সভ্যতা ও বস্তুবাদী ভাবধারার অনুপ্রবেশের পরোক্ষ ফল। মৃত্যুর একবছর আগে কাওয়ারাতা লেখেন"মানুষ এক কংক্রিটের দেয়াল দ্বারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন, যে দেয়াল ভালোবাসার যে কোন সঞ্চালনকে বাধাগ্রস্ত করে। প্রগতির নামে শ্বাসরোধ করা হচ্ছে প্রকৃতির। তার উপন্যাস তুষাররাজ্য (১৯৩৭) তে কাওয়াবাতা আধুনিক মানুষের নিঃসঙ্গ এবং বিচ্ছিন্নতাকে কেন্দ্রীক আলোকে তুলে ধরেছেন। সকল মহৎ সাংস্কৃতি প্রতিনিধি একইভাবে সভ্যতায় মানুষের ব্যর্থতা ও পরাজয়ের চিত্র খুঁজে পেয়েছেন। আন্দ্রে মার্লো উনবিংশ শতকীয় আশাবাদের চূড়ান্ত ব্যর্থতা দেখে বিস্মিত হয়েছেন। ইউরোপ ধ্বংসাক্রান্ত এবং রক্তদ্বারা কলংকিত মানুষ তৈরী করতে চেয়েছিল এবং ইউরোপ তা করেছেও। একই চিত্র দেখেছেন পল ভেলরি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপর। নাস্তিবাদ বলছে পরিপ্রেক্ষিতহীন। পৃথিবীর কথা, বলছে ভীষণ নৈঃশব্দের কথা, বলছে ভগ্ন ও ছিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্বের কথা কিন্তু এটা কোনক্রমেই কোন বিষাক্ত দর্শন নয় যেমনটি কিছু সংখ্যক মানুষ বলে থাকেন। বস্তুতঃ এই দর্শন অত্যন্ত গভীর এবং শিক্ষাপ্রদ। এটা সেই পৃথিবীর বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ ও অসমর্থনের প্রকাশ। যে পৃথিবী তার (মানুষ) ইমেজকে মৌলিক ভাবমূর্তিকে আক্রান্ত করেছে। এটা সভ্যতার এক রৈখিক বিশ্ববিস্তারের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহ। একই কারণে কেউ কেউ আধুনিক নাস্তিবাদকে একধরণের ধর্মরূপে দেখেছেন এবং এই ধারণাটি ভিত্তিহীন নয়।

আদিম উদ্বিগ্নতা কবরপাড়ের চিত্রকল্প, এই পৃথিবী থেকে, যেখানে সে আগন্তুক মাত্র, মুক্তি লাভের পথ অনুসন্ধানের বেপরোয়া প্রচেষ্টা এসব কিছুই ধর্ম এবং নাস্তিবাদে উপস্থিত। পার্থক্য শুধু এই যে, এ প্রচেষ্টায় নাস্তিবাদ কোন পথ খুঁজে পায়নি, কিন্তু ধর্মে এই পথের সন্ধান মিলে গেছে।

বিজ্ঞান, ক্ষমতা এবং সমৃদ্ধির মাধ্যমে মানবিক সুখের সমস্যার সমাধানে সভ্যতার নিদারুণ ব্যর্থতাকে যখন মানুষ উপলব্ধি ও স্বীকার করবে তখনই মানুষ জাতির উপর সবচেয়ে কঠিন মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবটি আসবে। তখন সময় হবে ইতিপূর্বে গৃহীত কিছু চিন্তাধারার পুনর্বিবেচনার। প্রথম পুনর্বিবেচনার বিষয় হবে মানুষকে নিয়ে গড়ে উঠা বৈজ্ঞানিক ভূল ধারণা। কারণ সভ্যতা যদি মানুষের সুখশান্তি সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়ে থাকে, তাহলে মানুষের উৎপত্তি বিষয়ে ধর্মীয় ধারণাটিই সত্য এবং বৈজ্ঞানিক ধারণাটি মিথ্যে। তৃতীয় কোন বিকল্প নেই।

নীতি এবং ইতিহাস

আমরা 'কেন' এই বিশ্বসংসারে বেঁচে আছি? এ প্রশ্ন সংস্কৃতির। আর–কিভাবে আমরা বেঁচে আছি – এ প্রশ্ন সভ্যতার। একটি জীবণের অর্থ সম্পর্কিত, অপরটি জীবন যাপন প্রণালী সম্পর্কিত। সভ্যতার নানা রঙ প্রতিভাত হচ্ছে সেই আগুণ আবিষ্কার থেকে আরম্ভ করে জলকল, লৌহ, লেখা, ইঞ্জিন, তারপর আনবিক শক্তি, নভোচারণ ইত্যাদি ক্রমউৎকর্ষের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সংস্কৃতির অন্য

www.pathagar.com

চরিত্র। সেই ঠিকই নতুনভাবে সব কিছু আরম্ভ করছে। কিন্তু পেছণের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সংস্কৃতির বিষয়বস্তু হিসেবে মানুষের যে প্রতিকী ভালোমন্দ, সদগুণ ও সংশয় তা তার মানবিক অস্তিত্বকেই সংহত করে এবং এটা এক ধরণের অপরিবর্তনীয়তা। আজকের সকল সংকট ও সমস্যা, দুহাজার বছর আগেই নীতিভাবাপনায় পরিচিত ছিল। মানবতার সকলশিক্ষাকে পয়গম্বর মুসা, যীশুখৃষ্ট, মুহাম্মদ (সাঃ) এবং অপয়গম্বর কনফুসিয়াস, গৌতম বুদ্ধ, সক্রেটিস, কান্ট, টলস্টয় এবং মা-টির বুবার (খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে বর্তমান কাল অবধি) সকলেই আবার সুবিচারের একই নৈতিকতা শিক্ষা দিয়েছেন। সামাজিক শৃংখলা এবং উৎপাদনের উপায়সংক্রান্ত নিয়ম থেকে নৈতিক মতগুলো পৃথক এবং তা অবিচ্ছিন্নতা পরিচায়ক (Constant) কিন্তু বাস্তব জীবনে সবকিছু বিপরীত ক্রমিক যেমন John Kenneth Golbratth বলেন, পরিবর্তনশীলতাই অর্থনৈতিক জীবনের নিয়ম। নৈতিক সত্য গুলোর অপরিবর্তনশীলতার কারণ নিহিত রয়েছে সেই সৃষ্টিকালীন সময়ে যখন সমস্ত মানবিক দ্বন্দপ্রকরণ ও রহস্যকে আমাদের জীবনের সাথে স্থিত করে নেয়া হয়েছিল। এ কাজটি মানবেতিহাস শুরু হওয়ার পূর্বেই সংগঠিত হয়েছিল স্বর্গে। বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ঐ ব্যাপারটি জানতে আমাদেরকে সহায়তা করতে পারেন। যীশুখৃষ্ট তাঁর সতসত্যকে উচ্চারণ করেন তাঁর মিশন সম্পন্ন করেন খোদা এবং মানুষ সম্পর্কে মহৎ সত্যগুলো জ্ঞান বা অতিজ্ঞতার মাধ্যমে অধিগম্য নয়। (সেন্ট লূকঃ ১০ঃ২১) সারবত্তীয় নৈতিক নির্দেশনাগুলো স্থান, কাল ও সামগ্রিক পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত নয় পৃথিবীব্যাপী মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক পদ্ধতিসমূহ এবং তাদের গতিবিধির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমরা নৈতিক নীতিগুলোর মধ্যে আশ্চর্যজনক সামঞ্জস্য লক্ষ্য করি। (টলস্টয় বলছেন, খোদা কি? এ ব্যাপার যদিও বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রকম মন্তব্য করে থাকে কিন্তু খোদা তাদের নিকট কি চায় সে ব্যাপারটা যেন সকলেই সমানভাবে বুঝে থাকেন) Epictetus এবং Marcus Aurelius একজন দাস অপরজন রাজা। এরা একই নৈতিক শিক্ষা এমনকি একই বাক্যমালা প্রচার করেন। সাধারণভাবে যে সমস্ত ভালো-মন্দ নীতি-অনীতির ধারণ স্থান-কাল পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয় সে গুলো কম গুরুত্ব পূর্ণ প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত। নৈতিক মৌলিক চেতনায় অথবা সর্বত্র সার্বজনীনত্ব লক্ষ্য করি। এই ব্যাপারটি কান্ড-এর বিখ্যাত Categoric Imperative দ্বারাও দৃঢ়কৃত হচ্ছে। এই নীতি, যা প্রাচীন চিন্তাবিদদের মধ্যে পাওয়া যাবে, প্রথম সংজ্ঞায়িত হয়েছে কান্টের Foundation of the Meatphysics Morals এ এঁইভাবেঃ "কাজ কর শুধু মাত্র সেই নীতি অনুযায়ী যাকে তুমি চাও একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে গড়ে উঠুক" এবং এরপর তাঁর Critique of pure Rason এ বললেন, "প্রাচীন গ্রীসের সাত সাধুর এক সাধু থেলেস (জন্ম ৬৪২ খৃঃ পৃঃ) কিভাবে সৎ জীবনযাপন করা যায় সে প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে কাজের জন্যে আমরা অন্যকে তিরস্কার করি সেটা করা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে। সাত সাধুর অপর একজন পিথাকাসও একই কথা বলেছেন। প্রাচীন রোমের সিসেরো বলেন অন্যের যা কিছুকে তুমি সমালোচনা কর। নিজে সেটা করা থেকে দুরে থাকো। ইহুদী চিন্তাবিদ হিল্লেল, যিনি যীশুখৃষ্টের

www.pathagar.com

সমসাময়িক ছিলেন এবং প্যালেষ্টাইনে বাস করতেন, তাকে যখন একজন বহু ঈশ্বরবাদী ধর্মের সার সংক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে বলেছিলেন, তিনি উত্তরে বলেছিলেন "যা তুমি নিজের জন্যে চাওনা তা তোমার প্রতিবেশীর জন্যও চেও না। সমস্ত তওরাত এরই নীতির সাথে সম্পৃক্ত।" (Babuloninan Talmud. Part-Sabbath) এই একই জ্ঞান চীনদেশে শিক্ষা দিয়েছিলেন কনফুসিয়াস, যিনি বুদ্ধি এবং পিথাগোবাসের সমসাময়িক ছিলেন "আমি নিজে যা করতে চাইনে, তা অন্যের জন্যে করি না। (Lun-Yu, Thoughts and Talks of Comfusious) এই নীতি খ্রীষ্ট প্রকাশ করেছেন তাঁর বিখ্যাত উক্তিতে " Do unto otharsas you would have them unto you" (St. Mathew 7: 2 SL. Lhke 6:31 Gatcgoric Imperative' এর এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রমাণ করে যে, এই সর্বছোঁয়া নৈতিক নীতিটির কোন ইতিহাস নেই। আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য থাকতে পারে কিন্তু সারসত্যটি সর্বত্রই এক।

ধর্ম এবং জীনব

দ্বৈততা (Dualiy) কোন দুরূহ তত্ত্বদর্শন নয়; এটা জীবনেরই চূড়ান্ত রূপ। ব্যাপারটিকে তলিয়ে দেখা যেতে পারে। কবিতা মূলত হৃদয়কেন্দ্রিক শিল্প, কিন্তু মহত্তম কবিগণ হোমার, ফেরদৌসী, দানতে, সেক্সপীয়ার, গ্যাটে তাঁদের কবিতাকে যুক্তি এবং অনুভূতি, বিজ্ঞান এবং সৌন্দর্য দিয়ে সাজিয়েছেন। কবিতা ব্যক্তিসৃষ্ট; সমাজের সৃষ্ট নয়। কিন্তু ব্যক্তি হোমারের কবিতা গ্রীক জাতি গঠনে সাহায্যে করেছিল এবং হুইটারের অগ্নিগর্ব কবিতা সাহায্য করেছিল আমেরিকার দাসপ্রথা নির্মূল করেন। অংক বুদ্ধির অধিগত, কিন্তু "একজন ভালো অংকশাস্ত্রবিদ একজন ভালো কবিও বটে"। বলেছেন (Weirstrass) সকল উচু মাপের পদার্থ বিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী একদিন থেকে রহস্যবাদী ছিলেনঃ কোন কোনাগারনিকাস, নিউটন, কেপলার, আইনস্পাইন, আপেনহেইমার প্রমূখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। শাস্তি একটি অবদানমূলক পদক্ষেপ হলেও শাস্তিটা যথার্থ হলে তা থেকে অপরাধী এবং অন্যদের জন্য একটি শিক্ষামূল্য থেকে যায়। এদিকে স্রষ্টার প্রতিভয় থেকে যেমন নৈতিকতার শুরু তেমনি স্রষ্টার প্রতি ভয় থেকেই স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসারও শুরু। খেলাধুলা যদিও একটি দৈহিক তৎপরতা মাত্র, এর একটি শক্তিশালী শিক্ষনীয় দিকও আছে। প্লেটো তার এই নামটি পেয়েছেন তার চওড়া কাজের জন্য। শক্তিশালী দেহ উন্নত আত্মার সেবক। দেহ এবং আত্মা, হৃদয় এবং দেহ বিজ্ঞান এবং ধর্ম, পদার্থিব চিন্তা এবং ভাববাদী দর্শন এমন একটি কেন্দ্রে মিলিত হয় যেখানে জীবনের মৌলিক চিত্রটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। নগ্ন বুদ্ধিমত্তা এবং খাঁটি ভাবগ্রহ নিশ্চিতভাবেই অবক্ষয়ের পরিচায়ক। এ প্রেক্ষিতে আরও কয়েকটি দিক বিবেচনা করা যেতে পারে। তথাকথিত সহজাত শিক্ষার। (Natural educaion) উদ্ধেশ্যে কি? রুশো এর একটি উত্তর দিয়েছেন এভাবে যে, "যা কিছুর পারস্পরিক সমঝোতাকে কষ্টকর বলে বিবেচিত অথচ মহৎমনীষীগণ সে সমঝোতাকে সম্ভব করে তুলেছেন। তারই চর্চা করা হলো সহজাত শিক্ষার উদ্দেশ্য; যেমনঃ দৈহিক ও মানসিক শক্তি, দার্শনিকের রোধি এবং ক্রীড়াবিদের নৈপণ্য।"

www.pathagar.com

নীতিগতভাবে নৈতিকতার সাথে বল প্রয়োগ বা ক্ষমতার সম্পর্ক নেই। কিন্তু বাস্তব জীবনে শক্তি প্রয়োগ বা ক্ষমতার সম্পর্ক নেই। কিন্তু বাস্তব জীবনে শক্তি প্রয়োগ ছাড়া সুবিচার সাধন সম্ভব নয়। সুবিচার হলো ন্যায়ভিত্তিক সমতা এবং ক্ষমতার ধারণার মধ্যকার ঐক্যবিধান। বহুল পরিচিত যে রাজনৈকিত সাম্য-স্বাধীনতা-ভ্রাতৃত্বের ধারণা তা এসেছে ধর্ম থেকে , কিন্তু বাস্তবে তাদেরকে বিপ্লব তথা রাজনীতি ও সন্ত্রাসের মধ্যদিয়ে বস্তুগত করা হয়েছে। স্বীয় মহৎ আদর্শগুলো জোর-জুলুমপূর্বক বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে ধর্মের অক্ষমতা রয়েছে বলে তার আবেদনগুলো পৌছনো হয় বিনীত ও অত্যাচারিত মানুষের নিকট। অপরপক্ষে ধর্মের এই অক্ষমতার সুযোগে রাজনীতি এবং সন্ত্রাস ধর্মগত আদর্শকে তাদের নামেই চালিয়ে দিতে পেরেছে। মানুষের কাজের কথা-ই ধরা যাক। প্রথম দৃষ্টিতে এর দুটো দিক আছেঃ (১) স্বয়ং কাজটি যা মানবিক এবং যা উপযোগহীন (২) সেই কাজের ফলাফলটি উৎপাদন বা উপযোগিতাহী। ধর্ম সম্পৃক্ত প্রথমোক্ত ধারণ এবং সভ্যতা দ্বিতীয়টিতে।

ধর্ম পৃথিবীতে মানুষের ভাগ্যকে স্থির করেছে এই বলে যে, "কপালের ঘাম ঝরিয়ে তোমারা রুটি রুজি অর্জন কর।" কিন্তু বিজ্ঞান এবং বস্তুবাদ প্রধানত দাবী করে কর্মহীন পৃথিবী যেখানে যন্ত্রই ক্রমবর্ধমানভাবে মানুষের কর্দার্য সেরে দেবে: ধর্ম পাপ থেকে মুক্ত থাকার মাধ্যম হিসেবে কাজকে কাজের জন্যই দাবী করে। যেমন বলা হয়েছে, "অলস মস্তিষ্ক শয়তানের বাসা।" উদ্দেশ্য বস্তুজীবনের উৎপাদন ও পুনঃউৎপাদন নয়। অপরপক্ষে সভ্যতা উদ্বিগ্ন কাজের ফলাফল বা উৎপাদন নিয়ে।

মার্কসবাদী লেখক Henry Lefelvre এর মতে কাজ একটি উৎপাদন সংক্রান্ত ব্যাপার, নীতির নয়। এক কথায় ধর্ম সবাইকে কাজের মধ্যে আনতে চায় ফলাফলকে অত্যধিক গুরুত্ব না দিয়ে। অপরপক্ষে সভ্যতা চায় কাজের ফল; সভ্যতা চেষ্টা করে অন্য দেশের নিয়োজিত করার মাধ্যমে নিজেরা যথাসম্ভব কাজ থেকে দূরে থাকতে; যেমন প্রাচীন আমলে দাস এবং আধুনিক যুগের যন্ত্রের ব্যবহার। এভাবেই কাজ দু'টি ধারায় বিশ্লেষিত হচ্ছে। কিন্তু সার্বিকভাবে একটি উপযোগসম্পন্ন ব্যাপার এবং একটি ঐক্যও একক হিসেবে কাজের নৈতিক এবং অর্থনৈতিক দুটো প্রেক্ষিতেই রয়েছে এবং এ প্রেক্ষাপটে প্রতীকী অর্থেই (SymbolicallY) কাজ একটি ইসলামী ধারণা। প্রয়োজনীয়তা ও নৈতিকতা তথা বিজ্ঞান ও নৈতিক দৃষ্টিভংগির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক এখানে বিবেচিত হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে আমরা নিকট আত্মীয়ের বিবাহে নিষেধাজ্ঞার প্রসঙ্গ আনতে পারি যা সকল সময় ও কালের একটি সার্বজনীন ধারণা। এখানে জীবন স্বয়ং যেন ইসলামী পথটিই অনুসরণ করে। নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহে যে নিষেধাজ্ঞা তা খাটি নীতিবোধ থেকে এসেছে না-কি তা বায়োলজিক্যাল কারণের উপর প্রতিষ্ঠিত? সরলভাবে এর উত্তর দেয়া যাবে না। বায়োলজিক্যাল কারণটি সন্দেহের অতীত। বিখ্যাত রুশ জীব বিজ্ঞানী Timiriazev লিখেছেনঃ "পিতা-মাতার মধ্যকার নিকট সম্পর্ক যে সন্তানের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে তার যথেষ্ট

www.pathagar.com

প্রমাণ রয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে জানা গেছে যে, এটা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যা শুধু মানুষেরই প্রয়োজন (Life of Plans. p/ 134) আবার অযাচারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাটি খুব পুরনো রীতি যা আমাদেরকে এর নৈতিকভাবে ভূল মনে করা হয় এবং ফলতঃতা নিষিদ্ধ। সে ক্ষেত্রে এটা নীতি এবং বিজ্ঞানের মধ্যকার সামঞ্জস্য ও সম্পর্কের একটি দারুণ দৃষ্টান্ত বৈকি এবং এখানে আমরা ইসলামকেই পাচ্ছি আবার চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে যা কিছু অবদান রেখেছে তাদের মধ্যকার চরিত্রগত দ্বৈততা উপলব্দি করি। চিকিৎসা ব্যাপারটি কখনোই একটি খাঁটি বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি। একই সময়ে বিজ্ঞতা, নীতি এবং আধ্যাত্মিক শৃংখলারও ব্যাপার। সম্প্রতি এমন অসুস্থতার সন্ধান পাওয়া গেছে যার কোন সত্য ব্যাখ্যা নেই। রোগীর সমস্যাটি তার মনোজগৎ থেকে উৎসারিত। এদিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক একটি শাখা সাইকোকসমিক, যা শরীর ও মনের মধ্যকার আন্তঃক্রিয়া বিষয়ে গবেষণা করে। এর মতে আলসার, হাঁপানী, ডায়াবেটিস এগুলোর উৎপত্তি প্রাথমিকভাবে মনস্তাত্বিক জগৎ তথা মনোগত দ্বন্দ্ব বা পীড়ন থেকে।

এ কারণে সত্যিকার চিকিৎসা শুধুমাত্র দৈহিক রাসায়নিক থেরাপি বা অস্ত্রোপাচার যা অন্য কোন যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পর্যবেক্ষিত করা যথার্থ নয়। কারণ বাস্তবে "কোন অসুস্থতা নেই, আছে অসুস্থ মানুষ।" সত্যিকার চিকিৎসা রোগ বিষয়ে যতটা উদ্বিগ্ন, তার চেয়ে বেশী রোগী নিয়ে বা রোগী ব্যক্তিত্ব নিয়ে। কারণ একই রোগের উপসর্গ সকল সময় একই হয় না বা একই রোগের দু'জন রোগীর জন্য চিকিৎসা বিধান একই রকম নাও হতে পারে। এ কারণে প্রার্থনা, উৎসর্গ, উপোস এবং বিভিন্ন আচার-নিষ্টার যে (রোগ মুক্তির জন্য) পুরনো কাহিনী জানি তার মধ্যে সত্যের কণা নিহিত আছে বলে স্বীকার করতেই হয়। এ প্রবনতা আজকের যুগেরও ধরে রাখা হয়েছে। প্যারিসের কয়েকটি হাসপাতালে মিউসিকোথেরপি প্রয়োগ করা হয়, যেহেতু অসুস্থতা শুধুমাত্র দেহ-নির্ভর নয়। এখানে মানুষকে প্রভাবিত করে এমন অনেক কিছুরমত ঔষধ বা চিকিৎসককেও উপলব্ধি করতে হবে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যকার অন্তযোগেরর ফলাফল হিসেবে। এভাবে যদি আমরা সবকিছু বিবেচনা করে থাকি তাহলে এই দ্বৈততার আরও দৃষ্টান্ত দেখি; কখনোই সম্পূর্ণভাবে যান্ত্রিক হতে পারে না-যেমনটি হতে পারে না সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টিশীল। এমন কোন কারুকর্ম নেই যা সৃষ্টিশীলতা নির্দেশ করে না। আবার এমন কোন কারুকর্ম নেই যা সৃষ্টিশীলতা নির্দেশ করে না। আবার এমন কোন শিল্পকর্ম নেই যা টেকনিক নির্দেশ করে না। একই দ্বৈততা আমরা জীবন জগতের অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখিঃ রয়েছে শিল্পী, রয়েছে শিল্পের ক্রেতা-বিক্রেতা; রয়েছে পুজি বিনিয়োগকারী ইত্যাদি ইত্যাদি। সংগীতের ইতিহাসও টেকনিক এবং অর্কেস্টার ব্যাস্থাপনা নিয়েও যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিলেন। জীবন সব সময়ই দুটো স্বাধীন বাস্তব সত্তার মধ্যকার পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফল। অন্যকথায়, মানুষের জীবতাত্বিক এবং ভিত্তির সম্মিলিত প্রভাবে এবং চৈতন্যবাহী মানবিক সৃষ্টিশীলতা শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ; প্রতিনিধিত্বশীল ধারণাও আদর্শ ইত্যাদির সম্মিলনে গড়ে ওঠেছে ইতিহাস। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতিটি মুহূর্ত এই দুটো অত্যাবশ্যকীয়

www.pathagar.com

স্বতন্ত্র গতি শক্তিরই ফল। ইতিহাসের গতিধারা নির্মাণে মানুষের যে প্রভাব তা নির্ভর করে তার ইচ্ছা শক্তির এবং চৈতন্যের স্তরের উপর। ইতিহাস নির্মাণে অংশগ্রহণকারীদের আধ্যাত্মিক সামর্থ্য যত বেশী বাহ্যিক চিন্তার বেষ্টনী থেকে তারা এত বেশী মুক্ত। মূলত মানুষ সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন। বাহ্য নিয়মের কোন আধিপত্য তার উপর নেই। তার ইচ্ছা-শক্তি দিয়ে সে অসুস্থতা এবং বিপদাপদকে প্রতিরোধ করেছে। একজন সাধারণ মানুষকে সিংহ পালের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করলে তার ধ্বংস অনিবার্য, কিন্তু সে কথা একজন সিংহপালকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ইতিহাস হলো অল্প সংখ্যক ব্যক্তির ইচ্ছা-শক্তিসম্পন্ন। উদ্যমী-সাহসী এবং বুদ্ধিমান মানুষের মগজ যা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ধারায় স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন প্রকৃতি এবং ইতিহাসের উপরে আমাদের যে আধিপত্য তা নির্ভর করে প্রাথমিকভাবে আমাদের নিজেদের উপর। আমাদের আধিপত্য বা নিয়ন্ত্রণ থেকে। এটাই ইতিহাসের ইসলামী দৃষ্টিভংগি। এই দৃষ্টিভংগি ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে আদর্শের সৃষ্টিশীল প্রভাব এবং মানুষের ইচ্ছা-শক্তি ও ক্ষমতার মাধ্যমে সংগঠিত এই ঐতিহাসিক বাস্তবতার পরিবর্ধন, পরিবর্তন বিষয়ে ব্যাখ্যা দান করে। পাশাপাশি তা নৈব্যক্তিক এবং বস্তুগত কার্যকারণ বা বাহ্য ঘটনাবলীকেও সমান ভাবে ব্যাখ্যা করে। কাজেই ইসলামী দৃষ্টি ভংগি ঐতিহাসিক নিয়ন্ত্রণবাদ এবং বাস্তবতা বিচ্ছিন্ন শূন্য ভাববাদ উভয়ই প্রত্যাখান করে। ঘটনা এবং ধারণা --- এবং মানুষ তাদের সঠিক মূল্যমানটা অর্জন করে এই ইসলামী প্রেক্ষিতেই।

ধর্মবিপ্লব, সর্বহারা শ্রেণী ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

ধর্মবিপ্লব

বিপ্লব কখনোই শুধুমাত্র সত্তা, অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতি পরিবেষ্টিত ঘটনা নয়। প্রত্যেক সত্যিকারের বিপ্লব বিশ্বাস ন্যায়বোধ, আকাঙ্খা, ত্যাগ ও আত্মউৎসর্গের সহযাত্রীও বটে। যারা বিপ্লবে অংশ নিয়েছেন কিংবা অতি নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন তারা প্রত্যেকেই বিপ্লবের এই নীতি প্রতিচ্ছবিকে স্বীকার করবেন। তাদের কাছে বিপ্লব একটি মহাকাব্য, শাসকশ্রেনীর সাময়িক উৎপাটন নয় শুধু। অন্তনিষ্ঠ প্রক্রিয়ায় জীবনের একটি অংশ হিসেবে বিশ্লেষণ করলে বিপ্লবকে মনে হয় একটি নাটক, যা মানুষকে প্রভাবিঃমধ্য দিয়ে। কিন্তু এদের মৃত্যু ঘটে বিলাস ও স্বচ্ছলতার মধ্য দিয়ে। তাদের সত্যিকার জীবন ততক্ষণই, যতক্ষণ তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের সংগ্রাম চলে। সেই প্রক্রিয়াটি শেষ হওয়ার অর্থ তাদের মৃত্যু হওয়া।

ধর্ম এবং বিপ্লব উভয়ই প্রতিষ্ঠিত হবার পর তৈরি করে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান এবং কাঠামো, যা ধীরে ধীরে তাদেরই স্বাসরোধ করে। আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাই বৈপ্লবিক নয়, ধমীয়ও নয়।

বিপ্লবের যদি কোন ধর্মীয় প্রতিপক্ষ থেকে থাকে তবে সংশ্লিষ্ট ধর্মটি আনুষ্ঠানিকতার ধর্মমা, যার অস্তিত্ব চার্চ এবং মোল্লাতন্ত্র নির্ভর।

বিপরীতভাবে যে বিপ্লব আমলাতন্ত্র ও কাঠামোভিত্তিক, তা ছদ্মবিপ্লব মাত্র এবং এই বিপ্লবের বন্ধুত্ব হয় আমলাতন্ত্র অপ্রিয় ঐ মিথ্যে ধর্মের সাথেই।

www.pathagar.com

শ্রমিক শ্রেণী

তথাকথিত খাটি সভ্যতার ঋণাত্মক প্রভাব সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শ্রমিক শ্রেণী। কারখানা শ্রমিকের ব্যক্তিত্বকে শান্ত ও নিস্পেষিত করে। শুধু তাই নয়, একজন সমাজ বিজ্ঞানী লিখছেন কর্মীরা একটি কঠিন শৃংখলার অন্তভূক্ত থাকাকালে প্রাপ্ত অভ্যাসকে স্বীয় সংগঠন গুলোতে চালান করে দেয়। তাদের ক্ষমতাকে তারা তাদেরই সৃষ্টি আমলাতন্ত্রে চালান করে দেয় যা পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক উভয় প্রকার দেশেই রক্ষণশীল ভূমিকা পালন করে থাকে।

Harbest Marcuse দেখেয়েছেন, উন্নত পুঁজিবাদী দেশে যেকোন প্রযুক্তি এবং কলকারখানার প্রভাব সবচেয়ে বেশি সেখানে কোনক্রমেই শ্রমিকরা আর বৈপ্লবিক শক্তি হিসেবে থাকতে পারে না। পরোক্ষভাবে তারা শাসক শ্রেণীর স্বার্থ সেবক হয়েছে এবং তাদের কথা তত্ত্বপুস্তকে উদ্ধৃত হয়েছে ঘন ঘন, কিন্তু প্রয়োজনে তাদের পরামর্শ গ্রহণ ও অনুসরণ করা হয়েছে খুব কমই। পৃথিবীর দুই বৃহত্তম শ্রমিক শ্রেণীর (যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়া) রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উপর তাদের কোন রকম প্রভাব নেই।

ধর্ম এবং শিল্প থেকে বিচ্যুতি ছাড়াও এই পরিস্থিতির আরও একটি ফল হলো চিন্তার দারিদ্র্য তথা শ্রেণী সংগ্রামের তাত্বিক ব্যাখ্যার বন্ধ্যত্ব। এই বিষয়টি Gorz. Garaudy, Basso এবং Malle এর মত কমিউনিষ্টদের লেখায় স্বীকৃত হয়েছে। একটি ইটালীয়ান সংবাদপত্রে ১৯৬৫ সালে প্রদত্ত এক সাক্ষাতকারে সুপরিচিত মার্কসবাদী লেখক Grorge Lukacz বলেন "মার্কসের পর লেনিন ছাড়া কেউই, পুঁজিবাদের সমস্যার ব্যাপারে কোন তাত্বিক ব্যাখ্যা দেননি।" স্টালিনের শাসনামল বিবেচনা করে বলেছেন "সকল মুক্তচিন্তা দমন করা হয়েছে এবং ক্ষমতাধর ব্যক্তির ব্যক্তিগত মতই তাত্বিক লাইন বলে ঘোষিত হয়। একটি সম্পূর্ণ প্রজন্ম এই তাত্বিক বিকৃতির মধ্যে বেড়ে উঠেছে। বস্তুতঃ মার্কস ছাড়া, যিনি নিজেও শ্রমিক শ্রেণীর নন, মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে এসেছেন, আর কেউ শ্রমিক শ্রেণী সংলগ্ন যথার্থ এবং মৌলিক ধারণাগুলো উপহার দিয়েছেন।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে ঝাঁকুনি দিয়ে যায় যে ধর্মঘট তা এক ধরণের অর্থনৈতিক নিয়ম বটে এবং এর সমাপ্তি ঘটে শ্রমিক নেতাদের সাথে বেতন বাড়তিসহ কিছু সমঝোতামূলক ফর্মুলা দ্বারা। এদিকে যেহেতু শ্রমিক শ্রেণীর ভীষণ দারিদ্র্য থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমাজের বিপরীত ধর্মী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের পরিবর্তে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের পরিবর্তে শ্রেণীমৈত্রী প্রতিষ্ঠা হবার পথ পাকাপোক্ত হয়েছে।

মার্কস-এর মত অনুযায়ী ক্লাসিক্যাল শ্রমিক শ্রেণী তথা কারখানার অত্যাচারিত প্রলেতা রিয়েত বা তাদের একই অবস্থা থেকে উত্তরণে আসার মুহূর্ত পর্যন্ত অস্তিত্বহীন থাকবে এটা একটি অস্থায়ি চিন্তা প্রকল্প মাত্র। যন্ত্র কায়িক পরিশ্রমের পরিবর্তন হচ্ছে এবং মানুষের কর্মকান্ডে প্রতিনিয়ত বৃহৎ

www.pathagar.com

স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিসমূহের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তথা উৎপাদন মাধ্যমের উন্নতি শ্রমিকদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে না, বরং নিঃশেষ করছে। উপরন্তু উৎপাদনের সামাজিক গুরুত্ব সমর্পিত হচ্ছে প্রযুক্তিগত যন্ত্রময়তায়। আদর্শবাদ এবং বৈপ্লবিক রোমান্টিসিজম–এর শেষ চিহ্নটি পর্যন্ত অদৃশ্য হয়েছে। টেকনোক্রেসি–এক বুদ্ধিবৃত্তিক ও নিষ্ঠার স্বৈরক্ষমতা যা কিনা সভ্যতার উপাদান, বিশ্বমঞ্চে অনেসক দূর এগিয়ে এসেছে।

গ্রাম ও নগর

একটি বৃহৎ নগরীকে কবি বিবেচনা করেছেন 'দোযখ' রূপে। অপর দিকে মার্কসবাদীরা গ্রামে বসবাস করাকে বলছেন গর্দভের কর্মকান্ড। নগরী সম্পর্কে কবিদের যে বিরাগ, তা খাঁটি মানবিক প্রতিক্রিয়া, সেহেতু প্রত্যেক মানুষই একদিক থেকে কবি। পর্যকালের মতো আজও নগরী এবং সভ্যতার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ, তা আসছে ধর্ম, সংস্কৃতি এবং শিল্প থেকে। প্রথম দিবকার খৃষ্টাদের নিকট রোম ছিল শয়তানের রাজা।

নগরীর আয়তন প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে ধর্মবোধের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। কারণ নগরীর আয়তন যত বাড়ে মানুষকে বিচ্ছিন্ন রেখে নাগরিক উপাদানের কেন্দ্রিকরণও তত বাড়তে থাকে। যত বড় নগর, তত সংক্ষিপ্ত প্রকৃতি ও আকাশ, তত বেশি ধোঁয়া, কংক্রিট, তত বেশি অপরাধপ্রবণতা। ধর্মবোধ বিপরীতক্রমে এবং অপরাধ প্রবণতা সরাসরি নগরীর আয়তনের সাথে পম্পর্ক । একজন গ্রামীণ মানুষ মিশে যেতে পারেন তারা খচিত আকাশ, অবারিত মাঠ, ফুল, পাখি, নদী ইত্যাদির সাথে। প্রকৃতির হৃদয়কে তিনি অনুভব করতে পারেন। সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতি, বৈবাহিক রীতি, পল্লীগীতি, নৃত্য ইতাদি একজন গ্রামীণ মানুষের নিকট এমন এক সাংস্কৃতিক ও সৌন্দর্যতাত্ত্বিক বোধ নির্মাণ করে, যা একজন শহরবাসীর নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। বেশীরভাগ শহরে মানুষ এক ধরণের বন্ধ ব্যারাকে বসবাস করে এবং তাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা হলো গণমাধ্যম এবং গণউৎপাদনের দ্রব্য পুঞ্জ। সেই আদিম মানুষের ভাববৈচিত্র কি আধুনিক মানুষের নিকট অদৃশ্য হয়ে যায়নি? তুলনামূলকভাবে একজন নগরবাসীর শিক্ষা–সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ বেশি। এই মতটি আমাদের যুগের সবচেয়ে মারাত্মক ভুলগুলোর একটি। ছুটি কাটানো উপলক্ষ্যে কনসার্ট, জাদুঘর বা চিড়িয়াখানা দেখা জীবন্ত সুর্যোদয় বসন্তে জেগে উঠা প্রকৃতি দর্মনের বিকল্প হতে পারে কি?

এখানে স্পষ্ট হয়, জীবনযাত্রার কিংবা শিক্ষার মান নয়, বিশেষ আধ্যাত্মিক আবহ ও অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্রই নির্দেশ করে কেন গড় পড়তা বিচারে গ্রামীণ মানুষেরা ধার্মিক শিক্ষা এবং সংস্কৃতিতে নাস্তিকতার বিকাশ প্রকল্প, বিজ্ঞান এবং সভ্যতায়।

www.pathagar.com

রাজনীতিতে মানবাধিকার + উত্তরাধিকার ও কেয়ার টেকার সরকারঃ আদর্শিক দন্দ্ব ও নির্বাচন

যে কোন বিবেচনায় বাংলাদেশ একটি জাতি-রাষ্ট্র। জাতীয় জীবনে বাহ্যতঃ অনৈক্য সৃষ্টিকারী উপাদান প্রায় অনুপস্থিত। কিন্তু ঐক্যের দারুন অভাব সর্বত্রই উপস্থিত। ম্যাকিয়াভেলীয় রাষ্ট্র শক্তি খুব দ্রুত জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলা আনতে সমর্থ। তবুও ইউরোপীয় জাতি-রাষ্ট্রে এ তত্ত্ব কার্যকর হতে সময় লেগেছে কয়েক শতাব্দী। অবশ্য সে শৃঙ্খলার ব্যাপ্তি অনেক বেশী। '

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করে মুসলিমলীগ। এ বাংলার জীবন ধারায় এক ধরণের ঐক্য সৃষ্টির প্রয়াস চালায়। ঐক্য সৃষ্টির প্রয়াসে রাষ্ট্র শক্তি ইসলামের উপর সওয়ার হয়। তদানীন্তন পূর্ব- বঙ্গীয় মুসলিম জীবন ধারায় পাক-রাষ্ট্র শক্তির উথান ছিল একটি অতীব শস্তা রাজনৈতিক ধারা। এর পরিণতি সম্পর্কে বুদ্ধিজীবীদের ধারণা ছিল অস্পষ্ট। তাই পশ্চিম পাকিস্তানীদের চাইতেও বঙ্গীয় মুসলমানরাই পাক-রাষ্ট্র শক্তি সৃষ্টির উম্মাদনায় অধিকতর তীব্রভাবে আচ্ছন্ন ছিল। যারা ভিন্নমত পোষণ করেছেন তাদের একজনের বক্তব্য ঃ "জগৎজোড়া বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ - এর সামনে মানুষ আজ সত্যিই অসহায়"। মানুষ আজ হয়েছে ধ্বংসের দূত-সংঘবদ্ধতা তাদের প্রধান অথবা একমাত্র পরিচয় আর সেই সংঘবদ্ধতা ছড়িয়ে চলছে মারীবিষ। সংঘবদ্ধতা স্বভাবতঃ মানুষের এক শ্রেষ্ঠ পরিচয়। কিন্তু মানুষের বিকৃত বুদ্ধি সংঘবদ্ধতাকে করে তুলেছে এমন অভিশপ্ত। (শাশ্বত বঙ্গ, পৃষ্ঠা ২২) এ অভিশাপ থেকে মুক্তির আশায় এ উদ্ধৃত অংশের লেখক মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে কলকাতায় স্থায়ী নিবাস গড়ে তুলেন। এ অভিশাপের মূল জন্মদাতা ও লালনকর্তা কিন্তু কোন দেশের জনপদ নয়। রাজনৈতিক দল বা শক্তিই এর বৈধ পিতামাতা।

আধুনিক রাষ্ট্র রাজনৈতিক দল ছাড়া অচল। রাজনৈতিক দলের অবস্থান ঠিক করে দেয় রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় চরিত্রের স্বরূপ। এ স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়েই পাক-রাষ্ট্র শক্তির গর্ভে জন্মলাভ করে বাংলাদেশ। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ একই জন্মসূত্রে গ্রথিত হলেও জীবন ও রাজনৈতিক ধারার ভিন্নতার জন্য এদের মাঝে ফারাক অনেক। কিন্তু এ দুটি রাষ্ট্র সৃষ্টির পেছনে বঙ্গীয় মুসলমানদের বিদ্রোহী মন ও সাহস সবচাইতে বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। যে বঙ্গীয় মুসলিম ধারা পাকিস্তানকে বরণ করেছে এক অসামান্য উম্মাদনা দিয়ে সেটিই সর্বাগ্রে বীর বিক্রমে ঐক্যবদ্ধ পাক রাষ্ট্রশক্তিকে নির্বাসিত করেছে আফগান সীমান্তে।

বারবার বিদ্রোহের এমন দাবানল খুব কম জনপদই প্রত্যক্ষ করেছে। বিদ্রোহের এ আগুন জ্বালাতে গিয়েই কাজী নজরুল ইসলাম নিজে দগ্ধ হয়েছেন। মুসলিম লীগ বঙ্গীয় জীবন ধারায় ভস্মীভূত হয়েছে প্রায় সম্পূর্ণরূপে। পর্যুদস্ত হয়েছে মুসলিমলীগের প্রায় সকল নীতিমালা।

www.pathagar.com

মুসলিমলীগের বিরোধিতায় আওয়ামীলীগ এবং পাকিস্তানের বিরোধিতায় বঙ্গীয় মুসলমানের বিজয় ধারা একই বীজ থেকে উৎকলিত। তাই বৈধতার প্রশ্নে বাংলাদেশের রাষ্ট্রসত্তা পাকিস্তানের চাইতে দ্বিগুণ সাচ্চা চরিত্রের দাবীদার।

জাতি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রসত্তার বৈধতা এখন আর কোন বিতর্কিত বিষয় নয়। তবে এর বিচিত্রতা সীমাহীন। রাষ্ট্র সত্তার সঠিক স্বরূপ নির্মিত বা নির্ণিত হবার জন্য দুই দশক আদৌ তেমন কোন বড় সময় নয়। তবে আধুনিক কালে রাষ্ট্র সত্তার রাজনৈতিক স্বকীয়তা অনেক বেশী মজবুত ও স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এর স্বরূপ সুনির্দিষ্ট হয় দ্রুতগতিতে। বাংলাদেশও এর কোন ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশকে ভারত রাজনৈতিকভাবে গলধঃ করণ বা সামরিকভাবে দখল করবে, এ বক্তব্য আজ নিতান্তই ছেলেমানুষী।

বাংলাদেশীয় রাষ্ট্রসত্তার সঠিক স্বরূপ চিহ্নিত হওয়া জরুরী আর এ ব্যাপারে পুর্বের যে কোন সরকারের চাইতে বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকান্ড ও অবস্থান অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সংসদ নির্বাচনকে এর একটি ফলাফল ধরে ব্যাখ্যা করলে ব্যাপারটির গ্রহণযোগ্যতা হয় অধিকতর স্বীকৃত আর এর বোধগম্যতা নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয় কম। এ প্রসঙ্গে সবচাইতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী হচ্ছে' ৯১-এর সংসদ নির্বাচন। ফলাফল কি অপ্রত্যাশিত ছিল? পরবর্তী সংসদ নির্বাচনের ফলাফল কেমন হবে? এ জাতি ও রাষ্ট্র বিনির্মাণে এর কি ধরণের ভূমিকা থাকবে? প্রধাণ রাজনৈতিক দলগুলো কি ধরণের নব নব কৌশল অবলম্বন করবে? এসব প্রশ্ন নিয়েই আমরা আজ ভাববো।

দুই দশকের রাজনীতিতে বাংলাদেশ

রাজনৈতিক স্বাধীনতার ধোঁয়া তুলে কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন। পূর্ব বঙ্গীয় হিন্দু-মুসলিম সবাই পাকিস্তানী রাষ্ট্র তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করেছে। অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য তাদের জন্য অর্থনৈতিক মুক্তির পথ দেখাতে পারেনি। আওয়ামীলীগ তাই আবির্ভূত হয়েছিল অর্থনৈতিক মুক্তির অগ্রদূত হিসেবে। রাজনৈতিক দাবী দাওয়া ছিল লক্ষ্য হাসিলের উপায় বা মাধ্যম মাত্র। বঙ্গীয় মুসলমানের সমর্থন পেতে আওয়ামীলীগকে ধর্মের জিগির গাইতে হয় নি। সত্যের সমর্থন করতে গিয়েই বাংলার মুসলমান আওয়ামী লীগকে এত বিপুল সমর্থন জুগিয়েছিল। সম্ভব হলে আওয়ামীলীগ সমগ্র পাকিস্তানী রাষ্ট্র সত্তাকে রূপান্তরিত করবে ইনসাফের মাপকাঠিতে-এমন চিন্তাও বঙ্গীয় মুসলমানের মনোজগতে বাসা বেধেছিল। কিন্তু তা যখন হাসিল করা সম্ভব ছিল না, তখন নিজস্ব স্বকীয় রাষ্ট্রচিন্তায় মগ্ন হল বঙ্গবাসী।

স্বাধীনতার উষালগ্নেই আওয়ামীলীগের চাইতে বড় শক্তির আধারে রূপান্তরিত হলেন শেখ মুজিবুর রহমান নিজে। মর্যাদা লাভ করলেন জাতির পিতা হিসেবে। বঙ্গবন্ধু খেতাবটিও সহকর্মীরা ব্যবহার করলো চরম উৎসাহের সাথে। নতুন রাষ্ট্র সত্তার তত্ত্ব হিসেবে দ্রুত আবিষ্কৃত হলো মুজিববাদ। মুজিববাদ শুধু নিছক তত্ত্বই থাকলো না, পারিগ্রহ করল সাংবিধানিক নীতিমালার রূপ। নীতিমালা হিসেবে চারটি উপাদান কোন বিতর্ক ছাড়াই গ্রহীত হলো। রাজনৈতিক

www.pathagar.com

:বোলচালের অধ্যায় যেন শেষ। দেশ গড়ার পালা যেন সঠিক অর্থেই শুরু হলো। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সমগ্র জাতির জন্য বয়ে আনবে অর্থনৈতিক মুক্তি–এতে যেন কারোরই আপত্তি রইল না। মুসলিম লীগ মার্কা বা জামায়াত পন্থী মতবাদ যেন নির্বাসিত হলো চিরতরে। জাতির পিতা নিজেই তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন নতুন রাষ্ট্র সত্তা সৃষ্টির পথে সশস্ত্র বাধা দানের অপরাধের জন্য। কিন্তু জাসদ নামের নতুন এক আপদ সৃষ্টি হল।

সরকারী সমাজতন্ত্রের মোকাবেলায় জাসদের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র শুধু আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী হলো না; চ্যালেঞ্জ করে বসলো জাতির জনকের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করার অধিকারকে। আওয়ামীলীগ বুদ্ধিমত্তার সাথে ১৯৭৩ সালেই সংসদ নির্বাচন দিয়ে পরিস্থিতির মোকাবেলা করলো। কিন্তু বেসরকারী সমাজতন্ত্রীরা প্রতিরোধ আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়লো। পঁচিশ বছরের অখন্ড পাকিস্তানের ইতিহাসে মুসলিম লীগের সরকারী ইসলামের বিরোধীতায় জামায়াতের বেসরকারী ইসলাম কখনোই এমন প্রতিরোধ গড়তে পারেনি। অথচ ২/৩ বছরের মধ্যেই জাসদের সমাজতন্ত্র বেসামাল করে দিল সরকারী সমাজতন্ত্রকে। প্রয়োজন দেখা দিল, নাকি কৃত্রিমভাবে প্রজনন ঘটল একদলীয় সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার। মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকারের বদলে জাতির জনকের দ্বারাই প্রবর্তিত হলো তাদের দ্বারা বহু ধিকৃত রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা। আওয়ামীলীগ নিজেই বিলুপ্ত হলো বাকশালে। মুজিববাদ ও বাকশালী আদর্শ বহুলাংশে সমার্থক হলো।

প্রতিক্রিয়া হিসেবে রাজনীতিতে ঘটে গেল সামরিক হস্তক্ষেপ। সবই যেন ভেসে গেল রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবার বর্গের সদস্যর হত্যাকান্ডের ঘটনা প্রবাহে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অপেক্ষা বাংলাদেশী সেনাবাহিনী অনেক বেশী সতর্ক। তারা আওয়ামীলীগদের দ্বারা সরকার পরিচালনা করল। অবস্থা বুঝে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসীন হলেন। তবে রাজনীতিবিদদের যথেষ্ট কদর করলেন। সব মতের ও দলের লোকদের রাজনীতির খেলায় মত্ত হবার সুযোগ করে দিলেন। এ খেলা যখন জমে উঠল তখনই ১৯৮১ সালে জেনারেল জিয়াকেও বরণ করতে হলো প্রায়ই প্রেসিডেন্ট মুজিবের ভাগ্য। জেনারেল ও প্রেসিডেন্ট হিসেবেই দেহ ত্যাগ করলেন তিনি। তবে সপরিবারে নয়, একাই। এসব কীর্তির কোনটিই কিন্তু বঙ্গীয় মুসলমান বা হিন্দুর সৃষ্টি নয়। সামরিক বাহিনী ও রাজনীতিবিদরাই এর রূপকার। বঙ্গীয় জীবনধারা আবারও নির্বাসনে। সত্য সন্ধানে সে যেন ক্লান্ত।

ক্লান্ত জনপদে দীর্ঘ দেহী বলিষ্ঠ জেনারেল এরশাদ প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা দখল করলেন কোনরূপ তাড়াহুড়ো ছাড়াই। রাজনীতিবিদদের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিল বাংলাদেশী রাষ্ট্র–সত্তা। জেনারেল জিয়া নাগরিক জীবনের ছোট অংশই নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু জেনারেল এরশাদ প্রশাসনের সর্বত্রই সামরিক উপাদান সংযুক্ত করতে উদ্যোমী হন। পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিল আয়ূবী দশক আর বাংলাদেশ প্রায় সৃষ্টি করতে যাচ্ছিল এমনই এরশাদী দশক।

www.pathagar.com

অখন্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্র সত্তা ছিল কৃত্রিম, আর বাংলাদেশী রাষ্ট্র সত্তা বিরাট অংশেই প্রাকৃতিক। প্রাকৃতিক বলেই বঙ্গীয় মুসলিম ধারা এত উদারতার সাথে হাত মিলিয়েছে অন্যসব বঙ্গীয় জীবন ধারার সাথে। বঙ্গীয় মুসলিম ধারায় এ উদারতার ইতিহাস অতি প্রাচীন। জেনারেল জিয়া ও এরশাদ জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতেই বঙ্গীয় মুসলিম ধারার উদারতায় বিশ্বাস রেখে বা না রেখেই রাজনৈতিক প্রয়োজনে রাষ্ট্র-সত্তায় নতুন করে সংযোজন ঘটালেন ইসলামী নিয়ামকের। ফল হিসেবে মুজিববাদ নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হলো। অথচ পশ্চিম বঙ্গীয় জীবন ধারায় সমাজতন্ত্র সমাদৃত হলো প্রবলভাবে।

'৯১- এর সংসদ নির্বাচন

নজীরবিহীন নিরপেক্ষ সংসদ বির্বাচন! কৃতিত্ব কেয়ার টেকার সরকারের। আসলে কিন্তু আবার বিজয় বঙ্গীয় মুসলিম-জীবন ধারার। রাজনীতিবিদরাও প্রশংসিত হয়েছেন কারচুপি না করার জন্য। কিন্তু কারচুপি করার সুযোগ ও উপায় ছিল কি? সবাই দেখতে চেয়েছে একটি নির্ভেজাল সংসদ নির্বাচন। অনেকে মনে করেন আওয়ামীলীগ জেতার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল বিধায় কারচুপি করে নি। কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। ১৯৭৫ এর পর আওয়ামীলীগ নিজেকে আবার অসহায় দেখতে পছন্দ করেছে ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে। জোর করে জেতা বা ১৯৮৭ সালে এরশাদের সাথে হাত মেলানোর অপরাধ ঢাকার জন্য মাত্রাতিরিক্ত সাধু থাকতে চেয়েছে আওয়ামী লীগ। ভেবেছিল বিজয়মাল্য তবেই পুরোপুরি নির্বিঘ্নে পরিয়ে দেবে বঙ্গবাসী। '৬৯ ও '৭০ বঙ্গীয় জীবন ধারায় আওয়ামীলীগ মজলুমের ভূমিকায় থেকেই এত নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। অথচ '৭৩ ও '৭৪ সালে জালেমী ভাব পরিগ্রহ করাতে এ দলটি জনমনে দারুনভাবে ভীতির সঞ্চার করে।

'৭৫-এর পট পরিবর্তন আবার আওয়ামী লীগকে মজলুম বনতে উৎসাহীত করে। '৯১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী ভাবধারায় বাকশালী চেতনা অনুপস্থিত ছিল। একদলীয় তন্ত্র-মন্ত্র তারা পরিহার করেছিল। কিন্তু অন্তরে-বাহিরে কোথাও কথার মারমুখীতা তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়নি। এ মারমুখীতাই '৯১ এর সংসদ নির্বাচনে খালেদা জিয়ার কাছে শেখ হাসিনার এত শোচনীয় পরাজয়ের মূখ্য কারণ। ইসলাম, ভারত ও সেনাবাহিনী ফ্যাক্টর অবশ্যই নিজ নিজ ভূমিকা রেখেছে নির্বাচনের ফলাফলে।

বি, এন, পি-র এ বিজয় মূলতঃ কার? সাংগঠনিক বা আদর্শিক মজবুতীর দিক থেকে আওয়ামীলীগ '৯০ পর্যন্ত দল হিসেবে ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু বঙ্গীয় জীবন ধারার মূল স্রোত থেকে সে সরে পড়েছে বেশ খানিকটা দূরে। জনগণ আর ঝুঁকি নিতে চায়নি। জনগণের সে ইচ্ছে পূরণ হয়েছে। চরম কোন কিছুই বঙ্গীয় জীবন বোধ বেশীদিন সহ্য করে না। এখানকার আবহাওয়ার মতই মানুষের মন। এমনিতেই কোন কিছুতে বেশীদিন তুষ্ট থাকতে চায়না বঙ্গবাসী; তদূপরি

www.pathagar.com

বেশী হাঁক-ডাক, ভয়-ভীতি ও দাম্ভিকতা দেখলে দ্রুত নিরাপদে আশ্রয় নেয়। সুযোগ পেলে মধ্যম ধরণের প্রতিশোধ নেয়। খালেদা জিয়াকে ক্ষমতায় বসিয়ে তিন বছরের মাথায় ঢাকা ও চট্টগ্রামের মেয়র নির্বাচনের ফলাফল এর আর একটি জ্বলন্ত প্রমাণ।

'৯১-এর নির্বাচনে ভারত ফ্যাক্টর

ভারতের সাথে আওয়ামীলীগের বন্ধুত্ব বাংলাদেশী মুসলমানদের জন্য শুভকর হবে, এমন দৃঢ় বিশ্বাসের অভাব জনমনে দারুণভাবে পরিলক্ষিত হয়। জামায়াতের ভারত বিরোধীতায় অনেকেই পাকিস্তান প্রীতির গন্ধ পেয়ে থাকেন। তবে তার চাইতেও বড় কথা বঙ্গীয় মুসলিম জীবন স্রোত থেকে সূচনাতেই এ দলটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তদুপরি যে জনগণ '৭৩, '৭৪ সালের আওয়ামীলীগকে ভূলতে পারেনি, তাদের পক্ষে '৭১ সালের জামায়াতকে পুরোপুরি বিস্তৃতির জগতে স্থান দেয়া সহজ নয়। তাহলে ১৯৯১-এর নির্বাচনে ১৮জন জামায়াত প্রার্থী জিতল কিভাবে? একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে এদের প্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় বি, এন, পি-এর প্রার্থী থেকে প্রভাব প্রতিপত্তিতে অনেক বেশী অগ্রসর ছিল ভোটাররা। মূলতঃ আওয়ামীলীগের বিজয় ঠেকাতে গিয়েই জামায়াত প্রার্থীকে ভোট দেয় '৯১-এর সংসদ নির্বাচনে।

'৯১-এর নির্বাচনে ইসলাম ফ্যাক্টর

বাকশাল বা কট্টর বামপন্থী দলগুলো ছাড়া সবকটি দলই ইসলাম সম্পর্কে তাদের রাজনৈতিক বক্তব্য পরিষ্কার করে। দেরিতে হলেও আওয়ামী লীগ "নৌকার মাঝি তুই আল্লাহ" শ্লোগান ধরে। মূলতঃ "ধানের ছড়ায় বিসমিল্লাহর" মোকাবিলায় এ সুর ধ্বনিত হয় আওয়ামীলীগের মুখ থেকে। কিন্তু এ শ্লোগান গুলোকে জনগণ নির্বাচনী কৌশল (রাজনৈতিক চাল) হিসেবে ধরে নেয়। তাই এর জের ভোটের ফলাফলে তেমন একটা পড়েনি।

ইসলাম পন্থীরা মুসলিমলীগ বা জামায়াতকে সব ভোট দিয়েছি কি? '৯১ এর সংসদ নির্বাচনে মুসলিমলীগের সব ধারা উপধারাকে বঙ্গীয় জীবন ধারা সম্পূর্ণরূপ চিরতরে সমাধিস্থ করেছে। এদেরকে এ অঞ্চলের মুসলমানরা সর্বোতঃভাবেই প্রত্যাখ্যান করে আসছিল বহুদিন ধরে। কিন্তু শাসকরা এদের জিইয়ে রেখেছিল। জেনারেল জিয়া সবচাইতে বিশ্বস্ত লোকজন সংগ্রহ করেছিল মুসলিমলীগ মার্কা দল থেকে। এ মার্কার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার যেন পৈতৃক সম্পর্ক। "পাকিস্তান সৃষ্টি করেছি আমরা, পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশের জন্মই হতো না"। মুসলিম লীগের এ ধরণের দাবী মূলতঃ পিতার সম্পত্তিতে পুত্রের উত্তরাধিকারের মত। জেনারেল জিয়া শাহ্ আজীজকে প্রধাণমন্ত্রী বানিয়ে যেন সেই উত্তরাধিকারের হক পূরণ করলেন। আওয়ামী লীগের উত্তরাধিকার কি তিনি ভুলে গিয়েছিলেন? হয়তো ভুলেননি। তবে তাদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগির বিপদ ছিল অনেক। ফ্রীডম পার্টির সাথে ক্ষমতার ভাগাভাগিকেও তাই তিনি সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন।

www.pathagar.com

হতভাগ্য মুসলিমলীগ সহ হতশাগ্রস্থ সকল চরম ডান-বাম দলের নেতৃবৃন্দের দ্বারা জেনারেল জিয়া তার রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করে এর উপরে পাকাপোক্তভাবে ইসলামী লেভেল এঁটে দেন। দলের ভেতরে বিভিন্ন চরম ধারার লোকরা একে অপরের বিরূপ প্রতিক্রিয়া অনেকখানি ঠেকিয়ে দেয় আর তিনি হাল্কা ইসলামী বোলচাল দিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গন ঠান্ডা রাখেন। কৌশলটি বেশ কাজ দিয়েছিল বলতে হবে। জেনারেল এরশাদ এ কৌশলের পথ ধরেই রাষ্ট্র-ধর্ম হিসেবে ইসলামের নাম সংবিধানে সংযোজিত করে নিলেন।

খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বি, এন, পি, এরশাদের সাংবিধানিক অবস্থা দৃঢ়তার সাথে মেনে নেয়। আর আওয়ামীলীগ এর পরিবর্তনের পক্ষে অত্যন্ত নীচু স্বরে কথা বলে। কাজেই অরাজনৈতিক ইসলামপন্থীরা খালেদা জিয়াকে সমর্থন জোগায় সারাদেশে।

'৯১-এর নির্বাচন ও মহিলা নেতৃত্ব

রাজনীতিতে মহিলা নেতৃত্ব সমগ্র বিশ্বেই বিরল। মুসলিম সমাজে তো এর বিরুদ্ধে রয়েছে বহু যুক্তি। ১৯৬৫ সালে ফাতেমা জিন্নাহ ছিলেন আয়ূব খানের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থী। তখন কিন্তু সমগ্র পাকিস্তানে ইসলামী রাজনীতিবিদরা মহিলা পদপ্রার্থীকেই মন্দের ভালো (lesser evil) বলে চিহ্নিত করেন। '৯১ এর সংসদ নির্বাচনে কোন বলিষ্ঠ পুরুষ নেতৃত্ব ছিল না। জেনারেল এরশাদ তার নয় বছরের শাসনামলে প্রায় সকল পুরুষ নেতৃত্বকেই নিস্ক্রিয় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। প্রধান দুই ধারার নেতৃত্ব বহু আগেই উত্তরাধিকার সূত্রে মহিলাদের হাতে চলে যায়। কাজেই নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন, দেশের গুরু দায়িত্ব যে মহিলা নেতৃত্বের হাতেই পড়ত, এতে কোন সন্দেহ নেই।

খালেদা জিয়া তার নয় বছরের আপোষহীন নেতৃত্বের পুরস্কার হিসেবে ক্ষমতা লাভ করলেও, যদি দেশের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট হতে চাইতেন, তবে বিপাকে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। সংসদীয় পদ্ধতির সরকার সেদিক থেকে তাকে বাঁচিয়েছে। অবশ্য এ সম্পর্কে গণভোট একটি প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। তবে যেহেতু আওয়ামীলীগ ও জামায়াতসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলও এ প্রহসনের সক্রিয় খেলোয়াড় ছিল তাই কোন আপত্তি বা বিপত্তি ঘটেনি।

নির্বাচনের পর খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে অকুন্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা যারা (উপরদিকে) সবচেয়ে বেশী জুগিয়েছেন খালেদা জিয়া মার্গারেট থ্যাচার সমতূল্য। কাজেই মন্ত্রীত্বও তাদের ভাগেই বেশী জুটেছে। এটি কিন্তু জেনারেল জিয়ার উত্তরাধিকার নয় বরং বঙ্গীয় রাজনীতিতে বৃটিশ উত্তরাধিকারের জের। বি, এন, পি, কখন কোন উত্তরাধিকার বেশী ব্যবহার করেছে তা এখন বড় প্রশ্ন নয়। কথা হচ্ছে আওয়ামী লীগের মহিলা নেতৃত্ব বি, এন, পি-র মহিলা নেতৃত্বের পক্ষে পরোক্ষভাবে আরো বেশী সমর্থন জুগিয়েছে।

www.pathagar.com

'৯১– এর নির্বাচন ও জাতীয় পার্টি

জাতীয় পার্টি অন্যসব দলের মতই সংসদ নির্বাচনে অবাধ সুযোগ লাভ করেছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার। রংপুর এরশাদের জন্মভূমি হওয়ার কারণে তার জনপ্রিয়তা সেখানে পড়ে যায় নি? বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। সে সুবাদে চাঁদপুরের মিজানুর রহমান নিজ নির্বাচনী এলাকায় চরমভাবে ধিকৃত হলেও রংপুরে বিপুল ভোটে জয়ী। এটি জাতীয় পার্টির সবলতা ও দূর্বলতা ও দুই–ই। মিজানুর রহমান চৌধুরী হচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রীসভার সবচেয়ে বড় নেতা, যিনি মন্ত্রীত্ব হারিয়েছিলেন। নেতা বা শাসক হিসেবে শেখ মুজিব কখনোই নিজ দলের লোকের প্রতি কাঠোর হতে পারেননি। এমনকি শেখ হাসিনা ডঃ কামালের মত লোকদের প্রতি যত কঠোর হতে পেরেছেন তার বাবা মিজানুর রহমানদের মত লোকদের প্রতি তেমনটি হতে পারেন নি। তার পরও শেখ মুজিব নিজ হাতেই তাকে বরখাস্ত করেছেন। আর এ উত্তরাধিকার এখন জাতীয় পার্টির মালিকানায়। আ, স, ম আব্দুর রব অবশ্য একটু ভিন্নভাবে এ উত্তরাধিকারের অংশ।

জাতীয় পার্টির চেয়ে জেনারেল এরশাদই খালেদা জিয়ার জন্য বড় সমস্যা। তাই ব্যবস্থাও সেভাবেই গৃহীত হয়েছে। রংপুর বাসীরা কি শুধু অকারণেই তাদের সন্তানকে এত ভলোবাসেন? এরশাদ পতনের প্রাক্কালে মোটেই কোন চালাকী করেননি। ইচ্ছে করলে তিনি সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতায় বসাতে পারতেন কিনা বলা মুশকীল। তবে খালেদা জিয়া বা শেখ হাসিনাকে সরাসরি তার কাছ থেকে ক্ষমতা নেয়ার আহবান জানিয়ে বা শেখ হাসিনাকে সরাসরি তার কাছ থেকে ক্ষমতা নেয়ার আহবান জানিয়ে ভালো খেল জুড়ে দিতে পারতেন। বি, এন, পি, যদি এরশাদের স্পীকার শামসুল হুদা চৌধুরীর কাছ থেকে ক্ষমতা নিতে পারে, তবে এরশাদের দোষ কোথায়!

এরশাদ যদি বন্দী দশায় না থাকতেন তবে জাতীয় পার্টি এতটা অসহায় হয়ে পড়তো না। এখন আর জাতীয় পাটির পক্ষে এত সব উত্তরাধিকার নিয়ে রাজনীতিতে বড় কোন ভূমিকা পালন করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। প্রাক্তন স্পীকার শামসুল হুদা চৌধুরী নাকি নিজেই এখন আর একটি জাতীয় পার্টির মালিক। এদিক থেকে ডঃ কামাল বুদ্ধিমান বটে। তিনি মিজানুর রহমান চৌধুরীর মত আর একটি আওয়ামী লীগ না খুলে গণফোরাম গড়ার চেষ্টায় বিভোর। যদিও অনেকেরই ধারণা শামসুল হুদা চৌধুরীর জাতীয় পার্টির মতই গণফোরাম ও বি, এন, পি,–র সৃষ্টি।

'৯১– এর নির্বাচনের ফলাফল ও রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ গোলাম আযম ইস্যু

জামায়াতের সক্রিয় সমর্থন না পেলে খালেদা জিযার পক্ষে ক্ষমতায় আসীন হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই স্বভাবতঃই জামায়াত ভেবেছে বি, এন, পি, সরকার কৃতজ্ঞতার নিদর্শণ স্বরূপ গোলাম

www.pathagar.com

আযমের নাগরিকত্বের দাবী পূরণ করবে। জামায়াত নেতৃবৃন্দের এ বিশ্বাস এতই প্রবল ছিল যে তারা গোলাম আযমকে তাদের আমীর হিসেবে ঘোষণা করল। বাহ্যতঃ খালেদা জিয়া সরকার বিপাকে পড়ে গেল। সরকার ব্যাপারটি বিচার বিভাগীয় বিষয় বলে আদালতের রায়ের অপেক্ষা করল। আওয়ামী লীগ ব্যাপারটি একটি জাতীয় ইস্যু করে ব্যাপক জনসমর্থন লাভের প্রয়াস চালালো। ভাগ্য বিড়ম্বিত কট্টর বামপন্থী দলসমূহ আওয়ামীলীগের এ কাজকে পছন্দ করল না। তারা ইস্যুটিকে সামগ্রিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের ঐক্যবদ্ধ চেতনা জাগ্রত করার এক অপূর্ব সুযোগ হিসেবে চিহ্নিত করল। এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে পুত্রের উত্তরাধিকারের দাবী জোরদার হলো। পিতা ও স্বামীর উত্তরাধিকারের সাথে পুত্রের উত্তরাধিকার দাবী হয়তো মোটেই বেমানান নয়। কিন্তু এ করে ইস্যুটির জাতীয় গুরুত্ব বিনষ্ট হতে থাকলো। বি.এন.পি. সরকার প্রচুর ফায়দা লুটল। আওয়ামীলীগ ও জামায়াতের প্রচুর সময় ও অর্থ ব্যয় হল। খালেদা জিয়া নিজের নেতৃত্ব সুসংহত করার বিরাট মওকা পেয়ে গেলেন। "ধরি মাছ, না ছুই পানি" টাইপের সিদ্ধান্তের মাঝে সরকারের দিনগুলি ভলোই কাটল।

গণফোরাম– আর এক উওরাধিকার

দলছুট রাজনীতির জন্য বিখ্যাত এ বঙ্গভূমিতে গণফোরাম কি কোন ব্যতিক্রম? ডঃ কামাল কি উত্তরাধিকার দাবী করছেন। গোলাম আযম ইস্যুতে আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা দলটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেককেই হতাশ করেছে। কামাল হোসেন '৯১–এর সংসদ নির্বাচনে মীরপুরে এক অখ্যাত বি, এন, পি, পদপার্থীর কাছে পরাজিত হয়ে গভীর ভাবনায় আছেন। শেখ হাসিনাও তাকে আর তেমন পাত্তা দিচ্ছেন না। অথচ তিনিই বাংলাদেশের সংবিধান সৃষ্টির বিরাট কর্তৃত্বের মালিক। সংবিধানটি বিভিন্ন সংশোধনীর বৃত্তাকার চক্রে আবর্তিত হলেও রাষ্ট্রের মূল দলিল হিসেবে এটি সরকারী ও বেসরকারী রাজনৈতিক নীতিমালা তৈরী ও পরিবর্তনের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। জনগণ বৃত্তাকার ঘূর্ণায়মান চক্রে নিপতিত হয়ে হাবুডুবু খেলেও রাজনীতিবিদরা ভালোই মাছ শিকার করছেন দল–মত নির্বিশেষে।

গণফোরাম রাজনৈতিক দল হিসেবে তাড়াহুড়ো করে আত্মপ্রকাশ করেনি। কারণ ডঃ কামাল আওয়ামী লীগকে বিপাকে ফেলেছিলেন। তাকে না বহিষ্কার করা গিয়েছে, না তিনি পদত্যাগ করেছেন আওয়ামী লীগ থেকে। দলের আত্মপ্রকাশ সম্পূর্ণরূপে সাধণ করেই তিনি ছিন্ন করেছেন আওয়ামী লীগের সাথে তার বহুদিনের টানাপোড়নের সম্পর্ক। আওয়ামী ছাত্র লীগকে দ্বিধাবিভক্ত করতে ও সমর্থ হয়েছিল গণফোরাম। এ কৃতিত্ব অবশ্য মোস্তফা মহসীন মন্টুর। আর এক জাঁদরেল আওয়ামী নেতা। তিনিও '৯১–এর সংসদ নির্বাচনে পরাজিত। ৯১–এর নির্বাচনে জিততে পারলে এরা কেউ আওয়ামী লীগ থেকে সরে পড়ার স্বপ্ন দেখতে পারতেন না। কারণটি সাংবিধানিক। তবে কতটুকু অগণতান্ত্রিক, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তা বলা মুশকীল।

গণফোরাম নিজের আলাদা ছাত্র লীগ সৃষ্টি করে ঢাকা বিশ্বদ্যালয়ের ২/১টি হল দখল করে রাখলেও তেমন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি বৃহত্তর রাজনীতিতে। গণফোরাম নামে রাজনৈতিক

www.pathagar.com

দল সৃষ্টির আনুষ্ঠানিক কাজ সম্পন্ন করে ডঃ কালাম হোসেন বলেছিলেন, তার বয়স নাকি অনেক হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি তিনি বিজয়ী হতে চান। বাংলাদেশে তার উত্তরাধীকারের দাবীতে তিনি এবার হলেন সোচ্চার। পিতা, স্বামী ও পুত্রের উত্তরাধিকারী একদিন নিঃশেষ হতে পারে, কিন্তু সংবিধান সৃষ্টির উত্তরাধিকার নিঃশেষ হবার নয়। তাই কামাল হোসেন আশাবাদী। তার উত্তরাধিকার দাবীকে যদি তিনি গণফোরামের ভাগ্যন্নোয়নের সাথে আন্তরিকভাবে জড়িত করেন তবে সে আশায় গুড়ে বালি। খালেদা জিয়ার সাথে ক্ষমতার ভাগাভাগি হয়তো একেবারে অসম্ভব নয়। তবে শেখ হাসিনার সাথেও কি সম্ভব!

’৯১–এর নির্বাচন উত্তর ছাত্র রাজনীতি

ছাত্র রাজনীতিতে ব্যর্থতাই এরশাদের পতনের মূল কারণ। জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের রাজনৈতিক সফলতাই খালেদা জিয়ার উত্থানের অন্যতম প্রধাণ কারণ। গণিত শাস্ত্রের মতই এখানে কাজ করছে কার্যকরণ সম্পর্ক। ডাকসুতে ছাত্রদল নির্বাচিত। কৃতিত্ব কার! খালেদা জিয়ার, না ছাত্র নেতৃবৃন্দের। হয়তো বা শুধুই জিয়ার। এ এমন এক ধারা যার আদর্শ–অনাদর্শ বুঝা ভারী মুশকীল। কথায় জাতীয়তাবাদী, কাজে যে এরা কি, আর কি নয় তা হলফ করে বলা যায় না। বৃটিশ কমনওয়েলথের মত এদের রূপ। উত্তরাধিকার কার প্রাপ্য? বৃটিশদের, না কলোনীর! তাত্ত্বিক বিবেচনায় এ অবস্থা বড়ই গোলমেলে। কিন্তু বাস্তবে বড়ই আশ্চর্য টনিক।

জিয়া ছাত্রদের হাতে অপদস্থ হয়েছেন। কিন্তু প্রতিহিংসায় মেতে উঠেননি। তাদেরকে ভারত বিরোধী রাজনীতিতে নামিয়ে দেন। নিজে কট্টরপন্থী রূপ থেকে দূরে থেকেছেন। সামরিক বাহিনীর নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতি জিয়া কঠোর ছিলেন, কিন্তু ছাত্রদের প্রতি যথেষ্ট উদার ছিলেন। বলা মুশকীল এটা তার দূর্বলতাজনিত উদারতা কিনা। দূর্বলতা জনিতই হোক, কিংবা তার দূরদর্শিতার ফসলই হোক, জিয়ার মৃত্যুর পর ছাত্র রাজনীতিতে তার সমর্থন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। খালেদা জিয়া শুধু হাল শক্ত করে ধরেছিলেন। ফল পেয়েছেন হাতে নাতে।

বঙ্গীয় ছাত্র রাজনীতির সাধারণ ঐতিহ্য হচ্ছে সত্যপন্থী হয়ে ক্ষমতাশীলদের বিরোধীতা করা। বিদ্রোহী এ ভাব ছাত্র রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি। লাভ লোকসানের হিসাব নয়, আত্মমর্যাদার তাড়নায় বিদ্রোহে ফেটে পড়াই ছাত্র রাজনীতির বৈশিষ্ট্য। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অশিক্ষিত ও কুশিক্ষিত থাকার কারণে ছাত্র রাজনীতি কাজ করেছে জাতির বিবেকের মত। ’৮০–র দশকে এ বিবেককে ঘিরে ধরে অর্থ ও অস্ত্র। লেঁজুড়বৃত্তির প্রবণতা বৃদ্ধি পায় বহুগুণে। জরুরী সংগঠণের নির্দেশ পালনে নীতি আদর্শ হতে থাকে বিবর্জিত। এরশাদ সরকারের বিরোধিতায় ছাত্ররা কিন্তু অর্থ ও অস্ত্র দুই–ই সংগ্রহ করে অনেকটা নিজ দায়িত্বে। গড়ে উঠে সশস্ত্র ক্যাডার গ্রুপ। সর্বহারা নামধারী দল উপদলের কৌশল গৃহীত হয় এসব সশস্ত্র ক্যাডারদের দ্বারা। তবে এ কৌশল ব্যবহৃত হয় গোপনে ও সীমিত আকারে। অনেকটা আমাদের বাপ–দাদাদের ঘুষের মত। আমাদের পূর্ব–পুরুষরাও ঘুষ খেতেন, তবে সংগোপনে। ছেলে মেয়েদের জানতে দিতেন না যে তাদেরকে ঘুষের টাকায়

www.pathagar.com

"মানুষ" করা হচ্ছে। এখন ঘুষ আমাদের অহংকার ও গৌরব। জীবন ও ক্যারিয়ার গঠণের এক অন্যতম নিত্যসঙ্গী। ষ্ট্যাটাস সিমবল। না হলে বিয়েশাদী, ঘর-সংসার সবই জ্বলে পুড়ে ছারখার।

ব্যাংক-লোন, ডাকাতী, সরকারী হতবিলের যথেচ্ছ ব্যবহার না করলে বড় থাকা যেমন সম্ভব নয়, ছাত্র রাজনীতিতে অর্থ ও অস্ত্র ঠিক তেমনি এক অপরিহার্য নিয়ামক। কিন্তু খালেদা জিয়া ক্ষমতায় আসার আগে ও পরে এদের ব্যাপারে মনে হচ্ছে সাবধান ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে কখনোই স্বীকার করেন নি যে, ছাত্র নেতৃবৃন্দ তার দলের জন্য অসামান্য অবদান রেখেছেন বরং ছাত্রদের অস্ত্রের রাজনীতি থেকে বিরত থেকে পড়াশুনায় মনোনিবেশ করার পরামর্শ দিয়ে আসছেন বারবার। তিনি কি তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভয় করেন? শেখ মুজিবের মত লোক ছাত্র নেতৃবৃন্দের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বেসামাল ছিলেন, জিয়া তাদের সমীহ করতেন। এরশাদ তাদের ভয়ে থাকতেন কম্পমান এবং পরে কুপোকাত। খালেদা জিয়া ইদানিং বিরোধী দল সমূহের মোকাবিলায় তার ছাত্র-শক্তিকেই যথেষ্ট বলে মনে করেন।

এরশাদকে কুপোকাত করতে গিয়ে ছাত্র রাজনীতিতে ব্যাপক অস্ত্র ব্যবহারের স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজতে গিয়ে খালেদা জিয়ার তথ্যমন্ত্রীর বক্তব্য বহুলভাবে নিন্দিত হয়েছে। তবে এটি ঘুষ লেন-দেনের প্রতি নিন্দাবাদ ব্যক্ত করার মত বা জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে বুলি কপচানোর মত ওয়াজ নসিহত আর কি। ঘুষের বিরুদ্ধে তো বলাই হবে, কারণ এটি গর্হিত কাজ। কাজটি তো করতেই হবে। কারণ এটা এখন আমাদের জীবন-মরণ মান-সম্মান, অর্থ বিত্ত সবই।

জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষেই বা না বলি কি ভাবে! শেষে মানুষের ভারে যদি দেশ বঙ্গোপসাগরে মিলিয়ে যায়! জন্মনিয়ন্ত্রণ করিই বা কিভাবে। কম সন্তান-সন্ততি থাকলে সবকটিই যদি বাস ট্রাক চাপা পড়ে বা সন্ত্রাসীদের হাতে মারা যায়। তাই ২/১ টার চেয়ে ৫/৭ টা গ্রহণ অধিক বুদ্ধিমানের কাজ। তাছাড়া নিজ সন্তান তো জনসংখ্যা বাড়ায় না, কেবল দেশ গড়ার নতুন কারিগর জন্ম দেয়। কাজেই যত পারা যায় অন্যের ঘরের জন্ম নিয়ন্ত্রণ কর, আর নিজ ঘরে সন্তান সংখ্যা বাড়াও।

সার্বিক এ অবস্থা বুঝা না গেলে ছাত্র রাজনীতির অর্থ ও অস্ত্র রাখা বা চালানোর কৌশল বুঝা যাবে না। অর্থের কথা বাদ দিলাম। কারণ ছাত্র রাজনীতি করে কোটিপতি হওয়া এখন আর মোটেই অসম্ভব নয়। যেমন অসম্ভব নয় সরকারী ব্যাংকের টাকা দিয়েই বেসরকারী ব্যাংকের মালিক হওয়া।

গণফোরামের রাজনীতির পথ প্রশস্ত করার জন্য ছাত্রের হাতে অস্ত্র ব্যবহৃত হবার পরই কিন্তু ছাত্র রাজনীতিতে অস্ত্রের ব্যবহার প্রকাশ্য হয়ে পড়ে। ডাঃ মিলন হত্যার বিচার না হবার কারণেই প্রকাশ্য দিবালোকে ছাত্রদের অস্ত্র ব্যবহার দ্রুত গতিতে বেড়ে যায়। বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক বা কর্মচারীরাই শুধু আজ এর শিকার নয়, পুলিশ অফিসার ফরহাদ হত্যাকান্ড এর একটি প্রমাণ মাত্র।

www.pathagar.com

ছাত্র দলের দুই গ্রুপঃ ছাত্র রাজনীতির নতুন মাত্রা

এখন প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ছাত্রদলে দুই ভাগ। কাদের ভাগ! কিসের ভাগ! কার জন্য ভাগ! কেউ কি তা জানে না? কোন ভাগই সরকারী দল বা খালেদা জিয়ার বিপক্ষে নয়। রব জলীলের ছাত্রলীগ ছিল মুজিব ছাত্রলীগের বিরোধীতার ফসল। এটাই ছিল ঐতিহ্যগত বঙ্গীয় ছাত্র রাজনীতি। কিন্তু এখন দারুণ পরিবর্তন। সরকারী দলের বা নেতার বিরোধীতা করব না, কিন্তু নিজ এলাকার বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একক ছাত্র দল নেতার কর্তৃত্ব মানব না। নিজেই নেতা হব। ভাবখানা এমন, আমি কি ছাত্র দলের কম বড় নেতা নাকি!

সবাই বলে ছাত্র নেতা হলেই নাকি অনেক টাকা করা যায়। কিন্তু টাকার যোগান দেয় কারা? উত্তর সহজ। ব্যবসায়ী ও কন্টাক্টররা। অর্থাৎ চাঁদার পয়সাতেই ছাত্রনেতারা ধনী। টাকা আজ দ্বিতীয় খোদা। সহজে কেউ কাউকে দিতে চায় না। ঘুষখোর পিতা ও পুত্রকে মুক্ত হস্তে দেয় না। দেয়না ধনকুবেরের একমাত্র পুত্র তার প্রেমিকাকে। তাহলে ব্যবসায়ী ও কন্টাক্টররা এত টাকা চাঁদা দেন কেন? সহজ উত্তর? জানের ভয়ে। উত্তরটি সহজ, কিন্তু সঠিক নয়। ছাত্রদের আমরা বলি ঠিকমত পড়াশুনা করতে, ঠিকমত পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে। ব্যবসায়ী ও কন্টাক্টরদের কে বলে তাদের কাজ ঠিকঠাক মত করতে? নিশ্চয়ই আইন ও সরকার। ঠিকমত ব্যবসা বাণিজ্য করা মানেই তো নিজ পেটে লাথি মারা। এ কাজ না করলে কি কাউকে দোষ দেয়া যায়। ঠিকমত কন্টাক্টরী করা মানেই কোন প্রকার কাজ না পাওয়া বা কাজ করলেও বিল না পাওয়া। তাহলে এদের দোষ কোথায়? কিন্তু চাঁদাবাজদের ঠেকাতে এরা পুলিশের আশ্রয় নেয় না কেন? চাঁদাবাজরা যে অনেক আগেই পুলিশের আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য! চাঁদাবাজী করে যারা খায়, তাদের জীবনের নিরাপত্তা বড়ই প্রয়োজনীয় জিনিস। শুধুমাত্র ভয়ে চাঁদা দেয় এমন বোকা ব্যবসায়ী কমই আছে বা এ ধরণের চাঁদার অংক তেমন একটা বড় নয়। বড় চাঁদা দানকারী ব্যক্তিরা আরো বড় মাপের বুদ্ধির লোক। চাঁদাবাজদের দ্বারা কাজ আদায় করে বা তাদের দ্বারা নিজেদের নিরাপত্তা বিধান করে তবেই এরা চাঁদার কমিশনটা হাতছাড়া করে। ছাত্ররা যেহেতু বয়সে তরুণ আজকাল আর পড়াশুনায় তেমন একটা সময়ই ব্যয় করা লাগে না। অফুরন্ত অবসর। সরকারী ও বেসরকারী সকল পর্যায়ে যোগাযোগ ভাল। তাই অপরের নিরাপত্তা বিধান করে টাকা রোজগার রীতিমত হালাল পথে টাকা কামাবারই নামান্তর। আর পাস করলেই তো বেকারত্ব নামের অভিশাপে পড়তে হবে। তাই সকলের অলক্ষ্যে ছাত্র নেতারা এখন দেশের বেসরকারী পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব পালন করছেন।

এরা শুধু ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে জড়িত লোকদের জন্যই নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা করে না। এরা পাড়ায়-পাড়ায় জ্ঞানী-গুণী ও মা বোনদের ইজ্জতেরও রক্ষাকবচ। এদেরকে হাতের কাছেই পাওয়া যায়। এরা অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশের চাইতে বেশী বিশ্বস্ত ও কর্মতৎপর। সমস্যা একটাই। এরা নিজেদের মাঝে কর্মের প্রতিযোগিতায় দারুণ আপোষহীন। একজনকে রক্ষা করার জন্যই একাধিক গ্রুপ বা নেতার অতি আগ্রহ। তাই নেতার সংখ্যাবৃদ্ধিও সময়ের দাবী।

খালেদা জিয়ার আমলে সমগ্র দেশে ছাত্র সংসদ সমূহের নির্বাচনে ছাত্রদল পূর্বের চাইতেও বেশী হারে বিজয় হয়েছে। কিন্তু এ বিজয় তাদের অন্তদন্দ কমাতে পারেনি। কারণ বেসরকারী পুলিশী কাজে তাদের যথেষ্ট কদর বেড়েছে সর্বত্র। আর এ কাজটি সুচারুরূপে করা যায় যদি ছাত্র সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধি হওয়া যায়। একবার নির্বাচিত হলেই কর্মতৎপরতা দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ হয়ে পড়ে। নির্বাচিত না হলেও ক্ষতি নেই। পদপ্রার্থী বা মনোনয়ন প্রার্থী হলেও কাজ চলে। একটু খাটা খাটনি ও অন্তর ঝনঝনানি বেশী দরকার পড়ে আর কি! তাই বলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের সংসদ নির্বাচনে কারচুপি হয় এমনটি বলা যায় না। ডাকসুতেকারচুপির প্রশ্নই উঠে না। ব্যালট বক্স ডাকাতি অবশ্যই ঐতিহ্যের বাইরে নয়।

ছাত্র রাজনীতিঃ নিরস্ত্রীকরণে বিরোধী দল

সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে অবৈধ অস্ত্র খুঁজে বের করা। অবৈধ অস্ত্রধারীদের বিচার করা। কারাদন্ড দেয়া প্রয়োজনে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলানো। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসে সরকার বরারই অবৈধ

www.pathagar.com

অস্ত্রধারীদের কাছে অসহায়। শেখ মুজিব সরকার রক্ষীবাহীনী ব্যবহার করেও এদের সংখ্যা বা শক্তি কমাতে পারেন নি। গণবাহিনীর কাছে সরকারী বিভিন্ন বাহিনী নানাভাবে নাস্তানাবুদ হয়েছে। জিয়ার বিভিন্ন বাহিনী উপজাতীয়দের অবৈধ অস্ত্র পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করতে পারেনি। কালো টাকা ও অবৈধ অস্ত্র হচ্ছে এক ধরণের ভূতুড়ে ব্যবসা। এ ভূত আছর করলেই কংকালসার ছেলেটি হয়ে উঠে শক্তিমান পুরুষ। এসব শক্তিমান পুরুষদের মোকাবিলায় আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সরকার-যন্ত্র সহজে বড় ধরণের সাফল্য আশা করতে পারে না।

যেখানে সরকার ও সরকারী দল অবৈধ অস্ত্রের বিরুদ্ধে অসহায়, সেখানে বেসরকারী রাজনৈতিক দলগুলো কি করবে? আমাদের সরকার ও সরকারী নেতাদের সীমাবদ্ধতা অনেক। শক্ত আইন তার হাতে কম। শক্ত আইন করতে গেলে তা আবার কালাকানুন হয়ে যায়। ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের জন্য শেখ মুজিব ও তার সরকারকে কতই না নিন্দাবাদ দেয়া হয়েছে! কিন্তু আইনটি কেউ রদ করেনি, বরং এর ব্যবহারে ধন্য হয়েছে। যারা এ আইনটির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী বিষোদগার করেছে, তারাই এর ব্যবহার করেছে সবচেয়ে বেশী। শক্ত আইন কঠিনভাবে প্রয়োগ করলে তো সমাজের ক্ষমতাবানরা নাখোশ। লাখ লাখ লোক না খেয়ে মারা গেলেও ক্ষতি নেই। কলমের খোঁচায় যারা পুকুরচুরি করে তাদেরকে রক্ষায় সরকার ও আইন বড়ই সদয়। মানবতাবোধ আর কি!

অবৈধ অস্ত্রে হাজার হাজার লোক মারা পড়লেও মানবাধিকারের তেমন একটা ক্ষতি নেই। বিচার করে একজনকে ফাঁসী দিলে মানবাধিকার দরদী গোষ্ঠী খাপ্পা হয়ে যায়। খুনী মুনীরের জন্যও সে দরদ উথলে উঠে। সরকার তাই ভয়ে ভয়ে থাকে। বেসরকারী দলের সেসব ভয় নেই। তারা হতে পারে স্পষ্টবাদী, দাবী আদায়ে নিরলস। ছাত্র রাজনীতি এজন্য উর্বর ক্ষেত্র। ছাত্রনেতারা সে ক্ষেত্রের সফল চাষী।

ছাত্রনেতারা মরে না। একবার ছাত্রনেতা হয়ে গেলে দৈহিক মরণ পর্যন্ত তার মরণ হয় না, তাই সংখ্যায় এরা এখন প্রচুর। এদেরকে সাধারণ পুলিশ কিছুই করতে পারে না। বুদ্ধিতে, কর্মে, সাহসে ও ক্ষিপ্রতায় এরা সাধারণ পুলিশের চাইতে অনেক অগ্রসর। সাধারণ পুলিশরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাত্রনেতাদের "স্যার" বলে সম্বোধন করে। তাই এদেরকে মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন পড়ে পুলিশ অফিসারদের। পুলিশ অফিসাররা আবার চাকুরী সংক্রান্ত, পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত। অথচ ছাত্র নেতাদেরকে ঐসব সমস্যা নাগালেই পায় না।

এই ভূতুড়ে বাহিনী কিন্তু এখনও সমাজের সবচেয়ে সংবেদনশীল অংশ। বেসরকারী দলসমূহের কৌশলের কাছে এরা নতিস্বীকার করে। কারণ এরা সাধারণ ছাত্রদের হাবভাব আন্দাজ করে চলে। এরা সাধারণ ছাত্রমতের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজেদের অপমৃত্যু ঘটায় না সহজে, ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে ও থাকবে। গণবাহিনী সৃষ্টি করে জাসদ ক্ষমতায় যেতে পারেনি। কিন্তু জাসদ ছাত্রলীগ সাধারণ ছাত্রমতকে দারুণভাবে আচ্ছন্ন করতে সমর্থ হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের সম্মিলিত "লেলিন-সামা" প্যানেলের ভরাডুবি ঠেকাতে ব্যালট বক্স ছিনতাই করা ছাড়া উপায় ছিল না সরকারী দলের। অথচ ভোটের দিনও এ ফলাফল আন্দাজ করাযায় নি, অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী "লেনিন-সামার" ছবি বুকে এঁটে ভোট দিয়েছিল জাসদ ছাত্রলীগকে।

১৯৯৪ সালে বেসরকারী দল কি অনুরূপ অভূতপূর্ব বিজয় আনতে পারতনা! ডাকসুর ব্যালট বক্স ছিনতাই করা এখন পূর্বের যে কোন সময়ের চাইতে কঠিন। সরকারী দল অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ডাকসুর নির্বাচনে ভোট ডাকাতি করতে পারবে না। সকল ভোটারের পরিচ-পত্র থাকার ফলে কারচুপি সম্ভব নয়। তাহলে ১৯৯৪ সালের ডাকসু নির্বাচন পেছানোর জন্য ২৭ ও ২৯ শে মার্চ আওয়ামী ছাত্রলীগ কেন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখল? এ কৌশল আত্মঘাতী হয়েছে। সাধারণ ছাত্রমত জনমতের চাইতেও বেশী মারাত্মক অস্ত্র। ১৯৯৪ সালের ঢাকা, চট্টগ্রাম মেয়র নির্বাচনে জনমত সঠিকভাবেই যাচাই হয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্র নিস্ক্রিয় ছিল, ভোটের অস্ত্র গর্জেছিল।

www.pathagar.com

১৯৯৪– এর মেয়র নির্বাচন

সরাসরি জনগণের ভোটে মেয়র নির্বাচন পদ্ধতি খালেদা জিয়ার সরকারের উদ্যোগেই চালু হয়েছে। এর পেছনে যত সুন্দর সুন্দর গণতান্ত্রিক বক্তব্যই দেয়া হোক না কেন, মূলতঃ বি, এন, পি,র আরো কিছু নেতাকে ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করতে দেয়াই এর লক্ষ্য ছিল। ৯১'র সংসদ নির্বাচনে ঢাকার সাতটি নির্বাচনী এলাকা থেকে বি, এন, পি প্রার্থীর বিপুল ভোটের বিজয়ের কারণে সরকারী দলের নেতৃবৃন্দ এখানে পরাজয়ের কোন চিন্তাই করতে পারেনি। কিন্তু সরকারী দলের হিসেবে বেশ কিছু গলদ ছিল।

খালেদা জিয়ার সরকারের আমলেই জানা গিয়েছে, পৃথিবীর নিকৃষ্ট আবর্জনাতম রাজধানী শহর হচ্ছে, ঢাকা। এজন্য অবশ্য পূর্বের সবকটি সরকারই সমভাবে দায়ী। তবে সে দায়ভার খালেদা জিয়ার উপর এখন বেশী হারে নিপতিত হবে। কারণ তিনি ক্ষমতায় সমাসীন। দায়িত্ব তার সরকারেরই বেশী। '৯৪ 'র মেয়র নির্বাচনের পূর্বেই ঢাকার বাতাসে সরকারের জন্য বিরূপ গন্ধ বইতে শুরু করে। দিনের বেলায় দূর্গন্ধযুক্ত আবর্জনা পরিষ্কারের মত অতটা তীব্র গন্ধ অবশ্য এটি নয়। তবু সরকার প্রধাণ সহ প্রায় সকল মন্ত্রী উপমন্ত্রীর নাকেই সে গন্ধ অল্প-বিস্তার প্রবেশ করে। ব্যবস্থাও গৃহীত হয়। সকল মন্ত্রীই নির্বাচনী প্রচারাভিযানে নেমে পড়ে। প্রধাণমন্ত্রী প্রতিদিন কয়েকটি করে জনসভা করা ছাড়াও, বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে বেড়ান ভোট সংগ্রহের জন্য। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এটাই সুফল, চরম ক্ষমতাধর ব্যক্তিটিও নির্বাচনের পূর্বে ভোটারদের কাছে ভিক্ষে চাইতে বাধ্য। কিন্তু ভোট শেষেই তারা আবার সকলের নাগালের বহু দূরে। আমাদের দেশের জন্য কথাটি বেশী হারে সত্য, তাই গণতন্ত্রের কুফলও এখানে প্রকট।

নির্বাচনের সুফল কুফল যাই হোক,'৯৪ সালের মেয়র নির্বাচন ছিল দেশের দুই নেত্রীর মাঝে এক কঠিন যুদ্ধ। এবার শেখ হাসিনা বক্তব্যে ছিলেন শান্ত ও পরিশীলিত। হাঁক –ডাক নেই। সরকারের ব্যর্থতার বর্ণনায় অনেক ক্ষেত্রেই তার বক্তব্য ছিল হৃদয়গ্রাহী। নিজ দলের প্রার্থী নির্বাচনে দলের অভিজ্ঞ লোকদের মতামত দাম পেয়েছে অনেক বেশী। জনগণের আস্থা অর্জনে তিনি ছিলেন অনেক বেশী মনোযোগী। দাম্ভিকতাকে প্রশ্রয় দেননি। '৯১'র সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে টি, ভি, ভাষণের অনুরূপ করে কোন বক্তব্য রাখেননি। নিজেকে একজন বঙ্গীয় সম্ভ্রান্ত মুসলিম নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছেন। ফলও হয়েছে হাতে নাতেই।

আওয়ামীলীগ প্রার্থী হানিফ ঢাকার রাজনীতিতে প্রায় হারিয়ে যাওয়া একটি নাম ছিল এরশাদের উত্থানের পর। তার রিরুদ্ধে এরশাদ সরকারের সাথে হাত মেলানোর অভিযোগও ছিল। কিন্তু তেনমভবে প্রমাণিত হয়নি। মহসীন মন্টুর মত উচ্চাভিলাসী নেতা তিনি নন। দলের প্রতি তার নিষ্ঠার বহু প্রমাণ রয়েছে বৈ কি! পুরোনো ঢাকার সাথে তার প্রায় নাড়ীর সংযোগ। অথচ আব্বাস হচ্ছেন নতুন গজিয়ে ওঠা শহরে বাবুদেরই প্রতিনিধি। পুরোনো ঢাকার অধিবাসীরা তাই আব্বাস প্রীতি দেখায় কিভাবে।

আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে হানিফের বিপুল ভোটে জয়লাভ বি, এন, পি'র কল্পনার বাহিরে ছিল। নির্বাচনের পর সরকারী দলের নেতারা হানিফকে অভিন্দন জানাতে প্রথমে ভুলেই গিয়েছিল। পরে অবশ্য ঘটা করে তাকে মিষ্টিমুখ করিয়েছেন সবাই। সকলের অলক্ষেই হানিফ শহরবাসীর কাছে বিরাট ওয়াদা করেছেন। পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি কোন শহর কর বৃদ্ধি করবেন না। এ পথেও প্রচুর ভোট এসেছে মাছের পেটে। ব্যালট বক্সগুলো মাছের বাচ্চা বমি করার মতই হানিফের পক্ষে ভোটের যোগান দিয়েছে।

ঢাকাবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। খালেদা জিয়ার সরকারের অধীনে ঢাকা শহরের কর্তৃত্ব শেখ হাসিনার কাছে। কোন দল বা নেত্রী দ্বারা অত্যাচারিত বা অপমানিত হবার ভয় যেন একটু কমল জনগণের। জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস বুলিটি ক্ষমতাসীনদের মুখেই মানায় ভালো। কারণ তারাই হয়ত আসল জনগণ। সাধারণ ভূখা-নাঙ্গা মানুষও জনগণ। কিন্তু তারা নিরীহ। এখন এমনই নিরীহ যে ৫/১০ টাকার বিনিময়ে একটা ভোট বেচে দিতেও রাজী। কারণ এখন ভোটাভুটিতে এছাড়া আর প্রত্যক্ষ কোন লাভ নেই। তবুও এরা বিশ্বাসঘাতক নয়। যে দলের কাছ

www.pathagar.com

থেকে টাকা নেয়, তাকেই এরা ভোট দেয়। যে দল টাকা দেয় তার মিছিলেই যায়। মিছিলে যাবার মজুরীটাও ঠিকমত পায় না। কমিশন নিয়ে নেয় জননেতা, ছাত্রনেতা, শ্রমিক নেতা ও আরো নানা কিসিমের নেতারা।

তবুও এদের দরকার। ইতিহাস এরা গড়ে। নিজের রক্তের দাম এরা তেমন পায় না, কিন্তু ইতিহাস এদের রক্তেই গড়া। এদের ভোটেই '৯৪ 'র মেয়র নির্বাচনে সরকারী নেতাদের নাড়ী ভূড়ি ছিড়ে যাবার যোগাড়। কিন্তু বড় নেতাদের নার্ভ শক্ত। এসব তাদের গা-সওয়া। ছোট নেতারা বেসামাল। তাই লালবাগে দিন দুপুরে আজিজের হাতে ছয়জন খুন। আজিজ পাগল! না, সে উম্মাদ নয়। অবশ্য সে আখতারুজ্জামান বাবুর মত পাকা প্লেয়ার নয়। আমেরিকা এখনও তার জন্য দূরে। কিন্তু বাংলার মাটি তার জন্য বিস্তৃত-বিশাল। তাই কলকাতার মাটি তাকে হাতছানি দে। এটা এখন আমাদের ঐতিহ্য। বাঘা সিদ্দিকী থেকে শুরু করে শতে শতে ভাল -মন্দ বাংলাদেশী মানুষকে পালিয়ে ফিরতে হয় কলকাতার মাটিতে। এরা সবাই অপরাধী এমন নয়। সরকার, পুলিশ,মাস্তান, নেতাসহ ন্যায়-অন্যায় দু'ভাবেই ঢাকা থেকে গাঢাকা দিতে হয় কলকাতায়। মেয়র হানিফের ঢাকাতে যদি মান-সম্মান নিয়ে গা-ঢাকা দেয়া নাও যায়, তাতে বেশী আপত্তি নেই। কারণ বঙ্গবাসীর জন্য মান সম্মান এখন অনেক দূর্লভ বস্তু। কিন্তু নর্দমা ও আবর্জনার হাত থেকে যদি কিছুটা পরিত্রান পাওয়া যেত, তবেই এ নির্বাচনী বিজয় আওয়ামী লীগের জন্য আরো সফলতা বয়ে আনতে পারত।

যে সকল বইয়ের থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে

১. রাষ্ট্র চিন্তা পরিচিতি — আয়েশ্ উদ্দিন
২. রাষ্ট্র দর্শন — আয়েশ উদ্দিন
৩. রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কথা — ডঃ এমাজউদ্দীন আহমেদ
৪. রাষ্ট্র বিজ্ঞান — ডঃ ওদুদ ভূঁইয়া
৫. রাষ্ট্র বিজ্ঞান — ইউনুস ও আবদুর রাজ্জাক
৬. রাষ্ট্র বিজ্ঞান — সিরাজুল ইসলাম
৭. গ্রীক দর্শন — শাহজাহান কবীর/নুর ফাতেমা
৮. গ্রীক দর্শন — কমর উদ্দীন হোসাইন
৯. কান্টের দর্শন — কমর উদ্দীন হোসাইন
১০. সরকারের সমস্যাবলী — বিপুল রঞ্জন
১১. সরকারের সমস্যাবলী — ওদুদ ভূঁইয়া
১২. রাষ্ট্রবিজ্ঞান — মোজাম্মেল হক

www.pathagar.com